তোমরা ছিলে। ত্রিভঙ্গ-স্বাধীনতার তাড়নায় বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেলে। আমার এই দীর্ঘশ্বাসে তোমাদের অন্তিম তর্পণ।

॥ এক ॥

যবনিকা তুলছি।

এই শতকের প্রথম প'দ। মানুষেরা সেই সময়ের। গ্রামের চেহারা ভিন্ন।

আট বেহারার পালকি, গলা-ফাটানো ডাক ছাড়ছে। চারিদিকে তোলপাড়। সবাই জিজ্ঞাসা করে: কে চললেন হে?

সোনাখড়ির দেবনাথ ঘোষ।

বাইরেবাড়ি পালকি নামাল। ছেলেপুলে দৌড়চ্ছে। মেয়েরা খিড়কির দুয়ারে উঁকিঝুঁকি দেয়। ভবনাথ রোয়াক থেকে নেমে পালকির পাশে দাঁড়ালেন। দেবনাথ বেরিয়ে এলেন। ধবধবে ফরসা রং, মাথাজোড়া টাক, লম্বা-চওড়া দেহ। বললেন, গলায় বাঁশ দিয়ে চেঁচাচ্ছিল তোমার বেহারারা, কানে তালা ধরিয়ে দিয়েছে।

ভবনাথ হাসতে লাগলেন। দেবনাথ অনুযোগের কণ্ঠে বললেন, নাগরগোপে পালকি পাঠিয়েছ কেন দাদা? দেড়ক্রোশ পথ হাঁটতে পারব না, এতদূর অথর্ব হয়ে পড়েছি?

ভবনাথ বললেন, পারলেই হাঁটতে হবে তার কোন মানে আছে?

তুমি বড়ভাই হয়ে দশ ক্রোশ পথ কসবা অবধি হাঁটতে পার—তা-ও একদিন আধদিন নয়, পাঁচ-সাতবার মাসের মধ্যে—

ভবনাথ বললেন, হাঁটি তো সেইজন্যেই। গাড়ি-পালকির ভাড়া দিয়ে ফতুর হব নাকি? এক-আধদিন হলে পায়ে হাঁটি না পালকি চড়ি, বিবেচনা করতাম।

ভাইয়ের উপর হুমকি দিয়ে উঠলেন: বকবকানি থামাও দিকি। কষ্ট করে এলে, জিরিয়ে নাওগে।

সর্দার-বেহারা কেষ্ট মোড়ল কোমরের গামছা খুলে ঘাম মুছছে। তাকে দেখিয়ে দেবনাথ বলেন, পালকির খোল থেকে উঠোনে নেমে পড়লাম—আমার কি কষ্ট? কষ্ট ঐ ওদের। পায়ের কষ্টের চেয়ে বেশী কষ্ট গলার। যা চেঁচান চেঁচাচ্ছিল—গলা চিরে রক্ত বেরুবে, ভয় হচ্ছিল আমার।

পথে দেবনাথ মানা করেছিলেন: অত চেঁচিও না কেষ্ট।

কেষ্ট বলল, জোরডাক ডাকতে হবে, বড়কর্তা বলে দিয়েছেন। পালকি পাঠানোই সেইজন্যে। ছোটবাবু বাড়ি আসছেন, দশে-ধর্মে জানুক।

চাকরি নেবার পরেও দেবনাথ মতলব ছাড়েননি। বিদেশে পড়ে থাকবেন না তিনি, উকিল হয়ে কসবায় এসে বসবেন। মাসে একবার-দুবার বাড়ি যেতে পারবেন। যাতায়াতের অসুবিধাও দূর হয়েছে। সদর থেকে পায়ে হাঁটা কিম্বা গরুর-গাড়ি ভিন্ন উপায় ছিল না, এখন ঘোড়ার-গাড়ি চালু হয়েছে। মাদার বক্স আর কার্তিক ধরের তিনখানা করে ঘোড়ার-গাড়ি, আরও ক'জনের একখানা করে। কলকাতার উপর রয়েছেন দেবনাথ, কার্যবিধি বইগুলো ঝালিয়ে ঝুলিয়ে নিচ্ছেন, এবারে পরীক্ষা দেবেনই। এবং পাশও হবেন নির্ঘাৎ। কিন্তু আসলে বরবাদ—বাংলা-উকিলের রেওয়াজ উঠে গেল সেই বছরেই—এন্ট্রান্স পাশের পর প্লিডারশিপ পাশ না হলে উকিল হওয়া যাবে না। সাধ অতএব চিরতরে ঘুচে গেল, জমিদারি চাকরিতে দেবনাথ কায়েমি হয়ে রইলেন।

চাকরির আগেই ভবনাথ পনের বছুরে ভাইয়ের বিয়ে দিয়ে ন'বছুরে তরঙ্গিণীকে বউ করে এনেছিলেন। একবার দেবনাথ বাড়ি এলে তরঙ্গিণী এক কাণ্ড করে বসলেন। মেয়ে হয়েছে তখন—বিমলা। শহর কলকাতার নানান আজব গল্প শুনে মনে মনে লোভ হয়েছিল। চুপিচুপি স্বামীর কাছে বললেন, একলা পড়ে থাকো—বাসা করো না কেন কলকাতায়। আমি রেঁধেবেড়ে দিতে পারব, বিমিরও যত্ন হবে।

দেবনাথ বললেন: তোমার মেয়ের এবাড়ি বুঝি যত্ন নেই? খুবই অন্যায় কথা। তোমারও নেই, বুঝতে পারছি।

তখন অল্প বয়স—স্বামী বিদেশে পড়ে থাকেন। তরঙ্গিণী কতটুকুই বা বোঝেন তাঁকে। নালিশের বস্তা খুলে দিলেন—এর দোষ, তার দোষ। অমুক এই বলছিল, তমুক এই বলছিল। শতমুখে বলে গেলেন—বাসা করার পক্ষে তাতে যদি সুরাহা হয়।

চুপ করে শুনছিলেন দেবনাথ। অবশেষে কথা বললেন, তবে তো তোমার তিলার্ধ থাকা চলে না এ-সংসারে। কালই একটা এস্পার-ওস্পার করতে হবে।

দেবনাথের স্বর অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর। ভয় পেয়ে গেলেন তরঙ্গিণী: কী কাণ্ড করে বসেন না-জানি ও-মানুষ।

তখন আবার সামলে নিতে যান: তা কেন! মেয়েটাকে কোলে কাঁখে করতে পারিনে, সেই কথা বলছি। সংসারের খাটাখাটনি, সময় পাওয়া যায় না। দুধ খাওয়ানোর গরজে দু'বার-চারবার নিয়ে আসে—সেই সময় যা-একটু ধরতে পাই। বিনোর কোলে কোলে ঘোরে, দিদিরও বেশ ন্যাওটা। তাঁরা

কি আর যত্ন-আদর করেন না? তেমন কথা কেন বলতে যাব? তাহলেও মায়ের টান আলাদা, পুরুষ হয়ে সে-জিনিষ বুঝবে না।

হেসে তরল কণ্ঠে বলেন, নতুন বুলি ফুটেছে মেয়ের—বা-বা বা-বা করে। দু'বছর বয়স হল, বাবাকে চেনেই না মোটে। দেখল কবে যে চিনবে?

তা সে যেমন করেই বলো, ভবী ভোলবার নয়। রান্নাঘরের দাওয়ায় পরদিন পাশাপাশি দু' ভাই খেতে বসেছেন—মেয়ে-বউ সব রাঁধাবাড়া দেওয়া থোওয়া নিয়ে ব্যস্ত। দেবনাথ বললেন, দাদা, ছোটবউর উপর বাড়ির সবসুদ্ধ বিষম অত্যাচার করছে।

স্তম্ভিত ভবনাথ। বললেন, সে কি রে!

অত্যাচার কি এক-আধ রকম! তার হেনস্থা, মেয়ের অযত্ন—মোটের উপর, বাড়ির কেউ দু' চক্ষে ওদের দেখতে পারে না। বড্ড ঘুম আসছিল তখন, সব কথা আমার মনে নেই। কলকাতায় বাসা করতে বলছে। কিন্তু বাসা হলেও কাউকে বাদ দিয়ে তো হবে না—আশ্রিত-প্রতিপাল্য চাকর-মাহিন্দার সকলকে নিয়ে বাসা। জমিদারের নায়েব হয়ে অত খরচা কোত্থেকে কুলোব? তার চেয়ে ছোটবউকেই বাপের-বাড়ি পাঠানো ভাল। এক মায়ের এক মেয়ে—থাকবে ভাল, খাবে ভাল, মেয়ে নিয়ে সারাক্ষণ আদর-সোহাগ করতে পারবে—

থামো—বলে ভবনাথ ভাইকে থামিয়ে তরঙ্গিণীকে ডাকতে লাগলেন: মা, ওমা—

তরঙ্গিণী দরজার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছেন। দেবনাথের কথা সব কানে গেছে, তিনি মরমে মরে আছেন।

ভবনাথ বললেন, আমার সঙ্গে তো কথা বলবে না মা। অসুবিধের কথা খুলে সমস্ত তোমার বড়জাকে বলো—

দেবনাথ বলে উঠলেন, বউদিদিই তো বড় শত্রু। শত্রু কে নয় এ-বাড়ির মধ্যে? শোন দাদা, তালিতুলি দিয়ে চালানোর অবস্থা আর নেই। দু দিনের তরে বাড়ি এসেছি—আমার কানে পর্যন্ত উঠেছে—বুঝলে না? ঐ আমি যা বললাম, তাছাড়া ওষুধ নেই।

ভবনাথ হুঙ্কার দিয়ে ভাইকে নিরস্ত করলেন: থাক্। মাতব্বরি করতে হবে না—চিরকেলে মোটাবুদ্ধি তোমার। বউমাকে এ-সংসারে আমি এনেছি। দায়িত্ব আমার—যা করতে হয়, আমি বুঝব সেটা। বাপের-বাড়ি পাঠাতে হয়তো সে বড়বউকে। সে আগে এসেছে, বউমা পরে। কেন সে মানিয়ে-গুছিয়ে চলতে পারে না।

তরঙ্গিণী মনে মনে ভাবছেন : বয়ে গেছে বাপের-বাড়ি যেতে। বললেই গেলাম আর কি! যিনি পাঠাতে চান, তিনি তো কর্তা নন। আসল-কর্তা আমার দিকে। খাও কলা।

এরপর ভবনাথ উমাসুন্দরীকে নিয়ে পড়লেন : মানিয়ে-গুছিয়ে চলতে না পারো তো সংসারের বড় হয়েছ কেন? মাথা আমার হেঁট করে দিলে।

ভয় পেয়ে উমাসুন্দরী বললেন, আমি কি করলাম?

যা-সমস্ত করবার, করোনি তুমি। বাপেরবাড়ি তোমারই চলে যাওয়া উচিত। এককোঁটা মেয়ে এনে তোমার সংসারে দিলাম—দশ-দশটা বছরেও বাঁধতে পারলে না, চলে যাবার কথা বলে।

উমাসুন্দরী চোখ মুছলেন। দোষ তাঁরই—কৈফিয়তের কিছু নেই। এর পরে তরঙ্গিণীর ডাক পড়ল। ভাসুরের ঘরে গেলেন না তিনি, দরজার বাইরে দাঁড়ালেন।

ভবনাথ বলেন, স্বয়ং লক্ষ্মী-ঠাকরুনকে খুঁজেপেতে ঘরে এনে প্রতিষ্ঠা করেছি। সংসার উথলে উঠছে সেই থেকে। কিসের ব্যথা আমায় বলো মা। আমি তোমায় এনেছি, কষ্টের আমি বিহিত করব।

ঘাড় নাড়লেন তরঙ্গিণী, কোন ব্যথা নেই। কোন অভিযোগ নেই তাঁর।

দেবনাথের উপর অভিমানে দু' চোখে ধারা গড়াচ্ছে। একটুকু কথা থেকে কত বড় কাণ্ড জমিয়ে তুললেন বাড়ি মধ্যে। লজ্জায় কারো পানে তিনি মুখ তুলতে পারেন না।

•

কথাবার্তা বন্ধ দেবনাথের সঙ্গে। রাত্রিবেলাতেও না। আষ্টেপিষ্টে কাপড় জড়িয়ে মেয়ে নিয়ে এক প্রান্তে শুয়ে থাকেন। কাঁচা বয়স তখন দেবনাথের—বারো মাস বিদেশে পড়ে থাকেন, কয়েকটা দিনের জন্য বাড়ি এসেছেন, তার মধ্যে এই বিপত্তি। হাত ধরে কাছে টেনে—দুটো খোশামুদির কথা বললেন, তরঙ্গিণী অমনি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন।

বিপাকে পড়ে দেবনাথ উমাসুন্দরীকে ধরলেন : ছিঁচকাঁদুনে নিয়ে মুশকিল হল বউঠান। উপায় কি বলো।

উমাসুন্দরীর রাগ আছে, কথা ঝেড়ে ফেলে দিলেন একেবারে : আমি কিছু জানিনে ভাই। কর্তার কাছে লাগানি-ভাঙানি করতে গিয়েছিলে যেমন। এক-বিছানায় শুয়ে মেয়েমানুষে অমন কত কি বলে থাকে। আমরাও বলেছি। ভাইয়ের কাছে পুটপুট করে সমস্ত বলতে হবে, এমন কখনো শুনিনি। বলবার ছিল তো আমায় বলতে পারতে। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে গিয়েছিলে যেমন—হাত ধরে না হয় তো পা জড়িয়ে ধরোগে যাও। আমি জানিনে।

॥ দুই ॥

পুরোনো কথা এমনি বিস্তর আছে। ভবনাথ আর দেবনাথ রাম-লক্ষ্মণ বলে গাঁয়ের লোক তুলনা দিয়ে থাকে। সৌভাগ্য উথলে উঠছে। তরঙ্গিণীর মেয়ের পর মেয়ে হতে লাগল—পরপর তিনটি। ছেলের আশা সকলে ছেড়ে দিয়েছিল, তা-ও হয়েছে। ছেলের নাম কমল—পয়মন্ত ছেলে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই দেবনাথের পদোন্নতি—সদর-নায়েব থেকে ম্যানেজার। খরার সময় শরিকী প্রাচীন পুকুরের জল খারাপ হয়ে যায়—এবারে শীতকালে বাগের মধ্যে নিজেদের নতুন পুকুর কাটা হয়েছে। কিস্তির খাজনা কালেকটারীতে জমা দিয়ে হাইকোর্টের কিছু মামলা-মোকদ্দমার কাজ সেরে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে দেবনাথ বাড়ি এসেছেন। থাকবেন কিছুদিন,—সারা জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে আম-কাঁঠাল খেয়ে তারপর যাবেন। ভাল ভাল কলমের চারা নিয়ে এসেছেন এক বিখ্যাত লোকের বাগান থেকে—আম, লিচু, গোলাপজাম, জামরুল, সপেটা, বিলাতিগাব—গন্ধমাদন বিশেষ। চারাগুলো কসবা থেকে দুখানা গরুর-গাড়ি বোঝাই হয়ে পরম যত্নে আসছে। কাছারির দুজন বরকন্দাজ সঙ্গে এসেছেন, তাদের উপর চারা পৌঁছে দেবার দায়িত্ব, সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছে যাবে তারা। পুকুরের তোলা মাটিতে গাছ লাগালে ধাঁ ধাঁ করে বড় হয়ে উঠবে—জমিদারির শতেক কাজের মধ্যেও সে খেয়াল আছে। বাড়ির কথা দেবনাথ তিলেকের তরে ভুলতে পারেন না। বাড়ি কেন, সারা সোনাখাড়ি গ্রাম তাঁর নখদর্পণে। গাঁয়ের লোক পেলে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়শিদের খবরাখবর নেন।

একটা এস্টেটের ম্যানেজার নাগরগোপে বাস থেকে নেমে টং-টং করে বাড়ি পর্যন্ত হাঁটবে, সে কেমন। ভবনাথ অতএব পালকির ব্যবস্থা করলেন। খুব একটা অন্যায় অপব্যয় নাকি? হয়ে থাকে হয়েছে—পুববাড়ির বড়কর্তা কারো কাছে কৈফিয়তের ধার ধারেন না।

দুই মাহিন্দার আজ মাসখানেক ধরে চারাগাছের বেড় বুনেছে, বাদামতলায় গাদা দেওয়া রয়েছে সেগুলো। সারা বিকাল ভবনাথ ও দেবনাথ দুই ভাই বাগান ও নতুনপুকুরের চারি পাড়ে ঘুরছেন, মাহিন্দার শিশুবর কোদালি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আছে। আষাঢ়ে চারাপোনা বেচতে আসবে, রুই, কাতলা, মৃগেল—সে তো ছাড়া হবেই। তাছাড়াও এখানটা এই কাঁঠালগাছের পাশ দিয়ে নালা কেটে বিলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যাক। শিশুবর, ক' কোদাল মাটি কেটে নিশানা কর দিকি জায়গাটা। বিলের নিখরচার মাছ নালার পথে পুকুরে এসে ঢুকবে।

চারার গাড়ি এসে পৌঁছনোর পর কোন চারা কোথায় পোঁতা হবে, তারও ভাবনাচিন্তা বিচারবিবেচনা হচ্ছে। কোদালের কোপ দিয়ে শিশুবর জায়গা চিহ্নিত করে যাচ্ছে। সকাল থেকেই গর্ত খুঁড়ে পোঁতার কাজ আরম্ভ। চারা কম নয়, এবেলা-ওবেলা সমস্তটা দিন লেগে যাবে।

দেবনাথ বললেন, গোলাপখাস বিলের ধারে দিও না দাদা। কাঁচা থাকতেই আমে লালের ছোপ ধরে যায়—চাষারা লাঙল চষতে এসে, ঢিল আর এড়ো মেরে কাঁচা আমই শেষ করে ফেলবে, পাকা অবধি সবুর করবে না। গোলাপখাস বাড়ির ধারে দাও, বরঞ্চ গোপলাধোবা ওখানে। গোপলাধোবা পেকে গেলেও বোঝা যায় না, উপরটা কাঁচা থাকে। আর কাঁচামিঠে বাগের ভিতরেই না, উঠোনের এক পাশে। কাঁচা অবস্থায় খেতে হয়, পাকলে বিস্বাদ হয়ে যায়। নজরের উপর না থাকলে এ-আমের গুঁটিই খেয়ে ফেলবে মানুষে, বড় হতে দেবে না। আর একরকম এনেছি দাদা, বিষম টোকো—

নামেই ভবনাথ চমকে গেলেন, দেবনাথ মিটিমিটি হাসছেন।

ভবনাথ বলেন, টোকো আমের অভাব আছে ? ঝঞ্চাট করে ও আবার আনতে গেলে কেন ?

দেবনাথ বললেন, নামেই শুধু টক—আমে টকের ভাঁজও নেই। ভারি মিষ্টি আম।

গাছে নতুন আম ফললে পাড়ার লোকে নাকি জিজ্ঞাসা করেছিল : কেমন, আম, টক না মিষ্টি ? মুখ বাঁকিয়ে মালিক জবাব দিয়েছিল : বিষম টক। কোনো লোক তলার দিকে আসবে না, গাছের সব ক'টি আম নির্বিঘ্নে নিজেরা খাবে—ভয়-ধরানো নাম সেইজন্য। তারপরে অবশ্য সব জানাজানি হয়ে গেল—আমের নামে তবু কলঙ্ক রয়ে গেল—'বিষম-টোকো'।

চারা পৌঁছতে বেশি রাত্রি হয়ে গেল। তা হোকগে, রোপণ তো কাল। যোগাযোগটা ভাল, পাঁজির মতে বৃক্ষরোপণের দিনও বটে আগামীকাল। বিকেল তিনটা-পাঁচ থেকে ছ'টা-ছত্রিশ। অঢেল সময়, তিন ঘণ্টারও বেশি। সকালবেলার দিকে গর্ত খোঁড়া সমাধা করে রাখবে। সেই গর্তে নির্দিষ্ট চারা নামিয়ে কিছু ঝুরো মাটি ভিতরে ছড়িয়ে দিয়ে পরের গর্তে চলে যাবে। বাকি সমস্ত কাজ—গর্ত ভরাট করা, ঘের বসানো মাহিন্দার দু'জন শেষ করবে। কঞ্চির বুনানি গোলাকার ঘের বানিয়ে রেখেছে—চারা বেড় দিয়ে বসিয়ে দেবে, গরু ছাগলে খেতে না পারে। চারা বড় হচ্ছে, ওদিকে রোদবৃষ্টি খেয়ে খেয়ে ঘেরও জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তারপরে একদিন ভেঙে পড়বে—চারা তখন গাছ হয়ে গেছে, ঘেরের আর প্রয়োজন নেই।

গাছ পোঁতা—এ-ও যেন এক পরব। কবি-মনোভাব দেবনাথের (অল্পসল্প লেখেনও)—যে কাজে হাত দেন, কাজটা যেন আলাদা এক চেহারা নিয়ে নেয়। বাড়ির লোক বাগের মধ্যে এসে জুটেছে। ভবনাথ, দেবনাথ তো আছেনই, ভবনাথের তিন ছেলে—কৃষ্ণময়, কালীময় ও হিরন্ময় এবং মেয়ে নির্মলা, আর দেবনাথের মেয়ে পুঁটি। কমললোচন বাচ্চাছেলে, দিদি পুঁটির হাত ধরে সে-ও এসেছে। পুঁটির উপরের মেয়ে চঞ্চলা শ্বশুরবাড়িতে, মচ্ছবের মধ্যে সে নেই। আর বউ-গিন্নিরাও আসতে পারেন নি বাইরের এত মানুষের সামনে—গাছ পোঁতার ব্যাপারে তাঁরা সব বাড়ি রয়ে গেছেন।

দেবনাথ বলছেন, চারা গর্তে দেবার সময় সবাই একটু করে হাত ঠেকিয়ে দাও, একমুঠো করে মাটি দিয়ে দাও গোড়ায়। কেউ বাদ থাকবে না।

কমলের হাত নিয়ে চারায় ঠেকানো হচ্ছে, মাটিতেও একটুকু হাত ছুঁইয়ে দিয়ে সে মাটি গর্তে ফেলছে। দেবনাথ বললেন, সকলের হাতের পোঁতা গাছ। নিজের গাছ বলে মমতা হবে, ডালখানা কাটতেও প্রাণে লাগবে। এই কমল ছোট্ট এখন, কোন-কিছু বোঝে না—কিন্তু বড় হয়ে সমস্ত শুনে গাছপালার উপর অপত্যস্নেহ জাগবে ওর।

পাড়ায় চাউর হয়ে গেছে। ব্যাপারটা শুধু আর পুববাড়ির মধ্যে নেই। নিত্যিদিনের খাওয়া পরার বাড়তি কিছু হলেই গ্রামের মানুষ ঝুঁকে এসে পড়বে। তারিফ করছে সকলে দেবনাথের: শুনে যাও—চেয়ে দেখ। কোন কালে কি হবে, মাথার ভিতরে সেই ভবিষ্যদিনের ভাবনা। বিদেশের ভাল ভাল মানুষের সঙ্গে ওঠা-বসার ফলে এমনি সব চিন্তাভাবনা আসে।

বাগের কলরব বাড়ির মধ্যে দক্ষিণের ঘর অবধি এসেছে। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখে তরঙ্গিণীর দু'চোখ জলে ভরে গেল। কৃষ্ণময়ের বউ অলকা কি কাজে ঘরে এসেছে। তরঙ্গিণী সামলাবার সময় পাননি, দেখে ফেলেছে সে। কাছে এসে প্রশ্ন করে: ছোটমা, কি হয়েছে?

কিছু হয়নি—কী আবার হবে! তুমি যাও।

অলকা নড়ে না। নিজের আঁচলে খুড়শাশুড়ির চোখ মুছিয়ে দিল। বলে, বলো। কেন কাঁদছ, বলো আমায়।

একটা জিনিস মনে উঠল। বলে, কাকামশায় কিছু বলেছেন নাকি?

তরঙ্গিণী ঝেড়ে ফেলে দিলেন: না না, উনি কি বলবেন। দেখাই বা হল কোথায়?

অলকাকে তারপর সামাল করে দেন: কাউকে এসব বলতে যেও না

বউমা, সবাই মিলে ওখানে আনন্দ করছে—আমার চোখে জল। খুবই খারাপ সত্যি।

জেদ ধরে অলকা বলে, কী হয়েছে বলো তবে।

একমুহূর্ত নিঃশব্দে তরঙ্গিণী তাকিয়ে রইলেন। ঠোঁট দুটো অকস্মাৎ কেঁপে উঠল। বললেন, আমার বিমি থাকলেও বাগে গিয়ে কত আহ্লাদ করত।

ধৈর্য হারিয়ে হাউ-হাউ করে তিনি কেঁদে উঠলেন।

নয় বছরেরটি হয়ে মারা গিয়েছিল তরঙ্গিণীর প্রথম সন্তান বিমি—বিমলা। কত কাল হয়ে গেছে। আচমকা কেন জানি একদিন বিমলা বলেছিল, আমি মরে গেলে, মা, তোমার উনুনে কাঠ দেবে কে?

তরঙ্গিণী বিষম এক ধমক দিলেন: চোপ। একফোঁটা মেয়ে তার পাকা পাকা কথা শোন।

উঠানে কলাই শুকোতে দেওয়া আছে। আকাশ-ভরা মেঘ—ছড়-ছড় করে বৃষ্টি নামল। অকালবর্ষা। ভিজে গেল রে সব, ভিজে গেল। ও বিমি—

কোথায় ছিল বিমলা, ছুটে এসে পড়ল। বাতাস বেধে রাঙা শাড়িটুকু ফুলে উঠেছে—পাখনা-মেলা পরীর মত উড়ে এলো যেন। তরঙ্গিণী কুনকে ভরে দিচ্ছেন, মেয়ে বয়ে বয়ে ঘরে নিচ্ছে। মেজেয় ঢেলে আবার কুনকে নিয়ে আসে।

কাঁথা সেলাই করেন তরঙ্গিণী কাঁথার ডালা নিয়ে। পাশে বসে বিমলাও পুতুলের কাপড় সামান্য এক ন্যাকড়ার টুকরোর উপর ফুল তোলে।

সেই মেয়ের ভেদবমি। কবিরাজ জল বন্ধ করে গেছেন, আর বিমলা 'জল' 'জল' করে আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে: দাও মা জল—একটুখানি দাও। কবিরাজ টের পাবে না।

সামনে থাকলে এমনি তো করবে অবিরত—তরঙ্গিণী একটু আড়ালে গিয়েছেন, মেয়ে সেই ফাঁকে গড়াতে গড়াতে একেবারে জলের কলসির কাছে। কলসিতে জল কোথা, খালি কলসি ঢনঢন করছে।

তরঙ্গিণী অবাক হয়ে বললেন, তক্তাপোষ থেকে নেমে পড়েছিস—কেন রে?

জল দাও—

মেয়েকে আলগোছে আবার উপরে তুলে দিয়ে তরঙ্গিণী বললেন, কষ্ট করে একটু থাক্ মা, সেরে ওঠ্। কত জল খেতে চাস খাবি তখন।

ঘুমোল মেয়ে। মা ঘুরেফিরে আসেন, আর গায়ে হাত দেন। ঠাণ্ডাই তো। চুপচাপ ঘুমুচ্ছে—তবে আর কি! বাগের মধ্যে কুয়োপাখি ডাকছে: কুব-কুব-

কুব। অকক্ পাখি ডেকে জানান দিল দুই প্রহর হয়ে গেছে। ভুতুম ডেকে উঠল বাদামগাছ থেকে। তরঙ্গিণীর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ঝিঁঝিপোকারা কাঁদছে যেন। জোনাকি আজ রাত্রে বড্ড বেশি।

হাত-পা ঠাণ্ডা যে মেয়ের। লোকজন ভেঙে এসেছে। সোনার বিমি আমার, চোখ মেল্, 'মা' বলে ডাক্ একটিবার তুই—

বিমলার দেহ শ্মশানে নিয়ে যায়। অল্প অল্প রোদ উঠেছে। মরেছে বিমলা, কে বলবে। গায়ের রং ঝিকমিক করছে। মুখে হাসি লেগে আছে। রোগের যন্ত্রণা নেই, জল তেষ্টা পাচ্ছে না আর—

কত কাল গেছে তারপর।

দু-বছর আগে এমনিধারা বৈশাখ মাসের দিনে বাড়িতে বৃহৎ উৎসব। ভবনাথের মেয়ে নিমি আর দেবনাথের দ্বিতীয় মেয়ে চঞ্চলার একই রাত্রে বিয়ে। ঢোল কাঁসি সানাই নিয়ে দেশি বাজনা, জয়ঢাক ব্যাণ্ড কর্নেট নিয়ে বিলাতি বাজনা। গ্রাম তোলপাড়। দুড়ুম-দাড়াম গেঁটেবন্দুক ফুটছে, ঘট-বাজি সরাবাজি চরকি হাউই দীপক-বাজি হরেক রকমের। ভোজের পর ভোজ চলছে, যেন তার মুড়োদাঁড়া নেই। বিয়ের প্রীতিউপহার ছাপানোর নতুন রেওয়াজ উঠেছে—শহুরে বাসিন্দা দেবনাথ মেয়ে-ভাইঝির বিয়ের তা-ও ছাপিয়ে এনেছেন। আলাদা ধরণের পদ্য—আর দশ জায়গায় যা দেয়, সে জিনিস নয় :

> কখনো কন্যা কামনা কেউ যেন না করে,
> ভুজঙ্গের হার গলে সাধ করে কেবা পরে?
> মাতৃদায় পিতৃদায় এর কাছে লাগে কোথায়,
> কন্যাদায়ে হায় হায়, কান্নাকাটি ঘরে ঘরে।···

আনন্দ-সমারোহের মধ্যে কারো মনে পড়ল না একফোঁটা বিমির কথা, বেঁচে থাকলে আগেই তার বিয়ে হয়ে যেত। পালকি করে কোলে কাঁখে একটি-দুটি নিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে বোনেদের বিয়েয় চলে আসত সে। সবাই বিমিকে ভুলে গেছে—তরঙ্গিণী সেদিনও খুব গোপনে চোখের জল মুছেছিলেন, কেউ টের পায় নি। আজকে হঠাৎ ধরা পড়ে গেলেন।

চারা পোঁতা সারা হতে প্রায় সন্ধ্যা। নতুনপুকুরে তালের গুঁড়ির ঘাটে নেমে দেবনাথ ডুব দিয়ে দিয়ে অবগাহন-স্নান করলেন, গায়ের কাদামাটি ধুলেন। দেহ কিন্তু ঠাণ্ডা হয় না। পুকুরের ধারে কাছে গাছপালা নেই। শুধু কয়েকটা নারকেল-চারা পোঁতা হয়েছে ক'দিন। সারাদিনের ঠা-ঠা রোদে জল

একেবারে আগুন হয়ে আছে। গুমট গরম, লেশমাত্র হাওয়া নেই, গাছের পাতাটি কাঁপে না।

পাঁচিলের দরজার ডান দিকে তুলসীমঞ্চ। শ্বেততুলসী কৃষ্ণতুলসী দুই রকমের দুটো গাছ, ক্ষুদে ক্ষুদে চারাও আছে। মাটি দিয়ে গোঁড়া বাঁধানো, লেপা-পোঁছা, ঝকঝক তকতক করছে, পালেপার্বণে আলপনা দেয়। মাথার উপরে ঝারি দুটো—নিচু খুঁটি পুঁতে আড় বেঁধে ছিদ্রকুম্ভ ঝুলিয়ে দিয়েছে, কুম্ভের ভিতরে জল। টপটপ করে অহর্নিশি ফোঁটায় ফোঁটায় তুলসীর মাথায় জল পড়ছে। জল এক ফুরিয়ে যায়, কুম্ভ পরিপূর্ণ করে দেয় আবার। সারা বৈশাখ ধরে তুলসী-সেবা চলবে, তাপের ছোঁয়া এতটুকু না লাগে। আদর পেয়ে পেয়ে গাছের বাড়-বৃদ্ধি বিষম, বড় বড় পাতা—পাতায় ডালে ছত্রাকার হয়েছে।

নিমি তুলসীতলায় পিদ্দিম এনে রাখল, ধূপধুনো দিচ্ছে। দেবনাথ ঢুকে পড়ে পিছনটাতে দাঁড়িয়ে পড়লেন। নিঃশব্দে দেখছেন। আঁচলটা গলায় বেড় দিয়ে মাটিতে মাথা রেখে বিড়বিড় করে কী সব বলছে। মাথা তুলে দেবনাথকে দেখল।

সকৌতুকে দেবনাথ জিজ্ঞাসা করেন : কী মন্তোর পড়ছিলি রে?

শুনবে কাকাবাবু? শোন—

হাসতে হাসতে বলে যাচ্ছে :

তুলসী তুলসী নারায়ণ
তুমি তুলসী বৃন্দাবন
তোমার তলায় দিয়ে বাতি
হয় যেন মোর স্বর্গে গতি।

পিদ্দিম দিয়ে সব মেয়ে এই বলে থাকে, নিমিও বলেছে। দেবনাথের বুকের মধ্যে তবু মোচড় দিয়ে উঠল। একফোঁটা মেয়ের স্বর্গচিন্তা—সংসার বিষিয়ে উঠছে। আগের দিন হলে কাকা-ভাইঝিতে হাসিতামাসা হয়তো চলত—আজকে দেবনাথ আর দাঁড়াতে পারলেন না, মুখ ফিরিয়ে ঘরে চলে গেলেন।

দু বছর আগে এমনি বৈশাখ মাসের দিনে আশাসুখে দুই মেয়ের দিয়ে দিয়েছিলেন—দেবনাথের নিজের মেয়ে চঞ্চলা, আর ভবনাথের মেয়ে নিমি—নির্মলা। একই তারিখে—নিমির গোধূলিলগ্নে হল, আর চঞ্চলার হল দশটা পঁচিশ মিনিট গতে।

চঞ্চলা শ্বশুরবাড়িতে সুখেস্বচ্ছন্দে আছে—এক দোষ, তারা বউ পাঠাতে

চায় না মোটে। তরঙ্গিণী বেয়ানকে দোষেন আর নাকিকান্না কেঁদে বেড়ান। নিমির বেলা উল্টো—একেবারেই তারা বউ নেয় না। এবং এঁদেরও পাঠাতে আপত্তি। ভবনাথ বিয়ের আগে পাত্রের বৈষয়িক খোঁজখবর নিখুঁতভাবে নিয়েছিলেন, কিন্তু খোদ পাত্র নিয়ে তত মাথা ঘামান নি। কানে আপনা-আপনি কিছু এসেছিল, তিনি উড়িয়ে দিলেন : জ্ঞাতি-শত্রুরা ভাংচি দিচ্ছে, ওসবে কান দিতে গেলে পল্লীগ্রামে কারোই কোনদিন বিয়ে হবে না। বাহির-টান একটু-আধটু যদি থাকেও—বেটাছেলের অমন থেকে থাকে, সে কিছু ধর্তব্য নয়—বিয়ের পরে শুধরে যায়। বাজিবাজনা করে বিস্তর আড়ম্বরে বিয়ে হয়ে গেল—আর দু'টো বছর না যেতেই মেয়েটা যেন যোগিনী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠাকুর-দেবতার উপর ভক্তি বেড়ে গেছে, দেবস্থান দেখলেই মাথা খোঁড়ে।

দালানকোঠা দেবনাথের পছন্দ নয়, বাড়ি এসে খড়ের ঘরে থাকেন তিনি। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ঘর—দেয়াল অবশ্য পাকা, কিন্তু চাল খড়ের মেঝে মাটির। দুদিকে দুটো দাওয়া আছে—দক্ষিণের দাওয়া, উত্তরের দাওয়া। দেবনাথ দক্ষিণের দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে নিয়ে বসলেন। নিমি কোন দিকে ছিল—ছুটে এসে ধবধবে তাকিয়া পিঠের দিকে দিল। তালপাতা-পাখা নিয়ে পাশে বসে বাতাস করছে। সামনে উঠান আছে একটা, ধান উঠলে তখন এই উঠানের গরজ—মলা-ডলা সমস্ত এখানে। এখন ঘাসবন হয়ে আছে। বাঁ-হাতে গোয়াল, ডাইনে কাঠকুটো রাখবার চালাঘর আর সামনাসামনি এজমালি কানাপুকুর। দামে ও হোগলায় পুকুর প্রায় আচ্ছন্ন—পাড়ের কাছে খানিকটা অংশে জল পাওয়া যায়, বাসন মাজাটা চলে সেখানে। গিন্নি-বউদের কায়ক্লেশে আগে স্নানও সারতে হত, বাগের পুকুর কাটা হয়ে সে দুঃখের অবসান হয়েছে। বাতাস বন্ধ। কানাপুকুর-পাড়ে ডালপালা-মেলানো প্রাচীন টুরে-আমগাছ, একটি পাতা নড়ছে না গাছের এখন।

খাওয়াদাওয়া সেরে এবং ভবনাথের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পগাছা করে দেবনাথ আবার দক্ষিণের দাওয়ায় এলেন। মাদুর তাকিয়া পাখা সেইখানেই আছে। ভিন্ন অবস্থা এখন। হাওয়া দিচ্ছে, ডালপালা দুলছে। চাঁদ উঠে গেছে খানিক আগে। বসা নয়—তাকিয়া মাথায় দিয়ে গড়িয়ে পড়লেন তিনি। গ্রাম নিশুত, এ-বাড়ির রান্নাঘরের পাট এখনো বোধহয় কিছু বাকি। তরঙ্গিণী ঘরে আসেন নি। জোনাকি উড়ছে গোয়ালের ধারে, হাসনুহানার ঝাড়ে জমেছেও বিস্তর—জ্বলছে আর নিভছে। টুরে-গাছের ছোট ছোট আম, কিন্তু মধুর মতন মিষ্টি। ফলেছেও অফুরন্ত। কিন্তু হলে হবে কি—বড্ড নরম বোঁটা, হাওয়ার ভর সয় না। হাওয়ায় তো পড়ছেই, আবার বাদুড়ের ঝাঁক ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে পড়ছে আমডালের উপর। টুপ-টুপ করে তলায়

গেয়ে চলে যাবে—এ মেয়ের তর সয় না। বৈরাগী গাইতে গাইতে আসছেন। ঠাকুর-দেবতাদের গান- হরি-কথা, কৃষ্ণ-কথা। পুণ্যমাস বৈশাখে ঠাকুরের নাম কানে নিয়ে দিনের কাজকর্মের আরম্ভ। বৈশাখে হচ্ছে, এর পর আবার কার্তিক মাসে—পয়লা তারিখ থেকে সে-ও পুরো মাস। বছরের বারো মাসের মধ্যে দুটো মাস এই প্রভাতী গান।

বকুলফুল সারা রাত্তির ঝরেছে, তারই উপর দিয়ে গুটিগুটি আসছেন। কী মধুর গলাখানি, প্রাণ কেড়ে নেয়। আহ্লাদ বৈরাগী, দু-ক্রোশ দূরে হরিহর নদের ধারে মধ্যকূল গ্রামে বাড়ি। সোনাখড়িতে এসে ওঠেন, তখনো বেশ রাত্রি—আকাশে তারা ঝিকঝিক করে। আর গ্রাম পরিক্রমা যখন শেষ হয়, রোদ উঠে যায় দস্তুরমতো। আহ্লাদের বয়স বেশি নয়—কচি কচি মুখ, কিন্তু সমস্ত চুল পেকে গেছে, ভ্রূ অবধি পাকা। অন্ধ—চোখ বুঁজে পথ চলেন, কদাচিৎ যখন চোখ মেলেন—শূন্যদৃষ্টি। এক বৃদ্ধা আগে যাচ্ছেন—আহ্লাদ বৈরাগীর মা। কত্তাল মা-ই বাজাচ্ছেন, পিছনে বৈরাগীঠাকুর মায়ের দু-কাঁধে দু হাত রেখে গাইতে গাইতে চলেছেন। মা আর অন্ধ ছেলে। সহসা তরে গান থামাবেন না বৈরাগী, চলনও থামবে না। দেখেশুনে ভাল পথ ধরে মা নিয়ে চলেছেন—তবু তার মধ্যে গোলমেলে কোন ঠাঁই পড়লে সতর্ক করে দিচ্ছেন: ডাইনে—বাঁয়ে—সামনে……। কত্তাল বন্ধ করে ছেলের হাত ধরছেন কখনো-বা। এত সবের মধ্যে গানের কিন্তু তিলেক বিরতি নেই। গ্রামের সব বাড়ি শেষ করে ফকির রাস্তায় যখন পড়বেন, তখন থামবেন।

উমাসুন্দরী সাত সকালে উঠেই আজ ল্যাম্পো নিয়ে গোয়ালে ঢুকে গেছেন। মুংলি গাইটা বড্ড খুপ-দাপাদাপি করছে শেষরাত থেকে। সাঁজাল নিভে গেছে, ডাঁশপোকায় কামড় দিচ্ছে বোধহয় খুব। কিম্বা কেঁদো ঢুকে গেল কিনা গোয়ালে, কে জানে—ক'দিন আগে খুব ফেউ ডাকছিল। গিয়ে দেখলেন, ওসব কিছু নয়—পালান ভারী, বাঁট দুধে টনটন করছে। নুলেবাছুর খোয়াড়ে আটকানো, সেইদিকে তাকাচ্ছে ঘন ঘন। বড়গিন্নিকে দেখে হাম্বা ডেকে উঠল। গরু হোক যাই হোক, মা তো বটে। বাঁট-ভরা দুধ বাচ্চাকে খাওয়াতে পারছে না। হাম্বা দিয়ে তাই যেন সকাতর প্রার্থনা জানাল।

উমাসুন্দরী বললেন, উতলা হোসনে মা, একটু সবুর কর। রমণীকে ডেকে পাঠাচ্ছি—সকাল সকাল দুয়ে নিয়ে বাছুর ছেড়ে দেবো।

গান তখন উঠানে এসে পড়েছে। উমাসুন্দরী বলেন, ছোটবাবু বাড়ি এসেছেন। তোমাদের মা-বেটার কাপড় এসেছে। ফেরার সময় নিয়ে যেও।

বৈরাগী তো গান বন্ধ করবেন না—মা বগলা কত্তাল থামিয়ে বললেন, এখন কেন ঠাককুন। মাস অন্তে যেদিন বিদায় নিতে আসব, যা দয়া হয় তখন দিয়ে দেবেন।

বৈশাখ গিয়ে জ্যৈষ্ঠমাস পড়বে, প্রভাতী গাওনা তখন বন্ধ। মা আর ছেলে বিদায় নিতে বাড়ি বাড়ি দেখা দেবেন। পাওনাথোওনা খারাপ নয়—বিছানায় শুয়ে শুয়ে পুরোমাস পুণ্যার্জন হয়েছে, গৃহস্থরা যথাসাধ্য চালে-ডালে সিধা সাজিয়ে দেয়, নগদ টাকা দেয়। এ বাবদে কেউ বিশেষ কৃপণতা করে না।

ভাল বোষ্টম সুরেলা-কণ্ঠ আরও সব আছে—সোনাখড়িতে প্রভাতী গাওয়ার দরবার করেছিল তারা: চিরদিন এক মুখে কেন নাম শুনবেন, আমরাও তো প্রত্যাশী। কিন্তু কর্তারা কাউকে আমল দেন নি: বেশ তো চলছে। ঠাকুরদের নাম কানে যাওয়া নিয়ে কথা—আহ্লাদ-বৈরাগীই বা মন্দ হল কিসে? বাবাজীরা অন্যত্র দেখুনগে—অন্ধের অন্নজলে নজর দিতে আসবেন না। বগলা-বোষ্টমী আর ছেলে আহ্লাদ যদ্দিন সমর্থ আছেন, আমাদের গাঁয়ে কেউ ঢুকতে পাবে না।

সবাই জানে সে দুঃখের কাহিনী—বগলা-বোষ্টমী সকলকে বলেন, আর কপাল চাপড়ান: মা হয়ে আমি ছেলের সর্বনাশ করেছি—মা নয়, রাক্ষুসী আমি।

আহ্লাদ বড় মাতৃভক্ত। সে কেঁদে পড়ে: অমন করে বলবিনে তুই মা। আমার অদেষ্ট। তুই তো ভালর তরে ব্যবস্থা করলি। জানবি কেমন করে, আমার অদেষ্টে অষুধ আগুন হয়ে উঠবে।

মাথার অসুখ আহ্লাদের। ভীষণ যন্ত্রণা—ছিঁড়ে পড়ে যেন মাথা। কপাল টিপে ধরে আবোল-তাবোল বকে। ভয় হয়, পাগল না হয়ে যায়। সেই সময় এক তান্ত্রিক ঠাকুর এলেন হরিহরের তীরবর্তী কালীতলায়। ঠাকুরের পায়ের উপর বগলা-বোষ্টমী আছড়ে পড়লেন: বাঁচাও আমার ছেলেকে—আর আমাকেও। নয়তো মায়ে বেটায় বিষ খেয়ে পদতলে এসে মরে থাকব। ঘৃতকুমারী এবং আরও কয়েকটা গাছগাছড়ার রসে চিকিৎসা হল ক'দিন—উপশম হয় না তো শেষটা এক মোক্ষম চিকিৎসা। মাথায় পুরোনো-ঘি মাখিয়ে আগুনের মালসা দিল তার ওপর চাপিয়ে। কী আর্তনাদ রোগীর—ধাক্কা মেরে মাথার মালসা ফেলে দিল। ছটফট করছে কাটা-ছাগলের মতো। খানিকটা ভাং গিলিয়ে চুপ করে থাকতে বলে তান্ত্রিক কালীতলা ফিরলেন।

ঘুম এসে গেল আহ্লাদের, গভীর ঘুম। অনেকক্ষণ পরে ঘুম ভাঙল, কিন্তু চোখ মেলে কিছুই যে দেখছে না—

ও মা, মাঁগো, চোদ্দিকে অন্ধকার আমার—

কত রকম চিকিৎসা হল তারপর। মা-বুড়ি ভিক্ষেসিক্ষে করে কলকাতার ডাক্তারকেও একবার দেখিয়ে এনেছেন। দৃষ্টি ফিরল না। হলধর বৈরাগীর মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ হচ্ছিল। ভাল অবস্থা হলধরের—নিজের হাল-গরুতে দশ বিঘে জমির চাষ। কিন্তু চক্ষুহীন পাত্রের হাতে কে মেয়ে দেয়। সম্বন্ধ ভেঙে গেল।

আহ্লাদ বলে, এই বেশ ভাল মা। বিষয়-ভোগে ঠাকুরকে ভুলে থাকতাম। মায়ে-পোয়ে কেমন এখন নাম গেয়ে গেয়ে বেড়াচ্ছি।

দেবনাথের সঙ্গে দেখা করতে আসেন সব। বাংলা লেখাপড়া তো ভালই জানেন তিনি, ইংরেজিও জানেন না এমন নয়—অতএব শিক্ষিত ব্যক্তি এবং চাকরি করে বাইরে থেকে টাকা-পয়সা আনছেন, পুববাড়ির অবস্থা দেখতে দেখতে ফিরিয়ে ফেলেছেন—সে হিসাবে কৃতী পুরুষও বটেন। যতদিন বাড়ি আছেন, মানুষের আনাগোনা চলতে থাকবে। শুধু সোনাখড়ি বলে কি, বাইরের এ গ্রাম ও-গ্রাম থেকেও আসবে।

উত্তরের বাড়ির যজ্ঞেশ্বর এলেন—মস্ত একখানা মেটেআলু কলার ছোটায় বেঁধে হাতে ঝোলানো। খন্তা খুঁড়ে সারা সকাল ধরে মেটেআলু খুঁজেছেন—গায়ে ও কাপড়চোপড়ে ধুলোমাটি। বললেন, আলতাপাত আলু—খেয়ে দেখো কী জিনিস। তুলে আনার বড় ঝঞ্ঝাট—গাছ মরে গেছে, মাটির নিচে কোথায় আছে হদিশ হয় না। আছে এইটুকু জায়গায়, তল্লাট খুঁড়ে খুঁড়ে মরতে হয়েছে।

দেবনাথ বললেন, ঝঞ্ঝাটের দরকার কি ছিল যজ্ঞে-দা?

খাবে তুমি, আবার কি। শহরে সোনাসুবর্ণ খেয়ে থাক জানি, কিন্তু এসব জিনিস পাওনা।

দেবনাথ হেসে ঘাড় নাড়লেন: সোনা কোন দুঃখে খাবো যজ্ঞে-দা। ডাল-ভাতই খাই। বাজার খুঁজলে আপনার মেটেআলুও মিলে যাবে। হেন জিনিস নেই, যা কলকাতায় মেলে না।

শশধর দত্তকে দেখা গেল, লাঠি ঠুক ঠুক করে আসছেন। থুনথুনে বুড়ো হলেও পলকে কান খাড়া হল। কলকাতার কথা হচ্ছে—কলকাতা সম্বন্ধে দত্তমশায় যা বলবেন, তাই শেষ কথা। যেহেতু স্ত্রীর বাপের-বাড়ি ছিল কলকাতায়। এবং ছেলে কালিদাস দত্ত এখনো কলকাতায় মেসে থেকে মার্চেন্ট অফিসে চাকরি করে। খোনা গলায় দত্তমশায় বলে উঠলেন, উঁহু, ঠিক

বললে না বাবাজি। বলি, ডয়াকলা পাও তোমরা কলকাতায়?

চেষ্টা করলে মেলে বই কি।

হা-হা-হা, ডয়াকলার মতন জিনিস—তা-ও চেষ্টা করতে হয়। বোঝ তবে যজ্ঞেশ্বর—

একচোট হেসে নিয়ে যজ্ঞেশ্বরকেই শালিস মানেন: কেমন কলকাতা বুঝে দেখ। ডয়াকলা কেউ খায় না—বীচেকলা নাম দিয়ে ঠেলে রেখেছে। বীচিতে ভয় পেয়ে যান শহুরে মানুষ। আরও একটা কী যেন উদ্ভট নাম দিয়েছে—কী যেন—কী যেন—ডেমরে-কলা। হি হি হি—

পুনরপি প্রশ্ন: চই খায় তোমাদের কলকাতার লোক?

কলকাতার শহরে সব জিনিসের আকাল, প্রমাণ না করে বুড়ো ছাড়ছেন না। বলেন, পাবে কোথায় যে খাবে। কালিদাসের সঙ্গে ওর অফিসের দুই বন্ধু এসেছিল সেবার। পাঁঠা মারা হয়েছে। কাঁঠালগাছে চই উঠেছে, কয়েকটা টুকরো কেটে এনে মাংসে ছাড়া হল। বন্ধুরা অবাক: এ-ও খায় নাকি? কালিদাসের মা এক কুচি করে তাদের পাতে দিল। খেয়ে তো শিসিয়ে মরে।

চলল ঐ কলকাতা নিয়ে। তার মধ্যে খপ করে যজ্ঞেশ্বর বললেন, তার-পরে—হচ্ছে কবে তোমার এখানে?

দেবনাথ হেসে বললেন, হলেই হল। দাদা রয়েছেন যখন, না হয়ে উপায় আছে?

কোন বস্তু, বুঝিয়ে বলতে হয় না। দেবনাথ বাড়ি এলে গ্রামসুদ্ধ মানুষের এক-পাত পড়বেই। ব্যবস্থা ভবনাথের। চাকরে ভাইয়ের বাড়ি আসা সকলকে ভাল করে জানান দিতে হবে বই কি। নয়তো রামা-শ্যামা যোদো-মোধোর আসার মতোই হয়ে যায়। গোলার মধ্যে ধানের উপর কয়েক কলসি উৎকৃষ্ট দানাগুড় রেখে দিয়েছেন, পায়েসে লাগবে। গোয়ালের পিছনে বড় মানকচু রাখা আছে, মাছের তরকারিতে দেওয়া হবে। ক্ষেতের সোনামুগ-কলাই ভেজে ডাল করা আছে, নতুনপুকুরে রুই-কাতলা আছে। ভবনাথের সবই গোছানো, দেবনাথ এখন কিছু নগদ ছাড়লেই হল।

যজ্ঞেশ্বর নলডাঙা জমিদারি এস্টেটের তহশিলদার। বললেন, জষ্ঠির গোড়ায় কাছারির পুণ্যাহ। ক'টা জরুরি মামলার কারণে ছোটবাবু সদর ছাড়তে পারেন নি—পুণ্যাহে তাই দেরি পড়ে গেল। তোমাদের কাজটা এই মাসের মধ্যে সেরে ফেল ভায়া, যেন ফাঁকিতে পড়ে না যাই।

ভবনাথকে দেখতে পেয়ে দেবনাথ বলেন, তাড়াতাড়ি সেরে দেবার জন্য যজ্ঞে-দা বলছেন। জষ্ঠি পড়লে উনি কাছারি চলে যাবেন।

হোক তাঁই—ভবনাথ বললেন। জোর দিয়ে আবার বলেন, হয়ে গেলেই ভাল—জিইয়ে রেখে লাভ কি। হাটের কিছু কেনাকাটা আছে। বুধবারে গঞ্জের হাট করব, পরের দিন খাওয়াদাওয়া। বিষ্যুদের রাত্রিবেলা।

দেবনাথ শুধোলেন: আমার মিতে কোথায় এখন, কোন মেয়ের বাড়ি? তাকে একটা খবর দেওয়া যায় না?

পাথরঘাটা গাঁয়ের দেবেন্দ্র চক্রবর্তীর কথা বলছেন। শৈশবে দেবনাথ কাজেম-গুরুর পাঠশালায় পড়তেন, পাততাড়ি বগলে ঐ ছেলেটিও মাঠঘাট ভেঙে আসত, ভাবসাব তখন থেকেই। নামের খানিকটা মিলের দরুন একে অন্যকে মিতে বলে ডাকেন।

দেবনাথ বলেন, বাড়ি এসেছি খবর পেলে মিতে যেখানে থাকুক, ছুটে এসে পড়বে।

ভবনাথ বলেন, মির্জানগরে ছোটমেয়ের বাড়ি ছিল তো জানি। ফটিককে পাঠাব কাল।

যজ্ঞেশ্বর ঘাড নেড়ে বলে উঠলেন, বোশেখমাস যখন, বিষ্টুপুরে বড়মেয়ের বাড়িতেই আছেন। বছরের আরম্ভে উনি বড় থেকেই ধরেন।

কিছু অবাক হয়ে দেবনাথ প্রশ্ন করেন: দৈবজ্ঞের কাজকর্ম একেবারে ছেড়েছে?

যজ্ঞেশ্বর হেসে বল্লেন: এই তো কাজ এখন—মেয়েগুলোকে পালা করে পিতৃসেবার পুণ্যবান।

শতকণ্ঠে তারিপ করে চলেছেন: পাঁচ-পাঁচটা মেয়ে বহাল তবিয়তে শ্বশুরঘর করছে—দেবেন চকোত্তির মতন কপাল কার। অশন-বসন হুঁকো-তামাক বাবদে কানাকড়ির খরচা নেই। এক এক মেয়ের বাড়ি দু-মাস হিসেবে ভাগ করে নিয়েছেন। দু-মাস পুরল তো দুর্গা-দুর্গা বলে রওনা—পায়ে চটি গলায় চাদর বগলে পাঁজি হাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ। ব্যাগের মধ্যে কাপড়টা-আসটা—তাছাড়া ছক-গুটি-পাশা আর জলশূন্য খেলোহুঁকো তামাক-টিকে বাতি-দেশলাই। এই মানুষ কোন দুঃখে এখন আর খড়ি পেতে বিচার-আচার করতে যাবেন?

দেবনাথ বলেন, আগের [illegible] যজ্ঞে-দা। এতগুলো মেয়ে সুপাত্রে দিয়েছে, তবেই না [illegible] এখন।

যজ্ঞেশ্বর বলেন, সুখ [illegible] সুখ! মেয়ের মেয়ের [illegible]র পাল্লাপাল্লি। বড়-মেয়ের বাড়ি দা-কাটা তামাক শুনে মেজমেয়ে সদরে [illegible] পাঠিয়ে বাপের জন্য অম্বুরি তামাক আনালো। [illegible] মেজমেয়ে রাত্রে রুটি [illegible] শুনে সেজমেয়ে লুচির
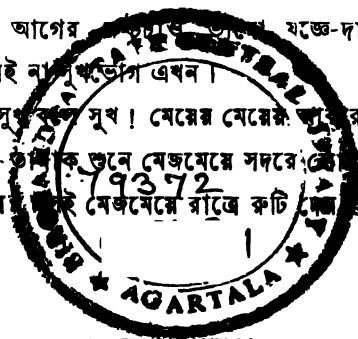
বন্দোবস্ত করল। ন-মেয়ে তারও উপর টেক্কা দিল—নিত্যি রাত্রে ঘি-ভাত। ছোটমেয়ে ভিন্ন দিক দিয়ে গেল: ছোটজামাই খেলে ভাল, দেওরটাও মোটামুটি চালিয়ে যেতে পারে। চতুর্থ খেড়ি কোথায় আর খুঁজে বেড়াবে—বউ হওয়া সত্ত্বেও নিজে সে শিখেপড়ে নিয়েছে। এক মেয়ে অন্য মেয়ের বাড়ি যাবার পথে দেবেন স্বগ্রাম পথে দেবেন স্বগ্রাম পাথরঘাটায় এক হপ্তা দু-হপ্তা জমাজমির তদারক করে যান—সেইসময় সকলের কাছে সুখের গল্প করেন, আর হেসে হেসে খুন হন। মড়িপোড়া চোয়াড়ে চেহারা ছিল, এখন নেওয়াপাতি গোছের খাসা একখানা ভুঁড়ি নেমেছে।

রাজীবপুরে পোস্টঅফিস, পিওন যাদব বাড়ুয্যে। রান্নায় তিনি ভারি ওস্তাদ। বললে সোনা হেন মুখ করে ভোজের রান্না রেঁধেবেড়ে দিয়ে যাবেন। কিন্তু বাড়ির মধ্যে থেকে ঘোরতর আপত্তি: সামান্য একটু কাজে পিওনঠাকুর অবধি যেতে হবে কেন, বলি হাত-রত্ আমরা কি পুড়িয়ে খেয়েছি? তাঁকে ডেকো যেদিন পাঁচগাঁয়ের পুরো সমাজ ধরে টান দেবে। গ্রামের ক'টা মানুষের পাতে ভাত-দেওয়া কাজটুকু স্বচ্ছন্দে আমরা পারব। ব্রাহ্মণ নিয়ে সমস্যা—তিন বামুন-বাড়ি ষোলআনা সিধে পাঠিয়ে দিলেই হয়ে যাবে।

তরঙ্গিণীর রোখটা সবচেয়ে বেশি। সঙ্গে জুটেছে বিনো আর অলকা। হবে তাই। লুচি-পোলাওর ব্যাপার নয়, শুধুমাত্র সাদা-ভাত। কেন হবে না?

উমাসুন্দরী বললেন, গ্রামে বিধবা ক'জনকেও বাদ দেওয়া যাবে না। ভোজের দিন নয়, দুটো দিন বাদ দিয়ে—এঁটোকাঁটা সম্পূর্ণ সাফসাফাই হয়ে যাবার পর। ছোটবউ তরঙ্গিণী মিত্তিরদের মেয়ে, অলকা বোসেদের। আর বিনো তো এই বাড়িরই—ঘোষ বংশের। রান্নার মধ্যে যে তিনজন, সবাই কুলীনের মেয়ে। কাপড়চোপড় ছেড়ে শুদ্ধাচারে রাঁধাবাড়া করবে। কারো আপত্তি হবার কথা নয়।

না, আপত্তি কিসের? বিনোই গ্রাম চক্কোর দিয়ে সকলের মতামত নিয়ে এলো।

চাঁদারডাঙি গঙ্গাপুত্তুরদের (জেলে কথাটা ভাল নয়, ওরা গঙ্গাপুত্র) সর্দার মাধব পাড়ুইকে খবর দেওয়া হয়েছে। বাঁশে জড়ানো দড়াজাল দস্তুরমতো এক বোঝা—বাঁশের দুই মুড়ো দুই জোয়ানে ঘাড়ে নিয়ে আগে আগে যাচ্ছে, পিছনে অন্যেরা। বাগের মধ্যে নতুনপুকুরের পারে গ্রামের মানুষ ভেঙে এসে পড়ল।

আমড়াতলায় পা ছড়িয়ে বসেছে মাধব। জড়ানো জাল খুলে আস্ত থান-ইট বাঁধছে জলের যে দিকটায় শোলা তার বিপরীতে। শোলার জালের উপর

দিক ভাসিয়ে রাখে, ইটের ভারে তলা অবধি টান-টান থাকে। তেল মাখছে জেলেরা আষ্টেপিষ্টে। ভবনাথ হেসে বলেন, পাকি এক সের তেল সাবাড় করলি যে বেটারা! কে-একজন বলল, চার আনা সেরের মাগ্‌গি তেল, কেনে তো এক পয়সার দু-পয়সার—খাবে না মাখবে? বাবুর বাড়ি পেয়েছে, বেদরদে মেখে নিচ্ছে।

তেল মেখে ঝুপঝুপ করে সব জলে পড়ল। দড়াজাল নামছে—পাড়ে আর মানুষ ধরে না। মাছ খাওয়ার চেয়ে ধরায় সুখ—ধরা দেখতেও সুখ খুব। কমল অবধি চলে এসেছে। বিনো কোলে করে আনছিল—কিন্তু বড় হয়ে গেছে সে। এত মানুষের মধ্যে কোলে উঠে আসবে—ছিঃ, নামিয়ে দিয়ে বিনো হাত ধরেছে, পুকুরের একেবারে কিনারে যেতে দিচ্ছে না। কমল টানাটানি করছে তো বিনো ভয় দেখায়: তবে খোকন বাড়ি নিয়ে যাবো তোমায়, মাঝের-কোঠায় পুরে শিকল তুলে দেবো। আর কমলের কথাটি নেই।

জাল অনেক লম্বা—পুকুরের এ-মুড়ো ও-মুড়ো বেড়ায় ঘেরা হয়ে গেল। আস্তে আস্তে টেনে ওপারে নিয়ে চলল—পুকুর ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। একটা দুটো চারা-মাছ জালের বাইরে লাফিয়ে পড়ে, হই-হই করে ওঠে অমনি মানুষ। মাধব বলে, চেঁচামেচি করলে মাছ একটাও জালে থাকবে না, মিছে আমাদের খেটে মরা। জালের গা ঘেঁষে ডুবের পর ডুব দিচ্ছে সে, জাল কোথাও গুটিয়ে গেলে ছড়িয়ে দিচ্ছে। জলতলে অদৃশ্য হয়ে থাকছেও অনেকক্ষণ, ভুড়ভুড়ি কাটছে। ডুব দিয়ে দিয়ে চক্ষু দুটো জবাফুলের মতো রাঙা।

টেনে টেনে জাল পাড়ের কাছে এনেছে, আবার তখন চিৎকার। দেবনাথের গলা সকলকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ তাঁর বাড়িতে কাজ—রাত পোহালে মাছের দরকার তাঁরই। এতবড় দরের মানুষ, তা একেবারে ছেলেপুলের অধম হয়ে গেছেন। দেবনাথ ধরিয়ে দিলেন, তারপরে সবসুদ্ধ চেঁচাচ্ছে—পুকুরপাড়ে ডাকাত পড়েছে যেন। শ্রম বৃথা যায় না—মাছ লাফাচ্ছে খোলাইাড়ির ফুটন্ত খইয়ের মতন। রোদে রুপোর মতন ঝিকমিক করছে। লাফিয়ে বেশ খানিকটা উচুঁতে উঠে জালের বাইরে পড়ছে বেশির ভাগ।

মাধব ব্যস্ত হয়ে বলে, সব মাছ যে পালিয়ে গেল কর্তা।

দেবনাথ বলেন, লোকে কত আমোদ পাচ্ছে তা-ও দেখ। টানো না আর একবার—

মাধব সর্তক করে দেয়: চেঁচামেচি না হয়, দেখবেন।

দেবনাথ বলেন, একটু-আধটু হবেই। এত মানুষ এসেছে—তুমি কি চাও পুকুরপাড়ে এসে সব ধ্যানে বসে যাবে? টেনে যাও না তোমরা—

হিমচাঁদ বলে ওঠেন, দুটো-চারটে টান না-হয় বেশি লাগবে। ভারী ভারী সব গতর নিয়ে এসেছ—বলি, গতরে কি আলু-কচু আজ্ঞে খাবে? লোকে মজা করে দেখছে, হলই বা একটু কষ্ট তোমাদের।

মাঝারি রুই তিন-চারটি রেখে চারামাছ জলে ছুঁড়ে দিল। বড় হোক—এখন ধরবে না ওদের। যেগুলো ধরেছে, তা-ও ডাঙায় তোলা হবে না—কানকোয় দড়ি দিয়ে খোঁটার সঙ্গে বেঁধে জলে রেখে দিল। খেলা করুক দড়ি বাঁধা অবস্থায়। কাজের দিন কাল সকালবেলা তুলবে, কোটা-বাছা হবে তখন।

আবার জাল টানছে। পাড়ের কাছকাছি হলেই যথাপূর্ব চিৎকার। মাছ লাফাচ্ছে—কী সুন্দর, কী সুন্দর!

টানের পর টান চলল দুপুর অবধি। এরই মধ্যে এক কাণ্ড। হিরু ধরে ফেলল—এত লোকের মধ্যে তারই শুধু নজরে এসেছে। চ্যাটালে-আমতলায় জলের মধ্যে শালাকচু-বন—মাধব পাড়ুই ঐখানটায় বড় বেশি ডুব দিচ্ছে। কোমরজল সেখানে—হাঁটছে জলের মধ্যে পা চেপে। হিরুতে ঝন্টুতে কি চোখ টেপাটেপি হল—ভাঁড় থেকে এক এক খাবলা তেল নিয়ে দুজনেই মাথায় মাখছে।

হারু মিত্তির বলে, জল ঘুলিয়ে দই-দই হয়ে গেছে—চান করবে তো নতুন- বাড়ির পুকুরে চলে যাও।

কে কার কথা শোনে, ঝপাঝপ তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাঁতরে চলে গেল চ্যাটালে-তলার কচুবনে, ঠিক যে জায়গায় মাধব পা চাপাচাপি করেছিল। ডুবের পর ডুব দিচ্ছে। টেনে বের করল কাতলা মাছ একটা—কাদার মধ্যে ঠেসে ঠেসে কবর দিয়ে রেখেছে। চ্যাটালে গাছ হল নিরিখ—মাছধরা শেষ হবার পর পুকুর নির্জন হলে কোন এক ফাঁকে এসে মাছ তুলত।

কাদায়-পোঁতা মাছ তুলে ঝন্টু চপাস করে সকলের মধ্যে ফেলল। আরে সর্বনাশ, কী ডাকাত—সবাই দুষছে, যাচ্ছেতাই করে বলছে মাধবকে।

দেবনাথ এগিয়ে এসে বললেন, শুধু-হাতে চললে কেন পাড়ুয়ের পো? মাছটা নিয়ে যাও. খাবে তোমরা।

শাস্তি না দিয়ে বখশিস। সকলে স্তম্ভিত। দেবনাথ বলেন, মাছ মারাই তো মানুষ খাওয়ানোর জন্য। কন্যাদায় পিতৃদায় কোন রকম দায়দাঁড়ার কারণে নয়, নিতান্তই শখ করে মানুষের পাতে চাট্টি ভাত দেওয়া। ভোজের পাতে হচ্ছে না তো পাড়ুয়েরা বাড়ি নিয়ে খাবে নতুনপুকুরের মাছটা।

ভদ্রজনকে তবু মন সরে না: রাজপুত্তুর মতন কাতলা—উঃ!

দেবনাথ মাধবকে বলছেন, আশা-সুখে রেখেছিল—মুখের জিনিস কাড়লে আমাদের পেটে হজম হবে না। ভালে জড়িয়ে নিয়ে যাও—সকলে সমান ভাগ করে নিও।

মাছ ধরা সেরে বাড়ি ফিরতে দুপুর গড়িয়ে গেল। পুঁটি-কমল ছটপট করছে। এর পরে তো স্নান, খাওয়া—এবং তারও পরে শোওয়া। বিকাল হয়ে গেছে দেখে শোওয়াটা দেবনাথ হয়তো বাতিলই করে দেবেন। তাহলে সর্বনাশ—মোটা রোজগার মাটি। ক'দিন ভাই-বোন এরা দুপুরবেলা দেবনাথের মাথার পাকাচুল তুলছে। দর ভালই—পয়সায় চারটে করে ছিল, এবারে বাড়ি এসে ছ'টা হয়ে গেল। দেবনাথই আপত্তি তুলেছিলেন: এক পয়সায় এক গণ্ডা—বড্ড মাগ্‌গি রে। চুল এখন মেলা পেকে গেছে—তোদের কাঁচা চোখে একগণ্ডা চুল বের করা কিছুই না, হাত ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে পুরো পয়সা রোজগার করে ফেলবি। এবারের রেট পয়সায় দশটা করে—যাকগে যাক, আটটা। অনেক ঝুলোঝুলির পর ছ'টায় এসে রফা হয়েছে—ছ'টা পাকা চুল তুলবে, এক পয়সা মজুরি।

পুঁটি-কমলের আগে দেবনাথের মাথা নিমি-চঞ্চলার দখলে ছিল। রেট সাংঘাতিক তখন—একগাছি চুল এক পয়সা। দেবনাথ বুঝিয়ে বললেন, রেট দেখলে তো হবে না—মাথা-ভরা কাঁচা চুল যে তখন। একটি সাদা চুল বের করতে চোখের জল বেরুত, সারা বেলাস্ত লাগত। চঞ্চলাটা বেশি বজ্জাত—একই চুল দু-বার তিনবার দেখাত, দেখিয়ে বেশি পয়সা আদায় করত। বুঝতে পেরে দেবনাথ নিয়ম বেঁধে দিলেন, তোলা মাত্তোর চুলটা দিয়ে দিতে হবে—নিজে রাখতে পারবে না। ফাঁকি দেবার আর তখন উপায় রইল না।

মাঝে-মধ্যে এরা ভবনাথের ধারে গিয়েও বসে। তাঁর মাথা শনের ক্ষেত—দেদার পাকাচুল, তুলতে পারলেই হল। এক অসুবিধা, খাটো খাটো চুল তাঁর মাথায়—দু-আঙুলে এঁটে ধরা যায় না। রেটও অতি সস্তা—এক-কুড়ি এক পয়সা। কষ্ট করে খুঁজতে হয় না বলে পাকাচুল তোলার মজাও নেই ভবনাথের মাথায়।

॥ চার ॥

কোকিল ডাকছে গাছের উপর ডালপালার মধ্যে। মাটির উপরেও যে ডাকে, বহু কোকিলের মতো - একটা দুটো নয়, অনেকগুলো—এদিক-সেদিক থেকে। যত বজ্জাত ছেলেপুলে কোকিলের ডাক ভ্যাংচাচ্ছে।

কড়া রোদ, ধূসর আকাশ। এলোমেলো হাওয়া আসে এক-এক-একবার—ধুলো ও শুকনো পাতা উড়ায়। বাতাসে যেন আগুনের হল্কা। মাঠ ফেটে চৌচির। দুটো কুকুর মুখোমুখি হাঁ করে জিভ ঝুলিয়ে হা-হা করছে। গরু ঘাস খায় না, আমতলায় শুয়ে ঝিমোয়। নতুনপুকুরের জল আগুন হয়ে যায়, চানের সময় অগ্নিকুণ্ডে নামছি এমনি মনে হবে। কানাপুকুর প্রায় শুকনো, দামের নিচে অল্প জল থাকতে পারে। আশশ্যাওড়া ভাঁট আর কাঁটাঝিটকে রাস্তার পগারের উপর ঝুলে পড়ে খানিকটা অংশ একেবারে অদৃশ্য। একটা মেটে সরা নিয়ে কটা ছোঁড়া ঐ জঙ্গলে নেমে পড়ল। জল আছে পগারের অদৃশ্য ঐখানটায়, এবং জল থাকলে মাছও আছে। জঙ্গল মলে দলে এদিকে আর ওদিকে দুটো আল দিয়ে নিল। সরা দিয়ে তারপর ভিতরের জল সেঁচে আলের বাইরে ফেলছে। চাপ পড়ে সদ্য বানানো আলে জল চোঁয়াচ্ছে, এক কোদাল দু-কোদাল মাটি কেটে সঙ্গে সঙ্গে চাপাচ্ছে সেখানে। জল সেঁচা হয়ে গিয়ে কাদার উপরে মাছ খলবল করে। মাছ সামান্যই—পাঁচ-সাতটা নাটা ও কয়েকটা কই-জিয়েল। তারই লোভে একটা মাছরাঙা এসে বসেছে অদূরের শুকনো সজনে-ডালের উপর। মাছ নাই থাক, কাদা বেশ গভীর ও আঁঠালো—স্ফূর্তিটা জমল কাদা মাখা ও কাদা মাখানোয়। ছোঁড়াগুলোর কোনটা কে—কথা না বলা অবধি আলাদা করে চেনবার জো নেই।

পাড়ার সকলের সারা হয়ে গেলে খাঁ খাঁ দুপুরে কর্মকারপাড়ার বউরা ঘাটে আসে। সব তাদের দোরতে। দুপুরের-খাওয়া খায় বেলা যখন ডুবু-ডুবু তখন। পুরুষরা হাটে যায়, অন্যেরা যে সময় হাট করে ফেরে। স্নান করে কর্মকার-বউ ভরা কলসি নিয়ে ঘরে ফিরছে। মেজে মেজে পেতলের কলসি সোনার মতন ঝকঝকে হয়েছে, কলসির উপরে রোদ ঠিকরে পড়ে। পথের বেলেমাটি রোদে তেতে-পুড়ে আগুন। পা ফেলা যায় না, সেঁক লাগে, পুড়ে ঠোসা ওঠার গতিক। বউমানুষ হলেও ফাঁকা জায়গাটা একদৌড়ে পার হয়ে বাঁশতলায় চলে যায়। জল ছলকে কাপড় ভিজে গেল। ভিজে পায়ের দাগ মাটিতে পড়তে না পড়তে শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন। পাড়ায় ঢোকবার মুখে প্রাচীন বটগাছ—শীতলাতলা। কলসি নামিয়ে বউ একটু জল ঢেলে দেয় বৃক্ষদেবতার পায়ের গোড়ায়। মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে, আর বিড়বিড় করে বলে, ঠাণ্ডা থাকো মা-জননী গো, সবাই আমাদের ঠাণ্ডা রাখো।

উঠানে তুলসীগাছ—মাথার উপর ঝরা টাঙানো। ছিদ্রকুম্ভ থেকে ফুটো বেয়ে অবিরত জল ঝরছে। সারা বৈশাখ জুড়ে তুলসীঠাকুর দিবারাত্রি ঝরার জলে স্নান করেন। রান্নাঘরের দাওয়ায় কলসি নামিয়ে তুলসীতলায়

বউ গড় হয়ে প্রণাম করে। একটুখানি আড়ালের দিকে গিয়ে ভিজে কাপড় ছাড়ছে।

নতুনপুকুরের জল খুব ভাল বলে চারিদিকে সুখ্যাতি। বেলা পড়ে এলে কাঁখে কলসি এ-পাড়ার সে-পাড়ার মেয়েরা এসে খাবার-জল নিয়ে যায়। অত দূরের পাথরঘাট গাঁ থেকেও এসেছে, দেবনাথের একদিন নজরে পড়ল। দূরের পথ বলে মেয়েলোক নয়, পুরুষ এসেছে। কলসি একটা নয়, এক জোড়া। কাঁধের উপর বাঁকের শিকেয় ঝোলানো জল-ভরতি কলসি দুটো নাচাতে নাচাতে নিয়ে চলে গেল।

এক বিকালে ঘনঘটা আকাশে। দেখতে দেখতে ঝড় উঠল। কাল-বৈশাখী। যজ্ঞেশ্বরের ছেলে জল্লাদ তখন খেজুরতলি গাছের মাথায়, জল্লাদের সর্বক্ষণের সাথী দাও আছে-কয়েকটা ডাল নিচে। কী ফলন ফলেছে এবার গাছটায়, ফলের ভারে ডাল ভেঙে পড়বার গতিক। ছিদ্র-করা শামুক তাদের গাঁটে, কাগজের মোড়কে নুন। দোডালার উপর পা ছড়িয়ে জুত করে বসে কোঁচড়ের কাঁচা-আম শামুকে কেটে নুন মাখিয়ে খাচ্ছে।

লোভে লোভে চারি, সুরি, পুঁটি আর পালেদের বেউলো তলায় ছুটে এলো। চারি তোষামোদ করছে জল্লাদকে: এত কষ্ট কেন করিস রে। ডালের উপর পা দিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে দে—আম তলায় পড়বে, বঁটিতে কেটে নুনে-ঝালে জারিয়ে এনে দেবো। এক টিপ চিনিও দিতে হবে, চিনি না পেলে গুড়। কী রকম তার হবে দেখিস খেয়ে।

জল্লাদ দোনা-মোনা—আম-জারানো সত্যি সত্যি দেবে, না ফাঁকি দিয়ে আম পাড়িয়ে নিচ্ছে? ভাবখানা বুঝে নিয়ে চারি বলে, দিয়ে দেখ। এক-দিনের দিন তো নয়—ফাঁকি দিলে কোনদিন কখনো আর দিসনে।

জল্লাদ দিত নিশ্চয় শেষ পর্যন্ত—দেরি করে একটু মান কাড়াচ্ছিল। কোনকিছুর আর দরকার নেই—ঝড় উঠল, কাউকে লাগবে না এখন। টিব-টাব করে আম পড়ছে এ-তলায় সে-তলায়—মেয়েগুলো ছুটোছুটি করে কুড়োচ্ছে। ধামা-ঝুড়ি নিয়ে আরও সব আমতলায় আসছে। চারি বুড়ো-আঙুল আন্দোলিত করে জল্লাদকে দেখাচ্ছে: পেড়ে দিলিনে তো বয়ে গেল। এই কলা, এই কলা। আম-জারানো দেখিয়ে দেখিয়ে খাব, এক কুঁচিও দেবো না। চাইলেও না।

ডালপালা বিষম দুলছে। সুপারিগাছগুলো এত নুয়ে পড়ছে—ভেঙেই পড়ে বুঝি-বা! পদা সড়াক করে ভুঁয়ে নেমে গেছে। জল্লাদের ভয়ডর নেই,

নামবে কি—মজা পেয়ে গেছে, বেয়ে বেয়ে আরও উঁচুতে উঠছে। দোল খাবে। সুরির বয়স এদের মধ্যে বেশি, সে চেঁচামেচি করছে: নেমে আয় ওরে জল্লাদ, পড়ে থেঁতো হয়ে যাবি—

দৌড়ে দৌড়ে মেয়েগুলো এ-তলায় সে-তলায় আম কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। চুল বাঁধা হয়নি—এলোচুল উড়ছে তাদের। আঁচলও উড়ছিল, বেড দিয়ে কোমরে বেঁধে নিয়েছে। পাতা ঝুর ঝুর করে মাথায় ঝরছে পুষ্পবৃষ্টির মতন। দুম করে বেউলোর পিঠে ঢিল মারল—উহু-হু, কে মারল, কে? মেরেছে ঢিল নয়, আম। পিঠ বাঁকাতে বাঁকাতে বেউলো আমটা কুড়িয়ে নিল। কে মেরেছে—জল্লাদ ছাড়া কে আবার। ঘাড় তুলে নিরিখ করে দেখে, তা-ও নয়। মেরে যদি কেউ থাকে, সে এই গাছ—জল্লাদ নয়।

জল্লাদকে এখন নতুন খেলায় পেয়ে গেছে, উঠে যাচ্ছে সে উপরের মগডালে ফনফন করে। ঝড়ের সঙ্গে দুলবে। বটগাছে দড়ির মতন সরু সরু ঝুরি ঝোলে, তারই কয়েকটা গেরো দিয়ে জল্লাদরা দোলনা বানিয়ে নেয়। ঝুরির দোলনায় বসে একজন দু হাতে শক্ত করে ঝুরি ধরে, অন্যে দোল দেয়। এই আকাশে উঠে গেল, আবার এই নেমে এলো ভুঁয়ে। ঝড়ের মধ্যে কিন্তু ভারি সুবিধা—দোল দেবার মানুষ লাগে না। ঝড়ই সে কাজটা মহাবিক্রমে করছে। দে দোল, দে দোল—

তরাসে সুরি ওদিকে সমানে চেঁচাচ্ছে: পড়ে মরবি রে হতভাগা। নেমে আয়—

জল্লাদের দৃকপাত নেই, লম্বা একখানা ডাল জড়িয়ে ধরে আছে। প্রচণ্ড বেগে যেন ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে—মজাটা সেই রকম।

সুরি সকরুণ কণ্ঠে বলে, নেমে আয় রে, ব্যাগোত্তা করছি। লকপকে ডাল ভেঙে পড়ল বলে। হাত-পা ভেঙে তুই মারা পড়বি।

সুরির ছটফটানিতে ডালের উপর জল্লাদ হি-হি করে হাসছে। চেঁচিয়ে জবাব দিল: পড়লে তো পাতাসুদ্ধ ডাল ভেঙে নিয়ে পড়ব। তাতে লাগে না। দিব্যি যেন গদিতে শুয়ে নেমে এলাম, সেই রকম ঠেকে।

অভিজ্ঞতা আছে আগেকার, তাই এরকম নিরুদ্বিগ্ন ভাব। এমনি সময়ে ঝেঁপে বৃষ্টি এলো। দৌড়, দৌড়। জল্লাদের কি হবে, ভাবনার ফুরসত নেই আর। চারজনে আবার একত্র রয়েছে—পুঁটি, চারি, সুরি, বেউলো। বৃষ্টি যেন আক্রমণ করতে আসছে, পালাচ্ছে চার মেয়ে।

তারপরে কবলে পড়ে গেল—ধারাবর্ষণ মাথার উপরে। ছুটছে না আর, হাতে হাতে ধরে মনের সুখে ভিজতে ভিজতে যাচ্ছে। কথা বলছে কলকল

করে—হাওয়ায় তক্ষুনি কথা উড়িয়ে নিয়ে যায়, একবর্ণ কানে পেঁছিয় না। যাও না বাড়ি। চুল ভিজিয়ে ফেলেছ—বকুনি কারে কয়, বুঝবে আজ।

ঘোর হতে না হতে বৃষ্টিবাতাস একেবারে থেমে গেল। কে বলবে, একটু আগে তোলপাড় করে তুলেছিল। পূব আকাশে খণ্ডচাঁদ দেখা দিয়েছে, ফিকে জ্যোৎস্নায় চারিদিক হাসছে। টপটপ করে গাছ থেকে ফোঁটা পড়ছে এখনো, চাঁদের আলো পড়ে ভিজে পাতা চিকচিক করছে।

উঠোনে জল দাঁড়িয়ে গেছে। শিশুবর কোদালে খানিক খানিক মাটি সরিয়ে পথ করে দিল, সোঁতা দিয়ে জল বেরিয়ে গিয়ে উঠোন শুকনো।

অটলা কোথা রে?

আর এক মাহিন্দার অটলের খোঁজ নিচ্ছেন ভবনাথ: আমতলায় আলো ঘুরছে—অটলা বুঝি?

অনতিপরে হাতে লণ্ঠন কাঁধে ঝুড়ি অটল এসে রোয়াকে উঠল। চৌখুপি কাচের লণ্ঠন, ভিতরে টেমি। ঝুড়ি ভরতি কাঁচাআম হড়াস করে ঢেলে ঝুড়ি খালাস করে নিল। আম ছড়িয়ে পড়ল। ভবনাথ হায়-হায় করে উঠলেন: পাকা আম খেতে দেবে না আর এবার। সেই বোল হওয়া ইস্তক অপঘাত চলেছে। কুয়োয় জলেপুড়ে গেল এক দফা, শিলাবৃষ্টিতে গুঁটি সব জখম করে দিয়ে গেল। যা বাকি ছিল, মুড়িয়ে শেষ করল আজ।

উমাসুন্দরী কিন্তু খুশি। জা'কে বলছেন. সরষে কোটো এবারে ছোটবউ। ঠাকুরপো বাড়ি এসেছে, এদ্দিনের মধ্যে পাতে একটু কাসুন্দি পড়ল না। 'বউ সরষে কোট' বলে পাখি তো মাথার ঝিটকি নড়িয়ে দেয়। গাছের কাঁচা আম প্রাণ ধরে পাড়তে পারছিলাম না, আর তোমার ভাসুরও তাহলে রক্ষে রাখতেন না। কালবোশেখী পেড়েঝেড়ে দিয়ে গেল।

পাখপাখালির ডাকে সকাল হয়। বেলা বাড়ে, কাজকর্মের মধ্যে পাখির ডাক কে আর শুনতে যাবে। এক রকমের ডাক কানে কিন্তু ঢুকবেই—এ ডাক বড় বেশি আজকাল। ছেলেপুলেরা পাখির সঙ্গে হুবহু সুর মিলিয়ে অনুকরণ করে: বউ সরষে কোট্‌, বউ সরষে কোট্‌। ডালপাতার মধ্যে অলক্ষ্য থেকে গৃহস্থবউদের পাখি মনে করিয়ে দিচ্ছে: আমের গুঁটি বেশ বড়সড় হয়েছে. সরষে-কোটার সময় এখন। আমে পাক ধরলে এর পরে আর হবে না।

বিকালের দিকে রোজই আকাশে ছেঁড়া মেঘের আনাগোনা। মেঘ জম-জমাট হয়ে চারিদিক আঁধার করে তোলে। ঝড় হয়, বৃষ্টি হয়। কাঁচাআম পড়ে, জামরুল পড়ে ডাঁই হয় তলায়। কলাবাগানে একটা অখণ্ড পাতা নেই—শত-

ছিন্ন হয়ে ডাঁটার গায়ে ন্যাকড়ার ফালির মতন ওড়ে। শিলাবৃষ্টি হল একদিন —জলের মধ্যে ছুটোছুটি করে মেয়েগুলো শিল কুড়োচ্ছে। হাতে রাখতে পারে না, হাত হিম হয়ে আসে। কুড়িয়েই মুখে ফেলে, আর নয়তো আঁচলের কাপড়ে রাখে। একদিন এর মধ্যে ঝড় বেশ জোরালো রকম হয়ে দেদার কলাগাছ ও সুপারিগাছ ফেলে গেল। চলছে এই। সারা দিনমান কড়া রোদ, আগুনের হল্কা—সন্ধ্যার মুখে মাঝে মাঝে বৃষ্টি-বাতাস। আর সকাল হতে না হতে পোড়া পাখি গাছে গাছে চেঁচিয়ে মরছে : বউ সরষে কোট্, বউ সরষে কোট্—

বাড়ি বাড়ি সরষে কুটছে, কাসুন্দি বানাচ্ছে। এ-ও এক পরব। সকাল বেলা বাসি কাপড়চোপড় ছেড়ে গায়ে তুলসীর জল ছিটিয়ে ষোল আনা শুদ্ধাচারে চারজন এঁরা কাসুন্দির কাজে ঢেঁকিশালে এলেন। বড়গিন্নি উমাসুন্দরীকে মূল-কারিগর বলা যায়। অলকা-বউ পাড় দিচ্ছে—কুচি কুচি রাঙা সরষে লোটের গর্তে, তরঙ্গিণী এলে দিচ্ছেন। কাঁচাআম চাকা চাকা করে কেটে আঁঠি ফেলে উমাসুন্দরী ধামায় করে নিয়ে এলেন। সরষে কোটা হয়ে গেল তো আম কোটা এবারে। আরও সব জিনিসপত্র বিনো বয়ে বয়ে আনছে। হলুদবরণ নতুন তেঁতুল বীচি বের করে ভাঁড়ে করে রেখেছে—সেই তেঁতুলের ভাঁড় একটা। বেঁটে সাইজের ছোট ছোট কাসুন্দির ঘট কুমোরেরা এই মরশুমে গড়ে, তাই গোটা আষ্টেক। হলুদগুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো। পাথরের খোরা, পাথরের থালা। পিতলের কড়াই, পিতলের কলসিতে জল। বওয়াবয়ির কাজটা বিনো পারে ভাল। ঢেঁকিশালের চালের নিচে এই চারজন—বাইরের কেউ না উঠে পড়ে দেখো। অনাচার লাগবে। তেমন হলে কাসুন্দি বিধবা কি সাত্ত্বিক লোকের পাতে দেওয়া যাবে না।

উমাসুন্দরী একলা হাতে বানাচ্ছেন, আর তিনজনে জোগাড় দিচ্ছে। ঢেঁকিশালের উনুনেই জল ফুটিয়ে নিল। ফুটন্ত জলে সরষে গুলে পরিমাণ মতো হলুদগুঁড়ো ও লঙ্কাগুঁড়ো মিশিয়ে ঝালকাসুন্দি। তার সঙ্গে কোটা-আম মিশাল দিলে—হল আমকাসুন্দি। পুনশ্চ তার সঙ্গে তেঁতুল চটকে দিয়ে তেঁতুল কাসুন্দি। মুখে বলেছি, আর চট করে অমনি হয়ে গেল—অত সোজা নয়। উপকরণের কমবেশি এবং মাখার কায়দা-কৌশলের উপর কাসুন্দির ভালমন্দ। সব হাতে কাসুন্দি উতরায় না। এ বাবদে পুববাড়ির বড়গিন্নির নাম আছে. তাঁর মাখা কাসুন্দি সকলে তারিপ করে খায়। ব্যঞ্জনে মিশালে একেবারে নতুন স্বাদ। ঝালকাসুন্দি আমকাসুন্দি বেশি দিন থাকে না, ছাতা ধরে যাবে। তেঁতুলকাসুন্দি ধীরেসুস্থে অনেক দিন ধরে খাওয়া চলবে, আত্মীয়-কুটুম্ব বাড়ি যাবে। আমকাসুন্দি ও তেঁতুলকাসুন্দি বড়গিন্নি ঠেসেঠেসে কয়েকটা ঘটে

ভরলেন। বললেন, সিকেয় তুলেপেড়ে রাখো এগুলো। আট-দশ দিন অন্তর রোদে দিতে হবে, খেয়াল্ থাকে যেন। কাসুন্দি ঠিক রাখা চাট্টিখানি কথা নয়।

কাসুন্দি হচ্ছে দেখে নিমি-পুঁটি ডালা নিয়ে শাক তুলতে বেরিয়েছিল। খুঁটে খুঁটে একরাশ ডাটাশাক তুলে ফিরল। শাক তেল-শাক হবে। শাক-ভাতের সঙ্গে ঝালকাসুন্দি জমে ভাল।

নতুনবাড়ির মেজঠাকরুন বিরাজবালা দেবনাথের কাছে নিমন্ত্রণ করতে এসেছেন। দেবনাথকে নয়, যে দু'জন বরকন্দাজ নিয়ে এসেছেন তাদের। বললেন, আমার ওখানে রেঁধে-বেড়ে খাবেন ওঁরা। আমি তো চিনি নে—তুমি বলে-কয়ে দাও ঠাকুরপো।

দেবনাথ হেসে বলেন, ওদের ভাগ্যি খুলল, আর আমরাই বাদ পড়ে গেলাম বউঠান?

আছ তো জষ্টিমাস অবধি—বাদ কেন পড়বে ভাই। ওঁদের তাড়াতাড়ি, কবে রওনা হয়ে পড়েন—

দেবনাথ বললেন, পরশু যাবে। বাংলাদেশের এ রকম গাঁ-গ্রাম দেখেনি কখনো। বললাম, কয়েকটা দিন থেকে যাও তবে। নয়তো আগেই চলে যেত।

মেজঠাকরুন ধরে পড়লেন: পরশু নয়, আরও একটা দিন থেকে যান। যাবেন তরশু। কাল দুপুরে একজনে খাবেন, আর একজনে পরশু। খাওয়া-দাওয়া সারা করে তার পরে পরশুও চলে যেতে পারেন, তাতে আমার অসুবিধে নেই।

দেবনাথ বলেন, পরশু কেন আবার? কালই একসঙ্গে দু-জনার হয়ে যাক না।

উঁহু—বলে ঠাকরুন ঘাড় নেড়ে দিলেন: তা কেন হবে? এনেছ অবিশ্যি তোমার নিজের কাজে, আমি ফাঁকতালে দুটি বামুন পেয়ে গেলাম। পেয়েছি তো দু-দিনের দায় সেরে নেবো। একসঙ্গে খাইয়ে দিলে তো এক দিনের কাজ হবে আমার।

দেবনাথের গোলমাল লাগছে। বললেন, বৃত্তান্তটা কি, খুলে বলো বউঠান।

এই বোশেখমাস জুড়ে ব্রাহ্মণ সেবা। নিত্যিদিন একজন করে তিরিশ দিনে তিরিশ। এতো বামুন পাই কোথা বলো দিকি। হতচ্ছাড়া গাঁয়ে ধানচালের আকাল নয়, বামুনের আকাল। তিন ঘর আছেন ওঁরা—কুড়িয়ে-বাড়িয়ে কত আর হবেন। সেই পাথরঘাটা বড়েঙ্গা রাজীবপুর ফুলবেড়ে অবধি নেমন্তন্ন

পাঠিয়ে হাতে-পায়ে ধরে দুনো দক্ষিণা কবুল করে আনতে হয়। না এনে উপায় নেই ঠাকুরপো. সংকল্প নিয়েছি—যেমন করে হোক চালিয়ে যেতে হবে।

দেবনাথ বসিয়ে দিলেন একেবারে: বরকন্দাজরা তো বামুন নয় বউঠান। একজন ছত্রি আর একজন গোয়ালা।

ঠাকরুন স্তম্ভিত। তারপর বললেন, তুমি মস্করা করছ ঠাকুরপো। চান করছিলেন, গলায় তখন এই মোটা পৈতে দেখেছি।

পৈতে তো আমাদের কায়স্থরাও কত জায়গায় নিচ্ছে। নাথমশায়রাও পৈতে ধারণ করেন। তাই বলে বামুন হয়ে গেল নাকি সব? হয় তো ভাল। তেমন বামুন মাসে তিরিশ কেন তিনশ জনকে ধরে ধরে খাওয়াও না।

বিরাজবালা সত্যি বিপদে পড়েছেন। বৈশাখী ভোজনের ব্রাহ্মণ জোটানো দিনকে দিন মুশকিল হয়ে উঠছে। হালের ছোকরারা ইস্কুল-কলেজে পড়ছে—শোনা যায়, চুপিসারে শহরের হোটেলে ঢুকে মুরগি মারে, কিন্তু ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষায় গররাজি তারা—ভোজনান্তে হাত পেতে দু-আনা দক্ষিণা নিতে তাদের ঘোর আপত্তি। ভোজন অবশ্য মেজঠাকরুনের বাড়িতে পোলাও-কালিয়া নয়, সাদামাটা ডাল-চচ্চড়ি-ভাত। বেওয়াবালতি মানুষ—পুণ্যের লোভ ষোলআনা আছে, কিন্তু খরচার টানাটানি। তা সে যা-ই হোক, এই সোনাখড়ি গাঁয়ের তিন ব্রাহ্মণবাড়িতে উপবীতধারী যতগুলি আছেন, সবাইকে এক একদিন করে খেয়ে যেতে হয়। আপত্তি করলে ঠাকরুন পা জড়িয়ে ধরবেন—একফোঁটা বালকেরও পা ধরতে বাধা নেই। বয়স কম হলেও ব্রাহ্মণো কেউ খাটো যায় না—কেউটেসাপ বাচ্চা হলেও পুরোদস্তুর বিষ থাকে। মেজঠাকরুনের হাত এ-তাবৎ এড়াতে পারেনি কেউ—উঁহু, একবারই কেবল. অনিল ভটচাজের বাপ হৃষীকেশ ভটচাজ মশায়। রাজি হয়ে গিয়ে দিনের দিন ভটচাজমশায় 'না' বলে বসলেন। কেন, কি বৃত্তান্ত? জ্বর হয়েছে কাল রাত্রে, নয়তো কেন আর যাব না বলো। যাচ্ছি তো ফি বছর। কিন্তু ফি বছর আর এ বছরে তফাত আছে, জানেন মেজঠাকরুন। অব্রাহ্মণের অন্নাহার চলবে না, সম্প্রতি কথা উঠেছে—হৃষী ঠাকুর হয়তো-বা তার মধ্যে গিয়ে পড়েছেন। বিরাজবালাও সহজে ছাড়ার পাত্র নন, ঢিপ করে হৃষীকেশের পায়ের উপর আছড়ে পড়লেন: কি করি এখন ঠাকুরমশায়? আপনার কথা পেয়ে অন্য কাউকে নেমন্তন্ন করা হয়নি—ব্রত পণ্ড হয়ে যাবে। একহাতে ঠাকুরের পা জড়িয়ে রয়েছেন, অন্য হাত বুলিয়ে ভাল করে আন্দাজ নিচ্ছেন। ঈষৎ গরম বলে ঠেকে—হতেও পারে জ্বর। তারপর হৃষী ভটচাজ 'ওঠো মা' বলে হাত ধরে তুলে দিলেন, তখন আর সন্দেহ রইল না। জ্বরই বটে, ঠাকুর ছুতো ধরেন নি। দীনু চক্কোত্তিকে

ধরে পেড়ে সেদিনের কাজ সমাধা হল। কিন্তু মনে মনে মেজ-ঠাকরুন শাসিয়ে গেলেন: ছাড়ছি নে ঠাকুর। জর বলে বিছানায় ক'দিন পড়ে থাকতে পারো দেখি। বোশেখ শেষ হতে এখনো বাইশ দিন বাকি— ভোজনে না বসে যাবে কোথা?

তক্কে তক্কে রইলেন ঘরের বার হলেই পা জড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু কায়দায় পাওয়া গেল না, জরবিকারে হৃষীকেশ মারা গেলেন বোশেখের ভিতরেই। আট তারিখে অসুখ করেছিল—তাঁর খাওয়ানোটা আগে সেরে রাখলে ব্রাহ্মণ সেই বছরটা অন্তত ফাঁকি দিতে পারতেন না।

বৃদ্ধ দীনু চকোত্তি ভোজনে বসে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আর চারটে-পাঁচটা বছর পরে অসুবিধা থাকবে না বউমা, গ্রামের ভিতর থেকেই বিস্তর পাবে।

আঙুলের কর গণে হিসাব করেছেন: আমাদের হরি আর অতুল, ভটচাজ-বাড়ির রমশা নিমু আর গোবরা, আর চাটুজ্জেদের শ্যামাপদ এতগুলোর উপনয়ন হয়ে যাবে। ছয়-ছয়টা আনকোরা ব্রাহ্মণ গাঁয়ের মধ্যে। তারপরেও যা নাজাই থাকল, এত গ্রাম চুঁড়তে হবে না, শুধু এক রাজীবপুর থেকেই হয়ে যাবে।

বিরাজবালা কিন্তু ভরসা পান না। জমা যেমন ছয়টি পড়ছে, খরচাও এর মধ্যে কতগুলো হবে কে জানে। ঐ হৃষী ভটচাজ্জের মতো। বয়স তোমারও কম হল না দীনু ঠাকুর—আরও পাঁচটা বছর তুমি নিজে টিকে থাকবে তো বটে?

রাজীবপুর বর্ধিষ্ণু গ্রাম, বিস্তর ঘর ব্রাহ্মণের বসতি। হলে হবে কি— বৈশাখ মাস সেখানেও, এবং নিত্যদিনের ব্রাহ্মণসেবী জন আষ্টেক অন্তত আছেন বিরাজ-বালার মতন। তার মধ্যে আবার চৌধুরিবাড়ি ও সরকারবাড়ির গিন্নি দুটি রয়েছেন। চৌধুরিরা বনেদি গৃহস্থ, রাজীবপুর তালুকখানার রকম চারআনা হিস্যার মালিক সকল শরিক মিলে। আর সরকাররা নতুন বড়লোক—কালীকান্ত সরকার মোক্তারি করে দু-হাতে রোজগার করছেন। চৌধুরিগিন্নি আর সরকারগিন্নিতে ঘোর পাল্লাপাল্লি। ইনি আজ কইমাছ খাওয়ালেন তো নির্ঘাত উনি কাল গলদাচিংড়ি খাওয়াবেন, ইনি পায়েস খাওয়াচ্ছেন তো উনি দই-রসগোল্লা। প্রতিযোগিতায় দক্ষিণাও বেড়ে যাচ্ছে—দু-আনা থেকে উঠতে উঠতে টাকায় পৌঁছে গেছে। এত মজা ছেড়ে রাজীবপুরবাসী কোন হতভাগা বামুন চড়া রোদের মধ্যে দু-ক্রোশ পথ ঠেঙিয়ে সোনাখড়ি অবধি যেতে যাবে?

এই তো অবস্থা! দেবনাথের কথা শুনে মেজঠাকরুন ঝিম হয়ে আছেন। বরকন্দাজ দুটো ফসকে গেল তবে—পৈতে সত্ত্বেও তারা সত্যিকার বামুন নয়।

ডুবন্ত লোকের তৃণ চেপে ধরার মতন তবু একবার বললেন, মস্করা কোরো না ঠাকুরপো, কত আশা করে এসেছি আমি—

দেবনাথ বললেন, মিছামিছি বামুন বলে তোমার পুণ্যি বরবাদ করব, সেইটে কি ভাল হবে বউঠান?

আচ্ছা, কী জাত আমিই ওঁদের জিজ্ঞাসা করব—বলে আশাভঙ্গের আঘাতে মেজঠাকরুন মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন।

॥ পাঁচ ॥

পুষ্পময় তরুরাজি কৈলাস-শিখরে।
সদা শোভে মনোহর রতন-নিকরে।
সিদ্ধ চারণাদি তথা সুখেতে বিহরে।
আমোদে অপ্সরাকুল নৃত্য করি ফিরে॥
বেদধ্বনি উঠে সদা ব্রহ্মঋষি মুখে।
নিবাস করেন শিবা শিব অতি সুখে॥

ভিতর দিক থেকে আসছে। দেবনাথের চমক লাগে, গলাটা মিতের না? বিনো পুকুরঘাটে গিয়েছিল—ভরা কলসি নিয়ে উঠি-কি-পড়ি বাড়িমুখো দৌড়চ্ছে।

দেবনাথ বললেন, সুর ধরেছে কে রে বিনো? দেবেন না?

বিনো বলে, তিনিই। হাঁটু অবধি কাপড় তুলে বিল ভেঙে বাদামতলায় এসে উঠলেন, ঘাট থেকে দেখতে পেলাম। ছোটমেয়ের কাছে বিল-পার মির্জানগরে ছিলেন, মনে হচ্ছে।

দেবনাথ হঠাৎ ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বললেন, আমার কাছে না এসে মিতে সরাসরি ভিতরে ঢুকে গেল?

কৈফিয়ৎ যেন বিনোরই দেবার কথা। সে বলে আপনি বাড়ি এসেছেন—কি করে জানবেন? বিষ্ণুপুর গিয়ে ফটিক সেদিন পায়নি। আমি গিয়ে বলছি আপনার কথা।

দেবেন্দ্র চক্রবর্তী বাড়ি যাচ্ছেন, পাথরঘাটা গাঁয়ে। পথের মাঝে সোনাখড়িতে একটু বসেছেন। দেবনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার দরুন সোনাখড়ি এলে পুববাড়িতে একবার বসবেনই। মেয়েমহলে বেশি পশার—কোথাও গেলে পুরুষদের এড়িয়ে সোজা ভিতরে চলে যান। সেকালে দৈবজ্ঞগিরি পেশা ছিল—তক্তার উপর আলকাতরায় সাইনবোর্ড লিখে বাড়ির সামনের সুপারিগাছে

টাঙিয়ে দিয়েছিলেন : হাত-দেখা বর্ষফল-গণনা গ্রহশান্তি স্বস্ত্যয়ন কোষ্ঠি-ঠিকুজি-বিচার যোটক-বিচার ইত্যাদি করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

পাঁচ মেয়ে পাত্রস্থ হবার পর অবস্থা বদলে গেল। 'দশপুত্র সম কন্যা যদি পড়ে পাত্রে'—চক্রবর্তীর কপালে তাই ঘটেছে। ব্রাহ্মণী গত হয়েছেন, কিন্তু মেয়েরা সাতিশয় ভক্তিমতী। তবে আর কোন দুঃখে দৈবজ্ঞগিরি করে বেড়াবেন। পেশা বরঞ্চ বলা যায়, পঞ্চকন্যাকে পালাক্রমে পিতৃসেবার পুণ্য-বিতরণ।

তখন দেবেন্দ্রের একটা কাজ ছিল, বৈশাখের গোড়ার দিকে বাড়ি বাড়ি বর্ষফল শোনানো—সিকিটা-আধটা মিলত। পেশা ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু নেশা যাবে কোথায়। আগেকার মতোই পাঁজি সব সময় সঙ্গে থাকে। পাঁজির ভিতরেই সর্বশাস্ত্র—পাঁজি যার নখদর্পণে, চক্রবর্তীর মতে, সে ব্যক্তি সর্ববিদ্যায় পারঙ্গম। এখনো যেহেতু বৈশাখ মাস চলছে, মেয়েরা সব তাঁর কাছে বর্ষফল শুনতে চায়। চক্রবর্তীও মহানন্দে লেগে গেলেন :

হর প্রতি প্রিয়ভাষে কন হৈমবতী।
বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি ॥
কোন গ্রহ হৈল রাজা, কেবা মন্ত্রীবর।
প্রকাশ করিয়া কহ, শুনি দিগম্বর ॥
ভব কন ভবানীকে, কহি বিবরণ।
বৎসরের ফলাফল করহ শ্রবণ ॥

ভূমিকা চলছে, আর চক্রবর্তী দ্রুত পাঁজির পাতা উল্টে যাচ্ছেন। রাজা-মন্ত্রীর পাতা বেরিয়ে গেল—গুরু রাজা, রবি মন্ত্রী। পাতার আধাআধি জুড়ে ছবি : মুকুট-পরা রাজা রাজসিংহাসনে আসন-পিঁড়ি হয়ে আছেন। আঁটো জামা গায়ে, ভারী গোঁফ। মাথার উপর ছাতা—ছাতা বোধহয় সিংহাসনের সঙ্গে সাঁটা। অথবা ছাতা ধরে কেউ পিছনের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে আছে। রাজার বাঁ-দিকে প্রকাণ্ড পাখা হাতে পাখাবরদার, তলোয়ার কাঁধে চাপড়াশ-আঁটা সৈন্য কয়েকটা। মন্ত্রীমশায় ডানদিকে—তাঁরও উঁচু আসন, কিন্তু আয়তনে ছোট। মাথায় পেখম-দেওয়া, মুকুট নয়, পাগড়ির মতন জিনিস। চোখ বুলিয়ে দেখে দেবেন্দ্র চক্রবর্তী বললেন, এবারের রাজাটি ভাল। মেঘ যথাকালে বৃষ্টিদান করবে। ধরিত্রী শস্যপূর্ণা, প্রজারা নিঃশঙ্ক। মন্ত্রীটি কিন্তু সুবিধের নন। শস্যহানি, প্রজাদের নানা নিগ্রহ-ভোগ, শোকভয়।

হিরু কলকের তামাক সেজে আগুনের জন্য রান্নাঘরে যাচ্ছিল। দাঁড়িয়ে পড়ে টিপ্পনী কাটে : রাজায় মন্ত্রীতে লেগে যাবে খটাখটি। ইনি শস্য ঢালবেন, উনি ভরা-ক্ষেত খরায় পুড়িয়েজ্বালিয়ে দেবেন।

জলাধিপতি শস্যাধিপতি মেঘনায়ক নাগনায়ক পবনাধীশ গজপতি সমুদ্রপতি পর্বতপতি ইত্যাদির ফলবর্ণনা একে একে আসছে। শস্যাধিপতির নামে চক্রবর্তী শিউরে উঠলেন—সর্বনেশে ঠাকুর—শনি। ফলং শস্যহানি, অগ্নিভীতি, দুর্ভিক্ষ, মড়ক।

কলকের ফুঁ দিতে দিতে হিরু এসে পড়ল। পাঁজি রেখে চক্রবর্তী নিজ হুঁকোয় কল্কে বসিয়ে নিলেন।

কমল উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল গুরু-রাজা রবি-মন্ত্রীর ছবি দেখবার জন্য। পাতাটা খোলাই আছে। বর্ষফল একটু থামিয়ে রেখে দেবেন দ্রুত কয়েক টান টেনে নিচ্ছেন। রাজা-মন্ত্রী কমল খুব মনোযোগ করে দেখছে। ধুস্—পুরানো পাঁজিগুলোয় যেমন আছে, এরাও হুবহু তাই। বছর বছর রাজা-মন্ত্রী বদলাচ্ছে, চেহারা তো বদলায় না। অবশেষে সমাধান একটা ভেবে নিল, আগে চেহারা যেমনই থাকুক রাজা-মন্ত্রী হলেই সব এক রকমের হয়ে যায়।

হপ্তাখানেক পরে একদিন হুলস্থুল কাণ্ড। শয়তানি সেধে গেছে কারা। সকালবেলা বাবলাডালের একটা দাঁতন ভাঙবেন বলে দেবনাথ দক্ষিণের দোর খুলে বেরিয়েছেন। সামনে দাওয়ার উপর ঠাকুর প্রতিমা। সদ্য-গড়া প্রতিমা রাতের অন্ধকারে চুপিসারে রেখে গেছে।

ও দাদা, উঠে এসো। দেখ কী করে গেছে—

হাঁক পাড়ছেন দেবনাথ। ভবনাথ মশারি খুলে দিয়ে শয্যার উপর উবু হয়ে বসে হুঁকো টানছেন। এই বিলাসটুকু বহু দিনের। হুঁকো ফেলে ছুটতে ছুটতে এলেন। চেঁচামেচিতে বাড়িসুদ্ধ সব এসে পড়েছে।

দেবনাথ বললেন, প্রতিমা রেখে গেছে, ফেলে তো দেওয়া যাবে না।

জিভ কেটে উমাসুন্দরী বললেন, সর্বনাশ! ছেলেপুলে নিয়ে ঘর—অমন কথা মুখেও আনে না। তোমাদের যেমন সাধ্য, করবে। নমো-নমো করে হলেও করতে হবে।

উত্তরে শরিক-বাড়ির দিকে চোখ পাকিয়ে ভবনাথ গর্জন করে উঠলেন: বংশীধর ঘোষের কারসাজি, দেখতে হবে না। দেওয়ানি মামলা করেছে, ফৌজদারি করেছে, কিছুতে কায়দা করতে পারে না—উল্টে নিজেই নাকানি-চোবানি খেয়ে আসে। এবারে এই চালাকি খেলল। খরচান্ত করে পুববাড়ি কাবু হয়ে পড়লে ওদেরই ভাল।

কৃষ্ণময় ঘাড় নেড়ে বলল, আমার কিন্তু তেমন মনে হয় না বাবা। বংশী-কাকা নন, ফক্কোড় ছোঁড়াদের কাজ—গাঁয়েরই হোক, কিম্বা বাইরের হোক।

নতুনবাড়ি ক'বছর পুজো করে বন্ধ করে দিল, তারপর থেকে আশ্বিনে এ গ্রামে ঢাকের কাঠি পড়ে না। অথচ সামান্য দূর রাজীবপুরে ছ-সাতখানা পুজো। কথা উঠেছিল, চাঁদা তুলে গাঁওটিপুজো হবে। মতলব করে তারপর আমাদের একলার ঘাড়ে সম্পূর্ণটা চাপিয়ে দিল।

কথার মাঝে উমাসুন্দরী না-না করে ওঠেন। কেউ চাপায় নি রে বাবা—প্রতিমা কারো রেখে-যাওয়া নয়। আমাদের ভাগ্যে জগন্মাতা নিজে এসে উঠেছেন।

কৃষ্ণময় আগের কথার জের ধরে বলে যাচ্ছে, নতুনবাড়ি অষ্টপ্রহরী আড্ডা। মতলব ওখান থেকেও উঠতে পারে। হিরুকে একবার ভাল মতন জেরা করে দেখুন কাকা।

উৎস আবিষ্কারে দেবনাথের আগ্রহ নেই। এতবড় দায় কাঁধে চাপল, তিনি আরও হি-হি করে হাসেন। বললেন, বড়লোক হয়েছে যে দাদা। ভাইয়ের পা রুপোয় বাঁধানো—হাঁটা-চলা নিষেধ, নগরগোপ থেকেও পালকি হাঁকিয়ে আসতে হয়, বেহারারা ও-হো এ-হে হাঁকডাক করে তল্লাটের কানে তালা ধরিয়ে দেয়। পুববাড়ি-রা সাংঘাতিক রকমের ধনী, সকলে জেনেছে। যে জিনিস তুমি চেয়েছিলে দাদা। সব শেয়াল ছেড়ে দিয়ে ল্যাজ-মোটাকে ধর, গল্পে আছে না—এবারে সামলাও ঠেলা। গাঁওটি বাতিল করে একলা তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। চেষ্টা করে ল্যাজ মোটা করেছ, এর তার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে কি হবে। পুজো কেমন করে ওতরায়, তাই দেখ এখন।

চাউর হয়ে গেল, পুববাড়িতে ঠাকুর ফেলেছে, প্যাঁচে পড়ে গেছে ওরা—পুজো না করে উপায় নেই। নতুনবাড়িতে আগে পুজো হত। শরিক অনেক—সকলের অবস্থা সমান নয়। খরচ করা ও ঝঞ্ঝাট পোহানোর অভিরুচিও থাকে না সকলের। মাদার ঘোষের বাপ চণ্ডী ঘোষ তখন বর্তমান। জজের পেস্কার তিনি, সিকিতে আধুলিতে নিত্যিদিন বিস্তর পকেটে পড়ে, হিসাব করলে উপরি-রোজগার মাসান্তে খোদ জজসাহেবের মাইনের দুনো-তেদুনো দাঁড়ায়। অতএব, শরিকদের যে যতটা পারে দিল, নাজাই পূরণের বাবদে আছেন চণ্ডী ঘোষ। তিনি মারা যাবার পরে মাদার একটা বছর কায়ক্লেশে চালিয়েছিলেন, কিন্তু বাপের দিল-দরিয়া মেজাজখানা থাকলেও সে রোজগার কোথায়? পুজো বন্ধ হল। এতদিন পরে এবারের আশ্বিনে সোনাখড়িতে আবার দুর্গোৎসব।

দলে দলে লোক এসে প্রতিমা দেখছে। ছোটখাট এক মেলা লেগেছে যেন। খবর বাইরেও ছড়িয়েছে, বা'র-গাঁয়ের লোকও আসছে। মাথা সমেত একেবারে ষোলআনা প্রতিমা—শুধু রং পড়েনি এবং সাজসজ্জা নেই। শতকণ্ঠে

সবাই তারিফ করছে। ঠাকুর গড়ানের পটুয়া বিলেত থেকে আসে নি নিশ্চয়। গড়া হয়েছে এই গাঁয়ের কুমোরপাড়ার ভিতরেই, আর নয় তো রাজীবপুরে। কোথায় রেখে গড়া হল, কারা গড়ল—ঘুণাক্ষরে প্রকাশ নেই। নিখুঁত মন্ত্রগুপ্তি।

বিকালবেলা গাঁয়ের মুরুব্বিদের নিয়ে ভবনাথ-দেবনাথ শলাপরামর্শে বসলেন। ভবনাথ দুঃখ করছেন : জোড়া মেয়ের বিয়ে দিয়ে তার উপর পুকুর কাটিয়ে হাত একেবারে শূন্য। জষ্টিমাসের আম-কাঁঠাল খেয়ে যাবে বলে ভাইকে বাড়ি নিয়ে এলাম, তখন এই শত্রুতা সেধে গেল। আপনাদের নিয়ে বসেছি—কী ভাবে কি করা যায়। ফেলেছেও ঠাকুর দেখুন দি'ক—কালী নন, লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক নন, দশভুজা দুর্গা। সেকালে শোনা আছে, জব্দ করার জন্য শত্রুপক্ষ এমনি ফেলত—তখন সস্তাগণ্ডার দিন, টাকা পঞ্চাশের মধ্যে খাসা একখান দুর্গোৎসব নেমে যেত। এখন নমো-নমো করেও কি লাগবে, হিসেব করে দেখুন।

বরদাকান্ত আগের প্রসঙ্গে একটু বলে নিচ্ছেন : শত্রুতা করে গেছে তোমাদের সঙ্গে, এমন কথা মনেও জায়গা দিও না ভবনাথ। রাজীবপুরে ছ-সাতখানা দুর্গা তোলে, আমাদের এ-গাঁয়ে তখন একটা ঢাকেও কাঠি পড়ে না। বেটাছেলেরা রাজীবপুর অবধি গিয়ে পূজো দেখে আসে, কিন্তু মেয়েলোকে পারে না—বুড়োরা ছেলেপুলেরাও না। ঘরে বসে মন আনচান করে, বুঝে দেখ তাদের অবস্থা। তা ছাড়া আমাদের সোনাখড়ি গাঁয়ের অপমানও বটে। তোমার রাঙা ভাই দেবনাথ—মহমায়ার ইচ্ছাতেই সে কৃতিপুরুষ হয়েছে। মায়ের বাঞ্ছা হয়েছে, তোমাদের হাতেই পূজো নেবেন তিনি। যারা প্রতিমা ফেলেছে, মহামায়াই তাদের হাত দিয়ে করেছেন—কোন সন্দেহ নেই।

উত্তরবাড়ির যজ্ঞেশ্বর জুড়ে দিলেন : আরও দেখ, সবে বোশেখমাস, পাকা ছ-মাস হাতে দিয়ে নোটিশ ছেড়েছে—সেদিক দিয়ে বলবার কিছু নেই। যোগাড়-যন্তরে এখন থেকে লেগে যাও। গাঁয়ের ছোঁড়ারা রয়েছে, ওরা ডাঙা ভেঙে ডহর করে। আর এর মধ্যে একটা পাল্লাপাল্লির ব্যাপারও আছে রাজীবপুরের সঙ্গে। ভাবনাচিন্তা কোরো না. নির্বিঘ্নে কাজ উঠে যাবে, ছোঁড়ারাই কোমর বেঁধে লাগবে।

পাল্লাপাল্লির কথায় হারু মিত্তির বলল, পূজো যখন হচ্ছে, থিয়েটারও হবে। অতি-অবশ্য ওটা। রাজীবপুরের ওরা তো থিয়েটারেই মাত করে দেয়। গেল-বছর কলকাতার অ্যাকটর নিয়ে এসেছিল।

অক্ষয় বলে, মণ্ডপে আর ক'টা লোক? মণ্ডপের সামনের স্টেজের মাঠে

লোকে-লোকারণ্য। কলকাতার অ্যাকটর এবারও হয়তো আনবে। থিয়েটার বিনে শুধো-দুর্গোৎসবে গাঁয়ের লোক কিন্তু ধরে রাখা যাবে না —রাত্রে মণ্ডপ পাহারার ক'টা জোয়ানপুরুষ জোটানোই মুশকিল হবে। তাছাড়া পূজো সোনাখড়িতে হচ্ছে—আর সোনাখড়ির যত মানুষ থিয়েটারের টানে রাজীবপুর গিয়ে জুটছে, আমাদের পক্ষে অপমানও বটে। বলুন তাই কিনা।

বরদাকান্ত বাধা দিয়ে ওঠেন : না হে, আর চাপিও না তোমরা। পুকুর-কাটা, মেয়ের বিয়ে দেওয়া—মোটা মোটা খরচ করে উঠেছে, তার উপরে আবার মা-দুর্গা ঘাড়ে এসে পড়লেন। যেমন তেমন পূজো নয়—দুর্গোৎসব। অন্য দেবদেবীরা আছে, শুধু-পূজো তাঁদের—সরস্বতীপূজো লক্ষ্মীপূজো বাস্তুপূজো শীতলাপূজো--উৎসব বলতে হয় না। দুর্গার বেলাতেই কেবল দুর্গোৎসব।

হারু সায় দিয়ে বলল, ঠিক বলেছেন মামা। থিয়েটার গাঁওটি -পুববাড়ির কিছু নয়, গ্রামসুদ্ধ চাঁদা তোলা হবে ঐ বাবদে। থিয়েটার সমেত গোটা পূজোই গাঁওটি হবে, আগে তো সেইরকম কথা হচ্ছিল —অর্ধেক তবু ছাড় হয়ে গেল। থিয়েটার সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার—পেয়াজেরও তোফা জায়গা রয়েছে, নতুনবাড়ির বৈঠকখানা।

হিমচাঁদ মাঝবয়সি রসিক মানুষ। রসান দিয়ে তিনি বললেন, থিয়েটার তো অহোরাত্রিই ওখানে যার যেমন খুশি করে যায়। এবারে মুখস্থ পার্ট-কার পরে কোন জন হিসেব করে তাদের চলন-বলন, এইমাত্র তফাত।

হারু মিস্তির বলল, এদিককার একপয়সা খরচার জন্যে বলব না, আমরা নিজেরা ব্যবস্থা করে নেবো। শুধু প্লের দিন পূজোর উঠোনটির উপরে সামিয়ানা খাটিয়ে নিচে কয়েকটা মাদুর ফেলে দেবেন, ব্যস। স্টেজ আমাদের খরচায় আমরাই বেঁধে নেবো, হ্যাজাক ভাড়া আমরা করব। পান-তামাক আর কেরাসিনতেল যা লাগবে, সেই খরচটা গৃহস্থের। নেহাৎ মাকে পালাটা শোনাতে চাই, নয়তো উঠোনও চাইতাম না।

হিমচাঁদা বললেন, ভাল বুদ্ধি করেছ হে। প্লে শুনে লোকজন উঠে যেতে পারে, তবু আসর ফাঁকা হতে পারবে না মা-জননীকে থাকতেই হবে, শেষ অবধি না শুনে গত্যন্তর নেই। একলা তিনি নন—দুই ছেলে কার্তিক-গণেশ দুই মেয়ে লক্ষ্মী-সরস্বতী সমেত। অন্য কেউ না থাকলেও এই পাঁচজন তো পাকা রইলেন। অসুর আর সিংহ ধরলে সাত।

বরদাকান্ত বললেন, গণেশের কলাবউকে বাদ দিচ্ছ যে? শোনার লোক আরও তো একজন বাড়তি আছেন।

কথাবার্তা শেষ করে হাসিখুশিতে যে যার বাড়ি চলে গেল।

ভবনাথ বললেন, কানাপুকুর-পাড়ের বেলগাছটা কেটে ফেলতে হবে। পাট ঐ গাছে। দেরি আছে অবিশ্যি।

মূল পূজার দায় যাঁদের কাঁধে, ইচ্ছে হয় তো তাঁরা দেরি করুন গে। আমাদের এক্ষুনি লেগে পড়তে হবে—কোমর বেঁধে। এক্ষুনি, এক্ষুনি—দশের কাজকর্মে পয়লানম্বরি পাণ্ডা হারু মিত্তির নতুনবাড়ির আড্ডায় ঘোষণা করল।

তালুকদার বলে পশ্চিমবাড়ির খাতির, যেহেতু দেবহাটা তালুকের কিছু অংশের মালিকানা তাঁদের। এক শরিক হারু—ছোট্ট শরিক, তালুকের রকম আধআনা হিস্যার মালিকানা। সোনাখড়ির আদি বাসিন্দা নয় সে, মামাবাড়ির ভাগ্নে হয়ে আসা-যাওয়া করত, মামা নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যাবার পর পাকা-পাকি এসে উঠেছে। সম্পত্তি ছোট, সংসারও ছোট তেমনি। সাকুল্যে দুটি প্রাণী. দেবা আর দেবী, সে নিজে আর বউ মনোরমা। দশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া স্বভাব তার: সংসারের ঝামেলা নেই, রোজগারের ভাবনা ভাবতে হয় না—ঘরের খেয়ে হারু মিত্তি অহর্নিশি বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়ায়।

গানবাজনা যাত্রা-থিয়েটারের নামে পাগল। যাত্রা শুনতে মাঘের রাত্রে তুর-তুর করে কাঁপতে কাঁপতে যে তিন-চার ক্রোশ দূর অবধি চলে যায়। (কুলোকে রটায়, ওর মধ্যে অন্য ব্যাপারও নাকি আছে।) এবারে গাঁয়ের সেই জিনিস। যাত্রা নয়, থিয়েটার—যাত্রার যা পিতামহস্বরূপ। বখেড়ার মোটা অংশ পূববাড়ির কর্তারা নিয়ে নিয়েছেন—পুজোআচ্চার ভাবনা হারুদের ভাবতে হবে না। একটা-কিছু বললে নিশ্চয় লেগেপড়ে করবে—কিন্তু দায়িত্বটা ওঁদের। থিয়েটারের ব্যাপারে এরাই সর্বেসর্বা—খ্যাতি-অখ্যাতি ষোলআনা এদের উপর বর্তাবে।

গ্রাম নিয়ে হারুর দেমাক। সোনাখড়ি আয়তনে একফোঁটা, লোকজন যৎসামান্য—তাহলেও রাজীবপুরের মতো গণ্ডগ্রামের সঙ্গে টক্কর দিয়ে চলবার মতো ক্ষমতা রাখি আমরা। সোনাখড়ি খাটো কিসে? মোনছোফ (মুন্সেফ) আছে আমাদের, ইঞ্জিনিয়ার আছে, উকিল আছে, মোক্তার আছে, কলকাতার চাকুরে আছে, কলেজের পড়ুয়া আছে। অধিকন্তু রায়-সাহেব আছে একটি—এ বাবদে রাজীবপুর গো-হারান হেরে রয়েছে। আশ্বিনের দুর্গোৎসবও ছিল—নতুনবাড়ির মাদার ঘোষের পিতা চণ্ডী ঘোষ জাঁকিয়ে পুজো করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে পুজো বন্ধ। থিয়েটার কোনদিনই নেই। উভয় কলঙ্ক মোচন হয়ে যাচ্ছে এবারে।

তড়িঘড়ি কাজ। দত্তবাড়ির কালিদাস কলকাতার হ্যারিসন রোডের মেসে

থাকে, চাকরি করে। কলকাতার বন্দোবস্ত তার উপর চাপিয়ে হারু জরুরি চিঠি দিল: পত্রপাঠমাত্র নাটক পছন্দ করে পাঠাও। পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক—যাতে সাজপোশাক গোঁফদাড়ি যুদ্ধ ও নৃত্যগীতাদি আছে। চরিত্র যত বেশি হয় ততই ভাল—বেশি লোক কাজে পাওয়া যাবে। কিন্তু স্ত্রী-চরিত্র পাঁচ-সাতটির বেশি নয়—গোঁফ কামিয়ে স্ত্রীলোক সাজতে ছেলেরা বড় নারাজ। নাটক ঠিক করে তার মধ্যে তোমার কোন পার্ট হবে জানিও। আর অমুক অমুকের (দু-তিনটে নাম—গাঁয়ের ছেলে তারাও, কলকাতায় থাকে) কি পছন্দ, তা-ও জিজ্ঞাসা করে নিও। এ ছাড়াও খাস-কলকাতার প্লেয়ার গোটা দুই-তিন আনার বন্দোবস্ত করবে। কলকাতার প্লেয়ার না হলে মানুষ টেনে রাখা মুশকিল হবে। আমাদের আসর খাঁ-খাঁ করছে, সব মানুষ গিয়ে রাজীবপুরে জুটেছে—এমনি অবস্থা ঘটলে গ্রামসুদ্ধ আত্মঘাতী হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

কালিদাস ঘোর থিয়েটার-পাগলা, হপ্তার মধ্যে থিয়েটারে একদিন নিদেন পক্ষে যাবেই। মানুষ বুঝেই হারু মাতব্বর কাড়ছে। মোনছোফ ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি ইত্যাদির কাছেও মচ্ছবের খবর জানিয়ে চিঠি চলে গেল—এমনও আছেন, তিন-চার পুরুষ আগে পিতামহ প্রপিতামহেরা আমলে চাকরি সূত্রে প্রবাসে গিয়ে তথাকার পাকাপাকি বাসিন্দা, সোনাখড়ি নামটা কানে শোনা আছে কি নেই—গ্রামবাসী হিসাবে তাঁরাও হারুর লিস্টি-ভুক্ত, পাল্লাপাল্লির মুখে জাঁক করে সে তাঁদের নামে। পুজোর সময় আসতেই হবে তাঁদে সপরিবারে। আর চাঁদার প্রার্থনাও জানিয়েছে গ্রামের ইতরভদ্র সর্বজনার পক্ষ থেকে।

বিচার-বিবেচনা ও অনেক শলাপরামর্শ অন্তে কালিদাস পালা পছন্দ করে পাঠাল—সিরাজদ্দৌলা। নবাবী সাজপোষাক, জোরদার অ্যাকটিং, ঘনঘন কামান নির্ঘোষ, দরকারে স্টেজের উপরেই লড়াইয়ের সিন ঢোকানো যেতে পারবে। আর আছে ইংরেজদের গালিগালাজ। আজকের দিনে এ জিনিস না জমে যাবে কোথায়! সৈন্যসামন্ত সভাসদ দূত নাগরিক প্রহরী খোজা দেদার রয়েছে, অতএব কথা মুখে ফুটুক আর না-ই ফুটুক যে চাইবে তাকেই পার্ট দিয়ে খুশি করা যাবে। এসব ছাড়াও সোনাখড়ি-বাসী এক বিশেষ গুণী রয়েছে—নরেন পাল। নাচে গানে চৌকস—রাজীবপুর থিয়েটারে সখি সেজে এসেছে বরাবর। নামডাক এতদূর বেড়েছে, গেল-বছর সদর থেকে ডাক এসেছিল তার—জজ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আলিবাবা পালায় মর্জিনা সেজে আসর মাত করে এসেছে। গ্রামেই থিয়েটার যখন, এবারে সে কোনখানে যাবে না—এখানকার ড্যান্সিং-মাস্টার। পালার গান তো আছেই, উপরি কিছু বাইরের গানও জুড়ে দেবে। মর্জিনার গান গোটা দুই নাগরিকাগণের মুখে জুড়ে দেবে, বলছে নরেন

অপরাহ্নবেলা নতুনবাড়ির রোয়াকের এ-মুড়ো ও-মুড়ো ঘুরে ঘুরে হারু মিস্তির ঢং-ঢং করে ঝাঁজ বাজায়। লোকজন ডাকছে। থিয়েটার নামানো চাট্টিখানি কথা নয়—নানান রকম কাজ, বিস্তর খাটনি। গাঁ তোলপাড়—মানুষ সব চলেছে। যাদের পার্ট আছে তারা যাচ্ছে, যাদের নেই তারাও যাচ্ছে রিহার্স্যাল দেখার কৌতূহলে। তিন-চারজনে অহোরাত্রি পার্ট লিখছে—লিখে লিখে দিয়ে দিচ্ছে। আধ-মুখস্থ হয়ে গেলে তখন রিহার্স্যাল। মনকষাকষি, ঝগড়া—আমার পার্ট ছোট হয়ে গেল, অমুকের পার্ট বড়। হারু বলে, ছোট হোক—এবারের মতন নামিয়ে দাও। ভাল হলে আয়েন্দা সব প্রোমোশান। কখন বা বিরক্ত হয়ে বলে, সামনের বছর খুঁজে পেতে এমন নাটক আনব, ঠিক ঠিক একশ নম্বর করে পার্ট যাতে। মেয়ে পুরুষ দূত সৈনিক সবাই একশ দফা করে বলতে পারে—একশ'র কম নয়, বেশিও নয়। তা নইলে দেখছি তোমাদের খুশি করা যাবে না, থিয়েটার-পার্টি ভেঙে যাবে।

দিনরাত্রি এখন এই এক উপসর্গ হয়েছে, উচ্চৈঃস্বরে পার্ট মুখস্থ করছে ছোঁড়ারা। প্রবীণও দু-পাঁচটি জুটে গেছেন তার মধ্যে। টানা মুখস্থ চাই, প্রম্পটারের উপর নির্ভর করলে হবে না—ম্যানেজার হারুর আদেশ। নরেন পালের বুড়ো বাপ হৃদয়নাথ পাল মশায় বলেন, ইস্কুলে পাঠশালে পড়ার সময় এই মনোযোগ কোথায় ছিল বাপসকল। তাহলে তো কেষ্ট-বিষ্টু, যা-হোক একটা হতিস, গাঁয়ে পড়ে ভেরেণ্ডা ভাজতে হত না।

॥ ছয় ॥

ভবনাথ ও দেবনাথের মাঝে ভগ্নী আছেন মুক্তকেশী। শ্বশুরবাড়ি কুশডাঙায় আছেন তিনি—সোনাখড়ি থেকে ক্রোশ পাঁচেক দূর।

উমাসুন্দরী বললেন, গাড়ি পাঠিয়ে দাও, ঠাকুরঝি চলে আসুন। তিন ভাই-বোন একসঙ্গে হবেন অনেক দিনের পর।

ভবনাথ ঘাড় নাড়লেন : মুক্তর গ্রামজোড়া সংসার—গুছিয়ে আসবে তো। গাড়ি পাঠালে গাড়ি ফেরত আসবে। তার চেয়ে ফটিক চলে যাক—আসার হলে ওখান থেকে গাড়ি করে আসবে।

ফটিক মোড়ল চাকরান খায়, রপ্তানিগিরি করে। অর্থাৎ এখানে দাওয়া সেখানে যাওয়া—ইটাইটির যাবতীয় দায় তার উপর। মুক্তঠাকরুনের বাড়ি হামেশাই যেতে হয় তাকে। পাকা ইমারত ভেঙেচুরে এক কুঠুরিতে এসে

ঠেকেছে। বেশি আর লাগেই বা কিসে। ছাতে জল মানার না বলে উপরে খোড়ো চাল। ভাঙাচোরা দেয়ালে গোবরমাটি লেপা। আর আছে চালাঘর দুটো—রান্নাঘর ও গোয়াল। বিশাল কম্পাউণ্ড জুড়ে রকমারি তরকারির ক্ষেত। বড় ফটকটা কিন্তু প্রায় অভগ্ন। ফটকের বাইরে পাঁচ শরিকের এজমালি পুকুর। পুকুর সেকেলে হলেও ঘাসবন কিছু নেই, জল টলটল করছে। এই বাড়িতে একলা মুক্তকেশী—দ্বিতীয় কোন প্রাণী নেই। পড়শি-দের কতজনে প্রস্তাব করেছে, তাদের বাড়ির মেয়েছেলে একজন কেউ গিয়ে রাতের বেলা শুয়ে থাকবে। দিনকাল খারাপ—একলা পড়ে থাকা ঠিক নয়। মুক্তঠাকরুন উড়িয়ে দেন : এদিকে ফণীরা, ওদিকে ভূপতিরা—একলা কিসে হলাম? ডাক দিলে ছুটে এসে পড়বে। দরকারই হবে না—অ্যাদ্দিন তো আছি, দিয়েছি কখনো ডাক?

ফণী ও ভূপতি দুই শরিক—ঠাকরুনের বাড়ির লাগোয়া উত্তরদিকে ও পশ্চিম দিকে তাদের বাড়ি। ফণী সম্পর্কে দেওর, ভূপতি ভাসুরপো। বউঠান বলতে ফণী পাগল, ভূপতিরও তেমনি জেঠিমা বলতে মুখে জল আসে। কে-ই বা নয় এমন। গ্রামসুদ্ধ তাঁর নামে তটস্থ—তাঁর কোনো কাজে লাগতে পারলে বর্তে যায়। মুক্তকেশীর গ্রামজোড়া সংসার ভবনাথ বললেন—সে কিছু বাড়িয়ে বলা নয়।

ফটিক এসে বলল, ছোট বাবুমশায় এসে গেছেন ঠাকরুন। যেতে হবে।

মুক্তকেশী বললেন, বললেই কি আর হুট করে যাওয়া যায় রে বাবা—আমার কি এক রকমের ঝঞ্ঝাট। সে হবে এখন—হেঁটেহুটে এলি, হাত-পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বোস দিকি এখন তুই।

এতকালের আসা-যাওয়া—ঠাণ্ডা হয়ে বসার অর্থ ফটিক কি আর বোঝে না? ঘাট থেকে হাত-পা ধুয়ে এসেই দেখবে, পিতলের জামবাটি ভরতি চিঁড়া ভিজানো—তার সঙ্গে দুধ আম-কাঁঠাল কলা-পাটালি আরও কোন কোন বস্তু সঠিক আন্দাজে আসছে না। এই দেড় পহর বেলায় চেটেপুঁছে সব শেষ করতে হবে। অনতিপরে দুপুরে আবার দুটো ডুব সেরে আসতে না আসতেই একপাথর ভাত বেড়ে এনে সামনে ধরবেন—খাওয়ানোর ব্যাপারে ঠাকরুন অতিশয় নিষ্ঠুর, দয়াধর্ম নেই কোন রকম।

পা ধুতে ফটিক পুকুরে গেছে, আর এদিকে হন্তদন্ত হয়ে ভূপতি এসে উপস্থিত। কথাবার্তা এক্ষুনি তো হল। এবং ঠাকরুন ও ফটিক দুটি মানুষের মধ্যে—দুই ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি কেউ ছিল না সেখানে। জিনিসটা এরই মধ্যে ভূপতি পর্যন্ত কেমন করে চাউর হয়ে গেল, কে তাকে খবর দিল? পোষা বিড়ালগুলো এবাড়ি-ওবাড়ি করে—তারা গিয়ে বলেছে নাকি? কিম্বা

পাতিকাকটা, জিওলগাছের ডালে যে বসে ছিল? অন্য কিছু তো ভেবে পাওয়া যাচ্ছে না।

ভূপতি উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, তোমার এখন নাকি বাপের-বাড়ি যাওয়া লাগল জেঠিমা? স্বচ্ছন্দে চলে যাও। আমিও এক মুখো বেরুই। বিয়ে বন্ধ।

মুক্তঠাকরুন প্রবোধ দিচ্ছেন: দেবনাথ বাড়ি এসেছে, না গেলে হবে না। তা বলে কি এখনই? আক্কেল-বিবেচনা নেই বুঝি আমার। বিয়ের কাজকর্ম মিটিয়ে কনে রওনা করে দিয়ে তারপরে যাব।

ফটিক ঘাট থেকে ফিরেছে। জলখাবার দিতে দিতে মুক্তকেশী বললেন, স্বকর্ণে শুনে যাচ্ছিস—গিয়ে সব বলবি। বিশে তারিখে ভূপতির মেয়ের বিয়ে। তার আগে যেতে দেবে না বলছে। গরুর-গাড়িতে জোর করে উঠে বসি তো চালির বাঁশ টেনে ধরবে। টেনে হিড়হিড় করে উল্টোমুখো নিয়ে যাবে।

ঠাকরুনের কথা শুনে ফটিক হি-হি করে হাসছে।

মুক্তকেশী বলছেন, বয়স হলে কি হবে. ওটা বিষম হুটকো। বড্ড ভয় করি আমি। দেখে যাচ্ছিস—আমার অবস্থা গিয়ে বলবি।

ভূপতি সদম্ভে বলে, আমি আর কি! বিয়ের কনে টুকি. সে ও তোমায় ছেড়ে কথা কইবে না।

একগাল হেসে মুক্তঠাকরুন সায় দিলেন: তা সত্যি, সেইখানে আরও ভয় আমার। একফোঁটা বয়স থেকে শাসন করে এসেছে—যাচ্ছি শুনলে পাকাচুল তোলার নাম করে যে ক'টা চুল আছে উপড়ে ফেলে দেবে।

ফটিককে বলেছেন গিয়ে ওদের সব বলবি। তাড়াও কিছু নেই। পুরো জষ্টিমাসটা দেবনাথ থাকবে—জষ্টির গোড়াতেই আমি চলে যাব। তোর আর আসতে হবে না ফটিক! এখান থেকে নিজেই একটা গাড়ি ঠিক করে আমি চলে যাব।

ফিরে যাচ্ছে ফটিক, পা বাড়িয়েছে। ঠাকরুন বললেন, খালি হাতে যাবি কি রে? দেবু বাড়ি এসেছে—বলবে. দিদি কি দিয়েছে দেখি। এই দু'খানা আমসত্ত্ব হাতে করে নিয়ে যা।

বৈশাখের গোড়া। আমে পাকই ধরল না এখনো—ঠাকরুনের আমসত্ত্ব দেওয়া লেগে গেছে। গোটালে নামে গাছটায় কিছু অকালে আম ফলে, খেতে তেমন ভাল না, কিন্তু আমসত্ত্ব অপরূপ। খান কয়েক আমসত্ত্ব ন্যাকড়ায় জড়িয়ে ঠাকরুন ফটিকের হাতে দিলেন: নিয়ে যা, বাবা।

সামান্য একটু জিনিস—কিন্তু এতেই শোধ যাবে, বিশ্বাস হয় না। এতাবৎ কখনো তো যায়নি। আরম্ভ থেকেই ফটিক আপত্তি জুড়ে দেয়: আমসত্ত্ব

বয়ে নিতে হবে কেন? আমাদের বট্‌ঠাকরুনই তো দেবেন আর ক'টা দিন পরে।

বট্‌ঠাকরুনের আমসত্ত, আর এই? খেয়ে দেখলি তো। আমারই বাপের বাড়ি—মিছে নিন্দে করতে যাব কেন? উতরোয় সেখানে এ জিনিস? বল্।

সত্যি, এ আমসত্ত্বের জাত আলাদা। সোনার রং—ঈষৎ নলেন-পাটালির গন্ধ। আশ্চর্য রকম মুচমুচে, ছিঁড়তে হয় না—ভেঙে খেতে হয়। এই আমসত্তোর এক টুকরো দুধের সঙ্গে খেতে হয়েছে ফটিককে—দুধে ফেলা মাত্র গুলে গেল। গোটাগে আমের গুণ আছে নিশ্চয়—তার সঙ্গে মিশেছে ঠাকরুনের হাতের গুণ।

মুক্তঠাকরুন বললেন, আমসত্ত নিলি, আর পদ্মকোষার কাঁঠালও একটা নিয়ে যা। দাদা বড় ভালবাসে। ঘরে কাঁঠাল আছে একটা, কাল-পরশুর মধ্যে পেকে যাবে। নিয়ে যা বাবা।

এই চলল—পালাতে পারলে যে হয় এখন। একের পর এক মনে পড়ে যাবে। ঠাকরুনকে এমনি তো ভাল লাগে—কথাবার্তা ভাল, 'বাবা' ছাড়া বলেন না। খাওয়ান ভাল, যত্ন আত্তি ভাল। কিন্তু বোঝা চাপানোর বেলা কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

বললেন, ভূপতির মেয়েকে বলেছিলাম, সে চাট্টি কামরাঙা পেড়ে দিয়ে গেল। নিয়ে যা, বউরা কামরাঙা খেতে ভালবাসে।

চাট্টি মানে এক ধামা পুরো। ধৈর্য হারিয়ে ফটিক বলে, ফটকে কি গরুর-গাড়ি পিসিঠাকরুন? মাসটা পরেই তো যাচ্ছ—আস্তা কুশডাঙা গাঁ খাব গাড়ি বোঝাই দিয়ে নিয়ে যেও তখন।

সেটা বলে দিতে হবে না। মুক্তকেশীর বাপের-বাড়ি যাওয়া এক দেখবার বস্তু। গরুর-গাড়ির আগাপাস্তলা এটা-সেটায় বোঝাই—তার মধ্যে বাঁশের কোড় লাউয়ের ডগা, হিঞ্চেশাক অবধি বাদ যায় না। মানুষটি তিনি একফোঁটা তাঁর বসার জন্য তবু বিঘতখানেক জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার সোনাখড়ি থেকে যেদিন ফিরবেন, সেদিনও এইরকম। আম-কাঁঠাল নারকেল সুপারি লাউ কুমড়ো বড়ির-হাঁড়ি কাসুন্দির-ভাঁড় ইত্যাদি সাপ্টা জিনিস আছেই, তার উপর হরিবুড়ো আলতাপাত আলুর কথা বলে দিয়েছেন—দেখ দিকি শিশুবর, পিত্তিরাজ গাছের এই দিকটা খুঁড়ে। শাঁখা বেচতে এলে প্রমাণসই এক-জোড়া অতি অবশ্যি কিনে রেখো ছোটবউ, সরলাবউকে দেবো। খালি-হাত দুখানা নিয়ে বেড়ায়, দেখতে পারিনে। ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক ফরমাস—খোবার-খোবার বিস্তর পাত্র-পাত্রী। পেল্লায় সংসার ঠাকরুনের শ্বশুরবাড়ির এবং

বাপেরবাড়িরও—মিছে কথা কি।

অথচ একদিন কী কান্নাকাটি পড়েছিল এই মুক্তকেশীকে নিয়ে। যার কানে গেছে—সে হায়-হায় করেছে, পোড়াকপালী শতেকখাগী বলেছে তাঁর নামে। হরেশ্বর ঘোষ এগারো বছুরে মেয়ে কুশডাঙা রায়বাড়ি পাত্রস্থ করলেন। রায়েদের তখন তালুকমুলুক বিস্তর, দাবরাব প্রচণ্ড। কিন্তু বিয়ের বছরেই বর মারা গেল। তারপর শ্বশুর-শাশুড়ি দেওর-ননদ ইত্যাদি সব পটাপট মরতে লাগল। অরক্তারিতে গেল বেশিরভাগ, কয়েকটি মা-শীতলার অনুগ্রহে, একটি জলে ডুবে। বছর ছয়-সাতের মধ্যে গমগমে বাড়ি একেবারে পরিষ্কার। সোনাখড়িতে ইতি-মধ্যে হরেশ্বরও গত হয়েছেন, ভবনাথ কর্তা। তিনি বললেন, চলে আয় মুক্ত। একা একা শ্মশান চৌকি দিয়ে কি করবি?

কেমন একা, দেখ গিয়ে এখন। গ্রামসুদ্ধ মানুষ—কারো তিনি ঠাকুমা, কারো জেঠিমা, কারো খুড়িমা। বউঠান বলারও আছেন দু-একটি। গাঁ-গ্রামে সম্পর্ক ধরে ডাকাডাকির চল আছে বটে, কিন্তু সে জিনিস নয়—সকলকে নিয়ে মুক্তঠাকরুন সংসার জমিয়ে আছেন, সবাই আপনজন। অমল বিয়ে করে এলো—বাড়ি ঢুকবার আগে জেঠিমার উঠোনে গিয়ে জোড়ে তাঁকে প্রণাম করল। সৃষ্টিধরের এখন তখন অবস্থা—কবিরাজ শ্বেতআকন্দ পাতার সেঁক দিতে বলছে। বাঁওড়ের ধারে বাঁশবাগানের কোথায় যেন দেখেছিলেন, লণ্ঠন হাতে রাত দুপুরে ঠাকরুন সেই আন্দাজি জায়গায় ছুটলেন—সাথী কেউ পিছন ধরল কিনা, বিপদের মুখে তাঁর খেয়াল নেই। আশপাশের গাঁয়ে মড়ক লেগেছে—কালীতলায় গাঁওঠিপুজো। পুজো হচ্ছে দিয়ে মুক্তঠাকরুন সামান্য দূরে বসে পর্যবেক্ষণ করেছেন—দশকর্মান্বিত পাকা পুরুত মণীন্দ্র চক্রবর্তীর পূজাবিধি ও মন্ত্রপাঠে ভুল হয়ে যায়, চোখ কটমট করে ঠাকরুন শুধরে দেন। এরই মধ্যে আবার মণীর তিন বছুরে মা-হারা মেয়েকে খাইয়ে দিতে ছুটলেন একবার। মুক্তঠাকরুনের হাতে না খেলে মেয়ের নাকি পেট ভরে না।

গ্রাম শাসন করে বেড়ান মুক্তঠাকরুন। বেচাল দেখলেই রে-রে—করে পড়বেন তার মধ্যে। ছেলেপুলে পুকুরে জল ঝাঁপাঝাঁপি করছে, ঠাকরুনের সাড়া পেলেই চুপচাপ ভালমানুষ। সতীশ্বর ও বউয়ের মধ্যে ধুন্ধুমার ঝগড়া লেগেছে, ঘরের মধ্যে ঢুকে ঠাকরুন আচ্ছা করে বকুনি দিলেন, দুজনের মুখে আর কথাটি নেই। তারপরে এ ওকে দুষছে, ঝগড়া করতে গিয়ে গলা উঠে যায় কেন? ফিসফিসিয়ে হলে তো ঠাকরুনের কানে যেত না। রঙ্গলালের শালা কলকাতার কলেজে ঢুকেছে—শহুরে ছেলে বোনের বাড়ি বেড়াতে এসে রাস্তায় সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে যাচ্ছে। অতটুকু ছেলে সিগারেট খাস কেন রে? ছেলেটা বুঝি অগ্রাহ্য করে হেসেছিল। আর যাবে কোথায়—রেগেমেগে

ঠাকরুন কুটুম্বর ছেলের গালে ঠাস করে চড় কষিয়ে দিলেন। দাবরাব এমনি। আবার পদ্মবালার বর এসেছে শুনে সেই মানুষ ছুটতে ছুটতে গিয়ে হাজির। দেখেশুনে বলছেন, নাতজামাই বড় রূপবান রে। আমি ছাড়ব না, এ বর পাবিনে তুই পদ্ম, আমি নিয়ে নিলাম। থান কাপড়ের ঘোমটা টেনে বউ হয়ে ঝুপ করে বরের পাশে বসে পড়লেন। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে পদ্ম হাসে, আর ঘাড়টা অনেক অনেকখানি কাত করে দেয়। অর্থাৎ নাওগে বর, খুশি মনে দিয়ে দিচ্ছি ঠাকুমা—

শুধু মানুষ কেন, পশুপক্ষীরাও ঠাকরুনের সংসারের বাইরে নয়। নীলির সঙ্গে কাকেদের বোংহয় ঝগড়া। বাটিতে চাট্টি মুড়কি দিয়ে বসিয়ে বোন জল আনতে গেছে ঠিক টের পেয়েছে কাকেরা, একটি-দুটি করে দাওয়ায় এসে বসছে। এগিয়ে আসে কাছাকাছি। নীলি ছোট হাত দু-খানিতে বাটি ঢেকে ধরেছে তো কাকে গায়ে ঠোক্কর মারছে। কেঁদে পড়ে নীলি, পালাতে গিয়ে হাতের বাটি ছিটকে পড়ে। কাকেদের মচ্ছব পড়ে গেল, খুব মুড়কি খাচ্ছে। মুক্ত ঠাকরুন এমনি সময় উঠানে পা দিলেন।

এইও, ভয় দেখিয়ে বাচ্চার মুড়কি খাওয়া হচ্ছে?

নীলিকে ডাকছেন: আয় রে, কিছু করবে না। কাঁদিস নে, আবার মুড়কি দিচ্ছি। ভয় কিসের, তোকে ক্ষেপাচ্ছে।

এখনো তো কত দূরে মুক্তঠাকরুন—কিন্তু মুড়কি ফেলে কাকগুলো দূরে চলে গেছে। নিপাট ভালমানুষ—মাথা কাত করে ঠোঁটে গা খোঁচাচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছে না এদিকে যেন।

তাতে ছাড়াছাড়ি নেই, মুক্তঠাকরুন সমানে বকুনি দিয়ে যাচ্ছেন: হুস, হুস—ভারি বজ্জাত হয়েছ সব। সাতসকালে এক পেট মুড়ি গিলে আবার এখানে বাচ্চার মুড়কিতে ভাগ বসাতে এসেছ।

সকালবেলা রান্নাঘরের পাশে জিওলতলায় দাঁড়িয়ে ডাক দেবেন: আয় আয় আয়। ডাক চেনে কাকেরা—নানান দিক থেকে উড়ে এসে পড়ে। মুড়ি ছড়িয়ে দেন ঠাকরুন। কাকেরা রা মানে না—নিজে খাচ্ছে আবার অন্যের দিকে ঠোক্কর মারে। ঠাকরুন তাড়না করেছেন, এইও, সরে যা বলছি, সরে যা বলছি। সরে যা, মারব কিন্তু—

ঠিক এরাই কিনা বলা যায় না—কিন্তু মুক্তঠাকরুনের ধারণা, সকালের সেই দলের কয়েকটি অন্তত এর মধ্যে আছে। একটার দিকে আঙুল দেখান: এই পাজিটা বড্ড শয়তান। নিজের খাবে আবার অন্যের দিকে ঠোক মারবে। নিত্যি সকালে দেখে দেখে চিনেছি।

শিবা-ভোজন করিয়ে থাকেন ঠাকরুন। সন্ধ্যাবেলা পুকুরপাড়ে জঙ্গলে ঢুকে যান। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জোড়হাত করে বলেন, মহারাজেরা আছ তো সব? আজ রাত্রে পঞ্চজন তোমাদের সেবা—কোন্ পাঁচজন ঠিক করে নাও। সামনের শনিবার আবার পাঁচটিকে ডাকব। ঝগড়াঝাটি কাড়াকাড়ি যদি কর, তাহলে ইতি পড়ে যাবে কিন্তু।

সেবারে ঠিক তাই হয়েছিল। হেসে-হেসে ঠাকরুন বৃত্তান্ত বলেন। রেগেমেগে শিবা-ভোজন বন্ধ করলেন। কান্নাকাটি পড়ে গেল কিছুদিন পরে। উঠোনে ঘুরত, রান্নাঘরের কানাচে ধন্না দিত রাত্রিবেলা। পুকুরপাড়ে দলবদ্ধ হয়ে এসে হুক্কা-হুয়া করত। কাণ্ড দেখে মুক্তঠাকরুন হাসতেন খিলখিল করে। শেষটা মাপ করে দিলেন, আর কখনো বজ্জাতি করবিনে, মনে থাকে যেন।

জঙ্গলের ধারে নিমগাছ-তলায় পাতা পড়তে লাগল আবার। লাইনবন্দি পাঁচখানা কলাপাতা—পরিপাটি করে ভাত বাড়া, ভাতের উপর ডাল, পাশে পায়স। মালসায় জল পাশে পাশে—গেলাসে মুখ ঢুকবে না শিয়াল-নিমন্ত্রিতদের। সকালবেলা গিয়ে তীক্ষ্ণ নজরে দেখেন ভদ্রভাবে খেয়ে গেছে কিনা। মুক্তকেশী ছাড়া অন্য কেউ বুঝবে না। দেখে প্রসন্ন হলেন তিনি, না এবারে শিক্ষা হয়েছে—আর বাঁদরামি করবে না।

পোষা পায়রা আছে। ফটকের উপর ছাদ থেকে বাঁশের চালি ঝোলানো পায়রাদের আস্তানা সেখানে। উঠানে ধান ছড়িয়ে দেন, খেয়ে আবার চালিতে উঠে বকম-বকম করে। আগে চারটে মাত্র ছিল—ছা-বাচ্চা হয়ে এখন মস্তবড় এক ঝাঁক।

বিড়াল পুষেছেন। বিষম ন্যাওটা, গায়ে গড়ায়। একটা তো এমন আদুরে হয়ে পড়েছে, দুধ দিয়ে ভাত না মাখালে খান না তিনি—বার দুয়েক শুঁকে মুখ তুলে নেন। কুকুরও আছে তিনটি। রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে, দিনে-রাত্রে কোন সময় পাত্তা পাওয়া যায় না, কোন কাজে আসে না। নিত্যপোষ্য তারা তবু। আ-তু-উ-উ—করে ডাক দিলে অলক্ষ্য জায়গা থেকে ছুটতে ছুটতে এসে পড়বে, গব-গব করে গিলে তক্ষুনি আবার উধাও। হাঁস পুষেছিলেন ঠাকরুন একজোড়া—পুকুরে জলে ভেসে বেড়াত—চই-চই করে ডাকলে ঘাটে চলে আসত। বেশ ছিল—শিয়ালে ধরে নিয়ে গেল দুটোকেই পর পর। মানকচু-বনে শজারু ঢুকে কুরে কুরে খেয়ে যেত, ভূপতির ছেলে ফাঁদ পেতে একটা ধরে ফেললে—মুক্তঠাকরুন বধ করতে দিলেন না, পুষবেন বলে গোয়ালের বড় ঝুড়িটা চাপা দিয়ে রাখলেন। তার মধ্যে থেকেও কোন কৌশলে পালাল, ঈশ্বর জানেন। শালিক পুষেছিলেন—পাঠশালার গুরু-

মশায়ের মতন সকাল বিকাল নিয়মিত বুলি পড়াতেন। পোষা শালিক রা কাড়ে না—মাস চারেক ধ্বস্তাধ্বস্তি করে শেষটা রাগ করে একদিন খাঁচার দরজা খুলে দিলেন, শালিক উড়ে চলে গেল। জলের মাছও পুষেছেন ঠাকরুন—পনের বিশটা-পোষা মাছ পুকুরে। খেয়ে খেয়ে তাগড়াই হয়েছে, দেখে লোকের লালসা জাগে। কিন্তু মুক্তঠাকরুনের পোষা জীবে হাত ঠেকাবে কে! মাছ পোষার আরম্ভ এইভাবে—

ভূপতি বলল, পুকুরে ঘাসজঙ্গল হয়ে যাচ্ছে জেঠিমা। বাঁওড় অনেকটা দূরে। লোকে চান করে, রান্নার জল খাবার জল নিয়ে যায়। পুকুরটা আমাদের সাফসাফাই রাখা উচিত।

বেশ ত, ভালোই তো। খুব উৎসাহ মুক্তঠাকরুনের।

এসবের খরচাও আছে একটা বেশ। বলছি কি জেঠিমা, সব শরিকে মিলে গুঁড়ো-পোনা ছেড়ে দিই এবারে। পুরানো পুকুরে দেখতে দেখতে মাছ বড় হয়ে যাবে।

ঠাকরুন অবাক হয়ে বলেন, বললি কি রে? মাছ বিক্রি করবি শেষটা তোরা? রায়পুকুরের মাছ বেচে খরচা তুলবি?

মতলবটা ছিল নিশ্চয় তাই, বেগতিক বুঝে ভূপতি চেপে গেল। ঘাড় নেড়ে বলল, তা কেন, রুই-কাতলা ধরে ধরে খাবো আমরা। অতিথি-কুটুম্ব এলে খাবে। পেটে খেলে পিঠে সয়। মাছ খেয়ে ফুর্তি থাকবে—পুকুর সাফাইয়ের খরচা দিতে কেউ আর কাড়ুং-কুড়ুং করবে না।

ফণী ছিলেন, তিনি বললেন, বউঠানও তো তিন আনা-চারগণ্ডার শরিক—তাঁর কি?

ভূপতির হাজির-জবাব: ঐ তিন আনা-চারগণ্ডার মতোই খরচা দেবেন জেঠিমা। তাঁর অংশের মাছ, দেওর তুমি আছ, ভাসুরপো আমরা আছি—আমরাই সব ভাগযোগে খাব।

ঠাকরুন হেসে বললেন, খাস তাই। কিন্তু গোটাকতক রুই চাই আমার। পুষব।

বর্ষার মুখে মাছের পোনা বেচতে আসে। দূরঅঞ্চলের মানুষ—কোন একখানে বাসা নিয়ে থাকে। সে বাসা এমন-কিছু ব্যাপার নয়—মাছের জন্য একটুকু খানাখন্দ জায়গা এবং মানুষের জন্য কারো ঘরের দাওয়া। চারাপোনা খানায় ঢেলে রাখে, সকালবেলা ছাঁকনি দিয়ে কিছু হাঁড়ায় তুলে নিয়ে গামাসে বেরোয়: মাছের পোনা নেবেন নাকি কর্তা? এক খুঁচি দিয়ে যাই পুকুরে ঢেলে।

শিকে-বাঁকের দু-মুড়োয় দুই হাঁড়া। পোনার হাঁড়া নিয়ে চলনের কায়দা আছে, দুলে দুলে চলতে হবে জল যাতে ছলাৎ-ছলাৎ করে হাঁড়ার গায়ে লাগে

বসেছে যখন, দু-হাত দু-হাঁড়ায় ঢুকিয়ে নাড়ছে, জল স্থির থাকতে দেবে না। চারামাছ তা হলে মারা যাবে।

একদিন ভূপতির কাছে গিয়ে পড়েছে: বাবু, পোনা খুঁজছেন শুনতে পেলাম।

ভূপতি বলল, দেখি, হাতে তোল দিকি চাট্টি। ইঃ, একেবারে গুঁড়ো। দেখে আর কি বুঝব?

লোকটা বলছে, সাচ্চা মাছ। রুই-কাতলাই সব—মৃগেল কালবোস দু-চারটে হতে পারে।

বলো তোমরা ঐ রকম। যতীনকাকার পুকুরে এমনি লম্বা লম্বা বলে দিয়ে গেল। ছ-মাস পরে জাল নামিয়ে রুই-কাতলা একটাও উঠল না—সমস্ত পুঁটি-চেলা। গুঁড়োমাছ চেনা তো যায় না।

লোকটা দিব্যি দিলেশা করে: সে কাজ-কারবার আমাদের কাছে নয় বাবু। কপোতাক্ষ পার হয়ে ইচ্ছামতীর চাঁদুড়ে-বাঁদুড়ে অবধি চলে যাই বাছাই ডিমের খোঁজে। দামে দু পয়সা বেশি ধরে নেবো, কিন্তু মালের কারসাজি পাবেন না।

মাস চারেক পরে জাল টেনে দেখা গেল, পোনা আঙুল ভর হয়েছে। মৃগেল আধাআধি, তবে খুচরো মাছের ভেজাল নেই বোধহয়। আরও খানিকটা বড় হলে রুইমাছ কতকগুলো ধরে ঠোঁটে নোলক পরিয়ে জলে ছাড়া হল আবার। ঠাকরুনের নামে রইল এগুলো, পুষবেন তিনি, জালে পড়লে ছেড়ে দেবে। চলছে তাই। আর কী আশ্চর্য! মাছেরা যেন বোঝে সমস্ত, দিব্যি পোষ মেনে গেছে। দুপুরে ও সন্ধ্যায় মুক্তকেশী ঘাটে দাঁড়িয়ে 'আয়' 'আয়' করে ডাকেন—জলে অমনি আলোড়ন ওঠে। ইয়া ইয়া দৈত্যাকার হয়েছে মাছগুলো, পুচ্ছ নেড়ে ঘাটের উপর চক্কোর দিয়ে বেড়ায়। খাবার পড়লে মুখ খুলে টুক টুক করে ধরে নেয়। কাজ সমাধা হলেই জলতলে ডুব। আর ডেকে পাওয়া যাবে না।

বলতে বলতে ঠাকরুন হাসেন: কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরোলে পাজি—মানুষের হালচাল বেচারা কেমন খাসা শিখে নিয়েছে। শুধু-হাতে অন্য সময় হাজার 'আয়' 'আয়' ডাকো, পাত্তা মিলবে না।

ফটিক মোড়ল ফিরে গেল অতএব। এত ঝক্কিঝামেলা এত সব আশ্রিত-প্রতিপাল্য ছেড়েছুড়ে চট করে ভাইয়ের বাড়ি ওঠেন কি করে? মাসের শেষাশেষি যাবেন বলে দিলেন। আর নয়তো জ্যৈষ্ঠমাসের গোড়ায়।

॥ সাত ॥

গাঁ-গ্রামে ছেলেপুলের কী মজা! ছেলেপুলে আর পাখি-পশুদের। ঝোপেঝাড়ে গাছে গুল্মে এত খাবার জিনিস—খুঁজেপেতে নিলেই হল। বৈঁচি-বনে বৈঁচি পেকে আছে—সামাল হয়ে ঢুকতে হবে, বড্ড কাঁটা। ওদের অভ্যাস হয়ে গেছে, কাঁটা বেঁধে না। আর বিঁধলেই বা কা—পাকা ফলে কোঁচড় ভরতি হয়ে এলো, কাঁটার খোঁচায় এখন আর গায়ে সাড় লাগে না। এক কোঁচড় বৈঁচি নিয়ে পুঁটি মালা গাঁথতে বসেছে। কমল সতৃষ্ণচোখে দিদির কাজ দেখছে। সদয় হয়ে পুঁটি মাঝে মধ্যে একটা দুটো ফল ছুঁড়ে দিচ্ছে ভাইয়ের দিকে, নিজের গালেও ফেলল হয়তো বা। আর সূচসুতো নিয়ে দ্রুতহাতে মালা গেঁথে চলেছে। একজোড়া মালা পরাল কমলের গলায়, একটা নিজের। খেলে বেড়াও, যা ইচ্ছে করো—খাবার ইচ্ছা হল মালা থেকে ছিঁড়ে মুখে ফেলে দাও. কাউকে দেবার ইচ্ছা হল ছিঁড়ে একটা দিয়ে দাও। শেষটা দেখা যাবে, শুধু একগাছি সুতো গলায় ঝুলছে, তাতে একটিও ফল নেই।

আশশ্যাওড়ার ফল পাকে—ছেলেপুলের দেওয়া নাম মধুফল। মুক্তাফলও বলতে পারত। গোলাকার লালচে একটি মুক্তা রসে টসটস করছে। সবটাই প্রায় বীচি বলে মালা গাঁথা চলবে না, ঝোপ থেকে ছিঁড়ে মুখে ফেলে, শুষে নিয়ে বীচি ছুঁড়ে দেয়। পাথরকুচির পাতা—দেখতে বড় ভাল, চাপ দিলে মট করে ভেঙে যায়। পুঁটিদের রাঁধাবাড়ি-খেলায় পাথরকুচি পাতার মাছ হয়, হেড়াঞ্চি-ফলের ডাল তেলাকুচো-ফলের পটোল। কচুর পাতার উপর ধুলোর ভাত বেড়ে নারকেল-মালার বাটিতে বাটিতে ডাল ও মাছের ঝোল সাজিয়ে পুঁটি কমলকে ভাত খেতে বসিয়ে দেয়। পাথরকুচি গাছে এখন লম্বা লম্বা ডাঁটা উঠেছে, ডাঁটা ঘিরে নিম্নমুখ অজস্র ফুল। কী সুন্দর দেখতে। আর ফুলের মধ্যে মধুকোষ। ছেলেপুলে সন্ধান জানে, ফুল চিরে মধু খায়। খেজুর কেউ পাড়তে যায় না, টের পেলে বাড়ির লোকে খেতেও দেবে না—খেজুর খেলে নাকি পেট কামড়ায়। গাছে পেকে ঝুরঝুর করে তলায় পড়ে, শিয়ালে খায়। খেজুরতলায় গিয়ে পুঁটি যে কটি পায় খুঁটে খুঁটে কোঁচড়ে তুলল। এদিক-ওদিক তাকায় আর মুখে ফেলে।

পিছু পিছু কমলও দেখি এসে গেছে। আমায় দে পুঁটি, আমায় দে—হাত বাড়িয়ে বলছে।

পুঁটি বলে, নাম ধরছিস কেন, 'দিদি' বললে তবে দেব।

এখন কমলকে যা বলবে, খেজুরের লোভে তাতেই সে রাজি। পুঁটি সামাল করে দেয় : খেয়ে বীচি ফেলে দিবি, গলায় না আটকায়। টপ করে খেয়ে ফেল, জেঠিমা দেখলে রক্ষে রাখবে না। মুখে আঙুল ঢুকিয়ে বের করে ফেলে দেবে।

আর কয়েকটা দিন পরে গাছে গাছে হঠাৎ যেন বান ডেকে গেল। যে গাছের যে ডালে তাকাও—পাকা ফল, ডাঁসা ফল। প্রকৃতি দেবী মেজাজে এসেছেন, দু-হাতে অফুরন্ত ঢালছেন। জামরুল গাছ দুটো ফলের ভারে নির্ঘাৎ এবারে ভেঙে পড়বে। গুঁড়ি ভেদ করেও থোকা থোকা ফল। কত খাবে, খাও না। ছেলেপুলেরা ঘরবাড়ি ভুলেছে, সারাটা দিন এ-গাছ ও-গাছ করে বেড়ায় কাঠবিড়ালির মতো। যার গাছে হোক উঠে পড়লেই হল। গৃহস্থ বড়জোর বলবে, এই, ডালে ঝাঁকি দিসনে রে—নরম বোঁটা, কুশিগুলোও পড়ে যাবে। কিম্বা বলবে, এই, জোরে দুটো ঝাঁকি দে না। তলায় পড়ুক, ধামা এনে কুড়িয়ে নিই। বলবে এইটুকু—এর অধিক কিছু নয়। খাওয়ার জন্য ভগবান দিয়েছেন। খেয়ে শেষ করা ছাড়া এ ফলে কোন আয় দেয় না। দুদিনে ফুরিয়ে যায়—পুরো বছর তারপর গাছের দিকে কেউ চোখ তুলে তাকাবে না।

আরও কত রকম। গাব পেকেছে, সপেটা পাকছে। জামের দেরি আছে—গোলাপজাম পাকতে লেগেছে দুটো চারটে করে। জল্লাদ মগডালে উঠে পিলপিল করে বেড়ায়। গাছে উঠে ছোঁড়া যেন শোলার মানুষ হয়ে যায় —দেহের ওজন একেবারে শূন্য, এতটুকু ডাল নড়ে না। সপেটার কাঁচা পাকা এমনি দেখে ধরা যায় না, ডালের মাথায় গিয়ে জল্লাদ টিপে টিপে দেখে নরম কিনা। গোলাপজামের বোঁটাসুদ্ধ নাকের কাছে তুলে ধরে শোঁকে।

লিচুতে পাক ধরেছে, এক রাত্রে বাদুড়ে সেটা বলে দিল। পূববাড়ির পাঁচটা লিচুগাছ সারবন্দি। পাখায় অন্ধকার দুলিয়ে ঝাঁক বেঁধে বাদুড় ঝপাস-ঝপাস করে গাছের উপর পড়ছে। কিচির-মিচির করে ঝগড়া বাধায় ভিন্ন দলের সঙ্গে। পুঁটি দাওয়ায় এসে চেঁচিয়ে বাদুড়-জব্দ ছড়া পড়ছে : বাদুড় বড় মিঠে, যা খায় তা তিতে। ছড়ার গুণে লিচু তিতো হয়ে যাবে বাদুড়ের মুখে, থুঃ-থুঃ করে পালাবে।

ভবনাথ মাহিন্দারকে বকছেন: চোখ তুলে দেখবি নে তোরা শিশুবর। রাতের মধ্যে সব শেষ করে যাবে। লিচু খেতে হবে না এবার, খাস ঘোড়ার ডিম।

শিশুবর চাটকোলের উপর পা ছড়িয়ে বসে পাটটাকুরে কোষ্টা কাটছে।

বলল, পাকে কি লিচু—দেখতে পাবেন কাল সকালবেলা। বাদুড় চালাক হয়ে গেছে, আমাদের বন্দোবস্তের আগেভাগে ফুলো ডাসা যা পায় খেয়ে নিচ্ছে।

বাদুড়দের উপর শাসানি দিচ্ছে: খেয়ে নে যা পারিস। কাল থেকে আর নয়। কত বড় শয়তান হয়েছিস দেখে নেবো।

সকাল হতে শিশুবর সেই ব্যবস্থায় লেগে গেছে। হিরুও এসে যোগ দিল। বলে, বাবা বড় মিছে বলেন নি, কত বীচি আর খোসা ছড়িয়ে আছে দেখ। সিকি আন্দাজ নিকেশ করে গেছে একটা রাতের মধ্যে।

বাড়িতে পাশখেওলা জাল আছে—প্রায় সব বাড়িতে থাকে। পুরানো জাল ছিঁড়ে পচে বাতিল হলে ফেলে দেয় না। এমনি সব কাজে লাগে। গাছের উপরে জাল বিছিয়ে ঢেকে দিচ্ছে। জালের নিচে লিচুফল—বাদুড়ে আর নাগাল পাবে না। কিন্তু মুশকিল হল, পাঁচ-পাঁচটা গাছ ঢেকে দেবার মতন এত জাল পাই কোথায়?

পরমসুহৃদ ঝন্টুর কাছে হিরু চলে গেল: ছেঁড়াছুটো জাল কি আছে বের কর্—

ঝন্টু ঘাড় নেড়ে দেয়: ইঁদুরে কেটে ফালা-ফালা করেছিল, ফেলে দিয়েছি।

আহা, দেখ্ না কেন চাবির কুঠুরি খুলে। ওর মধ্যে তো গরু হারালে পাওয়া যায়। কোণে-খাঁজোড়ে থাকলেও থাকতে পারে।

চাবি সংগ্রহ করে খোলা হল ঘর। জানলাহীন অন্ধকার কুঠরি। টেমি জেলে তন্নতন্ন করে খোঁজা হল। নেই।

ঝন্টু হাত ঘুরিয়ে দেয়: বয়ে গেল। ক্যানেস্তারা পেটাবি।

হিরু বলে, ক্যানেস্তারায় শজারু ভয় পায়, বাদুড়ে আমল দেবে না। বড় শয়তান। বাজাচ্ছিস, বাজাতে বাজাতে হয়তো বা গেছিস একটু থেমে। বাজনা থামলেই ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। রাত জেগে সারাক্ষণ বাজাবেই বা কে?

সারাক্ষণই বাজবে। বন্দোবস্ত করছি দেখ্—

ক্যানেস্তারা, খুঁটো-পোঁতা মুগুর ও দড়ির বাণ্ডিল নিয়ে ঝন্টু লিচুগাছের মাথায় উঠে পড়ল। সুকৌশলে মুগুর আর ক্যানেস্তারা ঝুলিয়ে দিল। পাঁচ গাছের উপরেই এক ব্যবস্থা। দড়ির মাথাগুলো একত্র করে বেড়ার ভিতর দিয়ে বাইরের-ঘরে ঢুকিয়ে দিল। গাছ থেকে নেমে এসে ঘরের ভিতরের তক্তাপোশ দেখিয়ে হিরুকে বলে, শুয়ে পড়্—

হিরু অবাক হয়ে বলে, সাতসকাল শুতে যাব কেন রে এখন?

এতক্ষণ ধরে এত খাটলাম, পরখ হবে না? শুবি তক্তপোশে, চোখ বুঁজবি, দড়ি ধরে টানবি—টানাপাখা যেমন ধরে টানে।

যেইমাত্র টান দিয়েছে—অদ্ভুত করেছে বটে ঝন্টু, হতভাগা ইঞ্জিনিয়ার কেন যে হয়নি! দড়ি টানার সঙ্গে সঙ্গে উৎকট বাদ্য সিঁদুরগাছের মাথার উপরে। বাদুড় তো বাদুড়, বাঘ থাকলেও চোঁচাঁ দৌড় দিতে দিশে পাবে না।

ঝন্টু বললে, ছেড়ে দে দড়ি—টান আবার। পালাবে না বাদুড়? বল্—

শতকণ্ঠে হিক্ক তারিপ করছে: বলিহারি ঝন্টু। বেড়ে বানিয়েছিস—বাহবা, বাহবা!

প্রশংসা পরিপাক করে নিয়ে ঝন্টু বলল, শিশুবর দরজার কাছে ঐখানটায় তো শোয়। আরো ভালো। ঘুমুবে আর দড়ি টানবে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাতপাখা নাড়ে তো দড়িটা কেন টানতে পারবে না?

অনেক রাত্রে কমলের ঘুম ভেঙে গেল। সিঁদুগাছে ধুন্দুমার। জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে, জানলা দিয়ে চাঁদ দেখা যায়। ভয়-ভয় করছে, মাকে কমল নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল। তরঙ্গিণীও ঘুমের ঘোরে ছেলেকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন।

আম পাকল। একটা দুটো করতে করতে অনেক। এ-গাছ ও গাছ করতে করতে গাছ আর বড় বাকি রইল না। সিঁদুরে-গাছের দিকে চেয়ে চোখ ঝলসে যায়, কাঁচা-পাকা সব আমে সিঁদুর মেখে গেছে যেন—টুকটুক করছে। এ গাছের কাঁচা আমেও পাখি ঠোকরায়। তেমনি আবার বর্ণচোরা আম গোপলাগোপা, কালমেঘা। পেকে তলতল করছে, খোসার রং কালো। টের পাবার জো নেই, আম পেকে গেছে।

বেলতলি খেজুরতলি নারকেলতলি জামতলি বাদামতলি ভুমুরতলি—'তলি' জুড়ে জুড়ে গাছের নাম। সাবেকি আমলের গাছ এইসব। আঁটির গাছ—গোড়ায় বেলগাছ নারকেলগাছ ছিল ঐ ঐ জায়গায়, তলার কাছে আমের আঁটি আপনি পড়ে গাছ হয়েছিল কিম্বা আঁটি পোঁতা হয়েছিল ঐখানটায়। বেল খেজুর কবে মরে নিশ্চিহ্ন হয়েছে—সেই জায়গায় ডালপালা-মেলানো প্রকাণ্ড আমগাছ এখন। নাম তবু রয়ে গেছে যার ছায়াতলে এই গাছ চারা অবস্থায় আশ্রয় নিয়েছিল। আছে আবার কানাইবাঁশী টুরে চ্যাটালে চুষি কালমেঘা—ফলের চেহারা থেকে গাছের নামকরণ। এর উপরে কমলের চারা বিস্তর এসে গেল এবার—চারাগুলো বড় হলে বাগের মধ্যে রোদ ঢুকবার পথ খুঁজে পাবে না।

পাকা আম টুপটাপ তলায় ঝরছে সারাদিন, সমস্ত রাত্রি। ছেলেপুলে বাড়ি রাখা যায় না, তলায় তলায় ঘুরছে। ধরে পেড়ে এই এনে ঘরে তুললে—

মুড়ুত করে আবার চলে গেছে। অন্য সময় কে আমতলায় যেতে যায়? ভাটি কালকাসুন্দে কাঁটাঝিটকে বিছুটির ঝোপে ছেয়ে থাকে, শুকনো পাতা পড়ে পড়ে পচে। গুটি পড়ার সময় থেকেই অল্পস্বল্প শুধু—এখন নিতি দিন কত পা পড়ছে তার অবধি নেই। পায়ে পায়ে আমতলা সাফসাফাই হয়ে যাবে। শেষে আর ঘাসটুকুও থাকবে না, বাড়ির উঠানের মতন ধবধব করবে।

কমল ছোট্ট মানুষ, বেশি দূর যেতে ভরসা পায় না—তার দৌড় খেজুরতলি অবধি। বাইরের উঠোনের পরেই মহাবৃদ্ধ গাছটি। খেলা করে গাছ বালকের সঙ্গে, কতরকম মজা করে। আম পেকে হলদে হয়ে ডালের উপর ঝুলছে। দুলছে বাতাসে চোখের উপর, লুব্ধ চোখে কমল আকাশমুখো তাকায়। বাতাস জোরে উঠল—হাত পেতে রয়েছে সে, বলের মতন লুফে নেবে। পড়ে না আম—লোভ বাড়িয়ে পাগল করে দিয়ে থেমে যায় হঠাৎ বাতাস।

কমল খোশামুদি করছে: ও গাছ, লক্ষ্মীসোনা, দাও না ফেলে আমটা। পেকে গেছে, পড়ে তো যাবেই। চারি-দিদি ঘোরাঘুরি করছে, তক্কে তক্কে আছে ওরা—কোন সময় পড়বে, টুক করে নিয়ে নেবে। আমি পাবো না।

গাছ কানে নিচ্ছে না। রোদে ঝিলমিল করে পাতা নড়ছে, রোদের কুচি খেলা করছে কমলের মুখের উপর। বুড়ো আঙুল নাড়ানোর ভঙ্গিতে গাছ যেন পাতা নেড়ে উপহাস করছে: দেবো না, দেবো না।

পায়ে পড়ছি ও গাছ, দাও—আমটা দিয়ে দাও।

গাছ উদাসীন। কমল এত করে বলছে, তা মোটে কানেই যায় না যেন। ডাল-পাতা নাড়ছিল, তা-ও একেবারে বন্ধ করে দিল। রাগে দুঃখে আমতলা ছেড়ে কমল উঠোনের দিকে চলল। যে-ই না পিছন ফিরেছে—টুপটাপ করে একটা নয়, চার-পাঁচটা আম পড়ল। বউদি'দা অলকার কাছে বলেছিল খেজুরতলির বজ্জাতির কথা। অলকা উড়িয়ে দিয়েছিল: গাছ কিছু বোঝে নাকি—গাছ কি মানুষ? বোঝে কি না, চাক্ষুষ দেখে যাও না এইবারে। চলে আসছে, ঠিক সেই মুহূর্তে সশব্দে এতগুলো আম ফেলার মানেটা কি শুনি? আম না কুড়িয়ে রাগে রাগে চলে যাচ্ছ—যাও না দেখি কেমন যেতে পার।

মানে জলাঞ্জলি দিয়ে কমল ফিরে এল গাছতলায়। ঘাসবন মরে ইতিমধ্যেই খানিক খানিক পরিষ্কার হয়ে গেছে, সেদিকটা যে চোখ তুলেও দেখে না। জানা আছে, খেজুরতলি মরে গেলেও পরিষ্কার জায়গায় ফেলবে না—ঝোপঝাপ-জঙ্গল দেখে ফেলবে, কষ্ট করে যাতে খুঁজে বার করতে হয়।

কাঁটাঝিটকের ঝোপে পাওয়া গেল একটা। আম ছোট্ট, তার জন্যে কাঁটার খোঁচা খেয়ে হাতে রক্ত বেরিয়ে গেল। কতকগুলো যাঁড়গাছের মাথায় তেলাকুচা-লতা জড়িয়ে আছে, টুকটুকে তেলাকচা ফল যাঁড়বন আলো করে ঝুলছে। লতার মধ্যে আম—মাটি অবধি পড়তে পায় নি। যাঁড়গাছেই দৈবাৎ যেন আম ফলেছে একটা। এত জায়গা ছেড়ে এইখানটা আপনাআপনি পড়েছে, কে বিশ্বাস করবে? খেজুরগুলিই খুব সম্ভব গদখালি-পেত্নীর মতন ডালের লম্বা হাত বের করে ঐখানটা আম রেখে ডাল আবার গুটিয়ে নিয়েছে—কমল যখন পিছন ফিরে বাড়ি যাচ্ছে, সেই সময় কাণ্ডটা করেছে। খুঁজে বের করতে পারে কিনা, পিটপিট করে দেখছে এখন পাতার আড়াল থেকে। যাঁড়গাছ ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বিস্তর কষ্টে কমল আম ভুঁয়ে ফেলল।

আরও দেখ। সেঁদাল গাছ একটা আমতলায়—তিনটে ডাল তিন দিকে, বেরিয়ে গেছে, সেই তেডালার ফাঁকেও আম। এর পরে কে বলবে ইচ্ছাকৃত নয় এসব। গাছের উপর অভিমান এসে যায় কমলের, অভিমানে চোখ ছলছল করে: তলায় এসেছি একা একা কটা আম কুড়িয়ে পুঁটির কাছে বাহাদুরি নেবো—খেজুরতলা তাতে শতেক রকম বাগড়া। দেখা যাচ্ছে, গাছও পুঁটি-চারি-সুরিদের দলে। ওদের বেলা এমন হয় না। আম পাড়ার শব্দে তলায় ছুটে আসে—এসে দেখে, আম একেবারে সামনের উপর পড়ে আছে। ধা মতে তুলে নিয়ে লহমার মধ্যে ফিরে চলে যায়।

ডিঙি মেরে কমল হাত বাড়াল—তেডালা অবধি হাত পৌঁছায় না। বাখারির টুকরো পেয়ে খোঁচাচ্ছে—পড়ে না আম, ফাঁকের মধ্যে সেঁটে আছে। ছোট ডাল কয়েকটা নিচের দিকে—একটায় পা রেখে উপরেরটায় অন্য পা তুলে দিল। গাছে ওঠা হয়ে গেল—যা আগে কখনো হয়নি। বাড়ির কেউ দেখলে রক্ষে রাখবে না। উঠে যাচ্ছে দিব্যি একের পর এক পা তুলে। পেয়েছে, পেয়েছে—আম নাগালে এসে গেছে। কমলের ভারি উল্লাস। গাছে উঠেছিল, কারো কাছে বলবে না এ খবর। আম নিয়ে যেন রণজয় করে বাড়ি ফিরল।

টুপটাপ আম তলায় ঝরছে। ছেলেপুলে তলায় তলায় ঘোরে—তাদের নামে সবাই বলে। কিন্তু বড়রাই বা কী! নিমি আর অলকা ননদ-ভাজে নতুন পুকুরে চানে যাচ্ছে—চ্যাটালের তলায় পড়ল একটা। কলসি ঘটি রইল পড়ে পথের উপর—গাছতলায় ছুটল। গা হাত পা ছড়ে গেল কাঁটায়, বিছুটির বিষে দাগড়া-দাগড়া হয়ে ফুলে উঠল। যতক্ষণ না পেয়ে যাচ্ছে, সর্বকর্ম ফেলে আম খোঁজা।

দুপুরবেলা রোদ্দুর ঝাঁ-ঝাঁ করে, আগুনের হল্কা বয়ে যায়। চাষ দিতে দিতে

চাষীরা লাঙল-গরু নিয়ে বিল ছেড়ে উঠে পড়েছে। গ্রাম নিঃশব্দ। পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে সবাই, ঘামে সর্বদেহ ভিজে। তক্তাপোশে নয়—মাটির মেজের উপর পড়েছে। মাদুরও নয়, খালি মাটি। হাতে তালপাতার পাখা। অভ্যাস এমনি, ঘুমের মধ্যেও হাত নড়ছে—হাতের পাখাও চলছে ঠিক। ঘুম গাঢ় হয়ে এলে পাখা হাত থেকে পড়ে যায়, হাতও পড়ে মাটিতে। ক্ষণপরে গরমটা অসহ্য হয়, সম্বিত পেয়ে পাখা তুলে দ্রুত নাড়ে কয়েকবার, গতি পুনশ্চ ক্ষীণ হয়ে আসে।

দেবনাথের আলাদা ব্যবস্থা। নতুন-পুকুরের উত্তরপাড়ে কয়েকটা বড় বড় আমগাছ জামগাছ কাঁঠালগাছ। রোদ ঢোকে না সেখানটা, ঠিক দুপুরেও আবছা অন্ধকার। আর জঙ্গল কেটে পাতা ঝাঁটপাট দিয়ে শিশুবর মাদুর-বালিশ পেতে দিয়েছে সেখানে। এমন কি গড়গড়াও নিয়ে এসেছে। হাতপাখা দিয়েছে, পাখার গরজ তেমন নেই এ জায়গায়। খান দুই তিন ক্ষেতের পর থেকে বিলের আরম্ভ, মুক্ত হাওয়া পুকুরের জলের উপর দিয়ে আরও ঠাণ্ডা হয়ে গায়ে এসে লাগছে। পত্রঘন ডালপালা মাথার উপরে। দেবনাথ বললেন মাদুর টেনে আমগাছের নিচ থেকে সরিয়ে দিয়ে যা শিশু। ঘুমিয়ে আছি, দুম করে থানইটের মতো পাকাআম গায়ের উপর পড়ল—বলা যায় না কিছু।

কমল-পুঁটি তলায় তলায় ঘুরছে দেখে ডাকলেন: আয় রে, মাদুরে এসে বোস। গল্প বলছি, রামের সেই গল্প। বিশ্বামিত্র মুনি এলেন অযোধ্যায়। অসুরের অত্যাচার, যাগযজ্ঞি নষ্ট করে দিচ্ছে। দশরথকে বললেন, রামকে দাও আমার সঙ্গে। ছেলেমানুষ হলে কি হয়, অসুর-দমন ওকে দিয়েই হবে…

গল্পের নামে কমলের স্ফূর্তি। বোঝে না কিছুই, ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে মিষ্টি রিনরিনে গলায় হুঁ-হুঁ দিয়ে যায়। যেখানে খুশি থামলেই হল। সেখা-নেই গল্পের শেষ মেনে নিয়ে আবদার ধরবে: আর একটা। বোঝে বরঞ্চ পুঁটি। সীতার বিয়ে রামের সঙ্গে—ভালও লাগে। কিন্তু আজকে কান পড়ে রয়েছে আমতলায়—আম পড়ার শব্দ আসে এদিক সেদিক থেকে। গল্প এর মধ্যে কানে ঢোকে না। আর এদিকে মিথিলায় রামকে নিয়ে পৌঁছানোর আগেই বাপ তো চোখ বুজে পড়েছেন, ফতরফত ফতরফত নিশ্বাস উঠছে।

রান্নাঘরের পাট সেরে কোনোদিকে কেউ নেই দেখে তরঙ্গিণী টিপিটিপি চলে এসেছেন।

উঃ বড্ড মজা—পালিয়ে আসা হয়েছে! ঘুমোস নি এখনো—এর পরে অবেলায় ঘুমিয়ে সন্ধ্যের সময় ওঠা হবে। রাত আড়াই প্রহর অবধি পায়ে পায়ে ঘুরবি।

স্ত্রীর গলা। তবে দেবনাথ চোখ মেললেন। ডাকছেন: এসো না, বসে যাও একটু। কেমন ঠাণ্ডা জায়গা বেছেছি দেখ এসে।

হেসে তরঙ্গিণী ঘাড় নাড়লেন: ওমা, কখন কে এসে পড়বে—

কমলের হাত ধরে নিয়ে চললেন। পুঁটির গর্ভধারিণী-ম হলেও তোর ভার উপরে উমাসুন্দরীর বেশী। তবু কর্তব্যো দায়েই যেন বলেন, তুই আসবি নে?

বাতাস করছি না বাবাকে?

গতিক বুঝে ইতিমধ্যেই পুঁটি পাখাটা হাতে তুলে নিয়েছে। অতএব আর কিছু বলা চলে না। তরঙ্গিণী সতর্ক করে দেন: পুকুরঘাটে নামবিনে, খবরদার। ঠিক দুপুরে গাছতলায় ঘুরবিনে চুল ছেড়ে দিয়ে শাকচুন্নির মতো---চুলের মুঠো ধরে গাছের উপর তুলে নেবে দেখিস। ঘুমিয়ে পড়লেই বাড়ি চলে আসবি। আর নয়তো শুয়ে পড়বি পাশটিতে।

আচ্ছা—বলে পুঁটি বাতাস করছে বাপকে। ঘোর ভক্তিমতী মেয়ে। মা চলে যেতে চারিদিকে ফালুক-ফুলুক তাকায়। লিচুতলায় ফ্রক দেখা দিল। হাত তোলে পুঁটি তার দিকে—অর্থাৎ একটু সবুর কর, বাবার ঘুম এসে গেছে প্রায়। জোরে জোরে বাতাস করছে, বাতাস কামাই দেবে না এখন। কাঁচাঘুমে বাবা জেগে পড়তে পারেন, তা হলে সমস্ত পণ্ড।

ক'দিন থেকেই মেঘ-মেঘ করছে। বাতাসে মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যায়। আজকেও আয়োজন গুরুতর, ঝোড়ো-কোণ কালো হয়ে গেল। অপরাহ্নেই মনে হয় সন্ধ্যা হয়ে গেছে। উড়ে যাবার মেঘ নয় আজ—ঝড় এলো বলে।

পুঁটিটাকে নিয়ে সামাল সামাল। লহমার তরে বাড়িতে টিকি দেখবার জো নেই। ছেলেটাকেও নিয়ে বের করেছে। পাড়ার একপাল বাঁদর জুটেছে, তলায় তলায় টহল দিয়ে বেড়ায়। অন্ধকার করে এসেছে, তা বলে একফোঁটা ভয়ডর নেই। দেখে আয় তো মা নিমি -

বলতে বলতে তরঙ্গিণী গর্জন করে ওঠেন: কোন চুলোয় হারামজাদি, দেখে আয়। ছেলেটাকে নিয়ে বের করেছে---দেখতে পেলে চুলের মুঠো ধরে টানতে টানতে আনবি!

হুকুম পেয়ে নিমি সোৎসাহে বেরুচ্ছে। ধরে আনতে বললে বেঁধে আনা স্বভাব তার—চুলের মুঠো ধরে সত্যিই টানবে সে, চড়টা চাপড়টাও দেবে না এমন মনে হয় না। লেগে যাবে দুই-বোনে। সভয়ে বড়গিন্নি বললেন, চুল-টুল ধরিসনে রে। বোশেখ মাসে আমতলায় গেছে তো কি হয়েছে। মাত্তর এই ক'টা দিন—এর পর কেউ থুতু ফেলতেও ওদিকে যাবে না। সন্ধ্যে হয়ে

এলো—পা-হাত পা ধোবে, চুল বাঁধবে এখন। বড়বোন তুই, ভালো কথায় বুঝিয়েসুঝিয়ে নিয়ে আয়।

বাতাস উঠল। ঝড় দস্তুরমতো। ঘনঘন ঝিলিক দিচ্ছে, জলও চ'লবে এইবার। দেখতে দেখতে ঝড় প্রচণ্ড হয়ে উঠল। বাইরের উঠানের একদিকে খেজুরতলি অন্যদিকে বেলতলি। ফলেছেও তেম'ন এবার। কিন্তু গাছে আজ একটি আম রেখে যাবে মনে হচ্ছে না। সবে পাক ধরেছে—টিবটাব পড়ছে তো পড়ছেই। পাকা ডাসা কাঁচা—ডাল ধরে শেষ করে দিয়ে যাচ্ছে। খই ভাজতে খোলার খই যেমন চিড়বিড় করে চতুর্দিকে ছিটকে গিয়ে পড়ে, তেমনি। আম গড়িয়ে উঠান অবধি এসে পড়ছে। স'মলে থাকা কঠিন বটে। পুঁটিটা তো ছটফট করছে—রোয়াক থেকে লম্ফ দিয়ে পড়ে আমতলায় চোঁচা-দৌড় দেবে। এইমাত্র বিষম বকুনি খেয়েছে বলে চুপচাপ আছে এখানে। শিশুবর খসর-খসর করে গরুর জন্য পোয়াল কাটছিল, পোয়াল-কাটা বঁটি কাত করে রেখে সে বেরুল। দেবনাথ হেন গণ্যমান্য বয়স্ক ব্যক্তিও থাকতে পারেন না—শিশুর অধম হয়ে খেজুরতলি তলায় চললেন। উমাসুন্দরী চেঁচাচ্ছে : যেও না ঠাকুরপো, গাছগাছালি ভেঙে পড়তে পারে। বাতাস থেমে যাক—যেতে হয় তার পরে যেও।

দেবনাথ বলেন, আম ততক্ষণ তলায় পড়ে থাকবে বুঝি? কুড়াতে এলে কাকে মানা করতে যাবো—করবই বা কেন?

হাসতে হাসতে ধামি হাতে নিয়ে ছুটলেন তিনি। উমাসুন্দরী কি করবেন—যে-মানুষ ধমক দিয়ে হাতের ধামি কেড়ে নিতে পারতেন, তিনি যে এখন বাড়ি নেই।

হাটবার আজ। কতদিন পরে ভাই বাড়ি এসেছে—হিরুকে সঙ্গে নিয়ে ভবনাথ নিজে হাট করতে গেছেন। বেছেগুছে দরদাম করে ভাল মাছটা ভাল তরকারিটা নিয়ে আসবেন—অন্যকে দিয়ে সে জিনিস হয় না।

হাটে যাবার মুখে বরাবরই ভবনাথ মুখ গোমড়া করে থাকেন। আজকে তা নয়। বরঞ্চ হাসিখুশি ভাব—খরচের মেজাজ। কমলকে সামনে পেয়ে বললেন, কি আনব রে?

বাড়ির মধ্যে কমলের যত আবদার জেঠামশায়ের কাছে। ভবনাথও এলাকাড়ি দেন। চারি-সুরির কাছে নতুন এক হেঁয়ালি শিখেছে কমল—বাহাদুরি দেখিয়ে তাই সে ঝেড়ে দিল :

কাসুন্দির সন্ধি বাদে, পাঁঠার বাদে পা,
লবঙ্গর বঙ্গ বাদে, নিয়ে এসো তা।

একগাল হেসে ভবনাথ বললেন, কাসন্দির সন্ধি বাদ দেবো—সে আবার কি রে? আমার কি অত বুদ্ধি আছে, সোজা করে বুঝিয়ে বল।

মিনি শুনছিল, সে বলল কাঁঠাল। কাসন্দির সন্ধি ছাড়লে কা থাকে না? পাঁঠার তেমনি থাকে ঠা, লবঙ্গর ল। কমল তোমায় কাঁঠাল আনতে বলেছে।

ভবনাথ বললেন, আমাদের গাছেই কত কাঁঠাল—পাক ধরেনি এখনো। সারা হাট খুঁজে একটা-দুটো মেলে। ছিরু, গিয়েই একটা কাঁঠাল কিনে ফেলো—দেরি করলে পাবে না। দাম নেবে সেইরকম—তা মনুর যখন ফরমাস, কী করা যাবে।

হাট থেকে ভবনাথ ফেরেননি এখনো। দেবনাথ তাই ঝড জলের মধ্যে বিঁবিয়ে আম কুড়োতে যাচ্ছেন।

আর বাপই চললেন তো মেয়ের কি—পরম অনুগত মেয়েটি হয়ে পুঁটি দেবনাথের পিছন ধরেছে। পিছনে তাকিয়ে নির্ভয়ে দেখে এক একবার মায়ের দিকে—বড়-গাছে বাসা বেঁধেছি, কাকে আর ডরাই? ভাবখানা এই প্রকার। জানালার ওধারে দক্ষিণের-ঘরের ভিতরে ছোটভাইটির করুণ অবস্থা দেখতে পাচ্ছে—বাতাস-বৃষ্টি গায়ে না লাগে—কমলকে মা জুতো-জামা পরিয়ে ঘরের মধ্যে আটক করে ফেলেছেন।

মড়মড় করে জামরুলগাছের একটা ডাল ভেঙে পড়ল। যা বলেছিলেন উমাসুন্দরী, ঠিক ঠিক তাই। চেঁচাচ্ছেন তিনি—প্রচণ্ড বাতাস-বৃষ্টিও আরম্ভ হয়ে গেল, কথা না বেরুতেই উড়িয়ে নিয়ে যায়। কেমন বাবা দেবনাথ জানিনে—বাচ্চা মেয়েটাকে অন্তত ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বাড়ি পাঠানো উচিত ছিল।

বৃষ্টি টিপটিপ করে হচ্ছিল—ঝেঁপে এলো এবার ঝড়ের সঙ্গে। কাঁচা পাতা ছিঁড়ে ঘূর্ণি বাতাসে পাক খেতে খেতে এসে পড়ছে। গাছপালা মাথা ঝাঁকাঝাঁকি করছে, সুপারিগাছ নুয়ে পড়েছে। ভেঙে পাঁচ সাতটা ভূমিশায়ী হল। সামনের কলাঝাড়ে সবে মোচা থেকে কাঁদি বেরিয়েছে—চোখের উপর গাছটা পড়ে গেল।

অলকা-বউ বলে, কাল থোড়-মোচা খাওয়া যাবে খুব।

তরঙ্গিণী বললেন, তুমি খেও—রেঁধে দেবো তোমায়। অন্য কেউ তো মুখে দেবে না।

বিনো হি-হি করে হাসে: তুমি যেন কী বউদি, কিছু বোঝ না। কাঁচকলার থোড়-মোচা বিষম তেতো—খাওয়া যায় না। সবসুদ্ধ কুচিকুচি করে কেটে জাবনায় মেখে দেবে, গরুতে খাবে। গুয়োগাছ পড়েছে—তার বরঞ্চ মাথি খাওয়া যাবে। ছোটখুড়িমা মাথির ডালনা রেঁধো না কাল। কি গরম-

সলা দিয়ে সেই যে রেঁধেছিল—তোমার মতন কেউ পারে না।

দেবনাথ ফিরলেন। পুঁটিও ফিরেছে বাপের সঙ্গে। কাপড়চোপড় ভিজে গেছে, গা-মাথা দিয়ে জল গড়াচ্ছে। ফিরেছেন সে জন্যে নয়। ছোট ধামি ভরে গেছে আমে। তলায় এখনো বিস্তর। একটা কোন বড় পাত্র চাই।

বিনো বলে, আমি যাবো ছোটকাকা। নিমি বলে, আমি যাবো। আম কুড়ানোর নামে নাচছে সবাই। ভবনাথ হাটে চলে গেছেন—রাতের বেলা ঝুপঝুপে এই বৃষ্টির মধ্যে আম কুড়ানোর সুবর্ণসুযোগ। দেবনাথ অতিশয় দরাজ এ ব্যাপারে—বলতেই ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বসে আছেন। অলকা-বউকে নিজে থেকেই আবার জিজ্ঞাসা করেন: তুমি যাবে না বউমা ?

ইচ্ছা কি আর হয় না, কিন্তু বউমানুষ যে! অলকা কথা ঠিক বলে না খুড়শ্বশুরের সঙ্গে—দরকার আকারে-ইঙ্গিত বলে। ঈষৎ ঘোমটা টেনে গামছাটা নিয়ে পুঁটির ভিজে চুল মুছতে লাগল সে।

বিনো আর নিমি যায় বুঝি বনে-বাদাড়ে—সভয়ে বড়গিন্নি বলেন, সত্যি সত্যি চললি যে তোরা ?

দোষ কি বউঠা'ন, আমি তো সঙ্গে থাকব।

দেবনাথ সম্পূর্ণ ওদের পক্ষে। বলছেন, ছেলেমেয়ে সবাই কুড়িয়ে বেড়াবে বলেই কর্তারা বাড়ির উপরে বাগ বানিয়ে রেখে গেছেন। জষ্ঠিমাসের দিনে আম খেয়ে সুখ বটে, কিন্তু কুড়ানোয় বেশি সুখ।

উমাসুন্দরী বললেন, তা বলে রাত্তিরে কেন ? কুড়োতে হয়, কাল সকাল-বেলা কুড়োবে।

বাগড়া পড়ায় বিনো ক্যার-ক্যার করে উঠল: সকাল অবধি আম পড়ে থাকবে কিনা। কতজনা এরই মধ্যে এসে পড়েছে দেখগে।

ঠেকানো যাবে না এ দুটোকে খোদ ছোটকর্তারই যখন আসকারা। বড়-গিন্নি একেবারে নিঃসংশয় হয়ে গেছেন। বৃথা বাকাব্যয় না করে পুঁটির হাত ধরে তিনি নিয়ে চললেন। বকতে বকতে যাচ্ছেন: সেদিন জ্বর থেকে উঠে-ছিস, রাত্তিরবেলা নেয়ে এলি আবার। কাঁপিয়ে জ্বর আসবে—মজা টের পাবি তখন। জামাইষষ্ঠীতে কত খাওয়াদাওয়া আমোদ-আহ্লাদ—বুড়ি আসবে জামাই আসবে, তুমি তখন বিছানায় শুয়ে চিঁ-চিঁ করো আর বার্লি গেলো—

দক্ষিণের ঘরে তরঙ্গিণীর হেপাজতে কমল। বড়গিন্নি পুঁটিকে সেখানে এনে ছাড়লেন। বাপের সঙ্গে কমল যেতে পারে নি, সেজন্য মুখ আঁধার। বড়গিন্নি আদর করে বললেন, কমল কেমন লক্ষ্মীসোনা, দেখ তো। রাতের বেলা আমতলায় যায় না—

কমল বিজ্ঞজনোচিতভাবে বলল, দিনমানে যেতে হয়—

কমল ভ্রলবিষ্টি লাগায় না—

কমল বলল, জল লাগলে অসুখ করে।

শিশুবর ফিরল। নতুনপুকুরের পূবে বাগের ঐ-মুড়োয় দূরের দিকে গিয়েছিল সে। ঝুড়ির আম হুড়মুড় করে দরদালানে ঢেলে দিল। বিনো যা বলেছিল—সত্যিই তাই। মাদারতলার দিক দিয়ে বিলের দিক দিয়ে মানুষ এসে উঠেছে, বেপরোয়াভাবে আম কুড়োচ্ছে। ছোটবাবু ছোটবাবু—বলে শিশুবর হাঁক পাড়ল, তা মোটে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। তাদের নিজেরই যেন জায়গা।

দেবনাথ শুনে যাচ্ছেন, এত বলাবলিতেও তাঁকে উত্তেজিত করা যায় না। উল্টে তিনি শিশুবরকে দুষছেন: অন্যায় তোমারই তো শিশুবর। কেন তুমি হাঁকাহাঁকি করতে যাও? গাছের তো পাড়ছে না। তলায় দুটো কুড়িয়ে নিচ্ছে—তাতে রাগ করলে হবে কেন?

অলিখিত আইন: গাছের ফল মালিকের। গাছে উঠে আম পাড়াটা বেআইনি—চুরির শামিল। তলার আম যে কুড়িয়ে পাবে তার, মালিকের সেখানে একক অধিকার নেই।

শিশুবর বলল, লণ্ঠন নিয়ে এসেছিল—চেঁচিয়ে উঠতে নিভিয়ে অন্ধকার করে দিল।

তবু দেবনাথ সে পক্ষের দোষ দেখতে পান না। বললেন, আনবেই তো। তলায় আগাছার জঙ্গল—আলো না হলে দেখতে পাবে কেন?

নাও, হয়ে গেল! তলায় কুড়োনোয় দোষ হবে না সে জিনিস হল, একটা-দুটো সামনের মাথায় দেখলাম, তুলে নিলাম। এমনিভাবে লণ্ঠন ধরে হন্নেহন্নে করে কুড়ানো কখনো হতে পারে না। কিন্তু মীমাংসা ও শাসন-নিবারণ ছোটবাবুকে দিয়ে হবার নয়। অথচ জমিদারের ম্যানেজার নাকি উনি—প্রতাপে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়। সেই মানুষ বাড়ি এসে বোম-ভোলানাথ হয়ে গেছেন।

হেনকালে ভবনাথ ফিরলেন। ঝড় থেমে গেছে, বৃষ্টি অল্পসল্প টিপটিপ করে পড়ছে। জল কাদা ভেঙে আম কুড়িয়ে বেড়াবে বলে আসমকা ছেঁড়া কাপড় কাঁধে বেড় দিয়ে গাছকোমর বেঁধে নিমি ও বনো তৈরি। হলে হবে কি—আয়োজন পণ্ড ভবনাথ এসে পড়েছেন। তাঁর কাছে কথা পাড়বেই বা কে, যাবেই বা কেমন করে তাঁর সামনে দিয়ে?

আসল মানুষ পেয়ে শিশুবর নালিশটা আবার গড়বড় করে গোড়া থেকে

বলে যায় : এত চেল্লাচেল্লি যোটে কানেই নিল না বড়বাবু। যেন ওদের বাবাতে-গাছ। দেদার কুড়োচ্ছে।

ভবনাথ গর্জে উঠলেন : কুড়ানো বের করে দিচ্ছি। চল্—

জিরান নেই, তক্ষুনি বেরুচ্ছেন আবার। উমাসুন্দরী বাধা দিয়ে বলেন, ওমা, হাট করে এই এসে দাঁড়ালে। শিশুটা হয়েছে কেমন যেন—লহমার সবুর সয় না। উঠোনে পা না ফেলতে আরম্ভ করে দেয়।

ভবনাথ বলেন, হাট অবধি যেতে পারলাম কই? বদন-সা'র তেল কেরা-সিনের দোকানে এতক্ষণ। দালানের মধ্যে দিব্যি আছ, বাইরে কী কাণ্ড হয়ে গেল টের পেলে না। হাটঘাট কিছু হয় নি, জলঝড়ের মধ্যে হাট মোটে বসতেই পারে নি আজ। ভাইটি আছে, ভাল দেখে মাছ-শাক আনব ভেবে-ছিলাম। নাও, কচু কোট বেগুন কোট—কচু-বেগুনের ডালনা রাঁধো। আর কি হবে।

দেবনাথকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছেন, বাতাসে দুটো-একটা পড়ে, কুড়িয়ে নিয়ে যায়—সে এক কথা। তা বলে কালবোশেখিতে গাছ মুড়িয়ে দিয়ে গেল—ধামা ধামা তাই নিয়ে হাটে বিক্রি করবে, সেটা কেমন করে হাতে দিই? হিরুটা আসছিল, গেল কোথায় আবার—এলে পাঠিয়ে দিও।

চললেন ভবনাথ বীরদর্পে। শিশুবর চলল পিছু পিছু ঝুড়ি কাঁধে নিয়ে। আম আলো ধরেই কুড়োচ্ছে বটে—আলো নড়ছে। অনেকটা দূরে—বাগের একেবারে শেষপ্রান্তে বিলের কাছাকাছি। ভবনাথ জোর পায়ে যাচ্ছেন, শিশুবর তাঁর সঙ্গে হেঁটে পারে না।

একেবারে কাছে চলে গেলেন। দুটো লোক—স্পষ্ট নজরে আসে। ভবনাথ হুঙ্কার দিলেন : কারা ওখানে?

মাহিন্দারের চেঁচামেচি নয়—ভবনাথের গলা তল্লাটের মধ্যে কে না জানে? লণ্ঠন পিছন দিকে নিয়ে ফুঁ দিয়ে চকিতে নিভিয়ে দিল। মানুষ চেনা গেল না—একছুটে তারা বিলের মধ্যে। রাত্রিবেলা বিলে নামা ঠিক হবে না। ভবনাথ সহাস্যে বললেন, আর আসবে না, মনের সুখে কুড়ো এবারে তুই।

মিছে বলেন নি ভবনাথ—সকলে তাঁকে ডরায়। কথা না শুনলে তিনি কোন ফ্যাসাদে ফেলবেন ঠিক কি। একেবারে কাছাকাছি হাজির হয়ে মানুষগুলোকে চিনে নেবেন—সেই মতলবে আলো আনেন নি, আঁধারে আঁধারে এসেছেন। শিশুবর এবারে বাড়ি থেকে লণ্ঠন নিয়ে এলো। আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে ভবনাথ বলেন, উঃ, কী ঝড়টা হয়ে গেল! আম কি আর আছে গাছে—আসবে না কেন মানুষ?

নিয়ম ওদিকে দেবনাথকে ধরেছে : বাবা তো বাগের ঐ-মুড়োয়। চলো

কাকামশায়, এই তলাগুলোর আমরা কুড়িয়ে আসি। বাবার আগেই ফিরে আসব—টেরও পাবেন না তিনি।

দোনামোনা করছিলেন দেবনাথ—বাড়ির উপর ভবনাথ সশরীরে হাজির, তার মধ্যে এত বড় দুঃসাহসিক কাজ উচিত হবে কিনা। হিরু এই সময়ে দেখা দিল। জবর খবর নিয়ে এসেছে, প্রত্যক্ষ পরিচয় খালুইতে—দুটো কইমাছ। শূন্য খালুই নিয়ে হাট ফেরতা ভবনাথের পিছু পিছু আসছিল, বাড়ির ছড়কোর কাছে এসে মাথায় মতলব এলো: এই নতুন বৃষ্টিতে কইমাছ উঠতে পারে—কানাপুকুরটা একবার ঘুরে এলে হয়। ভবনাথকে কিছু বলল না। বৃষ্টির মধ্যে জলকাদা ঘাসবনের মধ্যে হা-পিত্যেশ বসে থাকা—জলের মধ্যে মাছ খলখল করছে ভেবে সাপ এঁটে ধরাও বিচিত্র নয়। হয়েছিল তাই সেবারে—ভবনাথের হাতে সাপে ঠুকে দিয়েছিল। ভবনাথ টের পেলে যেতে দিতেন না, তাঁর অজান্তে তাই সরে পড়েছিল। জুত হল না। দেখা গেল, একলা তার নয়—অনেক মাথাতেই মতলব এসেছে। কানাপুকুরের গর্ভে হোগলা-বনের এদিকে-সেদিকে বিস্তর ছায়ামূর্তি। গণ্ডগোল করে মাটি করল—কারোই তেমন-কিছু হল না, হিরণ্ময়ের ভাগ্যে তবু যা-হোক দুটো জুটেছে—একেবারে বেকুব হতে হয়নি।

খালুই থেকে ঢেলে মাছ দেখা হল। মনোরম বটে—কালো-কুঁদ, লম্বায় বিগত-খানেক—হাটেবাজারে কালে-ভদ্রে এ জিনিস মেলে। হলে হবে কি, মাত্র দুটো। এত বড় সংসারে দুটো মাছ কার পাতেই বা দেওয়া যাবে!

হিরণ্ময় বলে দিল, একটা তো কাকার। আর একটা কেটে দু-খণ্ড করে আধখানা বাড়ির ছোট ছেলে কমলবাবুকে, বাকি আধখানা পরের মেয়ে বউ দিদিকে—

অলকার দিকে চেয়ে হাসল সে মুখ টিপে।

দেবনাথ রোখ ধরলেন: চল দিকি—

কোথায়?

কানাপুকুরটা ঘুরে আসি একবার—

হিরু অবাক হয়ে বলে, বৃষ্টি মাথায় করে জল-কাদা-জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা—বড্ড কষ্ট কাকা, আপনি পারবেন না।

না, পারব না, আমি যেন করি নি কখনো!

নেমে পড়লেন রোয়াক থেকে। বললেন, খালুইতে হবে না—বস্তা নিয়ে আয় একটা। কানকো ঠেলে মাছ উঠতে থাকে—ধরতে গিয়ে হুঁশ থাকে না তখন, খালুই উল্টে পড়তে পারে। বস্তার মধ্যে ফেলে দিলে নিশ্চিন্ত।

আর এক কালের পুরানো দিন সব মনে পড়ছে। তখন দাদা—ঐ দেব-নাথকে সঙ্গে নিয়েই কত হুল্লোড়পনা করেছেন। সঙ্গী ছিলেন সীতানাথ, ইন্দির, জিতে, ভেজালে, বিপ্র্র—আরও কত, নাম মনে পড়ছে না। বয়স হয়ে ঠাণ্ডা মেরে গেলেন এখন তাঁরা. মরেও গেছেন কতজনা।

কাকামশায় উঠানে দাঁড়িয়ে—না গিয়ে উপায় নেই অতএব। তাড়াতাড়ি হিরন্ময় সরঞ্জাম সংগ্রহ করে আনল। হিরুদের হেরিকেন একটা এবারে কলকাতা থেকে এসেছে, তল্লাটে নতুন জিনিস। সেটা নিয়ে নিল। ছাতা এনেছে, বস্তা তো আছেই। যেতে যেতে হিরু আবার একবার শুনিয়ে দেয়: মিছে যাওয়া কাকামশায়। আজ আর হবে না, যা হবার হয়ে গেছে। হবার হলে আমিই কি মাত্তর দুটো নিয়ে ফিরতাম?

দেবনাথ অন্য কথা তুললেন: ছাতা-আলো নিয়ে তোরা কইমাছ ধরিস নাকি? তবে একটা পিঁড়ি নিলি নে কেন? পিঁড়ি পেতে বরপাত্তোর হয়ে বসতিস।

ঝোপজঙ্গল খানাখন্দ অন্ধকার, মাথার উপর ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে—আলো-ছাতা ছাড়া আপনিই তো পেরে উঠবেন না কাকামশায়।

টুরে—শাখাসঙ্কুল বিশাল মহীরুহ, একেবারে কানাপুকুরের উপরে। ছোট ছোট আম, মধুর মতন মিষ্টি—এমন ফলন ফলেছে, পাতা দেখার যো নেই। নাম বোঁটা, দিবারাত্রি পড়েছে তো পড়ছেই। আম পড়ে পুকুরের খোলে—একফোঁটা জল ছিল না, মাটি ঠনঠন করছিল, সারাদিন আজও ছেলেপুলে ছুটোছুটি করে আম কুড়িয়েছে। সেই আমতলায় এখন জল দাঁড়িয়ে গেছে দস্তুরমতো—বৃষ্টির জল, তার উপর বিলের জল রাস্তার পগার দিয়ে এসে পড়ে। কইমাছ হিরু এইখানটায় ধরেছে।

অতএব ছাতা বন্ধ করে নরম মাটিতে ছাতার মাথা পুঁতে দেওয়া হল, হেরিকেনের জোর কমিয়ে নিভু-নিভু করা হল। খুড়ো-ভাইপো জলের উপর হাঁটু গেড়ে বসলেন—বসে অপেক্ষায় আছেন। পগারের জল ঝির ঝির করে পড়ছে এখনো। হঠাৎ কোন এক সময় উজান কেটে দাম-চাপা দশা থেকে মুক্তি নিয়ে উল্লাসে ডাঙায় উঠতে যাবে মাছ, মাথা চেপে ধরে অমনি বস্তার মধ্যে ফেলবেন। কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়তো হাত, ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই। ছাড়া পেয়ে মাছ দামের ভিতর যদি ফিরে যেতে পায়, তো হা সর্বনাশ। বলে দেবে সঙ্গীসাথী ইয়ারবন্ধুদের, তারপরে একটাও আর বেরুবে না। হাতেনাতে বহু-ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা, কইমাছ ধরার কাজে তাই আনাড়ি লোক আনতে নেই। সেই কাণ্ড আজও হয়েছে দামের তলে চাউর হয়ে গেছে মানুষ ওৎ পেতে রয়েছে

ধরবার জন্য। আজকে বোধহয় মাছ আর বেরুবে না।

হিরু বলল, কতক্ষণ আর বসবেন কাকা, উঠে পড়ুন। আর একদিন দেখা যাবে।

এ দিক সেদিক আরও কিছু ঘোরাঘুরি করে খুড়ো-ভাইপো বাড়ি ফিরে এলেন। ডাহা বেকুব—জলে ভেজা আর কাদা মাখাই সার হল শুধু।

আম কুড়িয়ে শিশুবর ধামার পর ধামা এনে দ'দালানে ঢালছে। লণ্ঠন হাতে ভবনাথ বাগের মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছেন। দেবনাথ বললেন, উঃ, কম আম! অর্ধেক মেজে ভরে গেল—আর কত আনবি রে?

শিশুবর বলে, তা আছে ছোটবাবু। আজ পড়লা দিনেই গাছ মুড়িয়ে শেষ করে দিয়ে গেছে।

পাকা আম, ডাঁসা আম, একেবারে ফুলো আমও আছে। মেজেয় পাতিয়ে দিচ্ছে—বাতাস পেয়ে তাড়াতাড়ি পচে উঠবে না। হিরুকে দেবনাথ বললেন, তুই গিয়ে দাঁড়া একটু। দাদা চলে আসুন। হয়েও এসেছে প্রায়, আর কতক্ষণ!

কালবৈশাখী এই প্রথম এবছর। খাওয়াদাওয়ার পর রাত্রে আকাশ পরিষ্কার, তারা ফুটেছে, বৃষ্টির দলার চিহ্নমাত্র নেই। সোনাখড়ি যেন চান করে উঠেছে, বৃষ্টি ধোওয়া পাতালতা ঝিকমিক করছে তারার আলোয়। ব্যাঙেরা গ্যাঙর-গ্যাং গ্যাঙর-গ্যাং করে গোলমাল জুড়েছে, ঝিঁঝিঁ ডাকছে, জল পড়ার সামান্য শব্দ এদিকে সেদিকে। রান্নাঘরের দাওয়ায় চটাচট পিঁড়ি পড়ছে—অর্থাৎ খেতে এসো সব এবারে। এদিকে আর ওদিকে কাঠের দেলকোর উপর দুটো টেমি ধরিয়ে দিয়েছে—চলে এসো শিগগির। বিনো আর অলকা-বউ ভাতের থালা এনে এনে রাখছে।

সুপাকা আম যাকে বলে, তা বড় নেই এই আমের গাদার মধ্যে। ভাল গাছের দুটো-পাঁচটা বেছে ছেলেপুলের হাতে দেওয়া হল। মিষ্টি নয়—পানসা কিম্বা হাড়ে-টক। যেগুলো একেবারে কাঁচা, বঁটিতে সরু সরু ফালি কেটে মাটির উপর মেলে দেওয়া হল—শুকিয়ে আমসি হবে। কচি আমের আমসিই ভাল, কিন্তু এ আম ফেলে দেওয়া যাবে না তো। ডাঁসা আম জাঁক দিয়ে রাখা হল, পাকবে না—শুঁটকো হয়ে নরম হোক, কিছু আমসত্ত্বে মিশাল দেওয়া যাবে, বাকি সমস্ত গরুর জাবনায়।

পরের দিন উমাসুন্দরী আমসত্ত্বের তোড়জোর করে বসলেন। কাজটা বরাবর তিনিই করে আসছেন, প্রধান কারিগর তিনি—তরঙ্গিণী সাথেসঙ্গে আছেন। অলকা-বউকে তরঙ্গিণী ডাকাডাকি করেন: এদিকে এসো বউমা,

লেগে পড়ে যাও। হেঁসেলে বিনো থাকুক, আম ছেঁচে দিয়ে আমি যাচ্ছি তারপরে।

অলকার দ্বিধা: আমি কি পেরে উঠব ছোটমা, চাকলা কেটে দিয়ে যাচ্ছি বরং।

চাকলা কাটবে, ছেঁচবে, ছাঁকবে, গোলা লেপবে—সমস্ত করবে তুমি। ক্ষেপে ধরলেন তরঙ্গিণী: আমি বরঞ্চ রান্নাঘরে যাবো এখন। ব'ল, শক্তটা কি আছে? দেখেশুনে শিখে-পড়ে নাও। সংসার তোমাদের—চিরকাল বেঁচে-বর্তে থেকে আমরা সব করে দেবো নাকি?

বঁটি পেতে তিন চাকলা করে আম কাটে। চাকলাগুলো ধামার মধ্যে ফেলে মুগুরের মাথা দিয়ে খুব একচোট পিষে নেয়—হামানদিস্তায় পান ছেঁচার মতো। পরিমাণ অত্যধিক হলে ঢেঁকিতেও কোটে। পাতলা কাপড়ে গোলা ছেঁকে নেয় তারপর। নরম হাতে আস্তে আস্তে ছেঁকতে হবে, জোর-জবরদস্তিতে কাপড় ছিঁড়ে যাবে, গোলা ভাল উতরাবে না। চিনি একটু মিশালে মিঠা বাড়ে, চুন একটু মিশালে রং খোলে। বড়গিন্নির এতে ঘোরতর আপত্তি—খাঁটি আমসত্ত্বের স্বাদ মিশাল জিনিসে মিলবে না। গোলা তৈরি হল। বারকোশ, পিঁড়ি, খেজুরপাতার পাটি আর আছে পাথুরে ছাঁচ—পাথরের উপর রকমারি খোদাই: মাছ পাখি পরী কলকা ফুল লতাপাতা উল্টো করে লেখা 'জলখাবার' 'আবার খাবো' ইত্যাদি। একগাদা এমনি ছাঁচ সেকালে ভবনাথের মা শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে গিয়ে নিয়ে এসেছিলেন—বাসনের বাক্সে দশ রকম বাসনের সঙ্গে থাকে, দরকারে বেরোয়। যেমন এই আমসত্ত্ব দেবার জন্য বেরিয়েছে, আবার জামাইষষ্ঠীর সময় ক্ষীরের ছাঁচ তৈরির কাজে বেরুবে। আমের গোলা নানান পাত্রে লাগিয়ে শুকোতে দিল—শুকোলে আবার গোলা লাগবে তার উপর। ছেলেপুলেরা পাহারায় আছে কাকে না ঠোক্কর দেয়। আজ হয়ে গেল, গোলা কাল আবার লাগাবে, বারম্বার লাগাবে। সম্পূর্ণ শুকোলে ছুরি দিয়ে কিনারা কেটে আমসত্ত্ব তুলে ফেলবে। ছেলেপুলের মজা তখন, তারা ঘিরে এসে বসল। পাহারা দিয়েছে, এইবারে পারিশ্রমিক—ছাঁচের ছোট ছোট কয়েকটা আমসত্ত্ব বিলি হবে হাত বাড়িয়ে কমল নাচন দিল: মাছখানা আমার।

পুঁটি বলে আমার তবে পাখি।

তরঙ্গিণী নিমকে জিজ্ঞাসা করেন: তুই কি নিবি রে?

আমার লাগবে না কাকিমা।

আজকালের বড্ডবুড় হয়ে গেছিস, তোর কিছু লাগে না। বড় এই কলকাখানা দিয়ে দিই, কেমন?

নিমি বলল, ছাড়বে না তো ছোট দেখে যা-হোক একখানা দিয়ে দাও। আমার পছন্দ-অপছন্দ নেই।

পরে শোনা গেল, সে আমসত্তটুকুও ছিঁড়ে কমল-পুঁটির মাঝে ভাগ করে দিয়েছে। এমনিই হয়েছে নিমি আজকাল—সর্বকর্মে নিস্পৃহ ভাব।

আমসত্ত দেওয়া চলল এখন—শুকিয়ে সযত্নে ভাঁজ করে তোলো-বোঝাই সরদালে তুলে রাখবে। আম যতদিন আছে, চলবে আমসত্ত দেওয়ার কাজ। বর্ষায় সাঁতসেঁতে হবে, খরা পেলে রোদে মেলে দেবে। আম তো এই ক'টা দিনের—আমসত্ত বারোমাস দুধের সঙ্গে খাবে, মাঝে মাছে অম্বল রাঁধবে।

আমে আমে ছয়লাপ, উমাসুন্দরী একটি মুখে দেন না। আম উৎসর্গ না হওয়া অবধি উপায় নেই। ইষ্টদেবতা ও পিতৃপুরুষের নামে আম-দুধ নিবেদন হবে—আগে তাঁদের ভোগ, তারপরে নিজের। সে কাজে পুরুত ও ছিনক্ষণ লাগবে, নারায়ণ-শিলা আসবেন ভদ্রা-কুলবর্তী সেই বড়েলা গ্রাম থেকে। পুরুত শরৎ চক্রবর্তীর বাড়ি সেখানে।

তরঙ্গিণী ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। হিরুকে বলেন, ঠাকুরমশায়ের বাড়ি চলে যাও তুমি। সকলে খাচ্ছে, দিদিই কেবল খাবেন না, এ কেমন কথা।

হিরুর সঙ্গে শরৎঠাকুরের নাকি হাটে দেখা হয়েছিল। কথাটা বলেছিল সে তখন। শরৎ বললেন, নারায়ণ নিয়ে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। এক বাড়ির সামান্য ঐ কাজটুকুর জন্য অত হাঙ্গামা পোষায় না।

হাঙ্গামা বিস্তর বটে। পাকা তিন ক্রোশ পথ—খেয়া-পার আছে তার মধ্যে একটা। নারায়ণ সঙ্গে থাকলে সারাক্ষণ নির্বাক হয়ে যেতে হয়, খুন করে ফেললেও টুঁ-শব্দটি বেরুবে না—কথা বলতে গিয়ে থুতুর কণিকা অঙ্গে ছিটকে পড়তে পারে।—পথের কোনখানে নারায়ণ-শিলা নামানোর জো নেই—অশুচি সংস্পর্শের শঙ্কা। তা তাড়াহুড়ো কিসের, আম তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না এরই মধ্যে।

পুরুত বলে দিয়েছেন, অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন দত্তবাড়ি ব্রতপ্রতিষ্ঠা আছে, একসঙ্গে সব কাজ সেরে দিয়ে যাবেন সেইদিন।

দরদালানের তক্তাপোশ দুটো উঠোনে নামিয়ে দিয়েছে। দুই উদ্দেশ্য। গ্রীষ্মের রাত্রে ঘরে না শুয়ে কেউ কেউ বাইরে শোয়—উঠোনের তক্তাপোশে তারা আরাম করে শুচ্ছে এখন। বৃষ্টি-বাদলার লক্ষণ দেখলে তখন এ-ঘরে সে-ঘরে যেখানে হোক ঢুকে পড়ে। তক্তাপোশ বেরিয়ে গিয়ে মেজে এখন একেবারে ফাঁকা—সমস্ত মেজেটা জুড়ে আম পাতানো। কতক সুপক্ক, কতক

আধপাকা। আমের উপরেও আম, তার উপরে সদ্য ভেঙে-আনা আশশ্যাওড়ার ডাল-পাতা। ওতে নাকি আম ভাল থাকে, আমের জীবনকাল বেশি হয়, ডাঁসা আম পেকে যায়। সকালবেলার এখন বড় কাজ হয়েছে আম বাছাই। কোন আম মিষ্টি, কোন আম টক। কোন আম রসালো—রস নিংড়ে দুধের সঙ্গে জমে ভাল, আবার কোন আমে রস ও আঁশ নেই—সেগুলো কেটে খেতে হয়। টক আম আমসত্তে যাবে, আমে পচন ধরেছে তো গরুর জাবনায় দেবে। জষ্টিমাসে গরুরও মজা। আমের খোসা কাঁঠালের ভুসড়ো খেয়ে খেয়ে কামধেনু হয়ে দাঁড়িয়েছে—দুধের ভারে পালান ফেটে পড়ে, বাঁট টানলেই স্রোতোধারায় দুধ।

বাড়ি বাড়ি আম খাওয়ার নিমন্ত্রণ—এখন আম, আষাঢ় পড়তেই ক্ষীর-কাঁঠাল। পড়শি-মানুষ খাওয়াতে কার না সাধ হয়। গরিবে ভোজ খাওয়ানো পেরে ওঠে না—ভগবান গাছে গাছে দেদার আম কাঁঠাল দিয়েছেন, গাছের ফলে তাদের সাধ মেটায়। সব বাড়িতেই ছয়লাপ, নিমন্ত্রণে গরজ কি? তবু যেতে হয়, নয়তো রাগ দুঃখ অভিমান। এমন কি ঝগড়াঝাটিও।

গিয়ে সব পিঁড়ি পেতে গোল হয়ে বসল, থালা রেকাব বাটি এক একটা হাতে নিয়েছে। বাড়ির গিন্নি বঁটি পেতে ঠিক মাঝখানে বসে ঝুড়ির আম চাকলা কেটে দিচ্ছেন। খাও, খেয়ে বলো কি রকম। গোল গোল আম, নাম হল গোলমা। চুষিপিঠের মতন চেহারা, চুষি নাম, চুষে খেতে ভাল। কালমেঘা—কালো রং বটে, খেয়ে দেখ কী মধুর…। খচ খচ করে কেটে যাচ্ছেন—বঁটিতে ক্ষুরের ধার। আম কেটে কেটে অম্লরসের জন্য হয় এমনধারা—জষ্টিমাসের বঁটিতে, আম তো ছার, মানুষের গলা কাটা যায়।

॥ আট ॥

বৈশাখের বিশে পার হয়ে গেল। ভূপতি রায়ের মেয়ের বিয়ে চুকে গেছে। মুক্তঠাকরুন এসে পড়বেন এইবার। কাল নয়তো পরশু। কিম্বা তার পরের দিন—তার ওদিকে কিছুতে নয়। ফটিকের কাছে আন্দাজি সেই রকম বলেছিলেন।

ঠাকরুণ আসছেন, সাড়া পড়ে গেছে। পুঁটি কমলকে ভয় দেখায়: রাগ হল তো ভুঁয়ে আছাড় খেয়ে পড়িস তুই। পিসিমা এসে দেখিস কি করেন।

পুঁটির দিকে বিনো অমনি করকর করে ওঠে : তোর কি করবেন পিসিমা, সেটা ভাবিস ? বাড়ি তো এক লহমা দাঁড়াস নে—পাড়ায় টহল দিয়ে বেড়াস। আর এখন হয়েছে তলায় তলায়—

অলকা-বউকেও বিনো শাসানি দিচ্ছে : তোমার মাথার কাপড় ঘন ঘন পড়ে যায় বউদি। বউ নও তুমি যেন, পূববাড়ির মেয়ে। পিসিমা আসছেন, হুঁশ থাকে যেন। বলছি কি, ঘোমটার কাপড় সেফটিপিন দিয়ে চুলের সঙ্গে সেঁটে রেখো—পড়ে যেতে পারবে না।

তরঙ্গিণী নিমিকে বলছেন, পাগলীর মতন অমন ছন্নছাড়া বেশে ঘুরবিনে তুই। দৃষ্টিকটু লাগে। সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে সিঁদুরফোঁটা. পায়ে আলতা পরে ভব্যসব্য হয়ে থাকবি—নয়তো বকুনি খেয়ে মরবি ঠাকুরঝির কাছে।

পাড়ার মধ্যেও মুক্তঠাকরুনের কথা। ভালোর ভালো তিনি, কিন্তু বেচাল দেখলে রক্ষে রাখবেন না। এই মানুষ হল আপনজন, ঐ মানুষটা পর—এসব ঠাকরুনের কাছে নেই।

দেড় প্রহর বেলা। পদা এসে খবর দিল : আসছেন পিসিমা। হাটখোলার দীঘির পাড়ের উপর আতাগাছ কাটছি, গরুর-গাড়ি দেখতে পেলাম। ভাবলাম, যাই—খবরটা বলে আসিগে।

এত পথ ছুটতে ছুটতে এসেছে, হাঁপাচ্ছে সে। দেবনাথ বললেন, রাস্তা-পথে গাড়ি তো কতই আসে যায়—

পদা বলে, পিসিমার গাড়ি দু-রশি দূর থেকে চেনা যায়—চলনই আলাদা। মালপত্রে ঠাসা—চিকির-চিকির করে আসছে। এত মাল যে গাড়োয়ানের জায়গা হয়নি, হেঁটে হেঁটে আসছে সে। পিসিই গাড়োয়ান হয়ে ডায়-ডায় করে গরু তাড়াচ্ছেন। হরিতলার কাছাকাছি এসে পড়লেন এতক্ষণে।

খবর দিয়েই পদা ছুটল দীঘির পাড়ের গাছ কাটা শেষ করতে। ব্যাটবল খেলায় একটা ব্যাটের প্রয়োজন পড়েছে, আতাগাছের গুঁড়িতে ভালো ব্যাট হয়।

বট-অশ্বত্থের জোড়াগাছ—হরিতলা। সেকালে, অনেক কাল আগে, পথিকের ছায়াদানের জন্য পুণ্যার্থী কেউ তিন রাস্তার মাথায় দুই গাছ একত্র রোপণ করে বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই হরিতলা থেকেই সোনাখড়ির আরম্ভ বলা যায়। বহুদীর্ঘ প্রায় সমান-আকৃতির দুই প্রকাণ্ড ডাল দুদিকে—স্তম্ভের মতো বিশাল দুটো বোয়া দুই প্রান্তে মাটিতে নেমে গেছে, তার উপরে ডালের ভর। নতুন পথিক, দেবস্থান বলে যে জানে না, সে-ও থমকে দাঁড়াবে

এইখানটা এসে। মহাবৃক্ষ দীর্ঘ দৃঢ় বাহুদ্বয় মেলে দুটো দিক আবৃত করে যেন গ্রাম রক্ষা করছেন। নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন জায়গাটা—চলতে চলতে আচমকা যেন ছাতের নিচে এসে পড়লাম, মনে হবে। তাড়া যতই থাক, পালকি গরুর-গাড়ি পথচারী মানুষ হরিতলায় একটুকু না জিরিয়ে নড়বে না, মাথা নুইয়ে বিড়বিড় করে হরিঠাকুরকে মনের কথা জানিয়ে যাবে।

দেবনাথ দিদিকে এগিয়ে আনতে চললেন। শহরে থাকার দরুন তল্লাটে একটু বিশেষ খাতির—অতএব গেঞ্জিটা গায়ে চড়িয়ে চটিজোড়া পায়ে ঢুকিয়ে নিতে হল। হরিতলায় এসে পড়লেন—কাকস্য পরিবেদনা। ভবনাথ কোন কাজে কোথায় ছিলেন—শুনতে পেয়ে তিনিও চলে এসেছেন। হাটখোলার পথ ধরে চললেন দু-ভাই পাশাপাশি। হাঁ, কুশডাঙার গাড়িই বটে—দা ভুল দেখে নি।

মুক্তকেশী চচ্-চচ্ আওয়াজ করে গরু থামাবার চেষ্টা করছেন। গরু আমল দেয় না। গাড়োয়ানকে ডাক দিলেন: এগিয়ে আয় রে নিতাই, গাড়ি ধর্, নামব।

নিতাই এতক্ষণে গাড়ির মাথায় চড়ছে—তিন ভাই-বোনে হেঁটে যাচ্ছেন। পথের উপরেই প্রণামাদি। দেবনাথ মুক্তকেশীর পদধূলি নিলেন, মুক্তকেশী ভবনাথের। তারপর কে কেমন আছে—নাম ধরে ধরে জিজ্ঞাসা। বাড়ির হয়ে গেল তো পাড়ার সকলের। তারপর গ্রামের। গাড়ির দিকে চেয়ে দেবনাথ অবাক হয়ে বললেন, করেছ কি ও দিদি, গোটা কুশডাঙা যে গাড়ি বোঝাই দিয়ে এনেছ। ·

মুক্তকেশী বলেন, তাই আরো কুলোবে না দেখিস। কতজনের কত রকম দাবি—

আশ্বিনে এবার বাড়িতে মা-দুর্গা আসছেন, ফটিক বলে এসেছে। আয়োজন কতটা কি হল সবিস্তর খবরাখবর নিচ্ছেন। আরও সব রকমারি প্রশ্ন: বউয়ে-শাশুড়িতে বনছে কেমন অমুকের বাড়ি? ছেলেমেয়ে কার কি হল? গোয়ালে আমাদের ক'টা দোওয়া-গাই এখন? পাড়ার মধ্যে নতুন ঘর কে তুলল? লাউ-কুমড়ো কার বানে কেমন ফলল এবার?

কথাবার্তার মধ্যে পথ এগোয় না। গরুর-গাড়ি এগিয়ে পড়েছে এখন, বোঝার ভারে কঁ্যাচকোচ আওয়াজ দিচ্ছে। মুক্ত-ঠাকরুন আসছেন—আওয়াজ তুলে গাড়ি যেন চারিদিকে জানান দিয়ে যাচ্ছে। হরিতলা পার হয়ে তাঁরা গ্রামে ঢুকে গেলেন।

ঠাকরুন আসছেন, সাড়া পড়ে গেছে। হুড়কোর পাশে দাঁড়িয়ে কেউ

মা বলে, শহুরে ভাই বাড়ি এসেছে—ঠাকুরঝির তাই বাপের-বাড়ির কথা মনে পড়ল। আমরা গাঁয়ে পড়ে থাকি—আমাদের কে খোঁজখবর নিতে যায়?

মুক্তকেশী সকাতরে বলেন, মন ছটফট করে সত্যি মেজবউ, কিন্তু পায়ে বেড়ি পরিয়ে রেখেছে—আসি কেমন করে? যা করে এবারের আসা! আমার ভিটের ডাঁটা ভালো খাও তুমি, নিয়ে এসেছি ক'গাছা।

যার দেখা পান, একটা না একটা বলছেন এমনি।

অকালের আনারস ফলেছে ক'টা। বলি, রুগি মানুষ ইন্দির-দাদা আছেন —নিয়ে যাই একটা, খুশি হবেন। আছে গাড়িতে, পাঠিয়ে দেবো।

তোর মেয়েকে নিয়ে যাসরে বোন। রথের বাজারের জন্য হাঁড়িবাশি বানাচ্ছে— চলে গেলাম কুমোরবাড়ি। আগ ভেঙে দশ-বারোটা আমায় দিতে হবে পালমশায়। কদ্দিন বাদে যাচ্ছি, ছেলেপুলের হাতে দেবো কি? তা এনেছি বেশ। বাঁশি ছাড়াও ক্ষুদে ক্ষুদে হাঁড়ি-মালসা-সরা—রাঁধাবাড়ি খেলবে সব। পুতুল এনেছি, পাল্কি এনেছি—খাসা বানায়। নিয়ে যাস মেয়েকে, পছন্দ করে নেবে।

মন্তার মাকে ডেকে বলেন, পিঁড়ির উপরে রুটি বেলতে দেখে গিয়েছিলাম —গাঙনের মেলায় চাকি-বেলন কিনেছি তোমার জন্য।

গরুর-গাড়ি বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে ইতিমধ্যে। ছইয়ের পেছনে বাঁধা প্রকাণ্ড মানকচুটা দেখিয়ে ফুলীকে বললেন, এক ফালি নিয়ে এসো দিদি আত আবিশ্যি। আঁশ মরেনি এখনো, তবু খেয়ে দেখো। কাঁচা চিবিয়ে খেলেও গলা ধরবে না।

যাকে দেখছেন, এমনি বলতে বলতে আসছেন। ভবনাথ স্নেহকণ্ঠে বললেন, এতও তোর মনে থাকে মুক্ত। কে কি খেতে ভালবাসে কার কোন অভাব দেখে গিয়েছিলি কোন জিনিসটা পেলে কে খুশি হয় সমস্ত তোর নখদর্পণে।

দেবনাথ বলেন, বাপের-বাড়ি কবে আসা হবে—ছ-মাস আগে থেকে দিদি ঘরের জিনিস বাইরের জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব গোছগাছ করে রাখেন।

গরুর-গাড়ি আগে পৌঁছে গেছে। মালপত্র নামিয়ে নিতাই বাইরের রোয়াকে সাজিয়ে রাখছে। হাঁড়ি তোলো কলসি কচু কলা লাউ চই দেলকো বাংকোশ চাটু খুন্তি—নেই কোন জিনিস। ছইয়ের খোল থেকে বের করছে তো করছেই উমাসুন্দরী বাইরে-বাড়ি এসে অপেক্ষায় আছেন। চোখ বড় বড় করে তিনি বললেন, কত রে বাবা!

হিরু টিপ্পনী কেটে বলে, পিসিমা ভাবেন ওঁর বাপের-বাড়ি মরুভূমির উপর। এত তাই সা জয়ে-গুছিয়ে আনলেন।

মুক্তকেশী এসে গেছেন, হিরুর কথা কানে গেছে তাঁর। হেসে বললেন, মা

গুছিয়েছিলাম, তার তো অর্ধেকও আনা হল না। আমার জন্য কি এনেছ— বলে কতজনে মুখ ভার করবে দেখিস। আমি কেমন করে? গাড়ির ছই করেছে একেবারে পাখির খাঁচা— একটা মানুষ ভেঙে দুমড়ে সিকিখানা হয়ে কোন রকমে বসে। কদমা বারখণ্ডি ফেনিবাতাসা আর কিছু গুড়ের-সন্দেশ চন্দ্রপুলি বানিয়ে আনলাম—দুখানা চারখানা করে বাড়িতে বাড়িতে দেওয়া যাবে।

গ্রামসুদ্ধ ভেঙে এসে পড়েছে। উমাসুন্দরী বউ মেয়েদের বলছেন, দেখ্ তোরা—একটি মানুষে কত মানুষ এসে জমেছে, চেয়ে দেখ। পিঁড়ি না দিয়ে লম্বা সপ পেতে সকলকে বসতে দিচ্ছেন।

ধ্বক করে পুরানো কথাটা ভবনাথের মনে চমক দিল। এককালে শ্বশুরের নির্বংশ ভিটা ছেড়ে আসবার জন্য বোনকে বলেছিলেন, একা একা শ্মশান চৌকি দিয়ে কি করবি? সেই মুক্তর কত আপনমানুষ—গুণতিতে আসে না। যেমন এই সোনাখড়িতে, তেমনি কুশডাঙায়।

বৃষ্টি বাতাস সন্ধ্যার দিকে অল্পস্বল্প প্রায়ই হচ্ছে। একরাত্রে আবার খুব জোর ঢালা ঢালল। বাতাসও তেমনি। সমস্ত রাত চলেছে—সকাল হয়ে গেল, এখনো জের মেটেনি। মুখ পুড়িয়ে আছে আকাশ। টিপ টিপ করে পড়ছে— হঠাৎ জোর এক এক পশলা। কী কাণ্ড, জ্যৈষ্ঠমাসেই বর্ষাকাল হাজির।

বাইরে বাড়ি রোয়াকের খুঁটি ঠেসান দিয়ে পুঁটি বাগের দিকে তাকিয়ে আছে। তলায় তলায় কত আম এখনো খুঁজে বের করা যায়—কিন্তু বৃষ্টির মাঝে বাইরে বেরুনো বন্ধ। বিশেষ করে মুক্তঠাকরুন রয়েছেন, বড় বড় চোখ ঘুরিয়ে বেড়ান তিনি, সে চোখে ফাঁকি চলে না। তিনি যখন তাকিয়ে পড়েন বুকের মধ্যে গুর গুর করে ওঠে।

সামনের রাস্তা দিয়ে ছাতার আড়ালে জল ছপছপ করে যাচ্ছে—চলন দেখেই ভবনাথ চিনেছেন। হাঁক দিয়ে উঠলেন: কে যায়, নন্দা না? বৃষ্টি মাথায় কোথায় চললে? শোন—

নন্দ পরমাণিকের কাঁধে ধামিতে চাল। ছাতা ধরেছে মাথায় নয়, ধামির উপরে। নিজে ভেজে ভিজুক, চালে না জল পড়ে। কিন্তু জল ঠেকানোর অবস্থা ছাতার নেই। আদি কালো-কাপড়টা নষ্ট হয়ে গেলে ছাতা সাদা কাপড়ে ছেয়ে নিয়েছিল, তা-ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন। তার উপরে ঝড়বাতাসে দুটো-তিনটে শিক ভেঙে আছে।

রোয়াকে উঠে নন্দ পরামাণিক বলল, নিজে ভিজেছি, চালও ভিজেছে।

দু-আনা সেরের মাগ্‌গি চাল—বাদলা দেখেছে, রাতারাতি অমনি এক পয়সা দর চড়িয়ে দিয়েছে। ছাতি সারারা আসে না—শিক দুটো বদলে নেবো, সে আর হয়ে উঠছে না।

ভবনাথ বললেন, শিক বাঁট ছাউনি আগাপাস্তলা সবই বদলাতে হবে। তার চেয়ে দেশি গোলপাতার ছাতা একটা কিনে নাওগে—সস্তা-গণ্ডার মধ্যে হবে, কাপুড়ে-ছাতার চেয়ে অনেক ভাল বাহার হবে না, কিন্তু বৃষ্টি ঠেকাবে।

চালের ধামি নামিয়ে রেখে নন্দ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। বলে, এলাম তো কলকে ধরিয়ে দিয়ে যাই। অর্থাৎ তামাক সেজে নিজে টেনে ধরাবে তারপর কলকেটা ভবনাথের হুঁকোয় বসিয়ে দিয়ে চলে যাবে। নুড়ির আগুনে তামাক খাওয়া—নারকেলের খোসা পাকিয়ে নন্দ নুড়ি বানাচ্ছে।

ভবনাথ বললেন, যে জন্য ডাকলাম নন্দ। বিষ্টিবাদলার মধ্যে ভাল দেখে একটা পাঁঠার জোগাড় দেখ। নয়তো ফুলখাসি। ছোটবাবু বাড়িতে—পারো তো আজকেই লাগিয়ে দাও।

এ-গ্রাম সে গ্রাম ঘুরে নন্দ পরামাণিক ছাগল কিনে আনে, দু-একটি সহকারী জুটিয়ে নিয়ে ঘাড়ে কোপ দেয়। নন্দ ছাগল মেরেছে, খবর হয়ে যায়। মাংসের প্রত্যাশীরা নন্দর বাড়ি এসে কেউ বলে চার-আনার ভাগ একটা আমায় দিও, কেউ বলে আট-আনার। মোট মূল্যের হিসাবে মাংসের ভাগ, লাভের ব্যাপার নেই তার মধ্যে। কেউ একজন উদ্যোগী না হলে গ্রামবাসীর মাংস খাওয়া হয় না। নন্দ পরামাণিক কাজটা বরাবর করে আসছে, মাংস খাবার ইচ্ছে হলে তাকে বলতে হয়।

নন্দ বলল, গাঁয়ের ক্ষেতেল মানুষ আজ-কাল সব ত্যাঁদোড় হয়ে গেছে বড়কর্তা। গরজ বুঝে চড়া দাম হাঁকে। হাটের দিন গঞ্জে গিয়ে কিনলে সুবিধা হবে। ক্ষেতেলরা সেখানে নিজেদের গরজে বেচতে আসে। দশটা মাল দেখেশুনে দরদাম করে কেনা যায়।

ভবনাথ বললেন, সামান্যের জন্য তত হাঙ্গামে কাজ নেই। বৃষ্টি নেমেছে, আর তুমি যাচ্ছ—দেখেই কথাটা মনে উঠল। গঞ্জের হাটে গিয়ে কিনতে হবে এর পরে। জামাইষষ্ঠিতে জামাই আসবে, পাঁঠা পড়বে প্রায় নিত্যিদিন, বেশি পাঁঠা লাগবে তখন।

বাড়ির মেজছেলে কালীময় ফুলবেড়ে শ্বশুরবাড়িতে আছে—সোনাখড়ি থেকে ক্রোশখানেক দূর। দেবনাথ বাড়ি আসার পরে সে-ও এসেছিল, থাকছিলও সোনাখড়িতে। কিন্তু জর এসে গেল। জর কালীময়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-কুটুম্বর মতন হয়ে গেছে—মাঝে মধ্যে আসবেই, কালীময়ের অদর্শন

নাইতে পারে না যেন। আসে জ্বর, নাইতে-খেতে সেরে যায়। জ্বর বলে কালীময়েরও কাজকর্ম কিছু আটকে থাকে না। হাতেম আলি নামে ফকির আছেন কোণা-খোলায়, রোজ সকালে 'ফুল-পানি' অর্থাৎ ফেরোর জলে ফকির মন্ত্রপূত একটা ফুল ফেলে দেন তাই নেবার জন্য শতশত রোগি থানে এসে ধর্না দেয়। এই ফুলপানি এবং সেই সঙ্গে নাওয়া ও খাওয়া দস্তুরমতো—জ্বর বাপ-বাপ করে পালায়। বড় সর্বনেশে নাওয়া—সামান্য জ্বরে বিশ ভাঁড় জল মাথায় ঢেলে নাইতে হয়, জ্বরের প্রকোপ যত বেশি ভাঁড়ের সংখ্যা বেড়ে যাবে ততই। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, ডাক্তারবাবুরা রায় দিয়েছেন ডবল-নিউমোনিয়া—সেই রোগিকে পুকুর-ঘাটে নিয়ে একজন ধরে আছে ও ভাঁড় গণে যাচ্ছে এবং অপরে ভাঁড় ভরে ভরে মাথায় ঢালছে। অসুখের বাড়াবাড়ি বুঝে ফকির সাড়ে পাঁচ কুড়ি অর্থাৎ একশ দশ ভাঁড় ঢালার ব্যবস্থা দিয়েছেন : ডাক্তারবাবুরা শুনে তো গর্জে ওঠেন : খুনে ফকিরকে ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত।

নাওয়া এই, আর খাওয়া শুনেও আঁতকে ওঠার কথা। ভাত ডাল মাছ কোন কিছুতে বাধা নেই। তেঁতুল-গোলা অতি অবশ্য। এবং গরম ভাতের তুলনায় পান্তা ও কড়োকড়োই প্রশস্ত। অবাক কাণ্ড—ক'টা দিন পরেই দেখা গেল, ডবল-নিউমোনিয়ার রোগিটি একহাঁটু কাদার মধ্যে লাঙলের মুঠো ধরে হটহট করে চাষ দিচ্ছে, রোগপীড়ার চিহ্নমাত্র নেই।

এক দুপুরে কালীময় ঘরে শুয়ে মৃদুস্বরে গান ধরল। অলকা-বউ কান পেতে শুনে শাশুড়িকে গিয়ে বলল, মেজবাবুর জ্বর আসছে মা। জ্বর আসার লক্ষণ গা শির-শির করা—তেমনি আবার গান ধরা কালীময়ের পক্ষে। এমনি সে গানটান গায় না, শুধুমাত্র জ্বর আসার মুখে এবং রাতবিরেতে ভুতুড়ে জায়গা অতিক্রম করার সময় গায়। দুপুরবেলা কালীময়ের জ্বর এলো, সন্ধ্যা হতে না হতেই সে একেবারে হাওয়া। শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। বউ বীণা-পাণিকে তেঁতুলগোলা করতে বলে ভাঁড়ের পর ভাঁড় মাথায় ঢালছে ঘাটের সিঁড়িতে বসে। ফকিরবোলা কালীময়—ফকিরের বিধিমত তার চিকিৎসা। যতকিঞ্চিৎ লেখাপড়ার চর্চা আছে বলে সোনাখড়ির মানুষজন নাস্তিক, ফকিরের একাবিন্দু মান্য নেই। ধনঞ্জয় কবিরাজ এবং এক হোমিওপ্যাথি ডাক্তার আছেন গাঁয়ের উপর, যাবতীয় রোগ তাঁদের একচেটিয়া। 'ভাত বন্ধ'—এই একটা বুলি বিশেষভাবে তাঁদের শেখা, নাড়ি দেখবার আগেই বার্লি-সাবুর ব্যবস্থা দিয়ে বসে আছেন। এই চিকিৎসার মধ্যে কালীময় নেই। দায়ে-দরকারে দশ-বিশদিন সোনাখড়ির বাড়ি থাকতে বাধা নেই কিন্তু অসুখ-বিসুখের লক্ষণ মাত্রেই সরাসরি সে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে উঠবে।

দেবনাথের জরুরি চিঠি নিয়ে শিশুবর কালীময়ের কাছে চলে গেল : আজ না হোক, কাল সকালে অতি অবশ্য বাড়ি আসবে—কুটুম্ববাড়ি যাবার প্রয়োজন। দেবনাথ না পাঠালেও শিশুবর যেত—মুক্তঠাকরুন এসে গেছেন, টুক করে গিয়ে খবরটা দিয়ে আসত। অসুখ যত বড় সাংঘাতিক হোক কালীময় ছুটে এসে পড়বে। ঠাকরুনকে বাঘের মতন ডরায় সে। ক্যাট- ক্যাট করে মুখের উপর তিনি যা-তা বলেন : পুববাড়ির কুলাঙ্গার তুই—মাধব মিত্তিরের বউয়ের কাছে দাসখত দিয়ে তার গোমস্তাগিরি করছিস। তোর বাপের ঘরে যেন অন্ন নেই।

ভবনাথকেও ছাড়েন না : ছেলের টোপ ফেলে সম্পত্তি তুলে আনতে গেলে, মাধব মিত্তিরের বউ তেমান ঘাগি মেয়েমানুষ—টোপই গিলে খেয়ে আছে। তোমরা খাও কলা এখন।

কুটুম্ববাড়ি যাওয়ার নামে কালীময় একপায়ে খাড়া, খাওয়াটা উপাদেয় বটে। তদুপরি মুক্তকেশী এসে পড়েছেন—তাঁর চোখের উপরে শ্বশুরালয়ে তিলার্ধকাল সে থাকবে না।

দাঁড়া শিশুবর। সকাল-টকাল নয়, এক্ষুনি যাচ্ছি। একটুখানি দাঁড়া —

জামা গায়ে ঢুকিয়ে চাদরটা তার উপর ফেলে জুতোজোড়া হাতে নিয়ে কালীময় বেরিয়ে পড়ল।

দেবনাথ তাকে অন্তরালে নিয়ে বললেন, আজকেই এসে পড়েছ—ভাল হয়েছে রাত থাকতে বেরিয়ে পড়ো। কানাইডাঙা থেকে অনেক হাটুরে-নৌকো ছাড়বে, তার একটায় উঠে বসো। যাচ্ছ গোঁসাইগঞ্জে, কেউ তা জানবে না—দাদা অবধি না। দাদাকে বলেছি, অম্বুজ দাসের কাছে পাঠাচ্ছি তোমায়—ছিরুর জন্য বনকরের একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারেন কিনা। দিদি আর আমি পরামর্শ করেছি—দু'জন মাত্র আমরা জানি, আর এই তুমি জানলে। দুলালকে যদি এনে ফেলতে পার, জানাজানি তখনই।

কালীময় ঘাড় নাড়ল। আমার যেতে কি—তবে খোঁতা-মুখ ভোঁতা করে ফিরতে হবে। গেল-বার এমনি ফটিক গিয়েছিল। এলো না, একগাদা কথা শুনিয়ে দিল। বাবা রেগে টং, নিমিটা মুখ চুন করে ঘোরে। পাড়ার লোক মজা দেখে : এলো না বুঝি জামাই ?

দেবনাথ বললেন, বাইরের লোক না গিয়ে তুমি যাচ্ছ সেই জন্যে। কাক-পক্ষী টের পাবে না। একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি বেয়ানের নামে।

কত সাধ করে একই দিনে দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। চঞ্চলার বেলা হয়েছে—বউকে তারা চোখে হারায়। চঞ্চলাও মজে গিয়েছে খুব—মুখে যা-ই বলুক, চিঠিতে যত ধানাই-পানাই করুক, বাপের-বাড়ির জন্য সে

মোটেই বিচলিত নয়। হোক তাই, ভাল থাকলেই ভাল, বাপ-মা আত্মীয়জনে এই তো চায়।

আর নিমির বেলা ঠিক উল্টো। বিয়ের পর বার তিনেক গোঁসাইগঞ্জে গিয়েছিল, তারপর থেকে বাপের-বাড়ি পড়ে আছে। বউ নেবার জন্য দুলালের মা গোমস্তাকে পাঠিয়েছিলেন একবার। উঠানে পালকি। কানাইডাঙার ঘাট অবধি যাবে। পানসি ভাড়া করা আছে সেখানে। হিরুও যাচ্ছে—বোনকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে। জামা-জুতো পরে সে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আসল মানুষ নিমিরই পাত্তা নেই। কোথায় গেল, কোথায় গেল? খুঁজতে খুঁজতে বিনোই শেষটা আবিষ্কার করল, নাটাবনের মধ্যে লুকিয়ে বসে আছে সে। যাবে না, কিছুতে যাবে না—জোর করে পালকিতে ঢুকিয়ে দেবে তো লাফিয়ে পড়বে পালকি থেকে। অথবা মাঝগাঙে পানসি থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। গোঁসাইগঞ্জে নিয়ে তুলতে পারবে না কেউ, দিব্যিদিলেশা করে বলছে। চুপ, চুপ! বাড়ির লোকে নরম হলেন তখন: ঘরে আয় তুই, কেলেঙ্কারি করে লোক হাসাস নে—যেতে হবে না শ্বশুরবাড়ি। পালকিসহ গোমস্তামশায় ফেরত চলে গেলেন—হঠাৎ নাকি মেয়ের সাংঘাতিক রকম পেট নামছে, সুস্থ হলে হিরু নিজে গিয়ে রেখে আসবে। গোমস্তাও ঘাস খান না—যা বোঝবার বুঝে গেলেন তিনি। বউ নেবার প্রস্তাব তার পরে আর গোঁসাই-গঞ্জ থেকে আসে নি। চঞ্চলা শ্বশুরবাড়ি চুটিয়ে সংসারধর্ম করছে, নিমি বাপের-বাড়ি পড়ে থাকে। বিষম জেদি—কথা-কথান্তর ঝগড়াঝাঁটি হলেই অমনি হাতের চুড়ি ভেঙে সিঁথির সিঁদুর মুছে বিধবা সাজবে, খোশামুদ করে তখন চুড়ি ও সিঁদুর পরাতে হয় আবার।

কানাঘুষো আগেই একটু শোনা গিয়েছিল, অলকা-বউ চাপাচাপি করে আরও কিছু বের করল নিমির কাছ থেকে। বাড়ির সবাই ভবনাথকে দোষে। নিজেই গিয়েছিলেন পাত্র পছন্দ করতে—পাটোয়ারি মানুষ, বিষয়সম্পত্তি দেখে মাথা ঘুরে গেল—অন্য খবরাখবর নেবার ফুরসত হল না। নিজের মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে জলে ছুঁড়ে দিয়েছেন তিনি। মারাত্মক কি হয়েছে, ভবনাথ অদ্যাবধি কিন্তু বুঝতে পারেন না। বেটা-ছেলের একটু-আধটু বাহিরফটকা দোষ থাকেও যদি, বিয়ের পর শুধরে যায়। বউয়েরই কর্তব্য সেটা, কড়া হাতে রাশ টেনে ধরবে সে। ছেলে বিগড়ে যাচ্ছে বুঝলে বাড়ির কর্তা ডাগরডোগর পাত্রী দেখে তাড়াতাড়ি সেইজন্য বিয়ে দিয়ে ফেলেন। নিমিই তো সৃষ্টিছাড়া—নিজের জিনিস ইঁদুর-বাঁদরে শিয়াল-শকুনে খুবলে খুবলে খেয়ে যাবে, মান করে উনি বাপের-বাড়ি পড়ে থেকে নাকিকান্না কাঁদবেন।

দেবনাথ ঠিক করেছেন, ফয়শালা করে যাবেনই এবারে—শ্বশুর বলে চুপ-চাপ থাকার মানে হয় না। দুলালের মাসতুতো বোন সেই সুহাসিনীটাকে নার্সিং-এর কাজে ঢুকিয়ে দেবেন। জমিদারের সেজ বাবু, মনিবের চেয়ে দেবনাথের বান্ধবই তিনি বেশি, এ ব্যাপারে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অতএব, শহরে চলে যাক মেয়েটা, নিজের পায়ে দাঁড়াক—মাসির বাড়ি কেন চিরকাল পড়ে থাকতে যাবে? এই নিয়েও স্পষ্টাস্পষ্টি কথা বললেন জামাইয়ের সঙ্গে। জামাইষষ্ঠীর আট দিন বাকি—কালীময়কে তাড়াহুড়ো করে পাঠাচ্ছেন। আগেভাগে দুলালকে নিয়ে আসুক। চঞ্চলা সুরেশ না আসতেই কথাবার্তা এঁরা চুকিয়ে বসে থাকবেন

বলেন, দেশে-ঘরে থাকিনে—বাবাজীকে শুধু চোখের দেখাই দেখছি, ভাল করে আলাপ-সালাপ হবে এবার—ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখে দিচ্ছি এইসব। তুমি মুখেও বোলো। তা সত্ত্বেও যদি না আসে, নিজে চলে যাবো তখন—

কালীময়ের ঘোর আপত্তি: না, আপনি যেতে যাবেন কেন? তালুইমশায় মারা গেছেন, চ্যাংড়াটা কর্তা হয়ে বসে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে শুনতে পাই। আমার মান অপমান নেই—কিন্তু আপনার মুখের উপর উল্টোপাল্টা কথা যদি কিছু বলে বসে?

দেবনাথ শান্ত কণ্ঠে বললেন, বন্দুক থাকবে আমার সঙ্গে—তাহলে শেষ করে আসব দুলাল-সুহাসিনী দুটোকেই। বিধবা হয়েছে নিমি নাকি বলে থাকে। তাই আমি সত্যি সত্যি করে আসব।

॥ নয় ॥

গোঁসাইগঞ্জে কালীময় এই প্রথম। নদী থেকে সামান্য দূরে একতলা পাকা দালান। উঠানে পা দিয়েই দু-পাশে গোলা দেখো। ফলশা গাছ চতুর্দিকে ঘিরে আছে। নদী ঘরের দুয়োরে বললেই হয়, আবার বাড়ির পিছনে বিশাল এক পুকুর। বিষয়ী মানুষ ভবনাথ এইসব দেখে মজে যাবেন, সে আর কত বড় কথা। আরও তো দুলালের বাপ বুড়ো কর্তা মশাই তখন বর্তমান। দাবরাব প্রচণ্ড ছিল তার। গোটা দুই ভাঁটা পেয়ে গিয়ে বাঁধবন্দী প্রকাণ্ড চক। হাজাশুকো নেই ওদের জমিতে। ফাল্গুনের গোড়ার দিকে সাঙড়নৌকো ধান বোঝাই হয়ে গোঁসাইগঞ্জের ঘাটে লাগে, জনমজুর মাঝিমাল্লারা নৌকো থেকে ধান বয়ে বয়ে উঠানে ঢালতে লেগে যায়। ঢালছে তো ঢালছেই—ছোটখাট পাহাড় হয়ে ওঠে। তারপর চিটে উড়িয়ে ধামা ভরে সেই ধান গোলায় তুলে

বেলা। কাজকর্ম সারা হতে কয়েকটা দিন লেগে যায়।

এমনি এক মরশুমের মধ্যেই ভবনাথ পাকা দেখতে এসে পড়েছিলেন। আশীর্বাদের আংটি দুলালকে পরাবেন, সে এসে দাঁড়িয়ে আছে, ভবনাথ তখনও মুগ্ধচোখে উঠানে ধানের গাদার দিকে তাকিয়ে। দুলালের বাপ হেসে বললেন, এ আর কি দেখছেন বেহাই, খোলাট থেকে সবই বেচে দিয়ে এলাম। খোরাকি বাবদ সামান্য কিছু বাড়ি এনেছি—

বাড়ি ফিরে শতকণ্ঠে নতুন কুটুম্বর ঐশ্বর্যের কথা বলতে লাগলেন।

নৌকোর চলাচলে সময়ের মাথামুণ্ডু থাকে না,—কালীময়কে নামিয়ে দিয়ে গেল প্রায় দুপুর তখন। গামছা কাঁধে দুলাল চানে যাচ্ছিল—কুটুম্ব দেখে হৈ-হৈ করে উঠল: আসুন আসুন। রোয়াকের তক্তপোশে নিয়ে বসাল। মাকে ডাকছে: ও মা, সোনাখড়ি থেকে মেজবাবু এসেছেন, দেখ।

দুলালের মা এসে দাঁড়ালেন। কালীময় পায়ের ধুলো নিয়ে দেবনাথের চিঠি হাতে দিল। চিঠি হাতের মুঠোয় মুড়ে নিয়ে বললেন, কুটুম-পাখি ডেকে গেল—বলছিলাম, কুটুম্ব আসবে আজ দেখিস। তা, ভাল তো সব তোমরা?

কালীময় কলকল করে বলে যাচ্ছে জামাইষষ্ঠী সামনে—আপনি অনুমতি করলে দুলালকে নিয়ে যাই। কাকামশায় বাড়ি এসেছেন, তিনি পাঠালেন। সেই বিয়ের সময় সামান্য দেখেশুনো—বললেন, নিয়ে আয় জামাইয়ের সঙ্গে সকলে কয়েকটা দিন আমোদআহ্লাদ করি।

দুলালের মা উদাসকণ্ঠে বললেন, তবু ভাল। ভেবেছিলাম, ভুলেই গেছ তোমরা আমাদের।

দুলালের এক বিধবা বোন বুঁচি তিন ছেলে মেয়ে নিয়ে থাকে। গাড়ুতে জল ভরে সে জলচৌকির পাশে এনে রাখল—গাড়ুর মুখে গামছা। দুলালের মা বললেন, পরের কথা পরে। জামা-জুতো খুলে হাত পা ধুয়ে জিরিয়ে নাও।

মেয়েকে ডেকে বললেন, এত বেলায় এখন আর জলখাবারের তালে বাসনে তোরা। দুলালের সঙ্গে পুকুরঘাট থেকে একটা ডুব দিয়ে এসে খেতে বসে যাক।

দু-জনে স্নান করতে গেল। ছোট বোনের বর বলে কালীময় 'তুমি' 'তুমি' করে বলছে. গেল-বার ফাঁকি দিয়েছ—সুরেশ গিয়েছিল ঠিক। কাকামশায় তাই বললেন, চিঠিপত্তোর কিম্বা আজেবাজে মানুষ পাঠানো নয়। তুমি নিজে চলে যাও. আমার কথা বিশেষ করে বলোগে।

দুলাল বলে, কাকামশায় কৃতী পুরুষ—তাঁর সম্বন্ধে অনেক শুনে থাকি। আমারও খুব ইচ্ছে তাঁর কাছে যাবার —

মুহূর্তকাল চুপ থেকে কিছু গম্ভীর হয়ে বলে, অনেক-কিছু আমায় নিয়ে বলাবলি হয় শুনতে পাই। আমার বলায় আছে—কাকামশায়ের কাছে যাওয়ার দরকার।

যাবার জন্যে জামাই তো পা বাড়িয়েই আছে—এত সহজে কর্মসিদ্ধি কে ভেবেছে? পুলকে ডগমগ হয়ে কালীময় বলে, কালকের জোয়ারে রওনা হওয়া যাক তবে দেরি করে কি হবে। ভাড়ার নৌকো এখানে মিলবে, না ফুফুরের বাজার অবধি যেতে হবে এই জন্য?

দুলাল হেসে বলে,আসেন নি তো এবাড়ি কখনো—এই প্রথম এলেন। তা হেন ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছেন। যাকে বলে দেখুন না. টের পাবেন তখন।

উপস্থিত মতে খাওয়া—কুটুম্বর জন্যে নতুন করে রান্নাবান্নার ফুরসত হয়নি। তাই কত রে! ছোটবাটিতে করে ঘি—বাড়ির সর-বাটা ঘি, পাতে খাবার জন্য। কী তার সুবাস! মাছ দু-রকম, নিরামিষ তরকারি তিন-চার পদ, ভাজাভুজি আছে। প্রকাণ্ড বাটি ভরতি ঘন-আঁটা দুধে চটের মতন সর—তার সঙ্গে আম-কাঁঠাল, বড় সাইজের বদমা। নিত্যিদিনের সাদামাটা খাওয়া এই রাত্রিবেলা ধীরেসুস্থে কুটুম্বর জন্য বিশেষ আয়োজন হবে—ব্যাপারটা আন্দাজ করতে গিয়ে কালীময়ের রোমাঞ্চ জাগল। আসা অবধি ছোঁক-ছোঁক করছে সুবাসিনী মেয়েটাকে দর্শনের জন্য। এক-আধ ঝলক হয়েছেও দেখা। খেতে বসে আর ক্ষোভ রইল না। দরদালানে দুলাল আর কালীময় পাশাপাশি বসেছে, পরিবেশন করছে সুবাসিনী—রান্নাঘর থেকে উঠান পার হয়ে ভাত-ব্যঞ্জন এনে এনে দিচ্ছে। সম্পর্কে দুলালের মাসতুতো বোন—দুলালেরই সমবয়সি, কিম্বা বড়ও হতে পারে। বর নিরুদ্দেশ, কোনও চুলোয় কেউ নেই বোধহয়—মেয়েটা এ-বাড়ির আশ্রিত। কালীময় আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বারংবার। মাজা মাজা রং দোহারা গড়ন—আহা-মরি কিছু নয়। কিছু ঠসক দস্তুরমতো। হাতে সোনার চুড়ি, গঙ্গাযমুনা-পাড় ধবধবে শাড়ি পরেন, গায়ে কাঁচুলি, সিঁথিতে সিঁদুর আছে কিনা মালুম পাওয়া যাচ্ছে না। এদেশ সে-দেশ, ঢি-ঢি পড়েছে—এরা তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে বলে মনে হয় না। কালীময়ের সামনে তাহলে বের হতে যাবে কেন?

সে যাই হোক, খাওয়া অতি উপাদেয় হল। কালীময়ের বাড়ি ফেরবার তাড়া মিইয়ে গেছে অনেকখানি। নিজে থেকেই বলল, কালকেই ছাড়তে চাইছ না—তা বেশ, মাঝামাঝি একটা রফা হোক। আটদিন পরে জামাইষষ্ঠী—তার

মধ্যে চারটে দিন আমি এখানে থাকছি, আর তোমারও অন্তত চারটে দিন আগে গিয়ে পড়তে হবে। সুরেশরা এসে পড়বার আগে। কাকামশায় বিশেষ করে বলে দিয়েছেন।

বিড়-বিড় করে সঠিক তারিখের হিসাব করে নিয়ে দুলালও সায় দিল: সেই ভাল। ডুমুরের হাটবার ঐদিন। একগাদা খরচা করে নৌকো ভাড়া করার দরকার নেই—হাটুরে-নৌকোয় হাটে গিয়ে নামব, আবার আপনাদের ওদিককার একটা হাটফেরতা নৌকো ওখান থেকে ধরা যাবে। সামান্য খরচার ব্যাপার—নিয়েও যাবে বাতাসের মতন উড়িয়ে।

পরমোৎসাহে বলল, মাকে বলুনগে তাই। আমিও বলব। আপত্তি হবে না জানি। বুধবার হাটের দিন আমরা রওনা হয়ে পড়ব।

এককথায় রাজি। গেল-বছর ফটিক ফিরে গেলে বলাবলি হয়েছিল, আসবে না তো জানা কথা—কোন লজ্জায় মুখ দেখাবে? কালীময় গিয়ে মাকে এবার বলতে পারবে, এসেছে কিনা দেখ। ফটিককে দিয়ে চিঠি পাঠানোই ভুল। ডাকের চিঠিতে সুরেশ এসে থাকে, কিন্তু সকলের পক্ষে এক জিনিস চলে না—শ্বশুরবাড়ি বাবদে ঘোরতর মানী দুলালরা। আমি গিয়ে এই তো টুক করে নিয়ে চলে এলাম। জাঁক করে সে এই সমস্ত বলবে।

বিকালবেলা ভূরিপ্রমাণ জলযোগে বসে কালীময় কথাটা পাড়ল: কাকার চিঠিটা দেখলেন মাউইমা? জামাইষষ্ঠীতে দুলালের না গেলে হবে না।

বেশ তো, যাবে—

দুলালের মা একেবারে গঙ্গাজল। বললেন, ষষ্ঠীর পর বেশি দিন কিন্তু আটকে রেখো না বাবা। ফিরে এসেই আবাদে যাবে—আমাদের ভাওভিত্তি যেখানে। ভেড়িতে এইবারে মাটি দেবার সময়। গোমস্তার নির্ভর হলে কাজে ফাঁকি দেবে, মাটি চুরি করবে। নিজেদের দাঁড়িয়ে থেকে করাতে হয়।

কালীময় পরমানন্দে বলে, আপনার অনুমতি পেলে বুধবার রওনা হয়ে যাব।

তাই যাবে—

বলে ঠাকরুন চুপ করে রইলেন মুহূর্তকাল। তারপর গম্ভীর আদেশের সুরে বললেন, বউমাকে দুলালের সঙ্গে পাঠিয়ে দিও। অতি অবশ্য পাঠিও। সেবারে পেট নেমেছিল, মাথা-টাথা ধরে না যেন এবার। এখানেও ডাক্তার কবিরাজ আছে—রোগ সত্যি সত্যি হলে তার চিকিচ্ছেপত্তোর হয়। বলি, শ্বশুরবাড়ি পাঠাতেই নারাজ তো মেয়ের বিয়ে দেওয়া কেন—বীজ রাখলে হত, লাউ-কুমড়োর মাচায় একটা-দুটো যেমন রেখে দেয়।

কণ্ঠস্বর ধাপে ধাপে উঠে প্রচণ্ড হল: বউ বাপের-বাড়ি পড়ে থাকবে বলে

ছেলের বিয়ে দিইনি। অজুহাত করে এবারও যদি না পাঠানো হয়, দুলালের আবার বিয়ে দেবো আমি। হ্যাঁ, খোলাখুলি বলে দিচ্ছি—বেয়াই-বেয়ানদের বোলো।

নিঃশব্দে কালীময় খাওয়া শেষ করে উঠল। নিজের বোন মিনির উপরেই রাগটা বেশি করে হচ্ছে। এত মান টাঙানো কিসের জন্যে—সুবাসিনীকে দুলাল যদি বিয়েই করে বসত! করেও তো এমন কতজনা। তাদের সোনা-খড়িতেই একটি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত কেশব রাহুতমশায়। পাঁচ-পাঁচটা বিয়ে করলেন তিনি বংশলোপ এবং পিতৃপুরুষের পিণ্ডলোপ ঘটে যায়, তাই রোধ করার জন্য। চেষ্টা বিফল—কোন বউয়ের ছেলেপুলে হল না। বড় মেজো গত হয়েছে, শেষ তিন বউ সশরীরে শান্তিতে সংসারধর্ম করছে। রাহুতমশায় পুরুষসিংহ—সতীনদের মধ্যে সামান্য চড়া গলার আওয়াজ পেয়েছেন কি ছুটে গিয়ে সামনে যেটিকে পেলেন চুলের মুঠো ধরে এলো-পাথাড়ি খড়ম-পেটা করবেন। গ্রামবাসী যখন, মিনি সুনিশ্চিত এই দৃশ্য চাক্ষুষ করেছে। ধরে নিলে তো পারে দুলালের আরও একটা বিয়ে। হয়নি সত্যি সত্যি নিতান্ত নিকট-আত্মীয় বলেই। সাক্ষাৎ মাসতুত বোন সুবাসিনী। আরও একটা কারণ, জলজ্যান্ত বর বেটা গা-ঢাকা দিয়ে আছে কোথায়, বিয়ে হবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে দুলালের শরিকদের সহায়তায় মামলা ঠুকে দিয়ে ফ্যাসাদে ফেলবে। কাকামশায় এবারে বাড়ি আছেন—ধরে-পেড়ে মিনিকে পাঠাতেই হবে দুলালের সঙ্গে। মেয়ের দু-ফোঁটা চোখের পানি দেখে পিছিয়ে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না।

রওনা হল কালীময় আর দুলাল। হাটুরে-নৌকো দ্রুতগামী বটে কিন্তু গাঙখালের পথ কখনো ডাঙার মানুষের সম্পূর্ণ এক্তিয়ারে থাকে না, সময়ের আগ-পাছ হবেই। ডুমুরের হাট জমে গেছে পুরোপুরি। বিশাল হাট, এ-দিগরের মধ্যে সকলের বড়, দূর দূর অঞ্চলের মানুষ এসে জমে। সমুদ্র বলতে যা বুঝি, একেবারে তাই—মানুষের সমুদ্র।

ঘাটে লাগতেই দুলাল টুক করে সকলের আগে নেমে পড়ে। তড়বড় করে কালীময়কে বলে, আপনাদের কানাইডাঙা ঘাটের নৌকো ঐ বটতলার দিকে বাঁধে। ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে রাখুনগে মেজদা। হাটঘাট সারা করে তবে তো ছাড়বে, তার মধ্যে আমি একটু কাজ সেরে আসছি। বটতলার ঘাটেই চলে যাব।

বলে চক্ষের পলকে মানুষের ভিতর মিশে গেল। চেনা নৌকো পাওয়া

গেল—কানাইডাঙার হাটুরে তারা। কথাবার্তা সেরে নিশ্চিন্ত হয়ে কালীময় হাটের মধ্যে ঘোরাঘুরি করল খানিক। জামাই সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে—কুড়ি খানেক বড় কইমাছ কিনে নতুন ভাঁড়ে জীইয়ে নিল। তারপর পহরখানেক রাত হতে চলল। ভাঙা হাট, মানুষজন পাতলা হয়ে গেছে, দুলালের কোন পাত্তা নেই।

মাছের ভাঁড় নৌকোয় রেখে কালীময় ঘুরে দেখে এলো। দুলালের টিকি দেখা যায় না। বিষম মুশকিল। নৌকো তাড়া দিচ্ছে: আসবেন তো উঠে পড়ুন। গোন নষ্ট করতে পারব না, আমরা চলে যাচ্ছি।

যাও তোমরা, কতক্ষণ আর আটকাব।

ভাঁড় হাতে ঝুলিয়ে সারা হাট সে চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছে। যাদের নৌকোয় গোঁসাইগঞ্জ থেকে এসেছিল, তাদের একটির সঙ্গে দৈবাৎ দেখা: দুলালবাবু? তিনি তো কখন রওনা হয়ে গেছেন। জলমার নৌকো যাচ্ছিল, তাতেই উঠে পড়লেন। বলে যান নি আপনাকে?

নাও, হয়ে গেল বাড়িতে জামাই হাজির করে দিয়ে বাহাদুরি নেওয়া! কী সাংঘাতিক শয়তান—ভাজে ঝিঙে তো বলবে পটোল। মতলব গোড়া থেকেই—হাটবার বুঝে আটঘাট বেঁধে তবে রওনা দিয়েছে। সুন্দরবনের ধার ঘেঁসে দুলালদের আবাদ, গাঙ-খাল পাড়ি দিয়ে অনেক কসরত করে পৌঁছুতে হয়। জলমা আবাদ অঞ্চলের মধ্যে এক গঞ্জ মতো জায়গা—কালীময়ের জানা আছে। আবাদে সত্যি সত্যি গেছে, তাতেও ঘোরতর সন্দেহ। মাঝে কোথাও নেমে পড়েছে হয়তো।

হাঁটুরে-নৌকো ধরা গেল না। খানিকটা পায়ে হেঁটে আর খানিকটা জেলে-ডিঙিতে বিস্তর মেহনতে কালীময় বাড়ি ফিরল।

দেবনাথ সমস্ত শুনলেন। চুপ, চুপ! গোঁসাইগঞ্জে জামাই আনতে গিয়েছিলে—তিনজনে আমরা যা জানলাম, অন্য কারো কানে না যায়। ফরেস্টার অম্বুজ দাসের বাড়ির গল্প করো তুমি এখন, দেখা হয়েছে কি হয়নি যেমনটা ইচ্ছে বানিয়ে বলো।

কুসুমপুরের কুটুম্বরা কিন্তু বড় ভালো, সুরেশের বাপ পরেশনাথ রায়ের অতি-দরাজ মন। ভবনাথ গোড়ায় বেয়াইকে একখানা পোস্টকার্ডের চিঠি দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অমনি জবাব এসে গেল:

চাকরির জন্য বেশি আগে যাওয়া শ্রীমানের পক্ষে সম্ভব হইবে না। জামাইষষ্ঠীর আগের দিন দুপুর নাগাদ আপনার মেয়ে-জামাই রওনা

করিয়া দিব, সাব্যস্ত করিলাম। তাহারা সন্ধ্যার পূর্বেই পৌঁছিয়া যাইবে। ছেলে যা, জামাইও তাই—আমি এইরূপ বিবেচনা করি। উহাদের লইয়া যাইবার জন্য ঘটা করিয়া কাহাকেও পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। নাগরগোপে কেবলমাত্র একখানা গরুর-গাড়ির ব্যবস্থা রাখিবেন। শ্রীমান একলা হইলে ঐ পথটুকু সে হাঁটিয়া যাইত। বধূমাতা সঙ্গে থাকিবেন বলিয়াই গাড়ির আবশ্যক......

রাজীবপুর পোস্টাপিসের এলাকার মধ্যে এই গ্রাম, সপ্তাহের মধ্যে দুটো হাটবারে পিওন এসে চিঠি বিলি করে যান। চিঠির বয়ান ভবনাথ ডেকে ডেকে সকলকে শোনাচ্ছেন: ভদ্দরলোক ছোটলোক গায়ে লেখা থাকে না. ভদ্দোর কারে কয় দেখ—

দেবনাথ অগ্রজকে আলাদা ডেকে নিয়ে বললেন, চিঠি নিয়ে হৈ-চৈ করা ঠিক হচ্ছে না দাদা।

কেন করব না। পাশাপাশি আর এক কুটুম্বর ব্যাভারটা দেখ মিলিয়ে। ডাকের চিঠি নয়, ফটিকের হাতে চিঠি পাঠিয়েছিলাম—মা মাগি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ক্যাট-ক্যাট করে একগাদা কথা শুনিয়ে দিল। আনার নামও করিনে আর সেই থেকে। যত গোলমাল, বুঝলে, সমস্তর মূলে ঐ মাগি। ঝাঁটা মেরে বোনঝিটাকে বাড়ি থেকে দূর করে দিক, সঙ্গে সঙ্গে সব ঠিক হয়ে যাবে।

দেবনাথ বলেন, নিমির কথাটা ভাবো দাদা। সুরেশকে নিয়ে সকলে আমোদ-আহ্লাদ করবে, নিমিও করবে—কিন্তু মনের মধ্যে তখন কি রকমটা হবে তার। আমার তাই একবার মনে হয়েছিল, জামাই দু-জনকে যখন পাচ্ছিনে কোনো জামাই এনে কাজ নেই। জামাইয়ের তত্ত্ব লোক মারফত পাঠিয়ে দেবো।

ভবনাথ চমক খেয়ে বললেন, সে কি কথা। জামাইষষ্ঠিতে জামাই ডাকব না—বলি, সুরেশের কি দোষটা হল?

দেবনাথ বললেন, দোষগুণ এখন ভেবে ফল নেই। হাতের ঢিল ছুঁড়েই তো দিয়েছ, চিঠির জবাব পর্যন্ত এসে গেছে। কিন্তু নতুন-জামাই নিয়ে বাড়াবাড়ি কোরো না দাদা, নিমি ব্যথা পাবে।

গরুর-গাড়ি নয়। বাড়ির মানুষ দেবনাথের জন্যে পালকি গিয়েছিল—জামাই-মেয়ের জন্যেও অতএব নিশ্চিত পালকি।

পালকি একজোড়া। সর্দার-বেহারা কেষ্ট ঘরের লোকের মতন। বাহিন্দার শিশুবরও সঙ্গে যাচ্ছে। দুই পালকির বাবদে বারোটি বেহারার দরকার বৃষ্টি হয়ে ক্ষেতে বড় গোন, লাঙল ছেড়ে কেউ এখন সোয়ারি বইতে চায় না। কেষ্ট এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে ধরাধরি করে কোন গতিকে দশটি জোগাড় করেছে, তারাও

এক জায়গায় হয়ে পালকি ঘাড়ে তুলতে বেশ খানিকটা দেরি করে ফেলল। হরিহরের পুলের উপর এসেছে, সেই সময় পাকারাস্তায় মোটরের আওয়াজ। এখনো অন্তত আধক্রোশ পথ। নাঃ, কলকব্জার সঙ্গে পারা কঠিন—ওদের হল ঘড়ি-ধরা কাজ, কেও বেহারা ঘড়ি পাবে কোথায়?

শিশুবর প্রবোধ দিল: দেখি তা কি করা যাবে। নেমে পড়ে বসে থাকবে ওখানে। বটতলা, পুকুরঘাটে বাঁধানো-চাতাল—আরামে গড়াতেও পারে। আমরা গিয়ে পালকিতে তুলে নিয়ে আসব।

গিয়ে দেখা গেল, কাকস্য পরিবেদনা। জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্নে রোদ্দ খাঁ-খাঁ করছে তখনো—কোন দিকে জনমানব নেই। 'বুড়ি-দিদি' 'বুড়ি-দিদি' করে শিশুবর চঞ্চলাকে ডাকল। ঘোরাঘুরি করে দেখল চারিদিক। বলে, আসেনি—এলে ঠিক নেমে পড়ত, মোটরের লোককে বললে তারাই নামিয়ে দিত। বারোটার মোটর ধরতে পারেনি। খাওয়াদাওয়া সেরে দেড়ক্রোশ পথ ঠেঙিয়ে বারোটার মধ্যে গাড়ি ধরা চাট্টিখানি কথা! পরের গাড়িতে আসছে তারা।

পাকারাস্তার পাশে সারি সারি পালকি দুটো রেখে সকলে বটতলায় বসল। পরের বাসে যখন আসবে, পালকি দেখে জায়গা চিনে নেমে পড়বে। পুকুরঘাটে নেমে অঁজলা ভরে জল খেয়ে এলো ক'জন, মুখে মাথায় থাবড়ে দিল। কান পেতে আছে, মোটর ইঞ্জিনের আওয়াজ পাওয়া যায় কখন।

পাওয়া যাচ্ছে আওয়াজ। সব ক'জন উঠে পালকির ধারে পাকারাস্তার উপর দাঁড়াল। হাঁ, অ ওয়াজই যেন। কিন্তু বিস্তর ক্ষণ হয়ে গেল, কাছাকাছি আসে কই গাড়ি? অবশেষে মালুম হল, উত্তরের মাঠের শেষে তালবন—বাতাসে বাগড়ো নড়ে আওয়াজ উঠছে। যা চলে!

এর পর এলো সত্যি সত্যি মোটরের আওয়াজ—এলো উল্টো দিক থেকে। বাস একটা নাগরগোপ অতিক্রম করে সদরের দিকে ছুটে বেরুল। বেলা ডুবু-ডুবু। শ্যামকুড়ের হাট, রাস্তায় লোক চলাচল বেড়েছে—ধামা ঝুড়ি বাঁকে ও মাথায়, তেলের বোতল হাতে ঝোলানো, হাটুরে মানুষ যাচ্ছে। নিদারুণ রকমের কাঁঠাল বোঝাই দুটো গরুর-গাড়ি ক্যাঁচকোঁচ করতে করতে চলে গেল। বসেই আছে এরা।

বসে বসে বেহারারা বেজার হয়ে উঠেছে। বলে, সন্ধ্যের আগে সোয়ারি বাড়ি পৌঁছে যাবে, কথা ছিল। আমরা কিন্তু রাত করতে পারব না। গোনের মুখে একবেলা আজ কামাই গেল, রাত থাকতে লাঙল জুড়ে খানিক তার পুষিয়ে নিতে হবে।

মোটরবাস আসে এবার সত্যি সত্যি—শহরের দিক থেকেই আসে। কিন্তু

থামার গতিক নয়। শিশুবর চেঁচাচ্ছে : এই যে, সোনাখড়ি থেকে আমরা পালকি নিয়ে আছি। নেমে পড়ুন জামাইবাবু। বাসও বেগ কমান, কিন্তু কোন প্যাসেঞ্জারের নামবার গতিক নয়। বাস বেরিয়ে গেল।

তবে? ফাঁকা মাঠের মধ্যে কাঁহাতক বসে থাকা যায়! আকাশে মেঘ, মেঘ-ভাঙা জ্যোৎস্না উঠেছে। বৃষ্টি হতে পারে আকাশের যা চেহারা। বড়ও। বিকালে এসে পৌঁছানোর কথা—কোন কারণে যাত্রা ভণ্ডুল হয়ে গেছে। অথবা এসে গেছে সেই গোড়ার বাসেই—কাউকে না দেখতে পেয়ে মেয়েলোক নিয়ে পথের মধ্যে নামেনি, পথের শেষ গঞ্জ অবধি চলে গেছে। সেখান থেকে পালকি গরুর-গাড়ি যা-হোক কিছু নিয়ে এতক্ষণে তারা বাড়ি গিয়ে উঠেছে।

পঞ্চমীর জ্যোৎস্না ডুবে গেল। ক'টা শিয়াল ছোঁক-ছোঁক করে এদিক-সেদিক বেড়াচ্ছে। কেহ বেহারার দল আর রাখা যায় না : সারা রাত্তির হা-পিত্যেশ বসে থাকব নাকি? উঠলাম আমরা—

পালকি-বেহারা ফিরে গেল। শিশুবর হদ্দমুদ্দ না দেখে যাচ্ছে না। বেহারাদের পিছন পিছন অদূরের গাঁয়ের দিকে চলল সে। দাসপাড়ায় এককড়ির বাড়ি গেল : গাড়ি আছে তোমার এককড়ি, গরুও আছে। ছই-টই বাঁধতে হবে না রাত্তিরবেলা। আসে যদি তো টুক করে তাদের সোনাখড়ি নামিয়ে দিয়ে আসবে। এই বলা রইল কিন্তু। রাত্তিরবেলা পড়ে-পাওয়া এই টাকাটা ছাড়তে যাবে কেন? আর যদি না আসে, খাওয়াদাওয়া-রাত অবধি দেখে তোমার ঐ দাওয়ায় এসে শুয়ে পড়ব।

আবার এসে শিশুবর রাস্তার ধারে ঘাটের চাতালে বসেছে। একেবারে একলা। এবারের আওয়াজে সত্যিই ভুল নেই—উত্তর দিক থেকেই। পাকারাস্তায় এসে শিশুবর একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। চৌনাটোলার বাঁক ঘুরে হেডলাইটের আলো দেখা দিল। আলো বড় হচ্ছে ক্রমশ। বাস এসে দাঁড়াল। ইঞ্জিনের চাপা গর্জন, থরথর কাঁপছে সামনেটা।

নামল সুরেশ। চঞ্চলা নামল দেখেশুনে সতর্কভাবে। ছাতের উপর থেকে টিনের পোর্টম্যান্টোটা নামিয়ে দিয়ে বাস চলে গেল। এই একটুক্ষণ কিছু আলো হয়েছিল, আবার অন্ধকার। তিন ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে।

শিশুবর বলল, রাত করে ফেলেছ জামাইবাবু। দু-দুখানা পালকি—দেখে দেখে তারা ফিরে গেল। জেদ ধরে আমিই কেবল বসে রইলাম।

দিব্যি আসছিল বাস বেলাবেলি নির্ঘাৎ পৌঁছে যেত—সতীঘাটের কাছাকাছি এসে ইঞ্জিন বিগড়াল। ড্রাইভার নিজে হদ্দমুদ্দ দেখে তারপর একটা সাইকেল জোগাড় করে সদরে ছুটল। একগাদা প্যাসেঞ্জার নিয়ে গাড়ি সেই-

খাবে পড়ে রখল। সদর থেকে মিস্ত্রি জুটিয়ে নিয়ে এবং কিছু সরঞ্জাম কিনে ড্রাইভার ফেরত এলো. সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে তখন। আলো ধরে ঘণ্টা দুই-তিন ঠুকঠাক করার পর তবে গাড়ি চালু হয়েছে।

বিষম ক্লান্ত তারা। গামছার বাড়ি দিয়ে চাতালটা ঝেড়েঝুড়ে শিশুবর বলল, বসো এখানে। দাসপাড়া থেকে একছুটে গাড়ি ডেকে আনি। বলা রয়েছে. দেরি হবে না।

সুরেশ বসে পড়ল, একগলা ঘোমটা টেনে চঞ্চলা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তা ঠিক. বসবে কেমন করে বরের কাছাকাছি?

চুড়ি নেড়ে শিশুবরকে কাছে ডেকে ফিসফিসিয়ে চঞ্চলা বলল, যেও না শিশুদা। দাঁড়িয়ে পড়ল শিশুবর। ভয় পেয়ে গেছে মেয়েটা। কৌতুক লাগে। বুড়ির প্রতাপে বাড়ি চৌচির—সেই বুড়ির ও-বছর মাত্র বিয়ে হয়ে এখন সে আলাদা একজন। জবুথবু হয়ে আলগোছে দাঁড়িয়েছ কেমন, দেখ। এমন আস্তে করে বলছে, কথা শোনা যায় কি না-যায়—

প্রবোধ দিয়ে শিশুবর বলে, ভয় কিসের? মাঠখানা ছেড়েই দাসপাড়া। গিয়ে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে গরু জুড়ে বেরিয়ে আসবে। বোসো না তুমি—না-হয় ও-পাশের ঐ চাতালে গিয়ে বোসোগে।

চঞ্চলা বলে, আমরাও যাই না কেন শিশু-দা। পথ তো ঐ—আবার উল্টো কেন গাড়ি এই অবধি আসতে যাবে?

অতএব, পোর্টম্যান্টো মাথায় শিশুবর আগে আগে চলল, পিছনে অন্য দু-জন। খুক করে একটুকু হাসি—ধরনটা চঞ্চলার মতন। মাথায় বোঝা নিয়ে শিশুবর ঘাড় ঘোরাতে পারছে না। তা হলেও চঞ্চলা কদাপি নয়—ঘোমটা-ঢাকা বউমানুষ খামোকা অমন বেহায়ার হাসি হাসতে যাবে কেন?

আরও রাত হল। গরুর-গাড়ি চলেছে। কিন্তু ওরা কেউ উঠল না, পোর্টম্যান্টো তুলে দিয়েছে শুধু। বাসের মধ্যে অতক্ষণ বসে পায়ে ঝিঁঝি ধরেছে, খানিকটা হেঁটে পা চাড়িয়ে নিচ্ছে তাই। গাড়ির আগায় এককড়ি ডা-ডা-ডা-ডা করে খুব একচোট গরু তাড়িয়ে নিল। হেরিকেন এনেছে শিশুবর, হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে গাড়োয়ানের পাশাপাশি যাচ্ছে। নিচু গলার গল্প করছে দু-জনে। হঠাৎ খেয়াল হল, বড্ড ওরা পিছিয়ে পড়েছে। হেঁটে আর পারছে না বেচারিরা--অভ্যাস নেই তো তেমন।

শিশুবর ডাক দিল: কি হল, অত পেছনে কেন বুড়ি দিদি? হাঁটা অনেক হয়েছে, গাড়িতে উঠে পড়ো এবার।

আমলেই আনল না তারা, কে যেন অন্য কাকে বলছে। অন্ধকারের মধ্যে

বেশ খানিকটা দূরে দুই ছায়ামূর্তি। উঁচু-নিচু কাঁচারাস্তা—খানাখন্দ এদিক-সেদিক। হাতে আলো, তা সত্ত্বেও শিশুবর একটা বিষম হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁক দেয়: এগিয়ে এসো, আলোয় এসো। পড়েটড়ে যাও যদি, বুঝবে মজা তখন।

জোর বাড়িয়ে আলো তুলে ধরল তাদের দিকে। হরি, হরি! অন্ধকার বলে কাপড়টুকুও আর মাথায় নেই। ভয়ে তখন যে কথা সরছিল না মেয়ের, লজ্জায় একেবারে কলাবউটি হয়ে ছিল! দেখাদেখি গরুর-গাড়িও থেমে পড়েছে। উল্টে ধমক দেয় চঞ্চলা: আবার দাঁড়িয়ে পড়লে কেন, রাত হচ্ছে না?

শিশুবর বলে সারাপথ হাঁটবে তো গাড়ি নিতে গেলাম কেন? উঠে পড়ো। হেঁটে যাচ্ছ বলে ভাড়া কিছু কম নেবে না।

সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চলা একেবারে ধোয়া-তুলসিপাতা: বলো তোমাদের জামাইকে। একরোখা কী রকম দেখছ না। গর্তে পা মচকে গেলে 'জামাই খোঁড়া' লোকে বলবে।

হেঁটে আর পারছেও না বোধহয়। গাড়িতে উঠল, চঞ্চলার মাথায় ঘোমটা উঠল অমনি। আলগোছে একটু তফাত হয়ে বসেছে। ঠোঁটে কুলুপ এঁটেছে—দু-জনেই। নিতান্ত প্রয়োজনে চঞ্চলা হাত নেড়ে শিশুবরকে ডেকে যা বলবার তাকেই চুপি চুপি বলছে। হরিতলা ছাড়াল। গ্রাম নিশুতি। বাইরে-বাড়ির হুড়কো খুলে গাড়ি একেবারে রোয়াকের পাশে এনে নামাল। খাওয়া-দাওয়া সেরে এ-বাড়িতেও সব শুয়ে পড়েছে। ভবনাথের বড় সজাগ ঘুম, গাড়ির আওয়াজ পেয়ে ঘুমের মধ্যে হাঁক পাড়লেন: কে ওখানে—কে? এসে গেছ? ওঠো তোমরা সব, আলো জ্বালো। সুরেশরা এসেছে।

দরজা খুলে তাড়াতাড়ি রোয়াকে বেরিয়ে এলেন: এত রাত্তির কেন বাবা?

সুরেশ তাড়াতাড়ি প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিল। পদতলে রূপোর টাকা চকচক করছে। টাকা দিয়ে প্রণাম করছে গুরুজনদের।

॥ দশ ॥

বিকাল থেকে পথ তাকিয়েছে, নিরাশ হয়ে সব শুয়ে পড়েছিল। ঘুম-টুম গেল সকলের চোখ থেকে। ঐটুকু কমল, সে পর্যন্ত শয্যা ছেড়ে বাইরে এসেছে। লহমার মধ্যে বাড়ি জমজমাট।

দুধ মেরে ক্ষীর বানিয়ে জামাইয়ের জন্য রকমারি খাবার হচ্ছে আজ ক' দিন। এ বাবদে মুক্তঠাকরুনের জুড়ি নেই—উপলক্ষ্য পেলেই লেগে যান। এক-একটা আছে—রীতিমত শিল্পকর্ম, এ কালের অনেক মেয়ে চোখে দেখে নি, নামও জানে না। সাগরেদি কর্মে অলকা-বউয়ের বড় উৎসাহ। বলে, ক্ষীরপদ্ম হোক পিসিমা, পাপড়ি বসানোর কায়দাটা শিখে নেবো ভাল করে, কিছুতে আমার হতে চায় না।

মুক্তঠাকরুন খুশি খুব। বলেন, খাটনির কাজ বউমা, ঠাণ্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে করতে হয়। চেষ্টা করলে কেন হবে না? রেকাবির উপর শতদল-পদ্ম ফুটে আছে—ঠিক তেমনি মনে হবে। শিখে নাও সমস্ত তোমরা, আমি তো চিরকাল বেঁচে থেকে এ সমস্ত করে খাওয়াবো না। আজকের লোকে সোজা-পথ দেখেছে—ময়রার দোকানে পয়সা ফেলে সন্দেশ-রসগোল্লা খাজা-গজা কিনে আনে। সে তো নিজেরাও খেয়ে থাকে। জামাইকে এমনি জিনিস খাওয়াবো, যা অন্য কেউ খাওয়াতে পারবে না।

তিন-চার দিন ধরে খাবার তৈরি হয়েছে—হাঁড়ির উপর হাঁড়ি রেখে শিকায় ঝুলানো। অলকা-বউ পাড়তে যাচ্ছিল, মুক্তকেশী হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। এসব জিনিস শুধু, কেবল খাওয়ার নয়—পাতের কোলে থরে থরে সাজিয়ে দেবে, ভোক্তা এবং আরও দশজনে অবাক হয়ে দেখবে। নিশিরাত্রে কে এখন দেখতে আসছে?

বললেন, ক্ষেপেছ বউমা। তাড়াতাড়ি দু'খানা লুচি ভেজে খাইয়ে দাও ওদের—পথের ধকলে আধখানা হয়ে এসেছে, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুক। আদর-আপ্যায়ন যাচ্ছে কোথা, কাল থেকে কোরো।

এক গেলাস জল চাইল জামাই। খেজুর-চিনি এক খাবলা জলে ফেলে কাগজিলেবুর রস দিয়ে নিমি ছুটোছুটি করে এনে দিল। বিয়ের পরে সুরেশ আরও দুবার এসেছে—নানান রকম অভিজ্ঞতা আছে। গেলাস সে মুখে তোলে না, নেড়েচেড়ে দেখছে।

কী হল, খাচ্ছেন না যে?

সুরেশ বলে, সরবত নয়—এমনি জল একটু এনে দিন।

উমাসুন্দরীর কোন দিক দিয়ে আবির্ভাব। নিমির হাত থেকে গেলাস কেড়ে নিয়ে রোয়াকের নিচে ঢেলে দিলেন। বললেন, আমি এনে দিচ্ছি বাবা।

নিমি বলে, কষ্ট করে করলাম—ফেলে দিলে কেন মা?

মুখ ফিরিয়ে উমাসুন্দরী হাসতে হাসতে বললেন, তোদের বিশ্বাস করছে না, চিনিপানা আমি নিজের হাতে করে দিচ্ছি।

দক্ষিণের ঘর, পাকা দেওয়ালের মস্তবড় ঘর—তারই দাওয়ায় ঠাঁই করল। কাঁঠাল-কাঠের ফরমায়েসি বড় পিঁড়ি পড়েছে, তার উপরে নিমির নিজ হাতে রকমারি নকসা-তোলা উলের আসন। চাপবাক্স থেকে প্রকাণ্ড বগিথালা বের করে তেঁতুলে-আমরুলে ঘসে ঘসে চকচকে করে রেখেছে এবং ডজন খানেক বাটি—ছোট ঘিয়ের-বাটি থেকে বিশাল দুধের-বাটি। মাছ-তরকারি সবই রান্না করা আছে, ক'খানা লুচি শুধু ভেজে দেওয়া। তরঙ্গিণী ও অলকা শাশুড়ি-বউ ওঁরা লেগে গেছেন সেই কর্মে। লুচি বেলা শেষ করে দিয়ে অলকা-বউ বাইরে চলে এলো দেওয়া-থোওয়ার ব্যবস্থা দেখতে। বিনো আর নিমির মধ্যে কি নিয়ে চোখ-টেপাটেপি—বিনো পুঁটিকে সামাল করে দিচ্ছে: যে ক'দিন জামাই আছে, আমাদের কোন কথা বুড়িকেও বলবিনে তুই। এখন সে ভিন্ন দলের—ওদেরই লোক।

অলকা-বউ বলে, বুড়ি ঠাকুরঝিকে দেখছিনে তো মোটে—

নিমি বলল, আহ্লাদি মেয়ে আসা ইস্তক কাকামশায়ের কাছে বসে ভিটির-ভিটির করছে। হাত-পা ধোওয়ার ফুরসতটুকুও নেই।

সুরেশ বাইরের ঘরে ভবনাথের সঙ্গে। থালা-বাটি সাজিয়ে অলকা-বউ পুঁটিকে ডাকতে পাঠাল। বিনো দনী বলে দিল. একটুও হাসবি নে কিন্তু পুঁটি। খবরদার।

সুরেশের হাতে হাত জড়িয়ে পুঁটি বাড়ির মধ্যে নিয়ে এলো। বয়সে এক-ফোঁটা, কিন্তু পরিপক্ক মেয়ে। যেমন বলে দিয়েছে, ঠিক ঠিক তাই—মুখে হাসির লেশমাত্র নেই নিপাট ভালোমানুষটি।

পুঁটি বলল, বসুন দাদাবাবু—

পিঁড়িতে পা দিয়েছে সুরেশ, পিড়ি অমনি গড়গড় করে চলল। আছাড় খেতে খেতে কোন গতিকে সামলে নিল। 'কোথা যাও' 'পালিয়ে যাচ্ছ কোথা' বলছে ওরা, আর হি-হি হা-হা হাসিতে ফেটে পড়ছে সব। বেকুব জামাই পা দিয়ে পিড়ি-ঢাকা আসনটা সরিয়ে দিয়ে দেখে পিড়ির নিচে সুপারি দিয়ে রেখেছে। একেবারে বসবার পিড়ি থেকেই কারসাজি—আরও কত দিকে কী সব কাণ্ড করে রেখেছে, ঠিক কি! অলকা-বউ সদ্য-ভাজা ক'খানা লুচি থালায় এনে দিল, তারই আধখানা ছিঁড়ে সুরেশ আনমনে দাঁতে কাটছে। খিদের পেট চোঁ-চোঁ করছে, কিন্তু এগুতে ভরসায় কুলোচ্ছে না তার।

গিরস্ত জাগো—চৌকিদার রোঁদে বেরিয়ে হাঁক দিয়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে। মুক্তকেশী স্বগত-ভাবেই জবাব দিলেন: ঘুমিয়েছি কে, যে জাগতে বলিস? দেবনাথ ও চঞ্চলার কাছে তিনিও গিয়ে বসেছিলেন। খাওয়ার জন্য চঞ্চল

এবার রান্নাঘরে ঢুকল। মুক্তঠাকরুন সুরেশের কাছে এসে অবাক হয়ে বললেন, খাচ্ছ না যে বাবা, সামনে বসে শুধু নাড়াচাড়া করছ ?

শালাজ ও শ্যালিকার দঙ্গল দেখে ব্যাপার বুঝতে বাকি রইল না। বললেন, দুপুর রাত হয়ে গেছে, এখন আর দিক করিস নে। যা-হোক কিছু মুখে দিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে দে তোরা। ঠাট্টা-বটকেরার সময় আছে।

আসনটা টেনে নিয়ে সামনের উপর জাপটে বসলেন: খাও বাবা, নির্ভাবনায় খেয়ে যাও, শেষ না হলে আমি উঠছি নে।

সেই মুহূর্তে এক কাণ্ড। মুড়িঘণ্ট, মাছের তরকারি—দু'হাতে দুটো বাটি অলকা-বউ চিলের মতন ছোঁ মেরে পাতের কোল থেকে তুলে নিল। ঠাকরুন বলছেন, দেখি দেখি, কী করেছিলি তোরা—দেখিয়ে যা। অমন দাবরার মুক্তকেশীর-তা মোটে কানেই নিল না তাঁর কথা, একছুটে রান্নাঘরে ঢুকে গেল ক্ষণপরে আর দুটো বাটি এনে হাসতে হাসতে থালার পাশে রাখল।

মাঝের-কোঠায় শোওয়া। কুলুঙ্গিতে কাঠের দেলকোর উপর রেড়ির-তেলের প্রদীপ। সুরেশ বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছে, চঞ্চলার দেখা নেই। বাপ সোহাগি মেয়ে খাওয়ার পরে আবার হয়তো বাপের কাছে গিয়ে বসেছে। ক্লান্তিতে সত্যি একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল, খুট করে কপাট নড়তে সজাগ হল প্রদীপ আছে, তা সত্ত্বেও হেরিকেন ধরে অলকা-বউ সঙ্গে করে আনল—একজনে হয় নি, বিনোও সঙ্গে। সামান্য কিছুকাল শ্বশুরঘর করে চঞ্চলা যেন ঘরে আসার পথ ভুলে মেরে দিয়েছে—একজনে হল না, দু-পাশে দু-জন লাগছে পথ দেখানোর জন্য। টিপে টিপে পা ফেলছে—ব্যথা লাগে যেন মাটির গায়ে পা পড়লে।

তক্তাপোশের দিকে অলকা হেরিকেন তুলে ধরল: কই গো, শব্দসাড়া নেই কেন ভাই, ঘুমিয়ে গেলে নাকি ?

ঘুমটুকু উড়ে গেছে, তবু সুরেশ চোখ খোলে না। অবহেলা দেখাতে হয়—গ্রাহ্য করিনে আপনাদের মেয়ে এলো কি এলো-না। দেখুন, কেমন ঘুমিয়ে আছে। ভাবখানা এই প্রকার।

বিনো বলে, তাড়াতাড়ি চাট্টি নাকে-মুখে গুঁজে বেরিয়েছে। পথে এই রাত্তির অবধি। কষ্টটা কম হয় নি তো।

বিনোর কথার মধ্যে দরদ, কিন্তু অলকা-বউ একেবারে উড়িয়ে দেয়: ঘুম-টুম নয়—ঠাকুরজামাই মান করেছেন দেরি হয়েছে বলে। আমাদের কি! ঘুম হোক রাগ হোক, বুড়ি ঠাকুরঝি বুঝবে। আমরা তো আর দেরি করিয়ে দিই নি।

কুলুঙ্গির প্রদীপ নিভিয়ে হেরিকেনটা এক পাশে রেখে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে দু'জনে চলে গেল।

হেরিকেন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চঞ্চলা অন্ধিসন্ধি দেখছে। তক্তাপোশের তলা দেখল, আলমারির পিছনটা। আলনার কাপড়চোপড় নেড়ে দেখল কাছে গিয়ে। বিয়ের পরেই জোড়ে এসে পয়লা রাত্রে ঘোর বিপাকে পড়েছিল তারা। পুঁটির দলের বেউলো কাপড়ের আণ্ডিলের মধ্যে ঐখানটা চুপটি করে বসে ছিল, আরও একগণ্ডা ছিল তক্তাপোশের নিচে। চঞ্চল অত শত বুঝত না তখন, আলো নিভিয়ে সরল মনে শুয়ে পড়েছে। তামাসা করে কি-একটা বলে ডেকেছে বরকে—মুখের কথা মুখে থাকতে আঁধার ঘরের চতুর্দিকে খল-খল করে হাসির ধ্বনি। ভুতুড়ে ব্যাপারের মতন গা কেঁপে উঠেছিল গোড়ায়। হাসতে হাসতে দড়াম করে দোর খুলে হুড়দাড় মেয়েগুলো বেরিয়ে গেল। কেলেঙ্কারির বেহাদ্দ—জেঠামশায় ভবনাথ অবধি জেনে গেলেন। রাত্রেই শেষ হয়ে গেল না, জের চলল পরের দিন—তার পরের দিন। সেই যা ফিসফিস করে বরকে বলেছিল, চঞ্চলাকে দেখলেই বিচ্ছু মেয়েগুলো তাই বলে নিজেদের মধ্যে ডাকাডাকি করে। কত রকম ঘুস দিয়েছে—তরল আলতা, পুঁথির মালা পুতুলের জন্য, চুলের ফিতে, তাম্বুল-বিহার। ঘুস দিয়ে তবে মুখ বন্ধ করতে হল। এবারে তাই এত সামাল। ঘরের মধ্যে কেউ নেই, নিঃসংশয় হয়েছে। রাত বেশি হয়ে গেছে বলেই ক্ষমা দিল বোধহয় আজ।

জলের বালতি ও ঘটি রোয়াকের ধারে। চঞ্চলা রগড়ে রগড়ে পা ধুয়ে দরজা দিল। সুরেশ এইবারে চোখ খুলেছে, চোখ পিটপিট করে দেখছে। জানলা বন্ধ করল চঞ্চলা। হেরিকেনের জোর কমিয়ে তক্তাপোশের নিচে সরিয়ে দিল। পায়ের গুজরি ঝুন-ঝুন করে বাজে—খুলে সেটা কুলুঙ্গিতে রাখল, গলার হার ও বাহুর অনন্ত বালিশের নিচে। হাতের চুড়ি-বালা ঠেলে ঠেলে কনুই অবধি তুলে দিল। তক্তাপোশে উঠল সে এইবার, বরের পাশে শুয়ে পড়ল। বিড়ালের চলাচলের মতন—এতটুকু আওয়াজ নেই।

সুরেশ ফিসফিসিয়ে বলল, দরজায় খিল দিলে না যে?

মুখে না বলে চঞ্চল হাত চাপা দিল সুরেশের মুখে। অর্থাৎ ফিসফিসানিও নয় এখন।

জৈষ্ঠমাসের গরম, তায় চারিদিক আটেঘাটে বন্ধ করে ফেলেছে। চঞ্চলা পাখা করছিল, খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ পাখা বন্ধ। নড়ে উঠেছিল সুরেশ, কানের উপর মুখ এনে বলল, চুপ! তারপর উঠে পড়ল নিঃসাড়ে, পা টিপে টিপে গিয়ে দরজা খুলল। রহস্যময় চালচলন, সুরেশও যাবে কিনা বুঝতে পারছে না। বাড়ি ওদের—সঙ্গে যাবার হলে চঞ্চলা উঠবার মুখে হাতখানা টেনে ইসারায় বলত।

এই সমস্ত ভাবছে সুরেশ, হেনকালে হড়াস করে জল পড়ার শব্দ বাইরে। চঞ্চলার গলা শোনা গেল : আরে সর্বনাশ, পিসিমা নাকি? জানলার গোড়ায় পিসিমা দাঁড়িয়ে—কেমন করে বুঝব? গরমে ঘুম হচ্ছে না বলে মাথায় জল থাবড়াতে এসেছিলাম। মানুষ দেখে ভাবলাম, চোর এসেছে। এঃ পিসিমা, রাতদুপুরে নাইয়ে দিলাম—কেমন করে জানব বলো।

ঘরের ভিতর ফিরে এসে খটাখট জানলা খুলে দেয়। রণ জয় করে এসেছে ভাবখানা এই রকম। সুরেশকে বলছে—ফিসফিসানির গরজ নেই আর এখন—। কিন্তু বলবে কি, হেসেই তো খুন। বলে, পিসিমাই নাস্তানাবুদ—কেউ আর এদিকে আসবে না, নিশ্চিন্ত। কান খাড়া ছিল—বুঝতে পারলাম, জানলার ওদিকে মানুষ। দুয়োরে কেন খিল দিই নি, বোঝ এইবারে—খিল খুলতে আওয়াজ হত। ঘটিতে জল পর্যন্ত ভরে রেখেছিলাম। মানুষ আসবেই জানি, তা সেই মানুষ যে হি-হি-হি—পিসিমা দাঁড়িয়ে পাতান দিচ্ছেন, লোকে চোখে দেখেও তো বিশ্বাস করবে না। ছুঁড়িগুলোকে তাড়াতে এসেছিলেন নাকি। তাই নিশ্চয়। ছুঁড়িদের তাড়িয়ে দিয়ে বুড়োমানুষ নিজে শেষটা লোভে পড়ে গেলেন।

মুখে কাপড় দিয়ে চঞ্চলা খুব খানিকটা হেসে নিল। বলে, বিয়ের দিন পুঁটিকে দিয়ে একটা মাছভাজা আনিয়ে খাচ্ছিলাম। মুখ নড়ছে দেখে পিসিমা ধরে ফেললেন। হাঁ করিয়ে সবটুকু মাছ বের :করে ফেলে তবে ছাড়লেন। কাজের বাড়ি মানুষ গিজ গিজ করছে—সকলের মধ্যে কী বকুনি-টাই দিলেন উপোসের নিয়ম ভেঙেছি বলে। সম্পর্কে পিসি হয়ে তিনিই বা কোন নিয়মে পাতান দিচ্ছিলেন শুনি। এদ্দিনে আজ উচিত মতো শোধ দিয়ে নিলাম।

ভোর থাকতেই চঞ্চলা সুরেশকে তুলে দিয়েছে। জামাই হওয়ার কী ঝঞ্ঝাট রে বাবা! চোখে যত ঘুমই থাকুক, সাত সকালে সকলের আগে উঠে প্রমাণ করতে হবে, সারা রাত বেহুশ হয়ে ঘুমিয়েছি বলেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছি। চঞ্চলারও ঠিক এই জিনিস—উঠতে দেরি হলে ঠাট্টা বটকেরায় অতিষ্ঠ করে মারবে।

ভবনাথ বাইরের রোয়াকে বসেছেন, মুক্তকেশীও আছেন। জামাই প্রণাম করতে বেরুবে, হিরু সঙ্গে নিয়ে যাবে—সেই সব কথা হচ্ছে। আগেও সুরেশ বার দুয়েক এসে গেছে বটে, কিন্তু থাকতে পারে নি—একদিন দু-দিনে ফেরত চলে গেছে। তাতে প্রণাম হয় না। যাদের প্রণাম করবে, তাদের তরফেও করণীয় রয়েছে—তার জন্য সময় দিতে হবে বই কি। এবারে এতদিনে আট-দশ দিন হাতে নিয়ে এসেছে—বাড়ি বাড়ি জামাইয়ের সেই মুলতুবি প্রণাম।

চঞ্চলা তামাক সেজে কলকের ফু দিতে দিতে ভবনাথের কাছে এলো।

তামাক সাজার এই কাজটা মিমি আর বুড়ি দুই বোনে বরাবর করে এসেছে। বুড়ি ছিল না এদ্দিন, বাপের-বাড়ি পা দিয়েই আবার লেগে গেছে। শত কণ্ঠে ভবনাথ জামাইয়ের গুণ-বাখান করেছেন: ভারি চটপটে ছেলে, যেমন আমি পছন্দ করি। অত রাত্রে এসেছে, তবু উঠে পড়েছে আমার আগে। পুকুরঘাটে দাঁতন সেরে বাড়ি ফিরছে, দেখতে পেলাম। আর আমাদের বাবুরা আছেন—কখন থেকে ডাকাডাকি করছি, তা আড়মোড়াই ভাঙছেন এই প্রহর বেলা অবধি।

বাপের ডাক পেয়ে হিরন্ময় আসছিল—নিন্দেমন্দ শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল। আপন মনে গজর গজর করছে: শ্বশুরবাড়ি দু-দিনের তরে এসে সবাই ও-বাহাদুরি দেখায়। রাত থাকতে উঠে পড়ে এখন ভোগান্তি—বিছানায় ঘুমোয় নি তো বসে ঘুমিয়ে তার শোধ নিচ্ছে।

কথা মিছা নয়, একটা চেয়ারে বসে সুরেশ ঢুলছে। অবস্থা দেখে করুণা হয়। তা-ও কি রেহাই আছে! বাইরের ঘর থেকে ভবনাথের ডাক, হিরু ডাকতে এসেছে। বলে, ছোটকর্তা বরদাকান্ত এসেছেন। যাও, ভ্যানর-ভ্যানর করো গে এখন সারা বেলাভর। ছিনেজোঁক কাঁঠালের-আঠা আর ছোটকর্তা-মশাই ধরলে আর ছাড়াছাড়ি নেই, বলে থাকে সকলে।

বরদাকান্ত গ্রামের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ। মানুষ পেলে ছাড়তে চান না। এ-গল্পে সে-গল্পে বেলা কাবার করে করে দেন। সেই ভয়ে কেউ বড় কাছ ঘেঁসে না। সকাল বিকাল লাঠি ঠুক ঠুক করে বরদাকান্ত নিজেই এখন এ-পাড়া ও-পাড়া খবরাখবর নিয়ে বেড়ান।

জামাই দেখতে এলাম ভবনাথ। উঠেছে?

কখন! সগর্বে ভবনাথ বলেন, বাড়ির মধ্যে আমার ঘুম সকলের আগে ভাঙে। বাবাজি আমায় পর্যন্ত হারিয়ে দিয়েছে।

নামের ফর্দ হচ্ছে—ভবনাথ বলে যাচ্ছেন, পাশে বসে হিরন্ময় কাগজে টুকছে। নাম বলছেন আর সঙ্গে এক টাকা দু টাকা এমনি একটা অঙ্ক। নতুন জামাই নিয়ে প্রণামে বেরুবে হিরু—কাকে কাকে প্রণাম করবে এবং পদতলে কি পড়বে ভুলভ্রান্তি না হয়, লিষ্টি করে দিচ্ছেন ভবনাথ। সুরেশ এলে বললেন, সেই পশ্চিমবাড়ি থেকে নাতজামাই দেখতে এসেছেন ছোটকর্তা-খুড়ো। আমার খুড়ো, তোমার হলেন দাদাশ্বশুর—

চোখাচোখ তাকিয়ে মৃদু ঘাড় নাড়লেন। অর্থাৎ প্রণাম অবশ্যই—তবে টাকাকড়ি নয়, শুধো-প্রণাম আপাতত।

বলছেন, বিকেল বেলা বাড়ি গিয়ে ভাল করে প্রণাম করে আসবে। এবেলা

ষষ্ঠির বাটা নেওয়ার ব্যাপার আছে, এবেলা বেশি তো পেরে উঠবে না—

বরদাকান্ত থাকতে থাকতে দ্বারিক পাল এলেন, বল্টু আর ভুলো এলো। জামাই প্রণামের পর প্রণাম করে যাচ্ছে। হিরন্ময় মজা দেখছে। কানে কানে একবার বলল, এখনো হয়েছে কি। পাড়ায় নিয়ে বেরুব, সারা গ্রাম মাথা ঠুকে ঠুকে বেড়াবে—পহর রাত অবধি চলবে।

ভিতর-বাড়ি থেকে পুঁটি এসে পড়ল : চলো দাদাবাবু, জেঠিমা ডাকছে।

হিরু জিজ্ঞাসা করে : ওদিকেও এসেছেন বুঝি?

পুঁটি বলল এক-আধ জন? রাঙাঠাকুমা দৈবপিসি, পালবাড়ির বুড়িমা, গৌরদাসের মা—দাওয়া ভরে গেছে।

হাত ঘুরিয়ে নৈরাশ্যের ভঙ্গিতে হিরু সুরেশকে বলে, জামাই হয়েছ, ভেবে আর কি করবে। যাও—

রাঙাঠাকুরমার রং কিন্তু কটকটে কালো। ফোকলা দাঁত, মাজা পড়ে গেছে, কালো বলেই প্রথম বয়সে উল্টো বিশেষণ দিয়েছিল কেউ—রাঙাবউ। বয়স বেড়েছে—রাঙাবউদি রাঙাখুড়িমা রাঙাজেঠিমা ইত্যাদি সহ রাঙাঠাকুরমা অবধি পৌঁছেছে। সুরেশকে দেখে বৃদ্ধা তারিফ করে উঠলেন : বাঃ বাঃ, খাসা বর, বড় পছন্দের বর গো। ওলো বুড়ি, বর পাবি নে—আমি নিয়ে নিলাম। বসো বর এই পাশটিতে। শাঁখ বাজা রে ছুঁড়িগুলো, উলু দে।

হাত ধরে টেনে পাশে বসালেন। গ্রাম সুবাদে চঞ্চলার ঠাকুরমা, সুরেশের অতএব দিদিশাশুড়ি—ঠাট্টাতামাসার সম্পর্ক। থানকাপড়ে ঘোমটা টেনে রাঙাঠাকুরমা গুটিসুটি হয়ে বউটি হয়ে বসেছেন। হাসির লহর বয়ে যাচ্ছে।

ভগ্নদূত হিরু এসে হাজির এমনি সময় : চলো, যজ্ঞেশ্বর-কাকা এলেন আবার এখন। রাঙাঠাকুরমার দিকে চেয়ে কৃত্রিম ক্রোধ দেখিয়ে বলল, ওটা কি হল? বউ তুমি তো আমার। বরাবর তাই হয়ে আছে।

তালাক দিলাম, যাঃ—

বিনো বলে উঠল. হিরুই কিন্তু ভাল ছিল রাঙাঠাকুরমা। বেওয়ারিশ আছে, কারো কিছু বলবার নেই। বুড়ি দেখো কি করে তোমায়। বরের দখল কিছুতে ছাড়বে না, ধুন্দুমার লেগে যাবে দু'জনার মধ্যে—

সুরেশ বাইরের ঘরে চলল আবার। যেতে যেতে বলে, এতখানি বয়স, রসে তবু টইটম্বুর একেবারে।

ঘাড় কাত করে হিরু সায় দিয়ে বলে স্বভাব। সমস্ত গিয়ে শেষ নাতি একটা ছিল, গেল-শ্রাবণে সেটিও সর্পাঘাতে মারা গেল। তবু যেখানে মেলা-মেশা আমোদ আহ্লাদ, রাঙাঠাকুরমা বসবেনই গিয়ে তার মধ্যে।

অনতিপরেই পুঁটি আবার বাইরের ঘরে এসে হাজির : চলে আসুন—

হিরু বলল, দাঁতের মাকু—একবার বাইরের ঘর, একবার ভিতর-বাড়ি। যাও, উপায় কি ?

প্রণামাদের ফর্দটা হিরুর হাতে দিয়ে ভবনাথ বললেন, বেরিয়ে পড় এবারে, পাড়াটা সেরে আয়। রোদ চড়ে যাচ্ছে। পাড়ার বাইরে যাসনে এখন। ফিরে এসে আসল যে-কাজ—ষষ্ঠীর বাটা নেওয়া আছে। বিকেলে বেরিয়ে বাকি সব সেরে আসবি। যত রাত্তির হয়, হবে।

মানুষ নয়, জলখাবার সাজিয়ে দিয়েছে—এবারের ডাক সেই জন্য। শ্বেত-পাথরের থালায় রকমারি মিষ্টান্ন—ক'দিন ধরে সন্ধ্যা থেকে রাত দুপুর অবধি মুক্তকেশী আর অলকা-বউ বসে বসে যা-সমস্ত বানাল। ঘিরে বসে সবাই খাও খাও—করছে। পাতের কোলে চুপচাপ বসে—লজ্জা করছে ? ওমা, মেয়েমানুষের অধম হলে যে ভাই। তোমাদের বয়সে লোহার কলাই দিলেও তো মটমট করে চিবিয়ে খাবার কথা।

খাবে কি, এমন শিল্পকর্ম ভেঙে ভেঙে মুখ ভরতে কষ্ট লাগে। বসে বসে খালি তাকাতে ইচ্ছে করে। হিরুকে দেখে সালিশ মানল : দেখুন তো সেজদা, জন দশেকের খাবার এক-পাতে দিয়ে বলছেন, বসে আছ কেন ? আপনি রক্ষে করুন—সিকির সিকি আমায় দিয়ে বসে যান আপনি পাশটিতে।

হিরু বলে, ক্ষেপেছ ? প্রণামে বেরুচ্ছি—যে বাড়ি যাবো, কিছু না কিছু দেবেই। না খেলে ছাড়বে না। একটু-আধটু দাঁতে কাটতে কাটতেই পেট ভরে যাবে। বাড়ির জিনিস যাচ্ছে কোথা ? এসব এখন না।

ফর্দটার উপর চোখ বুলিয়ে বলল, টাকা কুড়ির মতো নিয়ে নাও। এবেলার কাজ তাতেই হবে। আর নয়তো এক পয়সাও নিও না, প্রণামার কন্ট্রাক্ট আমায় দাও, আশীর্বাদের সিকি ভাগ আমার। বেকার বসে আছি, ফাঁকতালে কিছু রোজগার করে নিই।

অলকা-বউ বলে, পরের পাওনার উপর দৃষ্টি কেন ? নিজে বিয়ে করলেই তো হয়। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সিকি কেন ষোলআনা আশীর্বাদই নিজের তখন।

নতুন জামাই আত্মীয়স্বজন পাড়াপড়শির বাড়ি বাড়ি গিয়ে সকলকে প্রণাম করবে। পদতলে টাকা রাখার নিয়ম প্রণামের সময়—খালিহাতের শুখো-প্রণামও যে নেই এমন নয়। লোক বিশেষে ব্যবস্থা—এতক্ষণ ধরে বিচার-বিবেচনা করে ভবনাথ ফর্দে তুলে দিয়েছেন। প্রণাম সেরে চলে আসবে—কাল থেকেই আশীর্বাদ কুড়ানোর পালা। বাড়ি বাড়ি নেমন্তন্ন—অবস্থা অনুযায়ী আয়োজন। যেমন, নতুনবাড়িরা পোলাও খাওয়ান, উত্তরবাড়িরা ঘিয়ের লুচি।

সাদা-ভাত অনেকেই খাওয়ান। সব বাড়িতে পুরো খাওয়ানোর মতন অত-গুলো দুপুর ও রাত্রিবেলা কোথা—বেশির ভাগ তাই সকালে বিকালে ডেকে চন্দ্রপুলি ক্ষীরের-ছাঁচ পিঠে-পায়স খাইয়ে দেন। আর সেই সঙ্গে আশীর্বাদ। প্রণামী সূত্রে যা এই দিয়ে আসছে, আশীর্বাদী অন্ততপক্ষে তার ডবল। এবং তদুপরি জামাইয়ের ধুতি কোন কোন বাড়িতে।

ফর্দ মেলে ধরে হিরু বলল, এই কালা দত্ত, দৈবঠাকরুন—এঁদের সব কম প্রণামী—এক টাকা করে। আধুলি দিলেই ঠিক হত, বাবা বলছিলেন। কিন্তু বিশ্রী দেখায়। দু-টাকা আশীর্বাদী দিতেই জান বেরিয়ে যাবে ওঁদের। যাক প্রাণ রোক মন—দেবেনই তবু।

দুই জায়ে ঠেলাঠেলি। তরঙ্গিণী উমাসুন্দরীকে বলছেন, তুমি বাটা দাও দিদি। আমি ছোট—তুমি থাকতে আমি কেন দিতে যাব?

উমাসুন্দরী বোঝাচ্ছেন: বাটা আপন-শাশুড়িকে দিতে হয়—

তুমি পর-শাশুড়ি নাকি?

আমি যে জেঠ-শাশুড়ি। রীতিকর্ম না মানলে হবে কেন?

কিন্তু অবুঝ কিছুতে শুনবে না। তখন উমাসুন্দরী বললেন, আচ্ছা, আমিও দেবো। আগে তুমি ছোটবউ—আসল-শাশুড়ি যে। ফলের বাটাই আসল বাটা—তাই আমি আর একটা দেবো।

হিরু বলল, মজা সুরেশের—ডবল-বাটা পেয়ে যাচ্ছে।

উমাসুন্দরী বলেন, তার জন্যে দুঃখ কি। তোমরাও পাবে ডবল। জষ্টি-মাসে ফলের অভাব নেই—আমি দেবো, ছোটবউ দেবে।

জামাইষষ্ঠী হলেও শুধু জামাই নয়—পুত্রস্থানীয়রাও বাটার অধিকারী। তার মধ্যে কালীময় বাদ। ফুলবেড়ের শাশুড়ির বাটা নিচ্ছে সে।

ভব্য হয়ে সুরেশ আসনে বসেছে। দীপ জ্বলে, শঙ্খ বাজে। কোঁচানো-ধুতি সিল্কের জামা-চাদর-রুমাল ছাতা-জুতো একদিকে সাজানো। আর এক দিকে ফল ছয় রকম—আম জামরুল গোলাপজাম লিচু সপেটা এবং কাঁঠাল। নতুন ধুতি পরতে হয় আজকের দিনে, জামাটা গায়ে দিয়ে নিতে হয়—

কমল বায়না ধরে: আমার কাপড়-জামা কই? দাদাবাবু পরেছে, আমি কি পরে বাটা নিই এখন?

উমাসুন্দরী দেবনাথের কাছে অনুযোগ করেন: সত্যিই তো, বড় অন্যায়। জামাইয়ের নতুন কাপড় নতুন জামা—কমলের নয় কেন?

দেবনাথ হেসে বললেন, এবারে হয় নি—আচ্ছা, বছরের মধ্যেই বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। আসছে বার জামাইষষ্ঠীতে পাবে।

উমাসুন্দরী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, শুনলে তো কমল। বাবা বিয়ে দিয়ে দেবে—আর ভাবনা রইল না। শাশুড়ি জামা-জুতো-কাপড় সমস্ত সাজিয়ে দেবে তোমায়।

সুরেশ ও হিরু পাশাপাশি খেতে বসল। মাথা-সরু মোচার মতন করে জামাইয়ের ভাত বেড়েছে, থালা ঘিরে রকমারি তরকারির বাটি। জামাইকে দিয়ে তারপর অলকা-বউ হিরুর থালা নিয়ে এলো। ভাত ভেঙে সুরেশ ইতিমধ্যে খেতে লেগে গেছে। মুখে তেমন উঠছে না। নাড়াচাড়াই করছে কেবল।

বিনোর সঙ্গে অলকা-বউ মুখ তাকাতাকি করে: কী ব্যাপার?

নিমি এসে সুরেশকে বলল, খাচ্ছ না যে?

খুব খাচ্ছি—

গল্পই তো শুধু। মুখে ভাত ওঠে কই?

উমাসুন্দরী ও মুক্তকেশী ননদ-ভাজে আমসত্ত দেওয়া নিয়ে ব্যস্ত। নিমি গিয়ে বলল, জামাই খাচ্ছে না মোটে। কিসে কোন কারসাজি—সন্দেহ করে খাচ্ছে না। তোমরা কেউ যাও।

আগের দিনের মতো মুক্তকেশী গেলেন: খাও বাবা। খাবার জিনিস নিয়ে ঠাট্টাতামাসা কি—ওদের আমি মানা করে দিয়েছি, নির্ভাবনায় খাও।

সুরেশ সকাতরে বলে, সে জন্য নয়। জলখাবার খেয়েছি, তারপর প্রণামে বেরিয়ে এতগুলো বাড়িতে অল্পবিস্তর খেতে হল। ভাত মুখে তুলতেই গুলিয়ে আসছে এখন।

মুক্তঠাকরুন সঙ্গে সঙ্গে রায় দিলেন: তবে থাক জোরজবরদস্তির দরকার নেই। যা পারো খেয়ে খানিক গড়িয়ে নাওগে।

আমের গোলা ছাঁকতে ছাঁকতে চলে এসেছেন, আবার গিয়ে কাজে বসলেন। হিরু ফিক ফিক করে হাসে: রাত থাকতে উঠে বাহবা নিয়েছিলে —তারই জের। ঘুম ধরেছে। না খাবে তো হাত কোলে করে বসে থাকা গরজ নেই, উঠে পড়ো।

ওদিকে রান্নাঘরে অলকা-বউ বলল, ভাত তুমি বেড়েছিলে ঠাকুরঝি। ভুলে যাওনি তো?

বিনো বলল, আসল জিনিস ভুলি কখনো?

তবে?

লজ্জার মাথা খেয়ে অলকা তখন খাওয়ার জায়গায় গিয়ে প্রশ্ন করে: গেলাস কোথা ভাই?

জলের গেলাসটা দেখিয়ে সুরেশ বলল, এই তো—

ও গেলাস নয়। কমলের ছোট রুপোর গেলাস ভাতের মধ্যে ছিল।

ছিল নাকি?

ভাত ভাঙতে গিয়ে গেলাস উল্টে পড়বে, জামাইকে বেকুব করে হাসাহাসি হবে খুব। কিন্তু ন্যাকা সেজে সুরেশ বলে, ভাতের মধ্যে গেলাস কি জন্যে বউদি?

কী বলা যায় আর তখন। যা মুখে এলো জবাব দিয়ে দেয়: ভুল করে দিয়েছিল ঠাকুরঝি—

মুখ চুন করে ভালমানুষের মতন সুরেশ বলে, আমি তা জানব কেমন করে? সেজদা-র সঙ্গে কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক ভাবে খেয়েই ফেলেছি তবে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে খোঁজার ভান করে সুরেশ বলল. পাওয়া যাবে না—খেয়ে ফেলেছি ঠিক।

জামাই ঠকাতে গিয়ে নিজেরা ঠকেছে—সারা বেলাস্ত এবারে এই নিয়ে খেলাবে। কিন্তু মামাল এক্ষুনি পাচার করে ফেলা আবশ্যক। উঠতে যাচ্ছে সুরেশ—হায়, হিরুও শক্র! খপ করে সে পাঞ্জাবির ঝুল-পকেট এঁটে ধরে চেঁচাচ্ছে: চোর, চোর—

রুপোর গেলাস পকেটে। বাড়া-ভাতের ভিতর থেকে নিয়ে গেলাস কখন পকেটে ফেলেছে—ঠিক পাশটিতে বসেও হিরু ঘুণাক্ষরে টের পায় নি: এমন সাফাই হাত তোমার, পেশা বাছাইয়ে ভুল করলে কেন ভাই? লাইনে থাকলে চোরের রাজা চোরচক্রবর্তী হয়ে যেতে নির্ঘাত।

ঘরে গিয়ে সুরেশ শোবার উদ্যোগে আছে। ডিবে ভরতি করে পুঁটি পানের খিলি নিয়ে এলো। দেখি, দেখি—খিলি একটা খুলে ফেলল সুরেশ। তারিফ করে বলছে. কী সুন্দর! জিরে-জিরে করে কুচিয়েছে—কিন্তু খেজুর কখনো-সখনো খেয়ে থাকি, খেজুর-বীচি তো খাইনে। পান খাওয়াবে তো খেজুরবীচি ফেলে খিলির মধ্যে সুপারি দিয়ে নিয়ে এসো।

বেকুব হয়ে পুঁটি পানের ডিবে ফেরত নিয়ে এলো। চঞ্চলাকে পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। দুম-দুম করে পিঠে কিল মারছে। বলে, তুই বলে দিয়েছিস, তুই ছাড়া অন্য কেউ নয়—তুই, তুই—

নিরীহ মুখে চঞ্চলা বলে, কি বললাম রে?

কিছু যেন আর জানেন না! ভাতের মধ্যে গেলাসের কথা, পানের মধ্যে খেজুরবীচির কথা—সমস্ত পুটপুট করে লাগিয়েছিস। এখন তুই দাদাবাবুর দলে, বুঝতে পেরেছি। আড়ি তোর সঙ্গে। খবরদার, কখনো রান্নাঘরে তুই আর পা দিবি নে।

তিন কি চার দিন থাকবে সুরেশ ব্যবস্থা করে এসেছিল। সেখানে পুরো হপ্তা কেটে গেছে। টেরই পায়নি কেমন করে গেল—দিনগুলো পাখনা মেলে উড়ে পালাল যেন।

এতেও সন্তোষ নেই। সকালে উঠে সুরেশ দেখল, জুতা পাওয়া যাচ্ছে না এবং আলনায় টাঙানো সিল্কের পাঞ্জাবিও উধাও। পুঁটি মুখ টিপে টিপে হাসছিল—সুরেশ গিয়ে হাত এঁটে ধরল: চোর তুমি। কোথায় আছে বের করে দাও।

পুঁটি চেঁচিয়ে ওঠে: দেখ, দাদাবাবু আমায় চোর বলছে।

সুরেশ বলল, জুতোচোর।

এখন আর সংশয় নেই, পুঁটি একলা নয়, আরও সব দলে আছে। পুঁটিকে দিয়ে করিয়েছে। দেবনাথ কোনদিকে যাচ্ছিলেন—এগিয়ে এসে ধমক দিলেন: বের কর্ শিগগির। ভেবেছিস কি তোরা শুনি? চাকরি করে—সরকারি চাকরি। আমাদের মতন দেশি মনিবের চাকরি নয়—মাথার উপরে লালমুখো সাহেব। মাস দুই-তিন পরে পূজোর সময় আবার তো আসছে।

জামাইকে ডেকে তরঙ্গিণী ওদিকে আর এক ব্যবস্থায় আছেন। বললেন, বুড়িকে রেখে যাও না কেন। আশ্বিনে পূজাটুকো দেখে যখন ফিরে যাবে, এক সঙ্গে যেও তখন। মোটে তো মাস আড়াই—থাকুক এই ক'টা দিন এখানে।

সুরেশ গঙ্গাজল: থাকে থাক। আপনাদের মেয়ে যদি না পাঠাতে চান, বলবার কি আছে।

তরঙ্গিণী বললেন, বেহাই সদাশিব মানুষ। বেয়ানের সুখ্যাতিও তোমার শ্বশুরের মুখে ধরে না। মায়ের বুকের ভিতরের কথা ওঁরা ঠিক বুঝে নেবেন। তাই বলছিলাম, পূজোয় যখন আসতেই হবে এই ক'টা দিনের জন্য মেয়েটাকে টানাটানি নাই বা করলে।

সে তো ঠিক। বলে সুরেশ মিনমিন করে আবার একটু উল্টো কথাও বলে, আমার মামাতো বোনের বিয়ে এই মাসের তিরিশে। ওকে মা বিয়েয় নিয়ে যেতে চান। সে আর কি হবে—ও থেকে যাচ্ছে তো মা একলাই যাবেন। আপনি ভাল করে একটা চিঠি লিখে আমার হাতে দিয়ে দিন।

পরের ছেলে হয়ে সুরেশ যে টামুটি রাজি, কিন্তু নিজের মেয়েই ভণ্ডুল করে দিল। বাপের কাছে গিয়ে চঞ্চলা পুট-পুট করে সব কথা বলছে। বলল, শাশুড়ি মানুষ ভাল নয় বাবা, বিষম রাগী। আসার সময়টা হুকুম দিলেন: ফিরতে মোটেই যেন দেরি না হয়—

দেবনাথ ধমকে উঠলেন: শাশুড়ির নিন্দে মুখে তো নয়ই মনেও ভাববিনে

বুড়ি। আগের জন্মের সুকৃতি ছিল, তাই অমন শাশুড়ি পেয়েছিস। তোকে তিনি চোখে হারান।

চঞ্চলা বলে, বলছি তো তাই বাবা। দু-মিনিট থিতু হয়ে থাকার জো নেই—'বউমা' 'বউমা' হাঁক পাড়বেন। ভাল মাছখানা খেয়ে যাও বউমা, শিগগির ক্ষীরটুকু খাও। মহাভারত পড়ো একটু বউমা, আমি শুনি। রান্না-ঘরের কালি ঝুলির মধ্যে গিয়ে বসতে কে বলেছে? লেগেই আছে বাবা—হাড় কালি-কালি হয়ে গেল। ভাইয়ের মেয়ের বিয়ে—তা তিনি যাবেন বাপের-বাড়ি, আমাকেও সঙ্গে করে নেবেন—নিজের বাপের-বাড়ি থাকতে পাবো না। জুলুম নয়, বলো?

কন্যার সকাতর অভিযোগে বাপ মিটি-মিটি হাসছেন: তুই জানবি কি বুড়ি, বেয়ানের মনের কথা—আমি জেনেবুঝে এসেছি। বউ নিয়ে তাঁর বড্ড জাঁক—বিয়েবাড়ি আত্মীয়-কুটুম্ব মেলা আসবে, তাঁদের কাছে নিজের বউটি দেখিয়ে আনবেন। সেই তাঁর মতলব।

চঞ্চলা বলে, আরও এক কাণ্ড হয়েছে। ওদের উঠোনে লতানে-আমের চারা দেখেছ—এবারে সেই গাছে প্রথম ফল ধরেছে। মোটমাট দশটা কি বারোটা। পাকো-পাকো হয়েছে, দেখে এসেছি। তাই বলে দিলেন, শিগগির এসো বউমা। তুমি এলে নতুন গাছের আম পাড়াব। মুখের কথা নয়, আমি জানি। এখন যদি না যাই, ঐ আম পেকে পাখপাখালিতে খেয়ে পচে গলে লয় পাবে—কেউ তা ধরে তুলতে সাহস পাবে না। শাশুড়ির যেমন রাগ, তেমনি জেদ। তোমাদের জামাই তো ঘাড় নেড়ে দিয়ে ভালমানুষ হল—কিন্তু আমাকে ঝক্কি পোহাতে হবে, কথা শুনতে হবে।

দেবনাথ রায় দিলেন: না না, এখন কেন থাকতে যাবি—বেয়ান যেমন যেমন বলে দিয়েছেন, তাই হবে। সুরেশের সঙ্গে চলে যা তুই। পুজোর সময় আসবি।

স্ত্রীকে বললেন, সুরেশ আর বুড়ি চলে যাক—তুমি বাগড়া দিও না। মহা-ষষ্ঠীর দিন জোড়ে আসবে, ঠিক হয়ে রইল। মেয়ে না পাঠালে বেয়ান যে রাগ করবেন, তা নয়। কিন্তু দুঃখ পাবেন। আমাদের বুড়ির তাতে কল্যাণ হবে না

কমল মনে করিয়ে দেয়: ও সেজদি আনবি কিন্তু তখন—

চঞ্চলা ঘাড় কাত করে বলল, আনব।

ভুলে যাস নে—

না—ভুলব কেন, ঠিক আনব।

দাদাবাবু কিনে দেবেন, বলেছেন। বড়-দোকানে পাওয়া যায়। তুই মনে করিয়ে দিস।

তরঙ্গিণী হেসেছিলেন, সেই থেকে কমল নাম ধরে বলে না। খেলনা নয়, জামা-জুতো নয়—ছোটছেলের ফরমাস একটা কলমের। যেমন-তেমন কলম নয়, বড় আশ্চর্য জিনিস—শুধু কলমে লেখা হয়ে যায়, কালি লাগে না। নতুন-বাড়ির দাদার-কাকা কসবায় থাকেন, তার আছে একটা ঐ কলম। বাড়ি এসে ঐ কলমে লেখেন, কমল তখন একনজরে তাকিয়ে দেখে। লিখতে লিখতে একদিন দাদার কলম ফেলে একটু উঠে গিয়েছিলেন—কমল চুপিচুপি কলমটা হাতে তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। কালো কুচকুচে গোলাকার, মাথার দিকে সরু হতে হতে বাবলার কাঁটার মতো সুঁচাল হয়ে গেছে। এ কলম দোয়াতে ডুবিয়ে লিখতে হয় না—কাগজের উপর টেনে গেলে ক্ষুদে ক্ষুদে কালো পিঁপড়ের সারির মতন লেখা হয়ে যায়। কমলের চাই এ জিনিস—জনে জনের কাছে দরবার করে বেড়াচ্ছে।

জেঠামশায় ভবনাথের কাছে চেয়েছিল। বিনি-কালিতে লেখা হয়—জিনিসটা তাঁর মাথায় এলো না। উডপেন্সিল নাকি রে? না, উডপেন্সিল এক কুড়ি কমলের সংগ্রহেও আছে। উডপেন্সিল চাচ্ছে না সে।

আচ্ছা, দাদার এলে জিজ্ঞাসা করে দেখব। বলে ভবনাথ চাপা দিয়ে দিলেন।

দেবনাথ বাড়ি এলে কমল তাঁকে ধরল। তিনি বুঝলেন। স্টাইলো-পেন নতুন উঠেছে। কি কাণ্ড দেখ—পাড়াগাঁ জায়গায় একফোঁটা শিশু অবধি ফ্যাশান চালু হয়ে যাচ্ছে।

তরঙ্গিণীকে বললেন, সব ফেলে তবু কলমের ফরমাস—ভাল বলতে হবে বই কি। লেখাপড়ায় ছেলে খুব ভাল হবে, দেখে নিও তুমি।

তরঙ্গিণী হাসলেন খুব: খাগের কলম বুলোচ্ছে খোকন—তার পরে পাখনার কলম, তারও কত পরে নিবের কলম। আস্পা দেখ ছেলের—কেঁচো ধরতে পারে না, কেউটে ধরার শখ।

কমল অধ্যবসায় ছাড়ে নি। চঞ্চলা এলে বলল। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে সে সুরেশকে জিজ্ঞাসা করল। সুরেশ বলল, কসবার বড় কয়েকটা দোকানে স্টাইলো-কলম এসেছে। পুজোর সময় নিয়ে আসবে একটা।

সুরেশ আর চঞ্চলা যাচ্ছে। আগুপিছু দুই পালকি ও হো এ হে ডাক ধরে গ্রাম তোলপাড় করে চলল। ভবনাথ পথের ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন—তাঁকে দেখেই বেহারারা আরও গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে।

॥ এগারো ॥

জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ না হতেই গাছের আম ফুরিয়েছে। গাছে উঠে শিশুবর কাঠবিড়ালির মতন ডালে ডালে বেড়ায়—একটা আম নেই। এখানে এই—আর দেবনাথ বললেন, ল্যাংড়া-ফজলি ভাল ভাল জাতের আম ওঠেনি এখনো কলকাতার বাজারে। আমাদেরও হবে তাই। কলমের চারা পোঁতা হল—ফলন শুরু হলে আষাঢ়-শ্রাবণেও কত আম খাবে, খেও তখন।

তা যেন হল। কিন্তু একটা-দুটো আম নিতান্তই যে আবশ্যক। দশহরার দিনে আম খাওয়ার বিধি—না খেলে বছরের মধ্যে নানা উৎপাত ঘটে, সাপের কবলে পড়াও বিচিত্র নয়।

মুক্তঠাকুরুন বিধান দিলেন: আমসত্ত্ব খাও, তাতেই হবে। আমের রস কিছু পেটে পড়লে হল।

সকাল থেকে সেদিন ঘন ঘন সকলে উপর-মুখো তাকাচ্ছে—মেঘ ওঠে কই আকাশে, মেঘ না ডাকলে তো সর্বনাশ। সাপের ডিম ফেটে কিলবিল করে বাচ্চা বেরুনোর দিন আজ—মেঘ ডাকলে ডিম নষ্ট হয়ে যাবে, সাপ হতে পারবে না। গঙ্গাপুজো এই দিনে। ষষ্ঠীর বাটায় ছয় রকম ফল জোটাতেই গলদঘর্ম, দশহরায় আবার দশ রকম ফল। তার মধ্যে আম তো অমল হয়ে গেছে। কাঁঠালগাছে উঠল শিশুবর, গরুর দড়ি কোমরে জড়ানো। কাঁঠালে টোকা মেরে মেরে দেখছে—খাঁতি হলে আওয়াজে ধরা পড়বে। খাঁতি-কাঁঠালে আচ্ছা করে দড়ি বেড় দিয়ে দড়ির অন্য প্রান্ত ডালে বেঁধে বোঁটা কেটে দেয়। বিশালায়তন কাঁঠাল ফাটল না মাটিতে পড়ে, শূন্যে ঝুলছে। ভুঁয়ে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে তখন নামিয়ে নেয়।

এক রকমের হল। জাম পেকেছে এতদিনে—জাম গোলাপজাম আঁশফল কামরাঙা করমচা লেবু কাঁকুড়—কতগুলো হল, হিসাব করে দেখ। অভাবে গাবফল এবং হলুদ-বরণ ডাঁশা-খেজুরও নিতে পার। খাওয়ার অবস্থায় এসেছে কিনা ভাবতে গেলে হবে না। দেবতা হলেন গঙ্গাদেবী—খাবার প্রয়োজনে পাকিয়ে নেবেন তিনি। অথবা কাঁচাই খাবেন। ডগাডতে দশ ফল ভজিয়ে দেওয়া নিয়ে কথা।

গঙ্গা বিহনে পুজোটা অন্তত গাঙের ধারে হওয়া উচিত। সোনাখড়িতে গাঙ নেই খালও প্রায় শুকনো এখন। গাঁয়ের মানুষ পুকুরঘাটে অগত্যা পুজো সারছে।

আষাঢ়ের গোড়ায় দেবনাথ কর্মস্থলে চলে গেলেন। কাঁধের উপর পুজোর

হায় এসে চাপল—লোকের প্রত্যাশা অনেক, দেবনাথ যা নন সকলে তাই ভাবে তাঁর সম্বন্ধে। দাদাকে বলে কয়ে রওনা হয়ে গেলেন। স্থানীয় ব্যবস্থায় ভবনাথ রইলেন—দেবনাথ বাইরের কেনাকাটা যতদূর সম্ভব সারা করে জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে যথাসময়ে আসবেন।

দায়দায়িত্ব দু-ভাগ হয়ে গেছে। দুর্গোৎসব পুববাড়ির। গ্রামবাসীর সেদিকে আপাতত মাথা দিতে হচ্ছে না, যা করবার ওঁরাই করছেন। ওঁরা বলতে ভবনাথ—একাই তিনি এক সহস্র। বাইরে-বাড়ি উত্তরের পোতায় খড়ের দোচালা মণ্ডপ তোলা হয়েছে। কৃপাময়ী জননী প্রতি বছরই যদি আসেন, পোতার উপর পাকা দেয়াল উঠবে—নতুনবাড়িতে যেমন আছে। পাট কাটা হয়ে গেছে, নতুন মণ্ডপের উত্তরের বেড়া ঘেঁসে পাট স্থাপনা হয়েছে। তল্লাটের ভিতর রাজীবপুরের পালেরাই প্রতিমা গড়ে—এক রাজীবপুরেই ছয় বাড়িতে ছোট-বড় ছয়খানি দুর্গা—পালেরাই গড়ে ওঁদের সব। এবারে নতুন একখানা সোনাখড়িতে। সময় থাকতে গিয়ে ভবনাথ পালপাড়ায় বায়নার টাকা চাপিয়ে দিয়ে এসেছেন।

পুজো পুববাড়ির, কিন্তু থিয়েটার গ্রামবাসী সর্বজনার। হারু বিত্তির পুরো দমে লেগে গেছে, চেলাচামুণ্ডারা আছে সব সঙ্গে। রাজীবপুরের প্রতিমা ছয়-খানা বটে, কিন্তু থিয়েটার এক জায়গায় একটিমাত্র আসরে। সপ্তমী অষ্টমী নবমী পুজোর তিন দিন তিন পালা পর পর। চালু জিনিস ওদের, বছরের পর বছর হয়ে আসছে—তিনটে নাটক যেমন খুশি রিহার্শালে চড়িয়ে দিল, উতরে মোটামুটি যাবেই। সোনাখড়ির পক্ষে পয়লা বছর ঐ সিরাজদ্দৌলা ছাড়া অধিক আর সম্ভব নয়। সপ্তমীর দিন নামানো হবে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরণ-ভরসা—ঠাকুরের দয়ায় লেগে যায় তো নবমীর দিন 'বিশেষ অনুরোধ' পুনশ্চ দ্বিতীয় দফায়।

সিন-সিনারি সাজ-পোশাক এবং অন্য যাবতীয় সরঞ্জাম সদর থেকে ভাড়া হয়ে আসবে। মাদার ঘোষের সদরে প্রতিপত্তি, তাঁর উপরে সম্পূর্ণ ভার। কালিদাসের চিঠিতে মস্তবড় সংবাদ, কলকাতার প্লেয়ার ঠিক হয়ে গেছে—এক জোড়া একেবারে। কালিদাসের পরম বন্ধু তারা—একটি তার মধ্যে পাবলিক স্টেজেও নেমেছে মাঝে মধ্যে। দুই বগলদাবায় দু-জনকে নিয়ে মহালয়ার দিন কালিদাস এসে পৌঁছবে। একজন সিরাজদ্দৌলা সাজবে, অপরে করিম-চাচা। আর কালিদাস নিজে ক্লাইব। পার্ট বড় নয়—তাতেই সে খুশি। ঠাকুরের দয়া থাকলে ওর মধ্যেই কিছু খেল দেখিয়ে দেবে। এই বাবদে ইতিমধ্যে পাব-লিক স্টেজের সিরাজদ্দৌলা তিন বার দেখা হয়ে গেছে—সুযোগ পেলে আরও দেখবে। মোটের উপর সোনাখড়িতে যা নামবে, হুবহু তা কলকাতার মাল—

চলন-বলনে একচুল এদিক ওদিক হবে না।

এহেন বড় খবরে হারু মিত্তিরের কিন্তু মুখ অন্ধকার। বামুনপাড়ার গোবরা বিশেষ অন্তরঙ্গ তার—একসঙ্গে ইস্কুলে যেতো আবার একসঙ্গে ইস্তফা দিয়েছে। ক্ষিপ্ত হয়ে গোবরার কাছে বলল, এত খাটনি খাটছি সিরাজের পার্টের লোভে। চুলোয় যাকগে, পার্টই করব না আমি মোটে—গ্রামের কাজে খেটেখুটে দেবো।

গোবরা সান্ত্বনা দেয়: সিরাজ না হ'ল তো সিরাজের বেগম হয়ে যা—লুৎফউন্নিসা। সে-ও কিছু কম যায় না।

গান রয়েছে যে। হেঁড়ে গলায় গান ধরলে লোকে তেড়ে আসবে।

গোবরা বলে, লুৎফর গান তো বাদ। তুমি ম্যানেজার হয়েও জান না। নরেন পাল বলে দিয়েছে, যত কিছু গান বন্দী আর নর্তকীর মুখে।

হারুর ইতস্তত ভাব: গোঁফ কামাতে হবে—ধুস। খোচার মতন এমন খাসা গোঁফ জোড়া আমার—

গোবরা বলে, তা বস কেন, গোঁফ আবার গজাবে। পার্ট কিছু ছোট হতে পারে—কিন্তু আমার মনে হয়, সিরাজের চেয়েও লুৎফ জমবে বেশি। শেষ মারটা পুরোপুরি তার হাতে—কবরে ফুল ছড়ানো তার করুণরসের অ্যাকটিং। কাঁদতে কাঁদতে লোকে ঘরে যাবে। চাঁদেকার সব-কিছু বিলকুল ভুলে গিয়ে তোর অ্যাকটিংটাই কানে বাজবে শুধু।

তবু হারু মন-মরা। মহাবিপদ। গোবরা বোঝাচ্ছে: নিজের ভ বলে তো হবে না—কলকাতার প্লেয়ার নামছে, চাট্টিখানি কথা। ভিতরে বস্তু থাকলে মূক-সৈনিকের পার্টেও তাজ্জব দেখানো যায়। মুখোমুখি প্লে ক ব স জ তো একেবারে বুঝে ফেলবে তোর। গিয়ে গিয়ে গল্প করবে, কলকাতার স্টেজেই ডাক পড়তে পারে তখন।

হৈ হৈ পড়ে গেল। সোনাখড়ি পুজোর সময় নির্ঘাত এক কাণ্ড ঘটবে। পিওনঠাকুর যাদব বাড়ুয্যে হাটবারে এসে চিঠি বিলি করেন, সবিস্তর শুনে গেলেন তিনি। তাঁর মুখে বৃত্তান্ত রাজীবপুর পৌঁছে গেল। সকলের মুখ চুন। এই যদি হয়, একটা মানুষও রাজীবপুর আসরে বসবে না কলকাতার প্লেয়ারের নামে ঝেঁটিয়ে সব সোনাখড়ি জমবে। পুববাড়ির ঐটুকু উঠানে কি হবে—দক্ষিণের বেড়া ভেঙে বেগুনক্ষেত সাফ করে পোড়োভিটে কেটে চৌরস করে জায়গা বাড়িয়ে নাও। দক্ষিণের একেবারে শেষ মুড়োয় স্টেজ বাঁধা হবে মণ্ডপের সামনাসামনি। দেবীর চোখের সামনে, দেবীকে দেখিয়ে অভিনয়—

হাত-মুখ নেড়ে মহোৎসাহে হারু শোনাচ্ছিল, হিরচাঁদ 'কক্ষনো না'

'করবো না'—তুমুল কলরব করে উঠলেন।

কথার মধ্যে খামোকা ভণ্ডুল দিয়ে নিজের কথা শোনানো স্বভাব তাঁর। কিন্তু সেই বস্তু রসিয়ে উপভোগ করার লোকও যথেষ্ট। তারা বলে কী ব্যাপার? না না—করে উঠলেন কেন হিমে-দা?

মতলব করেছে, দুর্গাঠাকরুনকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে থিয়েটার শোনাবে। ঠাকরুন মুখ ঘোরাবেন কিন্তু বলে দিচ্ছি। সেকালে চাঁপাঘাটে যা একবার হয়েছিল, এখানেও তাই হবে দেখো। কিম্বা আরও সাংঘাতিক—

চাঁপাঘাটে সে উপাখ্যান সবাই জানে। মা-কালীর পাষাণ-বিগ্রহ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। হিমচাঁদ বললে রসিয়ে বিস্তর মজাদার করে বলবেন। পুরানো গল্প ছেলেরা তাঁর মুখে আর একবার শুনতে চায়: কি হয়েছিল হিমে-দা?

হিমচাঁদ আমল না দিয়ে বলে যাচ্ছেন, হারু হল লুৎফউন্নিসা তোমাদের— সাংঘাতিক কাণ্ড হবে বলে দিচ্ছি। সিরাজের বদলে লুৎফউন্নিসাকেই চাক-চাক করে কেটে হাঁড়িতে চড়াবে। মা জগদম্বাও হারুর অ্যাকটো শুনে অসুরের বুকের বল্লম উপড়ে লুৎফকে ছুঁড়ে মারবেন দেখো।

একলা হিমচাঁদ নন, নানাজনের নানান মন্তব্য। হারু মিত্তির কানেও নেয় না। পার্ট বিলি হয়ে গেছে, তারপর থেকে লোকের উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে খানিকটা বেশ। নাটকে যত পার্ট ই থাকুক, গ্রামসুদ্ধ মানুষকে খুশি করা সম্ভব নয়। পার্ট যারা পায় নি, রিহার্শালের ধারে কাছেও আসে না আর তারা। 'দূত' সৈনিক' 'নগরবাসী' জাতীয় ছোট পার্ট যাদের, তারাও আসতে চায় না: বলব তো আধখানা কথা, তার জন্যে নিত্যি নিত্যি যাবার কি আছে? কিন্তু হারুও ছাড়নপাত্র নয়। ঝাঁজ বাজাচ্ছে নতুনবাড়ির রোয়াকের এ-মুড়ো ও-মুড়ো দ্রুত পদচারণা করে। পুজোর আরতিতে যে-জাতীয় ঘণ্টা বাজায় তা-ও একটা সংগ্রহ করেছে। ঢং-ঢং করে বেশ খানিকটা ঝাঁজ বাজাল। ঝাঁজ রেখে দিয়ে তারপর ঘণ্টা: ঠুন-ঠুন ঠুন-ঠুন ঠুন-ঠুন—

কারা কারা এসেছে দেখে নিয়ে হারু পাড়ায় বেরিয়ে পড়ল: কী হল তোমার আবার, যাচ্ছ না যে? জ্বর হয়েছে, হাত দেখি। কিচ্ছু হয়নি, একটু-আধটু জ্বরে পার্ট বলা আটকায় না। রাজীবপুরদের গো-হারান হারাব এবারে—পুজোয় না পারি, থিয়েটারে। ওঠো—

থিয়েটারের নামে নানান গুণীলোকে এসে হানা দেয় মাঝেমধ্যে। মরশুমের পাখি। রোজগার যৎকিঞ্চিৎ হয়তো হবে, কিন্তু সেটা আসল নয়— গুণের বোঝা নিয়ে চুপচাপ থাকা অসহ। দূরদূরান্তর থেকে মাঠ-ঘাট জঙ্গল-জাঙাল ভেঙে হাজির হয়। স্থানীয় মুরুব্বি হারু মিত্তিরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে

তারপর খুব হয়ে খানিকটা রিহার্শাল শুনে শুষ্কমুখে ফিরে চলে যায়। এর মধ্যে যুগল আর সুধাময় নামে ত্বটো নাচের ছেলে ড্যান্সিং মাস্টার নরেন পাল ধরে রাখল—ত্বটো তৈরি মাল হতে থাকুক, আর যা লাগে বানিয়ে নেবে। আর একজন নিতান্ত নাছোড়বান্দা, আর্টিস্ট জটাধর সরকার, গড়বংশে বাড়ি। সিন-উইংস আঁকবার জন্যে এসেছে। বলছে খুব লম্বা-লম্বা কথা। আর্ট-ইস্কুলে সামান্য দিন পড়েছিল। আঁকচোক দেখে মাস্টার তাজ্জব হয়ে বললেন, তোমার স্বভাব-দত্ত ক্ষমতা—কতটুকু জানি আমরা, আর কি শেখাব। ইস্কুলে সময় নষ্ট করে কি হবে, দেশে ফিরে রুজিরোজগারে লেগে যাও। গুরুবাক্য মেনে ফিরে এসেছে আর্টিস্ট এবং রুজিরোজগারে লেগেও গেছে। পাড়াগাঁয়ে ছবির কদর নেই বলে অগত্যা পানের বরোজ করেছে—হাটবারে পান তুলে গোছে গোছে সাজিয়ে হাটে নিয়ে যায়। তা হলেও শিল্পমানুষ, জাত-শিল্পী—অঙ্কনের জন্য হাত সুড় সুড় করে, খবরটা কানে শুনেই ছুটতে ছুটতে এসেছে।

হারুর হাত জড়িয়ে ধরল: যত কিছু ক্ষমতা চর্চার অভাবে মরচে ধরে গেল মশাই। কাপড় আর রং কিনে দিন, ঘরের খেয়ে কাজ করব। গোটা আর্ট-ইস্কুল তাজ্জব বনেছিল, তল্লাট জুড়ে এবারে সেই কাণ্ড করব। বাকির কথা এখন বলছি নে, কাজ হয়ে যাক—পাইতক্কে এতাবৎ সিন-সিনারি যত হয়েছে জানীম নারা দেখবেন তুলনা করে, কলকাতা থেকে প্লেয়ার আসছেন তাঁরাও সব দেখবেন। দশে-ধর্মের বিচারে যা হবে, হাসিমুখে তাই আমি হাত পেতে নেবো।

প্রস্তাব চমৎকার, হারুর বেশ ভাল লাগল। কিন্তু হলে হবে কি, সিনের ভার মদার ঘোষের উপর। তিনি ভিন্ন কারো কিছু করার এক্তিয়ার নেই। মদার ঘোষের ঠিকানা নিয়ে আর্টিস্ট সেই সদর অবধি ধাওয়া করল। উত্তম যোগাযোগ বেরিয়ে গেল—মাদারের মুহুরি সুরেন বিশ্বাস জটাধরের সাক্ষাৎ ভগ্নীপতি। সুরেন জোর সুপারিশ করল: জটাধর খাঁটি মানুষ। দিয়ে দেখুন, ক্ষতি-লোকসান কিছু হবে না—অটা সে মানুষই নয়। আমি জামিন রইলাম।

মদার হিসাব করে দেখলেন। ভাড়া না নিয়ে সিন এঁকে দিয়ে করালে অনেক সস্তায় হবে, এবং গ্রামবাসীর সম্পত্তি হয়ে থাকবে। আপাতত চারখানা সিন—দরবার-কক্ষ, শিবির, পথ ও কুটির। এবং আনুষঙ্গিক উইংস ইত্যাদি। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এতেই চালাতে হবে, জরুরি আবশ্যক বিধায় এক-আধখানা ভাড়া-করা যাবে। এ-বছর এমনি চলল. সামনের বার ভেবেচিন্তে আরও চারটে বানানো হবে। তারপরের বছর আরও কিছু। পোশাকও ঐ সঙ্গে

একটা দুটো করে। ক'টা বছর যেতে দাও, সোনাখড়ি ড্রামাটিক-ক্লাব কারো কাছে হাতে পাততে যাবে না, সবই নিজস্ব তাদের তখন।

জটাধরকে নিয়ে মাস্টার চলে গেলেন। চালাও হুকুম: কাপড়ের থান পছন্দ করে কিনে নাও। রং কেনো যেমন তোমার অভিরুচি। বাড়ি নিয়ে গিয়ে ধীরেসুস্থে মনের মতন করে বানাওগে। মুখে ভড়পাচ্ছে, কাজে সেটা দেখাতে হবে। দিন দেখে রাজীবপুর মাথায় হাত দিয়ে পড়বে, তেমন জিনিস চাই।

জটাধর সদম্ভে বলল, দেখবেন—

॥ বারো ॥

আষাঢ় মাস। মাঠ সবুজ। গাছপালা বৃষ্টির জলে স্নান করে স্নিগ্ধ পবিত্র। কাঁচামিঠের চারাটায় কিছু লালচে পাতা এখনো। পুকুরপাড়ের কৃষ্ণচূড়া গাছ ফুলে ভরতি।

ডালে ডালে পাখির কিচির-মিচির। শালিখেরা ঝাঁকে ঝাঁকে বাইরের উঠোনে পড়েছে। কেঁচোয় মুখ বাড়িয়েছে, নানা রং-এর পোকা বেরিয়ে পড়েছে গর্তে জল ঢুকে গিয়ে। মচ্ছব লেগেছে পাখিদের। জল ভরা পাটকিলে রঙের মেঘ আকাশে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। ঝুপ ঝুপ করে এক পশলা হয়ে গিয়ে কখনো-বা মেঘশূন্য ঝিকমিকে আকাশ বেরিয়ে পড়ল একটু ক্ষণের জন্য: গাছের পাতা থেকে টপ টপ করে জল ঝরছে। খানিক বিরাম দিয়ে টিপটিপে বৃষ্টি এবার।

বেলা হয়েছে, কিন্তু চারিদিকে কুয়াসার ভাব। মানুষজন একটা দুটো করে বেরুচ্ছে—পথঘাটে জল ছপছপ করে ছিটিয়ে যাচ্ছে। কই মাছ একটা কানকোয় হেঁটে হাঁটতে যাচ্ছিল, রাস্তার পাশে ঘাসবনে আটকে গেল! একটা যখন দেখা গেল, আরও আছে ঠিক। খোঁজ করলে মিলে যাবে।

ক দিন পরে দেবরাজ আরও এক নতুন খেলা ধরলেন। থমথমে আকাশ, হঠাৎ তার মধ্যে ছির-ছির করে এক-এক পশলা বৃষ্টি আসে—দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পড়ে যেন পাকা সওয়ার। আর সেই সময়টা রোদে হাসছে বিলের মধ্যে ধানক্ষেতগুলো। নতুনপুকুরের নালার ধারে কমল আর পুঁটি— তেপান্তরের বিল চোখের সামনে, মাঝবিলে ভুতুড়ে বটগাছটা, অনেক অনেক দূরে বিল-পারের ঝাপসা গাছগাছালি, খোড়ো ঘর। বিল ভরতি ধান রুয়ে দিয়েছে। কচি ধান চারাদের কতক কতক হলদে, বেশির ভাগই কালো-বরণ হয়েছে। তাদের উপর দিয়ে এই রোদ এই মেঘছায়া এই বৃষ্টি ছুটোছুটি-খেলা করছে সারাক্ষণ। হাতভালি দিয়ে ভাইবোন কচি গলায় একসুরে ছড়া কাটে:

রোদ হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে
শিয়াল-কুকুরের বিয়ে হচ্ছে ।

নতুনপুকুর ও বিলের মধ্যে সরু এক নালার যোগাযোগ। কোদাল-মালসা নিয়ে হিরু আর অটল এসেছে ফোকটে কিছু মাছ ধরে নেবার জন্য । পুঁটি চাঁদা মৌরলা বাজি-ট্যাংরা ডারাবান এইসব ছোট ছোট মাছ। মাটি ফেলে নালার মুখ বন্ধ-করা—সেই মাটি এতটুকু কেটে দিল। ঝিরঝির করে বিলের জল পুকুরে পড়ছে আর বর্ষার স্ফূর্তিতে উজিয়ে মাছ নালায় ঢুকে যাচ্ছে। দু-কোদাল মাটি এদিকে তাড়াতাড়ি ফেলে নালার দু-মুখ বন্ধ করে দিল। মাছ আটকা পড়েছে—জলটুকু সেঁচে ফেলে মালসা ভরে তুলে নিলেই হল । দেবরাজের বজ্জাতি—দেখতে দেবেন এই মাছ ধরা! বৃষ্টি ঝেঁপে আসে, আকাশ চেরে চিকুর, কড়-কড় শব্দে বাজ তোলপাড় করে তোলে। জেঠামশায় খোঁজ-খোঁজ লাগিয়েছেন এতক্ষণে ঠিক।

আর থাকা চলে না। দেরি হলে রাগে রাগে নিজেই চলে আসবেন। ছুটল ভাই-বোনে—বুড়িচ্ছু খেলায় দম ধরে ছোটে যেমন—ছ-চালা বড়ঘরের হাতনের উপর উঠে পড়ল। জোর বৃষ্টি। বড় বেশি জোর দিল তো ছড়া কাটছে :

লেবুর পাতার করমচা,
যা বৃষ্টি ধরে যা—

তাই শুনে দেবরাজ জোর কমালেন তো তখন আবার উল্টো ছড়া :

আয় বৃষ্টি হেনে
ছাগল দেবো মেনে—

খড়ের চাল বেয়ে অসংখ্য ধারায় ছাঁচতলায় জল পড়ছে। খুঁটি ধরে হাতনে থেকে ঝুঁকে পড়ে জলের ধারা হাতে ধরছে। এই এক খেলা। জেঠামশায় দালানের রোয়াকে, মেজদা পুকুরপাড়ে, মা জেঠাইমা বিনো-দি সব রান্নাঘরের দিকে। কেউ নেই এদিকটা। আকাশে দেবরাজ আছেন শুধু—তিনিই মাঝে মাঝে গুম-গুম তাড়া দিচ্ছেন।

উঠোন জলে ভরে গেল দেখতে দেখতে। ছাতের জল নল দিয়ে ছড়ছড় করে প্রবল বেগে রোয়াকের উপর পড়ছে। ভাঙাচোরা পুরানো রোয়াক। যেখানটা নলের জল এসে পড়ে, সেখানে আটখানা করে টালি আঁটা—সানের উপর জল পড়ে রোয়াক যাতে জখম না হয় ।

ছাঁচতলা দিয়ে দ্রুত গড়িয়ে জল সোঁতায় গিয়ে পড়ছে। সোঁতা থেকে রাস্তায়—রাস্তার ওপারে। ওপারের জল এঁকে-বেঁকে শেষ তক বিলের জলে

মিশে যায়। কমল তাড়াতাড়ি কাগজের নৌকো বানিয়ে ফেলল। বিদ্যেটা হিমচাঁদের শেখানো—পুঁটি-কমলের তিনি হিমে-কাকা। ছেলেবুড়ো সব বয়সের সকলে হিমচাঁদের ইয়ারবন্ধু এবং সাগরেদ—রঙ্গরসিকতা তাঁর সকলের সঙ্গে। গায়ে হাত দিয়ে 'তুমি' করে কথা বলে হিমচাঁদের সঙ্গে কি পাঁচ-বছুরে ছেলেটা কি পঞ্চাশ-বছুরে বুড়োমানুষটা। ক্ষমতার অন্ত নেই, চট করে আহা-মরি জিনিস সব বানিয়ে উপহার দেন। শিমুলের কাঁটা ঘষে ঘষে পালিশ করে তার উপরে নরুন দিয়ে উল্টা-অক্ষরে নাম খোদাই করে দেবেন—হুবহু রবারস্ট্যাম্পের মতো ছাপ পড়বে। ঘুড়ি বানিয়ে দেন, পাইতক্কের ভিতর কেউ অমন পারবে না। সাপঘুড়িগুলো আকাশে ওড়ে—রোদভরা আকাশে রকমারি সাপ কিল-বিল করে বেড়াচ্ছে, মনে হবে। চাউস 'বঙ্গবাসী' কাগজ নিয়ে বাঁশের শলা ও জিওলের আঠায় বিস্তর যত্নে হিমচাঁদ দোরঘুড়ি বানান—মাঝারি সাইজের একখানা ঝাঁপের দরজা অবিকল। নিজ হাতে কোষ্টা কেটে ঘুড়ির জন্য শক্ত সুতালি পাকালেন। সেই ঘুড়ি আকাশ তুলে খেজুরগাছের সঙ্গে বেঁধে দিলেন। চৈত্রের খর-দুপুরে মিষ্টি সুরে মাতিয়ে ঘুড়ি উড়তে লাগল।

হিমে কাকার কাছ থেকে কমল নৌকো বানানো শিখেছে। কাগজের নৌকো আর কলার খোলার আহা মরি সব নৌকো। কাগজের নৌকো বানানো কিছুই নয়—দেদার বানিয়ে দিচ্ছে, আর পুঁটি ছাঁচতলার গাঙে নিয়ে ছাড়ছে। বৃষ্টি অবিরাম। জলের টানে নৌকো যাচ্ছে, চালের জল সুতোর ধারে পড়ছে নৌকোর উপর—কতক্ষণ আর ভাসবে, জল ভরতি হয়ে ডুবে যায়। এক নাগাড়ে বানিয়ে যাচ্ছে কমল, দিদিও জলে ছাড়ছে। কিন্তু নৌকোডুবি মারাত্মক রকমের—পাঁচ-দশ হাত যেতে না যেতে ভিজে ন্যাকড়ার মতন নৌকো নেতিয়ে পড়ে।

পুঁটি বলল, রোসো, এক কাজ করছি। এদিক-ওদিক দেখে নিল ভাল করে, আঁচলটা মাথায় তুলে দিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই মানকচু-বনে ছুটে গেল। বড় দেখে দুটো মানকচুর পাতা ভেঙে একটা কমলকে দিল, একটা নিজে রাখল। কমল ইতিমধ্যে আস্ত একখানা খবরের কাগজ দিয়ে মস্তবড় নৌকো বানিয়ে ফেলেছে। দুই কড়েপুতুল নৌকোর উপর—একটি মাঝি, অপরে বউমানুষ শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। বর্ষার সময় বিলের শয়াল বেয়ে যেমন সব আসা যাওয়া করে। এ নৌকো ছাঁচতলার জন্য নয়—মানকচু-পাতা মাথায় দিয়ে উঠোন পার হয়ে তারা সোঁতার জলে ভাসিয়ে দিল।

কী বেগে চলল রে নৌকো, ভাইবোনে পাশে পাশে চলেছে। সোঁতার পাশে গিয়ে পড়ে তো ঠেলে মাঝখানে সরিয়ে দেয়। তরতর করে ছুটেছে। পড়বে এইবারে রাস্তার পগারে, তারপর বিলে—জলের তফরা খেলছে ঐ যেখানে।

খলবল করে সোঁতার সামান্য জল ঠেলে উঠান মুখো উজান চলেছে—কী আবার, কইমাছ। নতুনপুকুরে হোক কিম্বা মজা-পুকুরে হোক, আজকে মাছ উঠেছে। কেউ ঠাহর পায়নি। কানকো বেয়ে এতখানি পথ চলে এসেছে—বাড়ির মধ্যে উঠানে ঢুকছে, উঠান থেকে ছাঁচতলায়, ছাঁচতলা থেকে রান্নাঘরেই বুঝি। রান্নাঘরে গিয়ে একেবারে গরম তেলের কড়াইয়ের ভিতর নেমে পড়বে? করবে কি, কেউ তোমরা গেলে না—দলছাড়া হয়ে একা একা চলে এসেছে বেচারি।

ওমা, কই ফিরে চলল যে চকিতে মুখ ফিরিয়ে। নতুন বর্ষার স্ফূর্তিতে ঘাসের তলা থেকে উঠে দেখে-শুনে বেড়াচ্ছিল, গতিক মন্দ বুঝে পিঠটান দিচ্ছে। ধর্ ধর্—মাথার কচুপাতা ফেলে পুঁটি ঝাঁপিয়ে পড়ল।

অত সহজ নয়—স্রোতের সঙ্গে মাছ পগারের দিকে ছুটেছে—একবার পগারে পড়তে পারলে আর তখন পায় কে! তবু পুঁটি একবার ধরেছিল, কাঁটা মেরে হাত ছাড়িয়ে কই পালিয়ে গেল। ভাইয়ের উপর সে খিঁচিয়ে ওঠে: পাতা মাথায় দিয়ে ঘটকপূর্র হয়ে কি দেখিস? আগে গিয়ে বেড় দিয়ে দাঁড়া। হাতের ক্ষত অগ্রাহ্য করে পুঁটি হাতড়া দিচ্ছে। দু-জোড়া পা আর দু-জোড়া হাত ঐটুকু সেঁ তার মধ্যে—আঁচলে হাত মুড়ে মাছ চেপে ধরল পুঁটি, আঁচলে জড়িয়ে তুলে নিল। কাঁটা মারবার জো নেই—আর যাবে কোথা বজ্জাত কইমাছ?

বিকালটা খাসা গেল। বৃষ্টি নেই, হালকা মেঘের আড়াল থেকে সূর্য উঁকি ঝুঁকি দিল কয়েক বার। সন্ধ্যাবেলা আবার আয়োজন করে আসে। মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়েছে, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। ঝিলিক দিচ্ছে—কালো-বাসুকি আকাশে যেন জিভ মেলছে বারংবার। অন্ধকারে চরাচর ডুবিয়ে দিয়েছে—ঘর-বাড়ি গাছপালা পথ-ঘাট কিছুই নজরে আসে না। নিজের হাত-পাগুলো পর্যন্ত। ঝিঁঝিঁ ডাকছে স্ফূর্তিতে চারদিকে ঝিমঝিম আওয়াজ তুলে। ব্যাঙে উলু দিচ্ছে। তারপর বৃষ্টি নামল। কলকল শব্দে উঁচু জায়গা থেকে জল গড়াচ্ছে কোথায়। তালের বাগড়ো পড়ল বুঝি খড-খড শব্দে। আর আছে অবিরাম বৃষ্টি পড়ার শব্দ। বেশ লাগে।

কমল মায়ের সঙ্গে এক কাঁথার মধ্যে গুটিসুটি হয়ে শুয়েছে। পুঁটি শোয় দরদালানে জেঠিমার সঙ্গে—জেঠিমার বড পেয়ারের সে। কমলের জন্মের সময় উঠানের উপর যথারীতি নারকেলপাতার ছাউনি দরমার বেড়ায় বাগলো বাঁধা হল, শিশু ভূমিষ্ঠ হল সেখানে। পুঁটি সেই সময়টা জেঠিমার কাছে শুত। তারপর কমল এত বড়টা হয়ে গেছে, সেই শোওয়া চলছে বরাবর। ঊষাসুন্দরী দৈবে-সৈবে বাপের বাড়ি যাবেন তো পুঁটিও নাছোড়বান্দা হয়ে যাবে তাঁর সঙ্গে।

অনেক রাত্রি। প্রচণ্ড আওয়াজে ঘন ঘন বাজ পড়ছে। কমল শিউরে কেঁপে—ঘুমের মধ্যে উঠে বসে ডুকরে কেঁদে উঠল। 'ভয় কি' 'ভয় কি' বলে তরঙ্গিণী টেনে শুইয়ে ছেলেকে বুকের মধ্যে নিলেন, কাঁথাটা ভাল করে গায়ে টেনে দিলেন। বাইরে ঝমঝম করে প্রবল ধারায় বৃষ্টি—কী ঢালা ঢালছে রে আজ, থামাথামি নেই, সৃষ্টি সংসার ভাসিয়ে দেবে। ভয় তরঙ্গিণীও পেয়েছেন, কমলকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরেছেন। খাসা ঘুম লাগে তখন, আরামে আবার কমল ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালবেলা বৃষ্টি ধরে গেছে। ঘোলাটে আকাশ, চিকচিকানি রোদ দেখা দিয়েছে তার মধ্যে। ভাই-বোনে পথে বেরুল বৃষ্টিবাদলায় চারিদিককার চেহারা কেমন পালটেছে দেখ। যেন আর এক জগৎ। মজা-পুকুরের খোলে খটখটে মাটির উপর ক'টা দিন আগেও টুরে ও কালমেঘায় কত আম কুড়িয়েছে, আজকে হাঁটুভর জল সেখানে। আগাছা ঘাসবন একটা দিনের মধ্যে যাবে আর কোথায়—যেমন ছিল তেমনি আছে, জলতলে ডুবে রয়েছে, চোখ তাকিয়ে সমস্ত নজরে আসে। গুঁড়িকচুর বনে জল ঢুকেছে—কচুপাতা জলের উপর নৌকোর মতন ভাসছে. মাথার উপর চোখ-বসানো কেঁয়ামাছ ভেসে বেড়াচ্ছে এদিকে-সেদিকে। জলের নিচে গাছগাছালির মধ্যে লুকানো আরও কত রকমের কত মাছ। পরশু-তরশু যা ছিল সাদামাটা নিতান্তই ডাঙা জায়গা, একটা দিনের মধ্যে সে জায়গা অজ্ঞাত রহস্যময় হয়ে উঠেছে। যদু মণ্ডল, দেখ, সাত-সকালে ঐ কচুবনে এসে মোটা বড়শিতে ব্যাং গেঁথে খোবা নাচিয়ে বেড়াচ্ছে—কোনখান থেকে শোলমাছ বেরিয়ে খপ করে টোপ গিলে খাবে।

বাড়ির পূবে বিল—সোনাখড়ি গ্রামের পূব সীমানা। বিলের চেহারাও পালটেছে। ডাঙার কাছাকাছি চটজমিতে আউশধান রুয়েছিল, হরিদ্রাভ খাটো ধান-চারা, সমস্ত এখন জলের নিচে। যতদূর নজর চলে. জল আর জল—ঘোলা জলের হকূল-পাথার। বাতাসে তুফান উঠছে, আমবাগানের নিচে ছলাৎ-ছলাৎ ঢেউ এসে ঘা দিচ্ছে।

বাড়ি এসে দেবনাথ খুব গল্প করেন ছেলেমেয়ের সঙ্গে। পৃথিবী নিয়েও কত গল্প। সোনাখড়ি এই একটা গ্রাম, বিল তার সামনে—পৃথিবীর উপর এমনি লক্ষকোটি গ্রাম আছে, শহর আছে, সমুদ্র আছে, হ্রদ আছে, দ্বীপ আছে, মরুভূমি আছে। আছে বরফে-ঢাকা মেরুপ্রদেশ। ভারি আশ্চর্য পৃথিবী। বড় হয়ে ভাল করে জানবে, দেশ বিদেশ ঘুরে পৃথিবীর কত রকম রূপ দেখতে পাবে।

দেবনাথ বলেন এইসব। কিন্তু বড় হওয়া পর্যন্ত সবুর করতে হয় না।

রাত্রের মধ্যে কমল যে সময়টা মায়ের কাছে কাঁথার নিচে ঘুমিয়ে ছিল, বাড়ির নিচের চেনা-বিল তার মধ্যে সমুদ্র হয়ে গেছে। মহাসমুদ্র—জল থই থই করছে, ঢেউ খেলছে, পুব মুখো তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ ব্যথা করে ফেললেও পার দেখা যাবে না। জলরাশির মাঝখানে বিশাল বটগাছটা দেখা যাচ্ছে ঠিক। আরও কিছু দূরে খড়ের ঘর কয়েকটা। অর্থাৎ ন্যাড়া সমুদ্র নয়—সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপও রয়েছে দস্তুরমতো। সমুদ্রে জাহাজের চলাচল—আমাদের এই গেঁয়ো-সমুদ্রে তালের ডোঙা। কালো কালো তালের ঠোঙা—তালের গুঁড়ির শাঁস খুঁড়ে ফেলে ডোঙা বানানো—শীতকালে ও চৈত্রের খরায় খানাখন্দে জল-কাদার মধ্যে ডোবানো ছিল। ভিজে থাকে যাতে, ফাটল না ধরে পাঁচ-ছ'মাস আত্মগোপনের পর অফুরন্ত জল পেয়ে গা-ভাসান দিয়েছে তারা সব। খটখট খটখট লগি বাইতে গিয়ে ডোঙার গায়ে ঘা পড়ছে। বিষম স্ফূর্তি আজ—মাথা দুলিয়ে অবাধে বিলের উপর সাঁ-সাঁ শব্দে ডোঙারা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে।

আর স্ফূর্তি মাছুড়েদের। বিল ফুঁড়ে রাজীবপুরের রাস্তা—এদিকে আসান নগরের বিল, ওদিকে চাতরার বিল। রাস্তার দুধারে পঞ্চাশ-ষাটজন ছিপ নিয়ে বসে গেছে। এ-বিলে ও-বিলে জল চলাচলের জন্য পাকা গাঁথনির প্রাচীন মরগা। ভেঙেচুরে গেছে এখন—ইট খুলে খুলে রাস্তার কাদার উপর দিয়ে পথিকজন সন্তর্পণে পা ফেলে চলে যায়। শুকনোর সময় পাশের খটখটে বিলে গরু-ছাগল বাঁধে, মরগার ইট খুলে ঘা মেরে মেরে খুঁটো পোতে তখন। এদিকে-ওদিকে পাকা-মরগার সামান্য নিশানা. বর্ষাকালে পারাপারের জন্য মাঝখানটায় বাঁশের সাঁকো বেঁধে নেয়। বর্ষান্তে সাঁকোর কাজ থাকে না, লোকে ভেঙেচুরে নিয়ে উনুনে পোড়ায়। বছর বছর নতুন সাঁকো বাঁধতে হয়, এবারও লেগে যাবে বাঁধতে। রাস্তার এপারে-ওপারে সারি-সারি মাছুড়েরা নির্বাক, নিশ্চল। নালশো অর্থাৎ লাল-পিঁপড়ের ডিম ছোটবড়শির আগায় গেঁথে নয়ানজুলিতে ফেলে, আর টান দেয়। টানে টানে পুঁটিমাছ। রোদের মধ্যে চাঁদিরুপোর টুকরোর মতন ঝিকঝিক করে জল থেকে উঠে আসে। খালুইতে ছুঁড়ে দিয়ে আবার ফেলল। মাছেরা লুকিয়ে আছে, সবুর সয় না। জলে পড়তে-না-পড়তে এসে টোপ ধরে—অমনি টান। যেন মেশিনের কাজ। এদিকে-ওদিকে পাশাপাশি সবগুলো ছিপ তুলেছে। খালুই ভরে ওঠে দেখতে দেখতে।

ডোঙা নয়ানজুলিতে এসে পড়লে হাঁ-হাঁ করে ওঠে নানাদিক থেকে: মাছ খাঁটা দিও না, হাত নরম করে দূরে দূরে লগি মারো। চারো-ঘুনি-ঝুনসি মাছ ধরার নানান সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়েছে, জায়গা বুঝে পেতে আসবে। মানুষ জন এদিগের এইবার খোঁড়া হয়ে পড়ল। ডোঙায় চড়ে যাবতীয় কাজকর্ম। আর

কিছুদিন পরে জল আরও বাড়লে ডোঙার যোগর ভিড়িও বিস্তর এসে পড়বে। মানুষের পা নামক অঙ্গ এই চার-পাঁচ মাস একেবারে না থাকলেই বা কি।

জল দেখে বুধোর বউর বাপের-বাড়ি যাবার শখ হল। মা বুড়ি ভুগছে অনেক দিন, মেয়ের জন্য পথ তাকাচ্ছে। এদ্দিন যেতে হলে গরুর-গাড়ি ছাড়া উপায় ছিল না—তিন টাকা দিতে হবে ভাড়া। দিচ্ছে কে রোক টাকা? অসুস্থ মায়ের জন্য এটা-সেটা গুছিয়ে পেঁটরা ভরেছে। ভবনাথের ভিটে-বাড়ির প্রথা—সন্ধ্যাবেলা বউ মনিব-বাড়ি গিয়ে বড়গিন্নি ছোটগিন্নি উভয়ের পায়ের ধুলো নিয়ে বন্দে-করে এলো। ঘাটে ডোঙা এনে রেখেছে—শেষরাত্রে চাঁদ উঠে গেলে পেঁটরা মাথায় নিয়ে বুধো আগে আগে চলল, পিছনে বউটা হাতে বোঁচকা ঝুলিয়ে নিয়েছে, ছোট একটা পিঁড়িও নিয়েছে আরামে বসবার জন্য। ডোঙা বেয়ে নিয়ে যাবে বুধো, এই মওকায় তারও অনেকদিন পরে শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হচ্ছে।

॥ তেরো ॥

গড়মণ্ডলের রথের মেলার নামডাক খুব। গ্রামটা হরিহর গাঙের উপরে, সোনাখড় থেকে ক্রোশ চারেক দূর। নাম শুনে মনে হবে মস্ত এক জায়গা, গড় টড় অনেক কিছু আছে। ছিল হয়তো কোন এক কালে—ভিতাক ভাঙা দালানকোঠা আছেও দু-চারটে। গ্রাম জুড়ে এখন কেবল বেতবন বাঁশঝাড় কসাড় জঙ্গল আর মজা-পুকুর। বসতি যৎসামান্য: ব্রাহ্মণ ও বারুজীবী আছেন কয়েক ঘর, বাকি সব জেলে। আর আছে তিনটে নাম—সরখেলবাড়ি সরকার-বাড়ি মুস্তোফি-বাড়ি—জঙ্গলে-ঢাকা ইটের স্তূপ, সাপ আর বুনো-শুয়োরের আস্তানা। লোকে তবু সম্ভ্রম করে তিন বাড়ির কথা বলে থাকে।

এখন ভগ্নস্তূপ, একদা অনেক ছিল। রথের আড়ং সেই পুরানো কালের সাক্ষি। তল্লাটের মধ্যে এত বড় মেলা দ্বিতীয় নেই। মেলার মালিক বারুজীবী সরকারমশায়রা। অবস্থা পড়ে গিয়েছে, কষ্টে-সৃষ্টে দিন কাটে, সারা বছর মেলার জন্য মুকিয়ে থাকেন। দোকানপাট ও মানুষজনে হপ্তা-খানেক ধরে গ্রাম গমগম করে, মালিকদের রীতিমত দু-পয়সা লভ্য হয়। দীর্ঘ রাস্তা গ্রামের এ সীমানা থেকে ও-সীমানা পর্যন্ত। চওড়াও যথেষ্ট। অন্য সময় আগাছা ও ঘাসবনে ঢেকে যায়. পায়ে-চলা একটুকু সুঁড়িপথ নিশানা থাকে শুধু। আড়ঙের সময় দোকানিরা জঙ্গল সাফসাফাই করে নিয়ে চালাঘর তোলে। খুঁটি পুঁততে গিয়ে ইট বেরোয়। বোঝা যায়, সমস্তটা ইটে বাঁধানো

পাকারাস্তা ছিল—উপরে এখন মাটির আস্তরণ পড়ে গেছে। সরকারবাড়িতে যদুপতি নামে বিশেষ এক ভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন, তাঁরই কীর্তি এ-সমস্ত।

রথের উপরে জগন্নাথ-দর্শন হলে মুক্তি মুঠোয় এসে গেল, বারম্বার জন্ম নিয়ে সংসারের দুঃখ-ধান্দা ভুগতে হবে না। রথযাত্রার মুখে যদুপতি পুরী চলেছেন—অনাথ দরিদ্র ক্ষেন্তি-বুড়ি এসে পথ আটকাল: তোমার বাবা কতটুকু আর বয়স, পয়সা আছে বলেই যেতে পারছ। আমি বুড়োমানুষ, আজ বাদে মরে যাব, দর্শনে আমারই গরজ বেশি। ছাড়ব না তোমায়, আমি সঙ্গে যাব।

বুড়ির ধরাধরি কান্নাকাটিতে যদুপতি দোমনা হলেন। রটনা হয়ে গেল, যদুপতি ক্ষেন্তি-বুড়িকে শ্রীক্ষেত্র নিয়ে যাচ্ছেন, জগন্নাথের রথ দেখাবেন। সাড়া পড়ল চতুর্দিকে—জ্ঞাতিগোষ্ঠি আত্মীয়কুটুম্ব সকলে তখন দাবিদার। ক্ষেন্তি-বুড়ি যেতে পারে, আমরাই বা কি দোষ করলাম? আমাদেরও নিয়ে যেতে হবে।

ওরে বাবা, কী কাণ্ড। গ্রাম কুড়িয়ে-বাড়িয়ে সঙ্গে নিতে হয় যে! যদুপতি সকাতরে বললেন, মা-সকল বাবা-সকল আমায় একলাই যেতে দাও। তন্নতন্ন করে দেখে বুঝে আসব। তোমাদের দশজনের আশীর্বাদে তীর্থসিদ্ধি করে সুভালাভালি যদি ঘরে ফিরতে পারি—কথা দিয়ে যাচ্ছি, এই গড়মণ্ডলেই আগামী সব রথযাত্রা হবে। পুরীধামে যেমন যেমন হয়, ঠিক তেমনটি। কথায় বিশ্বাস করে ছেড়ে দাও আমায়, পথে বেরিয়ে পড়ি।

পুরী যাওয়া বড় কষ্টকর তখন। চাল-চিঁড়ে নিয়ে পায়ে হেঁটে যেত লোকে, এক-মাসের উপর লাগত। যদুপতি বুঝিয়ে বললেন, সবসুদ্ধ কষ্ট করার কি দরকার। কষ্ট একলা আমার উপর দিয়েই যাক। সামনের আষাঢ়ে আমাদের এখানেই জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম রথে চড়ে মাসির বাড়ি যাবেন।

যে কথা, সেই কাজ। সেই কত দূরের শ্রীক্ষেত্র থেকে যদুপতি জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের বিগ্রহ কাঁধে করে গ্রামে নিয়ে এলেন। প্রশস্ত পথ বানানো হল গ্রামের মাঝখান দিয়ে, দৈর্ঘ্যে আধক্রোশ। পথের দু'মাথায় দুই মন্দির—একটি ঠাকুরবাড়ি, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত যেখানে। অপরটি মাসির বাড়ি, রথযাত্রার দিন বিগ্রহেরা যেখানে গিয়ে উঠবেন। মন্দিরের চিহ্নমাত্র নেই এখন, মেলাক্ষেত্রের এদিকে আর ওদিকে জঙ্গলে-ঢাকা ইটের স্তূপ দুটো। রথও নেই—প্রাচীনদের মুখে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাঁদের আমলের প্রাচীনদের মুখে তাঁরা গল্প শুনেছিলেন। দৈত্যাকার রথ—চল্লিশ হাত উঁচু। চাকা যোলখানা, ঘাড়-বাঁকানো তেজীয়ান কাঠের ঘোড়া ছয়টা। অ্যাব্বড়ো অ্যাব্বড়ো দুই-চোখ, বিঘত-মাপের গোঁফ, কাঠের সারথি। মুণ্ডটা কি ভাবে সংগ্রহ করে আর্টিস্ট জটাধর বাড়িতে এনে রেখেছে—পুরো সারথির তাই থেকে আন্দাজ পাওয়া

যাবে। পাঁচটি থাক রথের, পাঁচটি বড় চূড়া—তা ছাড়া খুচরা চূড়াও বিস্তর। উঁচুতে পনের হাত। আর বাড়ানো গেল না—বড় বড় ডাল কেটে ফেলতে হয়, মালিকদের আপত্তি। শত শত মানুষ রথ টানতে আসে, পথ চওড়া করতে গিয়ে গণ্ডগোল। জমি কেউ ছাড়বে না, মূল্য দিলেও না। যদুপতিও জেদি মানুষ, হার মেনে পিছিয়ে আসবেন না কিছুতে। ফলে দাঙ্গাহাঙ্গামা ফৌজদারি। সর্বস্বান্ত হয়ে যদুপতি অসুখে শেষটা পঙ্গু হয়ে পড়লেন। রথটানা বন্ধ। অচল রথের পূজো হল কিছু দিন, যদুপতি মারা যাবার পরে তা ও বন্ধ। রথের কাঠকুটো লোকে ইচ্ছা মতন ভেঙেচুরে নিয়ে গেল। পরবর্তীকালে রীতি-রক্ষার মতন রথ-টানা আবার চালু হয়েছে। গাঁওটি-রথ—গ্রামের দশজনে চাঁদা তুলে চলায়। নিতান্তই ছেলেখেলা সেকালের তুলনায়। দরিদ্র গ্রামবাসী—বিশ-পঁচিশের বেশী চাঁদা ওঠে না, ভাল রথ কেমন করে হবে? কিন্তু মেলার জাঁকজমক ঠিকই আছে—বেড়েছে বই কমেনি।

এবারে রথের সঙ্গে ইদ ও রবিবার জুড়ে গিয়ে কাছারি তিন দিন বন্ধ। মাদার ঘোষ বাড়ি এসে হারুকে প্রস্তাব দিলেন: রথের মেলায় যাই চলো। দু-তিন বছর যাওয়া হয়নি।

হারু বলে, শুধু রথ দেখা?

হেসে মাদার বলেন, ঠিক ধরেছ, কলা বেচাও আছে। রং-কাপড় কিনে দিলাম, সিনের কদ্দুর কি করল দেখে আসা যাবে। কাজ দেখে তোমাদের যেমন মনে হয় বলবে।

গরুর-গাড়ি ভাড়া হল। গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে না কেউ অবশ্য—থাক তবু সঙ্গে। খাট-চেয়ার পিঁড়ি-দেলকো থেকে মেলতুক-রামদা ইত্যাদি কাঠের ও লোহার ভাল ভাল জিনিস মেলায় আমদানি হয়। স্থানীয় কারিগরদের গড়া, দামেও সুবিধা। অল্পবিস্তর নিশ্চয় কেনাকাটা হবে, ফিরতি বেলা গাড়ি বোঝাই হবে সেই সব।

শেষরাত্রে বেরিয়ে পড়লেন। চারজন—মাদার হারু ঝন্টু ও হিমচাঁদ। পোহাতি-তারা আকাশে জলজল করছে। চারিদিকে আঁধার-আঁধার ভাব। শিউলি-তলায় ফুলের খই ছড়িয়ে আছে, এখনো পড়ছে ফুল। বকুলতলাতেও তাই নতুনবাড়ির বড়পুকুর-ঘাটের দু-দিকে বিশাল দুই কামিনীগাছ—ঘাটের রানায়ের উপর সাদা কামিনীফুল সন্ধ্যা থেকে পড়ে গাদা হয়ে গেছে। গ্রাম ছাড়িয়ে হাটের রাস্তায় এইবার। বিলের ধারে ধারে চলেছেন। ভোরের হাওয়া দিয়েছে—গা শিরশির করে, তবু বেশ আরাম।

গাছে গাছে পাখির কলরব। খানাখন্দ জলে টইটম্বুর, শাপলাফুল হাজারে

হাজারে দল মেলে আছে। আউশক্ষেতের চেহারা গাঢ় শ্যাম, উপর দিয়ে শনশন করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে, ধানবনে ঢেউ উঠছে। পূবের আকাশ ডগমগে-লাল হয়ে উঠল, বিলের উপরে ঝিকমিক আভা। ডোঙা নিয়ে ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে মানুষ চারো-ঘুনসি তুলে তুলে মাছ ঝেড়ে নিচ্ছে। আষাঢ়ের দিনেও সারা আকাশে এক টুকরো মেঘ নেই—বড় সুন্দর সকালবেলা।

পথের মাঝখানটা পায়ে পায়ে কাদা হয়ে গেছে. কাদা এড়িয়ে পাশে পাশে ঘাসের উপর দিয়ে যাচ্ছেন। পা হড়কে ঝন্টু ধপাস করে আছাড় খেয়ে পড়ল—কাদায় জলে মাখামাখি। পাশের নয়ানজুলিতে গা-মাথা ও কাপড়-জামার কাদা ধুয়ে গরুর-গাড়ির জন্য দাঁড়িয়ে আছে। শুকনো কাপড় বোঁচকায় বাঁধা, গাড়িতে আসছে। গাড়ি বেশ খানিকটা পিছনে, দাঁড়িয়েই আছে তারা। গাড়োয়ানের উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে উঠল: কই, কি হল তোমার? গরু যেন শুয়ে শুয়ে আসছে।

অপমান হল বুঝি গরুর নিন্দায়। লেজ মলে ডা-ডা ডা-ডা করে তাড়িয়ে অল্প সময়ে গাড়ি এসে পড়ল, গরুর ক্ষমতাটা দেখিয়ে দিল।

চারজনে উঠে বসলেন গাড়িতে। ছই নেই। চড়া রোদ্দুর, তবে হাওয়াটা ঠাণ্ডা। চলেছে, চলেছে। মাছনা নামে এক গণ্ডগ্রামে এসে পড়ল। জমিদার-কাছারির সামনে দিয়ে পথ। চারিদিকে গাছপালা—আম জাম কাঁঠাল নারকেল সুপারি। ছায়া-ছায়া জায়গা। চার-পাঁচ খানা ঘর ইতস্তত—কাচনির বেড়া, খড়ের ছাউনি। চালের উপর কুমড়া ফলে আছে, উঠানের মাচায় ঝিঙে পোল্লা বরবটি উঠছে। কেন্দ্রস্থলে মূল-কাছারির একটু বিশেষ কৌলিন্য—মেটে-দেয়ালের আটচালা ঘর। রান্নাঘরের পাশে ছাই-গাদা এই উঁচু হয়ে উঠেছে, নেড়িকুকুর একটা কুণ্ডলী পাকিয়ে আরামে তার উপর শুয়ে আছে। গরুর-গাড়ি দেখে গায়ের ছাই ঝেড়ে ঘেউ-ঘেউ করে তেড়ে আসে। গাড়ির উপর থেকে ছাতি উঁচাল তো সোঁচা দৌড়। ঘেউ-ঘেউ তিলেকের তরে ছাড়ে না, খানিকটা গিয়ে ফিরে দাঁড়ায় আবার কুকুর।

তহশিলদার নিশি বোস ডোবার ঘাট থেকে রাস্তা পার হয়ে কাছারির উঠোনে ঢুকছিলেন, 'এইও' 'এইও' হাঁক পেড়ে কুকুর সামলাচ্ছেন তিনি। কাছে এসে অবাক হয়ে বললেন, হিমে মামা না? কোথায় চললে তোমরা সব? তা আর এগোচ্ছ কেন. গাড়ির মুখ ঘোরাও গাড়োল।

হিমচাঁদের সঙ্গে নিশিকান্ত কি রকমের মামা-ভাগনে সম্পর্ক—ঠিকঠাক বুঝতে গেলে কাগজ-কলম লাগবে, এমনি-এমনি হবে না। কিস্তির মুখে সোনাখড়িতে যখন আদায়-তহশিলে যান, হিমচাঁদের বাইরের ঘরে অস্থায়ী-

কাছারি বসে। সেই অবস্থায় নিশিকান্ত চণ্ডমূর্তি—এমনি কিন্তু মানুষটি সামাজিক খুব। খেতে ও খাওয়াতে জুড়ি মেলা ভার।

ছুটে এসে গাড়ির মুখোমুখি হয়ে নিশিকান্ত জোয়াল এঁটে ধরলেন। বলেন আড়ঙে যাচ্ছ—এখন কি তার? সে তো বিকেলবেলা। খেয়েদেয়ে নাক ডেকে ঘুমোও পড়ে পড়ে—ঠিক সময়ে আমি রওনা করে দেবো। আমাদের বরকন্দাজ আর যতীন মুহুরিও যাবে বলছিল, দল বেঁধে সব যেতে পারবে।

মাদার আপত্তি করে বলেন, আড়ঙে যাওয়া আসল নয়। শুনেছেন বোধহয়, এবারের আশ্বিনে পুজো-থিয়েটার দুই রকম হচ্ছে আমাদের সোনাখড়িতে থিয়েটারের সিন আঁকছে ওখানে। কেমন হল, দেখতে যাচ্ছি।

ওখানে মানে গঞ্জমণ্ডলে আপনাদের সিন আঁকছে? বিস্ময়ে নিশি বোস প্রশ্ন করলেন।

আজ্ঞে হাঁ। আর্টিস্ট জটাধর সরকার আঁকছেন।

হিমচাঁদ বললেন, জাঁদরেল আর্টিস্ট—এঁদের দেখে আর্ট-ইস্কুল তাজ্জব মেনেছে।

ঝন্টু জুড়ে দেয়: হাতে সময় নিয়ে বেরিয়েছি সেই জন্যে। ডাল ভাত চাট্টি ওখানেই খেয়ে নেওয়া যাবে।

যেতে দিলে তবে তো!

শেষের কথাগুলো নিশি আমলেই নিলেন না, বিড়-বিড় করে আর্টিস্ট জটাধর মানুষটির হদিস খুঁজছেন। চিনেও ফেললেন। অবাক হয়ে বলেন, বলো কি হে, এত গুণের মানুষ? হাটে হাটে তবে পান বেচে বেড়ায় কেন?

মাদার একটু মুসড়ে গেলেন: পান বেচে নাকি?

ঝন্টু সামলে দেবার চেষ্টা করে বলে, পানের খদ্দের যে-না সেই, ছবির খদ্দের ক'টা আছে বলুন?

তা বটে, তা বটে—

নিশি প্রণিধান করলেন। এবং মাদারও। ইতিমধ্যে জোয়াল থেকে গরু খুলে কাঁঠালগাছের ছায়ায় বেঁধে দিয়েছে। পোয়ালগাদা দেখিয়ে গাড়োয়ানকে নিশি বললেন, চাট্টি চাট্টি পোয়াল এনে গরুর মুখে দাও। আর গাছে উঠে কাঁদি দুই-তিন ডাব পেড়ে ফেল। ভাতের দেরি আছে, শাঁসে জলে পেটে ভর দিয়ে নাও খানিক।

তুমুল হৈ চৈ লাগালেন তিনি। মুহুরি যতীনকে বললেন, ঘাটে ভাত কুঁড়োয় চার দিয়ে খেপলাজাল ফেল দিকি। বড় রুইটা যদি বেড়ে ফেলানো যায়।

মাদার বললেন, বেলা হয়ে গেছে—এখন আর ওসব ঝঞ্ঝাটে যাবেন না

নায়েবমশায়। উপস্থিত মতন যা আছে, তাতেই হয়ে যাবে।

নিশি ঘাড় নাড়লেন : তাই কখনো হয়। হিমে-মামার কথা না-ই ধরলাম—আউনাদের এতজনকে আর কবে পাচ্ছি বলুন।

বরকন্দাজ ডাকাডাকি লাগিয়েছেন : কাঁহা গিয়া হরি সিং—হরি সিং গেল কোথা? কুটুম্বলোক আয়া—কুটুম্বরা সব এসেছেন। পাড়ায় এখন সব গাই দুইছে, কলসি লেকে বেরিয়ে পড়ো। চার সের পাঁচ সের যদ্দুর পাও, নিয়ে এসো।

খাওয়াদাওয়ার অল্প পরেই রওনা। দিনের জন্য উদ্‌গ্রীব—তাড়াতাড়ি গিয়ে পড়া দরকার। ঘোর হয়ে গেলে কিম্বা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে, রঙের জৌলুষ ঠিকমতো ধরা যাবে না। পথে ভিড়, আড়ঙে চলেছে সব—বুড়ো যুবা বাচ্চা, নানান বয়সের। হাতে বাঁশের লাঠি, লাল গামছা কোমরে বাঁধা, নিতান্ত বাচ্চাগুলোকে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে। শৌখিন কারো বা এক-হাতে ছাতা, এক-হাতে বার্নিশ-চটি, অঙ্গে ফুল-কাটা কামিজ। বাহারে টেড়ি কেটেছে তেল-জবজবে চুলের মাঝামাঝি চিরে।

মেয়েরাও সঙ্গে। পাছাপেড়ে শাড়ি পরনে, হাতে রূপোর বালা, একগোছা বেলোয়ারি চুড়ি, কোমরে গোট, কানে ইয়ারিং বা ইছদি-মাকড়ি, নাকে নথ, গলায় দানা, কপালে টিপ চোখে কাজল, কপালে এ্যাব্বড়ো সিঁদুরফোঁটা—বয়সকেলে যারা, মোটামুটি এমনিতরো সাজগোজ তাদের।

চড়চড়ে রোদ, মেঠো রাস্তা। থোলো থোলো কালো জাম পেকে আছে; তেষ্টা মেটাতে গাছে উঠে পড়েছে ক-জন, তলায় ঘিরে দাঁড়িয়ে কাকুতিমিনতি করছে কেউ কেউ। জাম ফেলছে না গাছের মানুষ, খেয়ে আঁটি ছুঁড়ে মারছে।

আড়ঙে অনেক গরুর-গাড়িতেও যাচ্ছে, হারুদের আগে পিছে আট-দশখানা হয়ে গেল। পাল্লাপাল্লি চলছে কে আগে গিয়ে উঠতে পারে, গরু ঘোড়ায় কান মলে দিচ্ছে দৌড়ানোর বাবদে। মাঠ ছাড়িয়ে কয়েকটা বাঁশবন ও ধবধবির খাল পার হয়ে গড়মণ্ডল। এবং অনতিপরেই রথতলা—আড়ঙ যেখানে বসেছে।

কত দূর-দূরন্তর থেকে লোক আসছে। দোকানদারই বা কত? জঙ্গল সাফ-সাফাই করে সারি সারি ছাপড়া বেঁধে নিয়েছে। দোকানের মালপত্র গরুর-গাড়ি বোঝাই হয়ে এসেছে, হরিহরের উপর দিয়ে জলপথেও এসেছে। কাপড়ের দোকান, লোহার দোকান, কাঠের দোকান, পিতল-কাঁসার দোকান, পাথরেবাড় দোকান—দোকানের অবধি নেই।

মেলার মধ্যে গাড়ি ঢোকে না; গাঙ-কিনারে উলুবনে নিয়ে রাখছে। গাড়িতে গাড়িতে জায়গা ভরে গেল। সামান্য দূরে কীর্তিমান যদুপতি সরকারের

অট্টালিকার অবশেষ। রাস্তার সামনে ছিল ঠাকুরবাড়ি, তারই গায়ে দেউড়ির চিহ্ন। ভিতর দিকে এগিয়ে যাও—দু-পাশে কুঠুরি আত্মীয়-কুটুম্ব ও বাইরের লোকের জন্য। কয়েকটার আচ্ছাদন আছে, মেলা উপলক্ষে সাফসাফাই হয়েছে সেগুলো। ছাতে বারোমাস চামচিকে ঝোলে—চামচিকে তাড়ানো হলেও একটা উৎকট গন্ধ কিছুতে ছাড়ায় না। তাহলেও মোটামুটি বাসযোগ্য হয়েছে — বৃষ্টিবাদলা হলে মানুষজন আশ্রয় নিতে পারবে, রাঁধাবাড়া করে খেতেও পারবে।

গরুর-গাড়ি ছেড়ে মাদার ঘোষের দল মেলার রাস্তায় এগিয়ে চলল।

মিঠাইয়ের দোকানে তেলেভাজা জিলিপি এক পয়সায় চারখানা। মুড়ি পাহাড়ের চুড়োর আকৃতিতে ডালির উপর উঁচু হয়ে রয়েছে। যত মুড়ি দেখা যায়, আসলে তার সিকির সিকিও নয়। উপুড়-করা ডালির উপরে মুড়ি ঢেলে রেখেছে, অত উঁচু দেখাচ্ছে তাই। মুড়ি আর চিনির-রথ দু-আনার মতো কিনে চার জন চিবোতে চিবোতে চলল।

নগরকীর্তন বেরিয়েছে। হেলতে দুলতে অতি মন্থর যাচ্ছে। বষীয়সীরা ঢিবঢিব করে পায়ে পড়ে পদধূলি নিচ্ছেন। ইচ্ছে হলেও ভিড় ঠেলে তাড়াতাড়ি এগোবার জো নেই। কুমোরের দোকান—মাটির খেলনা, কত ছাই। হাঁড়ি বাঁশি—ছোট্ট হাঁড়ি দাগচোক-আঁকা, একদিকে নল, নলে ফুঁ দিলে মিষ্টি সুর বেরোয়। মাটির জাঁতা-হাঁড়ি-কলসি-তাওয়া-শিলনোড়া। নাড়ুগোপাল—নীল পুতুল হামাগুড়ি দিয়ে আছে, ডান হাতে বলের মতন বস্তু—মাখনের ডেলা বলে ধরে নিতে হবে। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি, কলসি-মাথায় রমণী, হাতির শুঁড়ওয়ালা গণেশ।

রকমারি শোলার জিনিস এসেছে। দাঁড়ে টিয়াপাখি, পালকিতে বর। দড়ির টানে হনুমান কলাগাছে ওঠে আর নামে। সাপ ছোবল মারে, আবার ঘাড় নুইয়ে পড়ে। কামারের জিনিস: ছুরি বঁটি কোদাল কাটারি—

থাক, কেনাকাটা পরে হবে—ফিরতি বেলা। বরঞ্চ পান খেয়ে নেওয়া যাক।

নাগরদোলায় কাঠের ঘোড়া বনবন করে পাক খাচ্ছে। অল্প দূরে বাঁশে-ঘেরা মাল-লাগার জায়গা। ঢোল বাজছে। এ তল্লাটের বিখ্যাত মাল কেতুঢালি এসেছে—দৈত্যসম চেহারা, গায়ের জোর ছাড়াও গুণজ্ঞান বিস্তর। ধুলো পড়ে গায়ে ঘষে নেয়, তারপর দা দিয়ে কোপালেও গায়ে বসবে না। বেশি কোপাকোপি করলে দায়েরই ধার পড়ে যাবে, কেতুর কিছু হবে না। কেতু কিন্তু নিজে এখন নামছে না, যোগ্য প্রতিপক্ষের অপেক্ষায় আছে। কৌতুকদৃষ্টি মেলে হালের ছোকরাদের কাজকর্ম দেখছে।

পানের দোকানে, সরবত-লেমনেড নয়, রঙিন জল বোতলে ভরে বিছাবিছি

সাজিয়ে রেখেছে দোকানের বাহার। ডবল-খিলি সেজে দিচ্ছে—তাকিয়ে তাকিয়ে চতুর্দিকে দেখছে এরা। মেলার মালিক সরকারমশায়রা বেরিয়ে পড়েছেন, মুটে সঙ্গে নিয়ে তোলা তুলছেন। জিজ্ঞাসাবাদ নেই—থাবায় ডালায় হাত ঢুকিয়ে মুঠো করে তুলে নিয়ে মুটের মাথায় ঝুড়ির মধ্যে ফেলছেন। নিও না, অত নিলে বাঁচব না কত্তা—বলছে দোকানি, কাকুতিমিনতি করছে। দয়া হল তো মুঠো থেকে কিছু পরিমাণ রাখলেন আবার ডালায়।

জয় জগন্নাথ, হরিবোল, হরি হরিবোল—তুমুল বোল ওদিকে। রথ বেরিয়েছে। কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে, ঢোল-কাঁসিও আছে একজোড়া। চারদিক থেকে পানের-বিড়ে সুপারি পাকাকলা বাতাসা পয়সাকড়ি পড়ছে রথের উপর। যত্নপতি সরকারের রথ একদিন চলতে এখানে—এই রাস্তার উপর দিয়ে, মহাবৃক্ষ ঐ আমগাছের বড় ডালখানা ছুঁয়ে যেত। আর এখানকার এই রথ একমানুষের সমান বড় জোর। আয়তন যাই হোক, বিষম হল্লোড়। ভক্তজনেরা পাগল হয়ে উঠেছে—রথের উপরের ঠাকুর দেখবে, রথের রশি একটুকু ছোঁবে। মেয়েরা একদিকে গাদাগাদি হয়ে দাঁড়িয়েছে, রথ কাছাকাছি হলে গলায় আঁচল দিয়ে যুক্তকরে প্রণাম করছে, উলু দিয়ে উঠছে কলকল করে।...

অং বং ছাড়িয়ে আরও পোয়াটাক গিয়ে আর্টিস্ট জটাধরের বাড়ি। সাতচালা ঘর একখানা—এ পাশে কামরায় স্টুডিও, মাঝের বড়ঘরে বউ ছেলেপুলেরা থাকে। মুহুরি সুরেন বিশ্বাসকে দিয়ে মাদার চিঠি লিখিয়ে দিয়েছেন, রথের সময় গিয়ে সিনের কাজকর্ম দেখবেন। জটাধরও তৈরি—ধোপদুরস্ত কামিজ গায়ে দিয়ে চুলে টেড়ি বাগিয়ে দুপুর থেকে ঘর-বার করছে। একখানা সিন পুরোপুরি শেষ করে ফেলেছে ইতিমধ্যে, হাত লাগালে গুণিজনের ক'দিন লাগে। সিন শেষ করে তলপ্রান্তে পরিপাটি করে জড়িয়ে রেখেছে।

গড়মণ্ডলের মানুষ গোড়ায় বিশ্বাস করেনি—জটাধর ধাপ্পা দিয়ে খাতির বাড়াচ্ছে ভেবেছিল। কিন্তু সে নাখড়ির চার মাতব্বর গরুর-গাড়ি করে কাজ দেখতে এসেছেন, এর পরে মানুষটাকে হেলা-ফেলা করা যায় না। গাঁয়ের মানুষও একপাল জুটে গেছে—কাজ তারাও দেখবে, রথের মেলা ফেলে সঙ্গে সঙ্গে চলল।

সিন বের করে জটাধর উঠানে নিয়ে এলো। উজ্জ্বল আলো উঠানে, দিব্যি খুঁটিয়ে দেখা চলবে। দুই ছোকরা বাঁশের দুই মুড়ো ধরে আছে, আর্টিস্ট নিজে অতি সন্তর্পণে গুটানো সিন খুলে দিচ্ছে। একটু একটু করে খুলে আসছে—আশ্চর্য এক রহস্যের উন্মোচন যেন—আর জটাধর তাকাচ্ছে ঘন ঘন মাদার মোষের দিকে।

চোখ বড় হয়ে গেছে মাদারের। সগর্বে জটাধর গ্রামবাসীদের দিকে তাকায়—কী হে বড় যে আমায় হেনস্থা করতে! ভাবখানা এই প্রকার। হারুর কিন্তু ভাল মনে হচ্ছে না। এমনিধারা চোখ বড়-বড় করা দেখা আছে ইতিপূর্বে। মাদার ঘোষের অনেক গুণ, কিন্তু বিষম বদরাগি। রেগে গেলে স্থান-কাল বিস্মরণ হয়ে যান। সিঁধের মুখে একবার চোর ধরা পড়েছিল। মাদার ঘোষ গিয়ে বললেন, সে তো বুঝলাম খোওয়া-তুলসিপাতা তুই, কিন্তু কুলবেড়ের মানুষ হয়ে সোনাখড়ির মন্তবাড়ি কেমন করে এসে পড়লি বুঝিয়ে দে তো শুনি। চোরের কৈফিয়ত: মাঠ ভেঙে কুটুমবাড়ি যাচ্ছিল বেচারি, আচমকা একটা খারাপ বাতাস উঠে এখানে উড়িয়ে এনে ফেলেছে (খারাপ বাতাস মানে অপদেবতা)। সেই বাতাসই বুঝি সিঁধকাঠি তোর হাতে গুঁজে দিয়ে গেছে? মাদার ঘোষ প্রশ্ন করলেন। আর পাশে-দাঁড়ানো হারু সেই সময় ঠাহর করেছিল, মাদার ঘোষ চোরের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়েছিলেন অবিকল এই আজকের মতন। আর্টিস্ট দু-পাটি দাঁত মেলে হেসে হেসে পড়শিদের কাছে বাহাদুরি নিচ্ছে, কিন্তু বহুদর্শী হারুর মুখ শুকাল। গ্রামের উপর যেমন খুশি চোর পেটানো যায়, এখানে ভিন্ন এলাকায় বেকায়দা না সামলালে চোরের মার নিজেদেরই খেয়ে যেতে হবে।

তা মাদার ঘোষ বুঝেছেন বোধহয় সেটা। মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে আর্টিস্টের সঙ্গে আলাপন চালাচ্ছেন: অরণ্যের দিন বুঝি।

অবোধের মতন কথা শুনে জটাধর একগাল হেসে বলল, দরবার-কক্ষ।

মন্টু বলে, এদিক-সেদিক মস্ত মস্ত গাছ—কক্ষের ভিতরে এত গাছ গজাল কেমন করে?

জটাধর বুঝিয়ে দিল: কক্ষের থাম্বা এগুলো।

হিমচাঁদ বলছেন, থামে যেন কাঁঠাল ফলে আছে—

কাঁঠাল নয়, ঝাড়লণ্ঠন।

বুঝেছি—বক দিয়ে মাদার আর্টিস্টকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, গাঙের ঘাটে চলো আমার সঙ্গে।

এই রে, ধরে গাঙে চুবানোর বোধহয় মতলব। বিচিত্র নয় ঐ রাগি মানুষের পক্ষে। মাদার নিজে পা বাড়ালেন গাঙের দিকে, আদেশ করলেন: চলে এসো।

ছোকরাদের উদ্দেশ করে বললেন, বাঁশ খুলে ফেলে সিনটাও আনো।

হতভম্ব হয়ে জটাধর প্রশ্ন করে: গাঙে কি?

আর্টিস্ট বলে ভাঁওতা দিয়েছিলে। রং মেখে এতটা কাপড় নষ্ট করেছ—রং ধুয়ে সাফসাফাই করে দিতে হবে।

জোর দিয়ে মাদার আবার বলেন, তুমি মাখিয়েছ—নিজের হাতে তোমা-কেই ধুতে হবে।

হারু বলল, সদর থেকে সিন ভাড়া করে আনব—আগে যা কথা হয়েছিল। তা ছাড়া উপায় নেই। সিনের নামে থানকাপড় কেনা হয়েছে—সেলাই করে সামিয়ানা বানাব। সামিয়ানারও তো দরকার।

জেদি মানুষ মাদার ঘোষ, যা বলছেন তাই করিয়ে তবে ছাড়লেন। গতিক বুঝে জটাধরও প্রতিবাদের সাহস পেল না। গাঙের একহাঁটু জলে দাঁড়িয়ে সিন কাচছে। গাঁয়ের ছোকরাগুলো ফ্যা-ফ্যা করে হাসছিল, তারপর আড়ালে চলে গেল।

ভিজে থানের জল নিংড়াতে নিংড়াতে জটাধর উঠে এসে বলে, আমার বিশটা দিনের খাটনি, তার কিছু পাওনা হবে না?

হিমচাঁদ হারুকে ফিস-ফিস করে বলেন, এই মরেছে, পাওনার কথা বলছে যে। মাদার-দা এবারে তো পাওনা শোধে লেগে যাবেন—আমি চললাম। ছোট মেয়েটার জন্য একপ্রস্থ কুমোর-সজ্জা কিনতে হবে। কেনাকাটা করে আমি গরুর-গাড়ির কাছে থাকব, এসো তোমরা।

বলে হন হন করে মুহূর্তে তিনি নিষ্ক্রান্ত হলেন।

মাদার জিজ্ঞাসা করলেন, পাওনা চাচ্ছ?

সবিনয়ে ঘাড় কাত করে জটাধর বলল, আজ্ঞে—

পাওনাগণ্ডা এই হল যে রঙের দামটা তোমার কাছ থেকে আদায় করলাম না। তোমার ভগ্নিপতি সুরেন আমার মুহুরি, সেই খাতিরে ওটা আমি নিজের পকেট থেকে দিয়ে দেবো।

যাবতীয় কাপড় এবং রং-তুলি যা বাড়তি ছিল, গরুর-গাড়িতে তুলে নিয়ে সন্ধ্যার মুখে সকলে সোনাখড়ি ফেরত চললেন।

সোনাখড়িতে রথের দিনে আজ ছোটখাট মচ্ছব পূববাড়ির সদ্যসমাপ্ত খোড়ো চণ্ডীমণ্ডপে। নতুন ঘর বাঁধতে ভবনাথের জুড়ি নেই। বাঁশঝাড় বিস্তর আছে এবং উলুখড়ের জমিও অনেক। ইচ্ছে হলেই চট করে ঘর তুলতে পারেন। তোলেনও তাই। বাড়ির এদিকে-সেদিকে বাঁশের খুঁটি কাচনির বেড়া খোড়ো-চালের কত যে ঘর, হিসাবে আনা মুশকিল। লোকে বলে, জনমজুরের টাকাটা নগদ যদি না গুণতে হত, পূববাড়ির বড়কর্তা নিত্যিদিন একটা করে ঘর তুলতেন।

প্রতিমার কাঠাম দেওয়া হয় এই রথের দিন থেকে। বেলগাছ চিরে পাট

বানিয়েছে—পাটাতন, প্রতিমা যার উপরে দাঁড়াবেন। রাজীবপুরের পাল-কারিগরমশায়দের জনা দুই আজ এসেছেন, মণ্ডপের উত্তরের বেড়া ঘেঁসে পাট বসিয়েছেন। ঢাকে কাঠি পড়ে এইবার—ছেলেপুলে ছুটে এসে পড়ল, বড়রাও আছেন কিছু কিছু। হরির লুঠ: মা-দুর্গার প্রীতে হরি হরি বলো। লুঠের বাতাসা কাড়াকাড়ি করে সকলে কুড়ায়।

বাঁশ-বাখারি খড়-দড়ি নিয়ে কারিগরে কাজ ধরলেন। প্রতিমার কাঠাম আকৃতিগুলির মূল। আরম্ভটা করে দিয়েই এক্ষুনি ওঁরা অন্যত্র ছুটবেন, সেখানেও আজ আরম্ভ। ভাদ্রমাসের আগেই কাঠামের কাজ শেষ করে ফেলতে হবে, মাটি উঠবে জন্মাষ্টমীর দিন। খড়ের কাঠামের গায়ে মাটি লেপা। পুজো-পুজো ভাব সেইদিন থেকে। একমেটে চলল ক'দিন ধরে। সেটা হয়ে গেল তো দিন দশেক কামাই—শুকানোর জন্য। তারপর দোমেটে। দোমেটের পরে দিন পাঁচেক বন্ধ রাখলেই যথেষ্ট। দোমেটের পর খড়ি দেওয়া, তারপরে রং-তুলির কাজ। এখন তো দিব্যি গতর এলিয়ে কাজকর্ম—শেষ মুখে তখন কারিগরদের আহার-নিদ্রা লোপ পেয়ে যাবে।

॥ চোদ্দ ॥

দোচালা বাংলাঘর, মন্তার-মা'র বাড়ি। বিধবা মেয়ে মন্তা আর তিনি—দুটি প্রাণী থাকেন। প্রহরখানেক-রাত, মেঘ-ভাঙা জোৎস্না। মন্তার-মা লাঠি ঠুক ঠুক করে উঠানের এদিক-সেদিক চক্কোর মারেন, খানিক আবার দাওয়ায় এসে বসেন। মানুষ দেখতে পেয়ে হাঁক পাড়েন: কে রে, কে ওখানে?

আমি—

নতুনবাড়ির রাখাল। থাকে নতুনবাড়ি, বাড়ি বিল-পারের মনোহরপুর গাঁয়ে। মেজঠাকরুন বিরজাবালার কনিষ্ঠ ভাই। ভাইকে তিনি চোখে হারান—লোকে বলে, কাজের গরজে। হাটহাট করে রাখাল, গাইটা দেখে, রান্নার কাঠকুটোর জোগাড় দেয়। গাঁয়ের মানুষেরও করে, পারতপক্ষে কোন কাজে 'না' বলে না, সকলের সঙ্গে ভাবসাব। সোনাখড়িতেই পড়ে থাকে সে, বাড়ি কালেভদ্রে কদাচিৎ যায়। সেই যাওয়াটুকুও মেজঠাকরুন বন্ধ করবার তালে আছেন। নতুনবাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা—বিদ্যের আবার বয়স আছে নাকি?—ভাইকে ঠাকরুন পাঠশালা জুড়ে দিতে চান। রাখালের মা-ভাইদেরও সেই ইচ্ছা: ঘষতে ঘষতে পাথর ক্ষয়। বাংলা হস্তাক্ষর যদি খানিকটা রপ্ত করতে পারে, মুহুরিগিরি একটা ঠেকায় কে?

রাখাল বলল, হাটবেসাতি দিতে এসেছি মাউইমা।

এক পয়সার পান আর দু-পয়সার মতিহারি তামাক—এই হল মোটমাট বেসাত। হাটের আগে মন্তার-মা তিনটে পয়সা দিয়ে এসেছিলেন। যেহেতু মেজঠাকরুনের শাশুড়ি সম্পর্কীয়, মন্তার-মাকে রাখাল মাউইমা বলে। বলছে, ছেঁচা-পান একটু মুখে না পড়লে মাউইমার ঘুম হবে না জানি। সাত তাড়াতাড়ি তাই দিতে এলাম। যা ভেবেছি, তাই। এতক্ষণে তোমার তো এক ঘুম কাবার হবার কথা—আজকে জেগে বসে আছ।

পানের জন্যে বুঝি? সারা রাত আজ এইভাবে কাটবে, শোওয়াশুয়ি নেই।

রাখাল একেবারে ভিন্ন-বেয়ালটি। বলে, কেন—কেন?

চোরের পাহারায় আছি। মাচায় মিঠেকুমড়ো ফলে আছে, ঘরের চালে শশা। জানতে পেলে সমস্ত ছিঁড়েখুঁড়ে নিয়ে যাবে।

এতক্ষণে যেন রাখালের খেয়ালে এল। বলে, ও, নষ্টচন্দোর বুঝি আজ? তা চোর বললে কেন মাউইমা? থানায় চুরি বলে এজাহার দিতে যাও, নেবে না। নষ্টচন্দ্রে চুরি হয় না।

ভাদ্রের শুক্ল চতুর্থীর রাত্রে নষ্টচন্দ্র। শাস্ত্রীয় পরব, পাঁজিতে রয়েছে। আকাশের চাঁদ ঐ দিনে নষ্ট হয়ে যায়, দর্শন নিষেধ। দেখে যদি ফেলে, তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত আছে—মজার প্রায়শ্চিত্ত। চুরি করতে হবে। ঘরের জিনিস কিছু নয়—বাইরের জিনিস, ফলটা পাকুড়টা, যা-সমস্ত ক্ষেতে ফলেছে। কাঁকুড় শশা, ফুটি, বাতাবিলেবু, কুমড়ো, আখ, ডাব ইত্যাদি। রাতের মধ্যেই খাওয়া সেরে ফেলবে, যে গৃহস্থর জিনিস তাকেও ভাগ দেবে। আর অজান্তে তাকে যদি একটু খাইয়ে দিতে পার সব পাপ কেটে গিয়ে উপরি পুণ্যার্জন।

রাখাল মন্তাকে ডাকছে: ওঠো মন্তাদাদা, মাউইমার পান ছেঁচে দাও।

ঘুমকাতুরে মন্তাকে দুটো-পাঁচটা ডাকে তোলা যায় না। হামানদিস্তা নিয়ে রাখাল নিজেই তখন ছেঁচতে লেগে গেল।

মন্তার মা প্রসন্ন কণ্ঠে বলেন, তুই আবার কেন রে?

কারিই না। হাত ক্ষয়ে যাবে না আমার—

প্রশ্ন করে: এ বাড়ির কর্তা চাঁদুবাবুর নামে তো সিন্নি পড়ত শুনেছি। তিনি নাকি বড় ছাড়া ছোট জিনিস রাখতেন না। হামানদিস্তা তবে ছোট কেন এমন?

মন্তার-মা বলেন, তেনার আমলের নাকি? সাড়ে-তিন কুড়ি বছর বয়স কাটিয়ে চলে গেলেন, একটা দাঁত পড়ে নি। ছোলা-ভাজা মটর-ভাজা কটর-মটর করে চিবিয়ে খেতেন। হামানদিস্তে ও-বছর দোলের বাজারে আমিই

ফিরলাম। তিনি হেসে, ওরে বাবা—

স্বর্গীয় কর্তার কথা একবার ধরিয়ে দিলে আর রক্ষা নেই—মস্তার-মা'র মুখ একের স্থলে একশখানা হলেও বলে তিনি কূল পেতেন না। বলেন, হাবা'হস্তে তাঁর হলে সে জিনিসে শান চেঁচা কেন, মানুষের আস্ত মুণ্ডু অবধি চেঁচা যেত। ছোটখাট জিনিস তেনার তু-চক্ষের বিষ। করমাস দিয়ে গাড়ু বানিয়ে ছিলেন—সে গাড়ুতে জল ভরে বয়ে নিয়ে যাওয়া নিজের ক্ষমতায় কুলোত না। মস্ত ছিল পিটেবাড়ির প্রথা—'মস্তি' 'মস্ত' করে চেঁচাতেন, গাড়ু সে নিয়ে বাঁশ-বাগানে রেখে আসত।

গল্পের পর গল্প। মস্তার-মা একাই চালিয়ে যাবেন, মাঝেমধ্যে একটু হুঁ-হাঁ দিয়ে গেলেই হল। হঠাৎ এর মধ্যে পিপাসা পেয়ে গেল রাখালের। বলে, জল খাব মাউইমা। তোমার মেটেকলসির জলে কেমন এক মিষ্টি স্বাদ। আর ঠাণ্ডা তেমনি। কত দিন ভেবেছি, যাই—মাউইমার কাছে গিয়ে এক কোষ জল খেয়ে আসি!

প্রীত হয়ে মস্তার-মা বলেন, তা এলেই হয়। আসিস নে কেন?

সেই মেটেকলসি শুদ্ধাচারে মাচায় নিচে রাখা—মস্তারও ছোঁবার জো নেই। জল আনতে মস্তার-মা ঘরের মধ্যে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাঁধে মই চেঁচিয়ে শশা প্রহ্লাদের আবির্ভাব।

রাখাল লাফ দিয়ে উঠানে পড়ল, দুটো শশা দাওয়ার উপর রেখে দুজনেই হাওয়া: সুঁড়িপথের উপর মাখন দাদা ও মস্তানাথ। মস্তনাথ বলে, যা একখানা দেখিয়ে এলো প্রহ্লাদ! বুড়ির ঠিক মাথার উপর পচা চালে দাঁড়িয়ে শশা ছিঁড়ছে, চাল মড়াৎ মড়াৎ করে। এই দেখ, আমার তো পা কাঁপছে—

রাখাল বলে, বুঝেসুঝেই কর্তার গল্প জুড়ে দিলাম। চালের মচমচানি কানে যাবার জো ছিল না।

ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে গেছে ও-দিকে। আচমকা বাটকে বাটকে মস্তার মা রাখাল ও দলবলের চতুর্দশপুরুষ উদ্ধার করছে। যত চেঁচায় বুড়ি, এরা বগল বাজায় এবং নৃত্য করে।

রাখালের হাত ধরে প্রহ্লাদ জোর করে টান দিল: এক বাড়িতেই হয়ে গেল? আরও সব রয়েছে না?

বড় দুর্যোগ। বৃষ্টির পর বৃষ্টি—থামে না মোটে। রাতের পর দিন হচ্ছে, সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা ঘুরে আবার রাত্রি। সূর্য মুখ লুকিয়ে আছে পুরো তিনটে

দিন আজ। বৃষ্টির কখনো ঝিরঝিরানি, কখনো ধারাবর্ষণ। আর জোর বাতাস। ডোবা-পুকুর সমস্ত ভেসে গেছে। পগার ছাপিয়ে জল রাস্তার উপর উঠেছে। হেড়াকি-বন জলতলে, উপর দিয়ে স্রোত বয়ে যাচ্ছে—যে ডালটুকু জেগে আছে, গুড়িপিঁপড়ে থিক-থিক করছে তার মাথায়। ধানক্ষেত ছিল ঘন সবুজ, জল চকচক করছে সেখানটা এখন।

লোকে তিতিবিরক্ত, আকাশের পানে চেয়ে কাতরাচ্ছে: দেবরাজ ক্ষমা দাও এবারে, সৃষ্টি-সংসার রসাতলে যাবার দাখিল। ছেলেপুলে ছড়া বলছে: লেবুর পাতায় করমচা, যা বিষ্টি ধরে যা।

জল্লাদ ঘোর থাকতে এসে দালানের দরজায় ঘা পাড়ছে, 'জেঠিমা' 'জেঠিমা' করে ডাকছে। ধড়মড় করে উমাসুন্দরী উঠে পড়লেন: কী রে? কি হয়েছে ও জল্লাদ?

বেরিয়ে দেখ জেঠিমা। ঠাকুর ধুয়ে গিয়ে খড় বেরিয়ে পড়েছেন।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও সোয়াস্তি নেই তোর জল্লাদ, মণ্ডপের মধ্যে মন পড়ে থাকে।

বৃষ্টিটা সামান্য বন্ধ হয়েছে তখন। বড়গিন্নি মণ্ডপে চললেন। পুঁটি জেগে পড়েছে চোখ মুছতে মুছতে সে-ও জেঠিমার পিছন ধরল। তারপরে নিমি এবং খোদ বড়কর্তা ভবনাথ। প্রতিমার দোমেটে সারা হয়ে বিরাম চলছে আজ ক'দিন, তারই মধ্যে দুর্যোগ। মণ্ডপের ভিতরে যাওয়া হল না—আগল বেঁধে ভিতরের পথ বন্ধ, শিয়ার-কুকুর না ঢুকে পড়তে পারে। জল্লাদ ঠিক বলেছে, বৃষ্টির ছাঁট লেগে প্রতিমার খানিক খানিক ধুয়ে গেছে। আজই পালমশায়দের খবর পাঠাতে হবে দাগরাজি করে দেবার জন্য। জলের ছাট আর না আসতে পারে—পূবদিকটা বিশেষভাবে ছেঁচা-বাঁশের বেড়ায় ঘিরে দিতে হবে।

বড়গিন্নি বললেন, রাত থাকতে বেরিয়ে পড়েছিস জল্লাদ, পূজো-পূজো করে ক্ষেপে উঠলি যে একেবারে।

সকৌতুকে তাকিয়ে পড়ে জল্লাদ বলে, কোন তারিখ আজ খেয়াল আছে জেঠিমা? উঠতে দেরি করলে ভাদ্দুরে কিল খেয়ে মরতে হবে যে।

তা বটে। ভাদ্রমাসের শেষদিন আজ। ছেঁাড়ার সর্ববিষয়ে হুঁশ আছে কেবল লেখাপড়াটা ছাড়া। আজ যারা সকালবেলা শুয়ে পড়বে. ভাদ্রমাস যাবার মুখে বেদম কিলিয়ে সর্বাঙ্গ তাদের ব্যথা-ব্যথা করে দিয়ে যাবে।

কমলের কথা পুটি'র মনে পড়ে যায়। আহা. ভাইটি ঘুমুচ্ছে—খবর রাখে না ভাদ্র-সংক্রান্তি আজ। বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে, ঘুম ভেঙে গায়ের ব্যথায় আর উঠতে পারবে না।

দক্ষিণের ঘরে পুঁটি ছুটল : ওঠ রে কমল, ভাদুরে-কিল না খেতে চাস তো উঠে পড়্।

উঠতে চায় না তো টেনে তুলে ধরল। ঘুমঘোরে কমল খিমছি কাটছে, কিল-চড় মারছে দিদিকে।

পুঁটি বলে মারিস কেন রে? তোর ভালোর জন্যেই তুলে দিলাম। মাকে জিজ্ঞাস করে দেখ্।

মার খেয়েও হাসে পুঁটি। জল্লাদ উঠানে আছে, চোখ ইসারায় পুঁটিকে ডেকে নিয়ে সে বাইরের দিকে চলে গেল। হঠাৎ আজ বড় সদয় পুঁটির উপর। নিভৃতে গিয়ে বলে, তাল কুড়িয়ে আনিগে চল্ যাই।

পুঁটি বলে, তাল তো ফুরিয়ে গেল। এক-আধটা দৈবে-সৈবে পড়ে যদি, সে কি এতক্ষণ তলায় রয়েছে?

আছে রে আছে—

রহস্যময় হাসি হাসে জল্লাদ : গাঁয়ে থাকিস তোরা, কোথায় কি আছে তাকিয়েও দেখিস না। সে যা জায়গা—একজনে হবে না, দু'জন লাগে। সেই জন্যে ডাকছি। ফাঁকি দেবো না, অর্ধেক ভাগ—তাল দশটা পেলে পাঁচটা তোর পাঁচটা আমার। না যাস, লোকের অভাব কি—অন্য কাউকে ডেকে নেবো।

এক সঙ্গে দু'জনে গেলে বাড়ির লোকে সন্দেহ করবে, জল্লাদ একলা বেরিয়ে গেল। বাগের শেষপ্রান্তে কলাবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। নিচে সামান্য দূরে ডোঙা, তড়াক করে ডোঙায় লাফ দিয়ে পড়ল। পুঁটিকে ডাকে : আয়—

হাতে ধরে পুঁটিকে ডোঙায় তুলে নিল। ধ্বজি মেরে চলেছে। পুঁটির শাড়ির আঁচল ফেরতা দিয়ে কোমরে বাঁধা—ধানক্ষেত ভেসে গেছে, অবাধে তার উপর দিয়ে ডোঙা বাইছে। বেশ খানিকটা গিয়ে উঁচু চটের জমি—ছোটখাট এক দ্বীপের মতন।

কাঁটাঝিটকে, বৈঁচি ও ন্যাড়াসেঁজর জঙ্গল, তার মধ্যে খেজুর ও তালগাছ কয়েকটা। বড়োসড়ো কুয়ো একটা পাশে—হিঞ্চে-কলমির দামে ঢাকা। বিস্তর কসরতে জল্লাদ কুয়োর মধ্যে ডোঙা এনে ফেলল। কাঁটার জঙ্গলে তাল পড়ে আছে। কুয়োর জলেও ভাসছে কয়েকটা। জল্লাদ এত সব সন্ধান রাখে, তাঁর অগোচর কিছু নেই। ডোঙা টলমল করছে, তার মধ্য থেকে হাত বাড়িয়ে তাল কুড়োতে হবে। কুড়োচ্ছে পুঁটি তাই। একটু এদিক-ওদিক হলেই ডোঙা কুয়োর তলে যাবে।

॥ পনের ॥

বৃষ্টিবাদলায় বড় বেশি জোর দিয়েছে। আকাশের মেঘ বিলখানার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। রোদ যে ওঠে না, তা নয়—মেঘে-মেঘে খেলা চলে তখন। জলজলে সূর্যটাকে ঝপাস করে কোন কালো কম্বলে ঢেকে দেয়—জগৎ অন্ধকার। কিন্তু কতক্ষণ! চঞ্চল মেঘেরা কি এক জায়গায় পড়ে থাকবার বান্দা? সূর্য আবার মুখ বাড়ালেন—মুখ বাড়িয়ে যেন বলেন, এই দেখ, এই যে আমি। চারিদিক থেকে অমনি মেঘপুঞ্জ ধেয়ে আসে—সূর্য ঢাকা পড়ে যান। তক্কে তক্কে আছেন সূর্য—আবার কখন একটু ফাঁক পাবেন, মুখ বের করে হেসে উঠবেন।

ধানক্ষেত ডুবিয়ে জলের সাগর হয়ে ছিল, জলকে ডুবিয়ে ধানেরা এবার উল্লাসে মাথা তুলে উঠেছে। একটানা হরিৎ—বিলের একেবারে ঐ শেষ অবধি। ডোঙা-নৌকোর সরান অথবা খাল চলে গেছে যেখান দিয়ে, সেই-খানে সামান্য একটু জলরেখা নজরে আসে। বিল ধরে পুব মুখো ক্রোশ তিনেক গেলে বড় গাঙ। গাঙে বুঝি এখন ভাটা লেগেছে—ঠাহর করে দেখলে এত-দূরে এখানেও ভাটার টান কিঞ্চিৎ মালুম পাওয়া যায়। জোরে হাওয়া দেয় এক একবার—পুকুর-কিনারে জামতলি আমগাছের শিকড়বাকড়ের মধ্যে বিলের জল ঢুকে পড়ে খল-বল করে। কয়েকটা বড় ডাল বিলের দিকে লম্বা হয়ে গেছে ছায়ায় ঢাকা বলে সেই জায়গাটুকুতে চাষবাস হয় না। শাপলার ঝাড়—থালার মতন বড় বড় পাতা বোঁটার উপর খাড়া-দাঁড়ানো। অজস্র শাপলাফুল। ধানবনের রং, মেঘের ছায়া পড়ে, এক এক জায়গায় ঘন কালো। ঘুরে বেড়ায় মেঘ, ধানবনের রং বদলায়—কালো ধানবন সোনার মতন ঝিকমিক করে মেঘ সরে রোদ এসে পড়ে যখন।

জামতলির একটা ডালের উপর জগন্নাথ চুপচাপ লম্বা হয়ে আছে। আমের সময় নয়, আমের জন্য গাছে ওঠেনি—পাঠশালা ভাল লাগে না, চুপচাপ তাই পড়ে আছে। হাওয়া বয়ে যাচ্ছে ধানপাতার উপর দিয়ে—নুয়ে পড়ে ধানপাতা, আবার খাড়া হয়ে জলের ঢেউ ভাঙার মতন। দেখে তাই অলস চোখ মেলে। ঝির ঝির করে জল পড়ছে, কানে সামান্য আওয়াজ পায়। নতুন পুকুর আর বিলে নালার যোগাযোগ—নালার মুখে মাটির বাঁধ চুঁইয়ে কিছু কিছু জল তবু নালার ভিতরে পড়ছে। ধানবনের ভিতরেও আলে আলে ক্ষেত ভাগ করা —ধানগাছ বড় হয়ে চারিদিক একশা হয়ে গেছে বলে বাইরে থেকে আজ বোঝা যাচ্ছে না।

আ'ল কেটে দেয় এ-ক্ষেতের বাড়তি জল ও-ক্ষেতে চালান করবার জন্য। সেই জল চলাচলের ক্ষীণ শব্দও কান পেতে শোনা যায়। ঘুনসি পাতে ঐ সব জায়গায়, ঘুনসিতে মাছও পড়ে। জল্লাদ আচমকা ডাল থেকে লম্ফ দিয়ে বিলের জলে পড়ে, শব্দের আন্দাজ কাটা গাছের কাছে গিয়ে ঘুনসি উঁচু করে তুলে দেখে। খলবল করে মাছ ঘুনসির ভিতরে, বেরুবার জো নেই। দেখেও সুখ। যেমনটি ছিল আবার সে তেমনটি পেতে রেখে দেয়।

পুকুরের পাড় ধরে সারবন্দি নারকেল-গাছ। কাঠবিড়ালির অত্যাচার—বাগড়োর মধ্যে ঢুকে ডাব-কুচি কুরিয়ে কুরিয়ে খায়। খাওয়ার মুখে বোঁটাও কাটা পড়ে যায়, আওয়াজ তুলে জলের মধ্যে ডাব পড়ে, জলতলে কাদায় বসে যায়। ছেলেপুলে ডুব দিয়ে দিয়ে খোঁজে, কাদা ইঁটকে দেখে। ঝুপঝুপ করে হয়তো বা একপশলা বৃষ্টি—সামান্য দূরেই রোদ, বৃষ্টির নামগন্ধ নেই সেখানে।

বৃষ্টি পেয়ে ছেলেপুলের মজা। আর মাছেদের মত ছেলেপুলে আছে, মজা তাদেরও। বিলের জল বাঁধ চুঁইয়ে চুঁইয়ে নালায় পড়ে—মাছ-শিশুরা ঐখানে এসে জমেছে। পুকুরের চার পাড়ের আটকানো জলে থাকে তারা—কেমন করে টের পেয়ে গেছে, বাঁধের ওধারে বিলের সীমাহীন জলাধার। বিলে যারা সব আছে—চলো, পরিচয় করিগে তাদের সঙ্গে। খানিকক্ষণ খেলা করে আসি। এমনি সব ভেবেই বুঝি সঙ্কীর্ণ নালায় ঝাঁকে ঝাঁকে ভিড় করেছে, কালো কালো শিরদাঁড়া পাশাপাশি দিয়ে নালার জল ঢেকে ফেলেছে প্রায়।

মাথার উপরে চিল চক্কোর দিচ্ছে, কী জানি কেমন করে তারা টের পেয়ে গেছে। জলে পোঁতা বাঁশের আগায় একটা মাছরাঙা নিস্পৃহ উদাসীনের মতো বসে রয়েছে। পানকৌড়ি ঘন ঘন ডুব দিচ্ছে—ডুব দিয়ে অদৃশ্য হল, অল্প পরে ভেসে উঠে গলা অনেকক্ষণ উঁচু করে তুলে সগর্বে বুঝি সকলকে শিকার দেখাচ্ছে, দুই ঠোঁটে চাপা চ্যাংমাছ একটা। মাছরাঙাও টুপ করে জলে পড়ে মাছ নিয়ে যথাপূর্ব উদাসীনভাবে আবার এসে বসেছে। ডালে শুয়ে শুয়ে জল্লাদ বেশ খানিকক্ষণ দেখল তারপর তাড়াতাড়ি করে নেমে পাড়কোদাল নিয়ে এলো। পূববাড়ির কোথায় কি থাকে সমস্ত জানে—পূববাড়ি বলে কি, গাঁয়ের সব বাড়ির সকল জিনিস নখদর্পণে তার। ঝপাঝপ কোদাল মেরে নালার অল্প মুখ বন্ধ করে দিল সে। মাছেরা আটকা পড়ে গেছে। ডাব খোঁজা ছেড়ে ছেলেরা ছুটে এসে পড়ল জল্লাদের হুকুম: নালার জল সেঁচে ফেল্। আঁস্তাকুড়ের ভাঙা হাঁড়ি-কলসি কুড়িয়ে গেল সব জল সেঁচতে। জল্লাদ নিজেও লাগল। জল উঠে গিয়ে কাদায় মাছ লাফাচ্ছে—মৌরলা পুঁটি চাঁদা কোটটাংরা। নিয়ে নে সমস্ত খুঁটে খুঁটে—

তুমি?

বেজার মুখে জল্লাদ বলল, বাবা বাড়ি এসেছে।

পাঠশালা পালিয়ে মাছ মেরে বেড়াচ্ছে, টের পেলে যজ্ঞেশ্বর রক্ষে রাখবেন না। মাছ খাওয়া নয়, ঠেঙানি খেতে হবে। খাওয়ার মধ্যে কি, মাছ ধরাতেই তো সুখ—এই সমস্ত বলে জল্লাদ মনকে বোঝায়। মংগার ধারে বাঁকা তালগাছওয়ালা রাস্তার এধারে-ওধারে বিস্তর লোক ছিপ নিয়ে বসে। কোনো এক বিকালে পায়ে পায়ে জল্লাদ ঐখানে চলে যায়, খুশি মতন একজনের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। ছিপ ছেড়ে লোকটা তক্ষণাৎ সরে গিয়ে বসবে, বিনাবাক্যে জল্লাদ ছিপ তুলে নেবে। তার মতন মাছুড়ে কে? টানে টানে পুঁটিমাছ। দেখতে দেখতে ঘটির কানা অবধি ভরতি। ও দক থেকে টুলু সর্দার ডাকছে: ও জল্লাদ, আমার এ কী হল? ছিপ এখনো আঁশ করতে পারলাম না। বুড়ো-হালদারের নাম করে তুমি একবার ছুঁয়ে যাও দিকি।

মাছ ধরতে ধরতে একদিন জল্লাদ সাপ ধরে ফেলল। কালকেউটে। বঁড়শি গেঁথে মাছ তোলে, সাপও তুলল অবিকল সেই কায়দায়।

শশধর দত্তের ভাঙা মণ্ডপে মস্তবড় বটগাছ, শিকড়-বাকড়ে সাপ মেরে চৌচির হয়ে আছে। সাপের আড্ডা বলে লোকে ও-মুখো হয় না। সাপদের মধ্যে একটি অবশ্য ভাল। বাস্তুসাপ তিনি, বাস্তুদেবতা। কারো ক্ষতি করেন না, দত্তদের বাস্তুবাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ করেন। দত্তগিন্নি তাঁর নামে মাঝেমধ্যে দুধ কলা দেন। সন্ধ্যাবেলা কলার খোলায় করে দিয়ে যান—সকালে এসে দেখা যায়, খোলা শূন্য, চেটে-মুছে উনি সেবা নিয়ে গেছেন। বাস্তু দেবতাটি ভাল, কিন্তু সাঙ্গোপাঙ্গ জাত-কেউটে-কালাজগুলো অতিশয় বদ—শিবের অনুচর ভূত-প্রেত-পিশাচদের মতন। তেড়েফুঁড়ে তারা আধার ধরে বেড়ায়, মানুষও কাটে।

জল্লাদ বলে, দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা।

ব্যাঙের কাতরানি শুনে মাথায় মতলব এলো। আওয়াজটা মণ্ডপের পাশের হেড়াঞ্চিবন থেকে আসছে। সাপে ব্যাঙ ধরে গেলার চেষ্টায় আছে। আহা টেনে টেনে বহুক্ষণ ধরে কী কান্নাটাই কাঁদল। অবশেষে চুপ। তার মানে ব্যাঙ পুরোপুরি সাপের গর্ভগত হয়ে গেল। এমন তো হামেশাই ঘটে। জল্লাদ কিন্তু রেগে টং: সাপ তুমি দাঁড়াও না, ব্যাঙ খাওয়ার সুখ টের পাইয়ে দেবো।

আরশুলা কিম্বা ক্ষুদেব্যাঙ গেঁথে ছিপ নাচিয়ে নাচিয়ে সোলমাছ ধরে—জল্লাদ ব্যাঙ গাঁথল বঁড়শিতে নয়—সাবধান বঁড়শি সাপ গিলেই খেয়ে নেবে।

কাঁটাওয়ালা লম্বা বেতের শীষ কেটে তার আগায় সে নিপুণভাবে ব্যাঙ বাঁধল। ভাঙা মণ্ডপে গিয়ে সন্দেহজনক ফাটল পেলেই তার ভিতরে শীষ সহ ব্যাঙ ঢোকাচ্ছে। ব্যাঙ মরে যায়, বদল করতে তখন জীবন্ত ব্যাঙ আবার একটা বাঁধে। অবিরাম অধ্যবসায় তিন-চার দিন ধরে, ফল হয় না। নতুন কি কৌশল খাটানো যায়, জল্লাদ ভাবছে। হেনকালে টোপ গিলল। টেনে টেনে জল্লাদ বেতের শীষের সঙ্গে সাপও বের করে ফেলল গর্ত থেকে। বিঘত-খানেক কাঁটা ভেতরে গিয়ে বিঁধে আছে। সাপ তবু করাল মূর্তিতে ফণা তুলে গর্জাচ্ছে। পড়ে যায়, আবার উঠে তাড়া করে। চেঁচামেচিতে মানুষজন এসে লাঠি-পেটা করে সাপ মারল।

যজ্ঞেশ্বর এসে থ হয়ে ছিলেন। এতক্ষণে জল্লাদের দিকে যাচ্ছেন। সাতিশয় কোমলকণ্ঠে ডাকছেন: আয় রে, কাছে আয়। জল্লাদ সতর্কদৃষ্টিতে তাকায় বাপের দিকে, আর পায়ে পায়ে এগোয়। কঞ্চির গাদা—সেইদিকে যেন বাবার ঝোঁক। অতএব জল্লাদও দাঁড়িয়ে পড়ে।

ভাবছিস কি রে হারামজাদা? টুক করে এক কঞ্চি তুলে যজ্ঞেশ্বর ছেলের পানে ছুটলেন। জল্লাদেরও চোঁচা-দৌড়। লোকে দু-চক্ষু মেলে বাপ-ছেলের দৌড়ানো দেখছে। বাপ হোন আর যা-ই হোন, পারবেন কেন উনি ছেলের সঙ্গে। অনেকটা দূরে নিরাপদ ব্যবধানে গিয়ে জল্লাদ দাঁড়িয়ে পড়ল। যজ্ঞেশ্বর হাঁপাচ্ছেন, আর শাসাচ্ছেন: বাড়ি আসতে হবে না? তখন দেখে নেব। এই কঞ্চি তোর পিঠে না ভাঙি তো আমি বাপের বেজন্মা পুত্তুর।

হিমচাঁদ বলেন, দিব্যিদিলেশা কেন? সাপের ছোবল থেকে প্রাণে বেঁচে গেছে—মাপ করে দেন।

যজ্ঞেশ্বর বলেন, ক'বার বাঁচবে? বাঁচা ওর কপালে নেই। মাথা নয় ওর—দুষ্টবুদ্ধির হাঁড়ি। পলকে পলকে বজ্জাতি গজায় ওর মাথায়।

হিমচাঁদ বললেন, হাঁড়িটাই তবে চুরমার করে দেন—আপদে চুকে যাক। তা হলে বাঁচতে পারে। কঞ্চিতে হবে না, বড় লাঠি ধরুন—

জল্লাদ ফৌত। কঞ্চি নাচিয়ে যজ্ঞেশ্বর গর্জে বেড়াচ্ছেন। ছেলের পিঠখানা হাতের নাগালে না পাওয়ার দরুন সপাং-সপাং করে কখনো ঘরের বেড়ায়, কখনো দাওয়ায় তক্তাপোশে, কখনো বা ঝোপেঝাপে বাড়ি মেরে রাগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত করছেন। খবর পাওয়া গেল, হেলাতলায় বড়বোন ফেকসির শ্বশুর-বাড়ি একরাত কাটিয়ে গেছে। না, রাত্রিটা পুরোপুরি নয়। কুটুম্বরা খুব আদরযত্ন করছেন, এবং দুটো দিন না হোক একটা দিন অন্তত থেকে যাবার জন্য জেদাজেদি করছেন—এর পর জল্লাদ আর দেরি করে! দিব্য চর্বচোষ্য

খাওয়া বন, আর ও'দিকে খবর নিয়ে লোক ছুটবে সোনাখড়িতে। শেষরাত্তে দুয়োর খুলে অতএব জল্লাদ হাওয়া। বিস্তর খোঁজখবর করেও আর হদিশ মেলে না।

যজ্ঞেশ্বর কঁহাতক কঞ্চি বয়ে বেড়াবেন—কঞ্চি ফেলে দিয়ে মুখের তড়পানি এখন শুধু। জল্লাদের মা, বড়মেয়ে ফেকলির নামে ফেকলির-মা বলে যাঁর পরিচয়, তিনিও কম যান না। পেলে একবার হয়, ছোঁড়ার হাড় এক জায়গায় মাংস এক জায়গায় করব—রাত্রে শুয়ে পড়েও গজর-গজর করছেন। এত সামান্যে যজ্ঞেশ্বরের মনঃপূত নয়—গর্জে উঠলেন তিনি ও'দিক থেকে: ধরতে পারলে মুণ্ডু কাটব। কাটব চাঙগাদার উপরে—রক্ত একফোঁটা মাটিতে না পড়ে। পড়লে সেখানে বজ্জাতির গাছ গজাবে। সে গাছের ফল খেয়ে ছেলেপুলে কেউ আর ভাল থাকবে না।

ঘুমিয়ে পড়লেন উভয়ে। রাত দুপুর। বাড়ির সব—পাড়ার সব ঘুমিয়ে গেছে। চারদিক নিঃসাড়। খোলা জানলার ধারে হেরিকেন একটা টিপ-টিপ করে জ্বলছে।

একঘুমের পর যজ্ঞেশ্বর চোখ মেলে খিঁচিয়ে উঠলেন: চেরাগ জালিয়ে নবাবি হচ্ছে—বলি কেরাসিন সস্তা? আমি তো ধরে নিয়েছি, চার ছেলের মধ্যে এক ছেলে আমার নেই। নেভাও বলছি, আলো চোখে লাগছে।

ফেকলির মা আলো নিভিয়ে নিঃশব্দে আবার শুয়ে পড়লেন। যজ্ঞেশ্বরের নাসাগর্জন বন্ধ হয়েছিল—হুমকি দিয়ে কর্তব্য-সমাপনের সঙ্গে সঙ্গে গর্জন আবার শুরু হয়ে গেল।

চুপচাপ আছেন ফেকলির মা। ঘুম আসছে না আর। কু-পুত্র যদি হয়, কুমাতা কখনো নয়। অন্তত তিরিশটা বছর কর্তার পাশে শুয়ে আসছেন—নাকের আওয়াজ থেকে মালুম পান, কখন ঘুম গাঢ় কখন লঘু। এক এক সময় ফরাৎ ফর ফরাৎ-ফর করে নিশ্বাসের যেন ঝড় বইতে থাকে। সেই সময়ে যজ্ঞেশ্বরের একখানা অঙ্গ কেটে নিলে কিম্বা তারও বেশী—কোমরের গাঁজিয়া কেটে টাকাপয়সা বের করে নিলেও তাঁর হুঁশ হবে না। কান পেতে অমনি ধরনের কিছু আন্দাজ নিয়ে ফেকলির মা উঠে আবার হেরিকেন ধরালেন। হেরিকেন এবারে ঘরের মধ্যে নয়, রান্নাঘরের দাওয়ায় খুঁটির গায়ে একটা পিঁড়ি ঠেসান দিয়ে একটু আড়াল করে রেখে এলেন। এবং চোখ মেলে জানলার পথে তাকিয়ে আছেন—ছেলে বেবড্ড হাঁটাহাঁটি লাগিয়েছে, হেরিকেন নিয়ে দিশাটান না দেয়। রান্নাঘরের দাওয়ায় আলো থাকায় ব্যাপারটা প্রাঞ্জল হয়ে গেল। হতভাগা ক্ষুধার্ত জল্লাদ কি অর্থ বুঝবে না? কোনবুদ্ধি নিয়ে তবে উৎপাত করে বেড়ায়?

চোখে দেখার পরে তবে তো অর্থ বুঝবে। কিন্তু জল্লাদ যে সোনাখড়িতেই নেই। অন্য যে বুঝে'ল কাণ্ড দেবে, তার নজরে এসে গেল একদিন দু-প্রহর রাতে। পদ্দা জল্লাদের পয়লা-নম্বরি সাকরেদ এবং চর—পাশাপাশি বাড়ি। রাত্রে উঠেছিল পদ্দা, সেই সময় উত্তরবাড়ির আলো দেখল এবং ঘুরে ফিরে কারণও খানিক বুঝে এলো। পরের দিন রাজারপুরের এক আখক্ষেতে গিয়ে জল্লাদকে ধরল: রান্নাঘরের হাঁড়িতে তোমার ভাত-ব্যঞ্জন পচে দুর্গন্ধ রাত-ভোর আলো জলে, আর হতচ্ছাড়া তুমি এখানে ফুলো-আখ চিবিয়ে মরছ। শোওয়ারও তোফা জায়গা দেখে এসেছি।

নিশিরাত্রে অতএব জল্লাদ বাড়ি ফিরল। গোয়ালে আড়ার উপর বাঁশ বিছিয়ে শুকনো কাঠকুটো রাখে। রান্নাঘরে ভাত খাওয়া সেরে আড়ার উপর উঠে অনেক দিন পরে আরামে ঘুমাল সে। নিজের বাড়িতে খাচ্ছে শুচ্ছে—জানে শুধু পদ্দা এবং গোয়ালের চারটে গরু ও নুলোবাছুরটা। পরের দিনও অমনি আরামের লোভে এসেছে, খাওয়া শেষ করে শুতে যাচ্ছে—ফেকনির মা ওৎ পেতে ছিলেন, হাঁড়ির ভাত কাল খেয়ে গেছে তো আজও আসবে এই বুঝে। আচমকা হাত এঁটে ধরলেন তিনি পিছন থেকে: ঘরে আয়—

হাতে-নাতে ধরা পড়েছে, রক্ষে নেই, যজ্ঞেশ্বর এক্ষুনি উঠে ঘুমচোখে পেটাতে শুরু করবেন। জোরে জোরে নিশ্বাস টানছে জল্লাদ—বুকের ভিতরে বাতাস বোঝাই থাকলে পিঠে নাকি কম লাগে। ঘরে পা দিতেই যজ্ঞেশ্বর পিটপিট করে তাকিয়ে পড়লেন। এইবার, এইবার! জল্লাদও তৈরি। কিন্তু আশ্চর্য নিরাসক্তভাবে চোখ বুজলেন আবার যজ্ঞেশ্বর, নাক-ডাকা শুরু হয়ে গেল। সকালে ঘুম ভেঙে উঠলেন, জল্লাদ মায়ের কাছে বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে—তা যেন চিনতে পারলেন না ছেলেকে, গাড়ু নিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরুলেন।

ক্ষিদের হিতাহিত ভাবেনি, মায়ের পাতা ফাঁদে ধরা দিয়েছিল—পরে এই নিয়ে জল্লাদ হেসেছে খুব। কী বোকা আমি রে! পুকুরের মাছ চার ফেলে ঘাটে নিয়ে আসে, তারপর বঁড়শিতে গাঁথে। এ জিনিসও তাই। ভাত রেখে রেখে জল্লাদকে রান্নাঘরে টেনে আনলেন, সেখান থেকে একটানে শোবার ঘরে।

বৃষ্টিবাদলায় যত জোর দেয়, থিয়েটারের স্ফূর্তি ওদিকে অত ঠাণ্ডা মেরে আসে। রিহার্শালে লোক হয় না। ঘণ্টার ঠুং-ঠুংনিতে হচ্ছে না দেখে হারু মিত্তির বড় কাঁসর একটা সংগ্রহ করল। ঠিক দুপুর থেকে ঢং-ঢং-ঢং-ঢং করে পেটায় নতুনবাড়ির বাইরের রোয়াকের এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো ঘুরে ঘুরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেটাচ্ছে। কাকস্য পরিবেদনা। দুত্তোর—বলে তখন কাঁসর

কেলে বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে বেড়ায় : কি হে, শুনতে পাচ্ছ না কেউ তোমরা ? আর তো এসে গেল—চলে যাও, পেরাজে বোসো গিয়ে। পার্ট ধরব সকলের – কার কদ্দুর মুখস্থ হয়েছে। আমাদের থিয়েটারে প্রম্পটার থাকবে না রাজীবপুরের মতন।

মুখফোঁড় একজন বলে, তোমার নিজের কদ্দুর হারু ? তোমার পার্ট'ও ধরব কিন্তু।

হারু আস্ফালন করে বলে, ধোরো ভাই। টরটরে মুখস্থ—ডরাই নাকি ? দিন খাটিয়ে কালই নামাও না—আমার লুৎফ ঠিক আমি করে যাবো।

মুখের বড়াই, পার্ট একবর্ণও মুখস্থ হয়নি। স্মরণশক্তির সুখ্যাতি হারুর কোনকালে নেই। তার উপরে দু দণ্ড স্থির হয়ে যে মুখস্থে বসবে, ফুরসত কই তার ? থিয়েটারের ভার নেওয়া ইস্তক খাটাখাটনি ও ভাবনা চিন্তায় পাগল হবার দাখিল। চারিদিকে এখন বিষম জল কাদা—চলাচলের রাস্তার উপরেও কাদা কোথাও এক-হাঁটু কোথাও বা এক-কোমর। কাদা বলতে সাধারণভাবে যা বুঝি তা নয়, রীতিমত আঠালো কাদা—প্রেম-কাদা যার অন্য নাম। পুরো কলসি জল ঢেলেও যে কাদা ছাড়ানো যায় না। হেন অবস্থার মাঝেও হারু মিত্তিরের পা দুটোর জিরান নেই। সারা বিকালবেলাটা মানুষ ডেকে ডেকে অবিরত চক্কোর মেরে বেড়াচ্ছে। নেহাৎপক্ষে আটখানা সখীর কমে আসর জমে না। যুগল ও সুধাময় ভাড়াটে সখীদ্বয় ছাড়াও নতুন ছ-ছ'টা সখী বানিয়ে নিতে হচ্ছে। যদুনাথ মণ্ডলের ছেলে বলাই তার মধ্যে সকলের সেরা। নাচের পা চমৎকার, গলাখানিও খাসা। ড্যান্সিং-মাস্টার নরেন পাল খুব তারিফ করে, কালক্রমে বলাই যে যুগল-সুধাময়ের কান কেটে নেবে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ সে। ফলে বলাই এবং বলাইয়ের বাপ যদুনাথের লেজ ফুলে আকশে উঠেছে। হারুকে যদু সাফ জবাব দিয়ে দেয় : যাবে না বাপু। মা মরা ছেলে—পেটের ধান্দায় আমি তো গামালে গামালে ঘুরি, জল-কাদা ভেঙে নিউমোনিয়ায় যদি ধরে, তখন বলাইকে কে দেখবে ?

হারু নিরুপায় হয়ে বলল, জল যাতে না ভাঙতে হয় তাই আমি করব। নিউমোনিয়া হলে ডাক্তার-কবিরাজের দায়ও আমাদের। তুমি আর আপত্তি কোরো না যদু।

হারুর দুর্গতি বাড়ল। ডাক পেয়ে বলাই ঘরের দাওয়ায় এসে বসে, সেখান থেকে হারু আলগোছে তাকে কাঁধে তুলে নতুনবাড়ির রোয়াকে এনে নামিয়ে দেয়। কাজ অন্তে কাঁধে করে আবার বাড়ির দাওয়ায় পৌঁছে দিয়ে আসে। বউ গত হবার পর থেকে যদুর ছেলে-অন্ত প্রাণ—আপাদমস্তক ঠাহর করে করে

দেখে, যেমনটি গিয়েছিল ঠিক ঠিক তেমনি অবস্থায় ফিরেছে কিনা। তারপর ঘরে ঢুকে রেখে দেবে। হারুও ছুটি।

কিন্তু বলাই ছাড়াও সখী আরও পাঁচটি। বয়সে ছেলেমানুষ তারাও—বলাইয়ের নিউমোনিয়া ধরতে পারে তো তাদেরই বা ধরবে না কেন, তারা এত খেলো হল কিসে? দেখাদেখি তারাও গাঁট হয়ে নিজ জায়গায় বসে থাকে: কাঁধে করে নাও, তবে যাবো।

হারু গোবরাকে বলে, একলা আমি কাঁহাতক বয়ে বেড়াই। গোবরাকে সখী তুই বয়ে দে ভাই।

আপত্তি নেই, বওয়া তো উচিতই। কিন্তু—

গোবরা দাঁত বের করে ফেলল: ঐটুকু এক এক ছোঁড়া কতই বা ভার! স্বচ্ছন্দে এনে দিতাম। কিন্তু ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত পা লেগে ওদের যে মুখে রক্ত উঠবে, ম্যাও ধরবে কে তখন?

এর পরে হারু আর কাউকে বলতে যায় নি। কাজ চাপাতে গেলে ডুব দেবে হয়তো মানুষ, ডেকে ডেকে তখন আর রিহার্শালেও পাওয়া যাবে না। চং-চং চং চং কাঁসর বাজায় হারু। কাঁসর বেজে নাচের ছেলে আনতে ছুটল। তাদের পৌঁছে দিয়ে এবারে প্লেয়ার ডেকে ডেকে বেড়াচ্ছে: কই গো, বেরিয়ে পড়ো। তামাকের ব্যবস্থা ওখানেই তো আছে—ওখানে গিয়ে খেও। আর দেরি কোরো না।

এক বাড়ি সেরে হারু মিস্তির আর এক বাড়ি ছোটে।

॥ ষোল ॥

পুজো পুববাড়ির, থিয়েটারটা গ্রামবাসী সর্বসাধারণের—এইরকম কথা হয়েছিল। হয় কখনো তাই? কালীপুজো শীতলপুজো নারায়ণপুজো—সকলের ক্ষেত্রে পুজো, আর দুর্গার বেলা উৎসব—দুর্গোৎসব। উৎসব একজনের এক বাড়ি নিয়ে হয় না। পুববাড়ি খরচখরচা করছে, প্রতিমাও বসছেন পুববাড়ির বাইরের উঠোনের মণ্ডপে. কি উৎসব সারা গ্রামের—তা কেন, গ্রাম ছাড়িয়ে বাইরেও হাওয়া গিয়ে লেগেছে।

আত্মীয়কুটুম্বর ফর্দ হচ্ছে। ছোটকর্তা বরদাকান্ত জলচৌকিতে উবু হয়ে বসে হুঁকো টানছেন, আর ফর্দের ছাড়ছুট ধরিয়ে দিচ্ছেন। সতর্ক মনোযোগে শুনতে শুনতে হুঁকো টানা ভুল হয়ে যাচ্ছে, কলকে নিভে যাবার গতিক। হঠাৎ

যেন মুণ্ডি ভেঙে ভুড়ুক-ভুড়ুক করে জোর জোর টেনে নিভন্ত কলকে চাঙ্গা করে তুলছেন। গাঁয়ের মধ্যে সকলের বড় বরদাকান্ত, তাঁর নিচে উত্তরবাড়ির যজ্ঞেশ্বরের মা বুড়ি। কার কোথায় আত্মীয়-কুটুম্ব, সমস্ত বরদাকান্তর নখদর্পণে। বয়স্ক বহুদর্শী ভবনাথ নিজেও, তিনি পর্যন্ত অবাক হয়ে যাচ্ছেন: বাগধার মেঘনাথ বিশ্বাস আমাদের কুটুম্ব—বলেন কি খুড়ো?

ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব। তোমার ঠাকুরমার ভাইয়ের সাক্ষাৎ নাতিন। তোমার সঙ্গে তাহলে ভাই সম্পর্ক দাঁড়াল।

ভবনাথ আঁতকে ওঠেন: কী সর্বনাশ! দু-দুটো মেয়ের বিয়ে দিলাম—এসব কুটুম্ব একদম নাড়া দেওয়া হয়নি। খবরই রাখতাম না।

তাই তো আগ বাড়িয়ে এসে বসলাম। বলি, ভবনাথ চিরকাল তো মামলা মোকর্দমা বিষয়আশয় নিয়ে আছে, সমাজ-সামাজিকতা নিয়ে মাথা ঘামাল কবে? যতদূর জানি মোটামুটি জুড়েগেঁথে দিয়ে যাচ্ছি। যত্ন করে রেখে দিও বাবাজি। আমি চোখ বুঁজলে এসবের হদিস পাবে না আর কেউ।

মণ্ডপের সামনাসামনি বেগুনক্ষেত সাফ করে জায়গা চৌরস করা হয়েছে—স্টেজ ঐখানটা। ভবনাথ বললেন, বাঁশ-কুটোয় মন্বন্তর নেই—একজোড়া চাল তুলে নাও না কেন মাথার উপরে, বৃষ্টিবাদলা হলে ভাড়া-করা সিন-পোশাক লাট হতে পারবে না। বুদ্ধিটা ভালো—স্টেজ দোচালার নিচে আর বসবার জায়গায় খানিক সামিয়ানা খাটানো, খানিকটার উপর লাউ-কুমড়োর মাচার মতো বানিয়ে উপরে নারকেলপাতা বিছিয়ে দিয়েছে।

মা-দুর্গা আসছেন—গ্রামবাসী বাইরে যারা আছে তারাও সব বাড়ি আসছে মোনছোব ও ইঞ্জিনিয়ার মশায়রা কত কাল দেশঘরে আসেন নি, তাদ মিত্তিরের মোক্ষম চিঠি গেল: চাঁদা দেন খুব ভালো, না দিলেও ভালো--বাড়ি আসা কিন্তু চাই-ই চাই। রাজীবপুরের কুচ্ছো করে, সোনাখড়ির মানুষ বলে মানেন না নাকি আপনারা। পুজোর কদিন চেয়ার পেতে আপনাদের মণ্ডপে বসিয়ে দেবো—আসতে যেতে লোকে দেখবে। তারপরে দেখি কী বলে ওরা...

মুন্সেফের মন দুলল, গিন্নিকে বললেন, এত করে লিখেছে—চলো আমার বাপের ভিটেয়, মুখ বদলানো হবে। গিয়ে পড়লে এক পয়সাও আর খরচা নেই। খুড়তুতো ভাইরা আছে—কী যত্নটা করবে দেখো।

সদর কসবা থেকে নাগরগোপ প্রায় দশ ক্রোশ। রাস্তা পাকা। আগে ঘোড়ার গাড়িতে চলাচল হত--মাঝপথে ঘোড়া-বদল, এক জোড়ায় অত পথ পেরে ওঠে না। ঝামেলা ছিল না, তবে সময় লাগত বেশি। এখন ঘোড়ার-গাড়ি গিয়ে মোটরবাস। সময় কম লাগার কথা, ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে লাগেও তাই—

সেটা কালেভদ্রে কদাচিৎ। যখন-তখন মোটর ভাল হয়ে যায়। ভাল না বলে লোকে 'ভাল হওয়া' বলে মোটরবাসের সম্পর্কে। ছুতরকলাই যাঁতায় ভেঙে ডাল বানায়, সেই তুলনা আর কি! লাইনের জন্য বেছে বেছে এমন সব লঝ্ঝড় বাস কোথা থেকে সংগ্রহ করে, কে জানে। নাগরগোপে নেমে ঘুরে ফিরে সর্বাঙ্গে মোচড় দিয়ে পরখ করে নেবেন, ঝাঁকুনির চোট খেয়ে হাড় পাঁজরার জোড় ঠিক আছে কিনা। অতঃপর পালকি গরুর-গাড়ি কিম্বা ঈশ্বরদত্ত নিখরচার পদযুগল। সোনাখড়ি যাবার বারোয়েসে পথ এই।

বর্ষাকালে এক নতুন পথ খুলে যায়—বিলের উপর দিয়ে ডিঙির চলাচল। আর ডোঙা তো আছেই। নপাড়া স্টেশন থেকে বিল ফুঁড়ে এসে সোজাসুজি রাজীবপুরের রাস্তায় মগরার পাশে জোড়া তালতলার ঘাটে এসে গালে, জল্লাটের মাছুড়েদের টাংরা-পুঁটি আড্ডা যেখানট।

দেবনাথ বাড়ি আসছেন। সঙ্গে বিস্তর মালপত্তর—কলকাতা থেকে কেনাকাটা করে নিয়ে আসছেন। সেবারের সেই বরকন্দাজ দুটিও আছে। পুজোর খাটাখাটনির জন্য বহু লোকের আবশ্যক—এই দু-জনকে সর্বক্ষণ পাওয়া যাবে। এত লটবহর ট্রেন মোটরবাস গরুর-গাড়িতে বারম্বার ওঠানো-নামানোর বিস্তর হাঙ্গামা। বিলের পথ নিয়ে নিলেন সেই জন্য। সময় বেশি লাগবে— নপাড়া স্টেশন থেকে প্রায় পুরো দিন একটা। লাগুককে, কিন্তু আরামের পথ—একটানা একেবারে সোনাখড়িতে গিয়ে নামা।

আকাশে মেঘের খেলা। একটা গাঁটরি ঠেশ দিয়ে নৌকোর মাদুরে দেবনাথ গড়িয়ে পড়লেন। মাথার উপরে ধোঁয়া-ধোঁয়া মেঘ ভাসতে ভাসতে এক জায়গায় হঠাৎ ঠাসাঠাসি হয়ে কালোবর্ণ হয়ে যায়। আর অমনি ঝুপঝাপ বৃষ্টি। হবি তো এখনই ভাল করে হয়ে যা রে বাপু। পুজোর মধ্যে দিক করিস নে। এত আয়োজন বরবাদ হবে, গ্রামসুদ্ধ মানুষের মনঃকষ্ট।

খাল থেকে সয়াল বেরিয়ে ধানবনে ঢুকে গেছে—নৌকো সেই সয়াল ধরল তেপান্তরের বিল, ধানগাছে উথল-পাথল হওয়া। দূরে—অনেক দূরে, যে দিকে তাকানো যায়, গাঁ-গ্রামের সবুজ গাছপালা। খেজুরবনই বেশি, মাঝে মাঝে বড়গাছ—আম, জাম, বট, শিমুল। গাছপালার ভিতর থেকে খোড়োঘরের চালও নজরে পড়ে—দালানকোঠা কালেভদ্রে কদাচিৎ।

দেবনাথের রোমাঞ্চ লাগে—ভরা বিলে কতকাল পরে নেমেছেন। এঁদের ছোকরা বয়সে এই পথটাই বেশি চালু—বিল ভেঙে খাল পাড়ি দিয়ে নপাড়া স্টেশনে ট্রেন ধরা, আবার ট্রেন থেকে নপাড়ায় নেমে বাড়ি যাওয়া। শুকনোর সময় হাঁটতে হাঁটতে পায়ের নলি ছড়ে যেত। বর্ষার সময়টা মজা—এই

আজকের মতন। যত ডোঙা পুকুর ও খানাখন্দে ডুবানো ছিল—খবার মরশুমে শীতল জলতলে কুম্ভকর্ণের ঘুম ঘুমিয়ে নিয়েছে। তারপরে ঘনঘটা আকাশে—দিন সেই রাত নেই, বৃষ্টি। বিল কাল দেখেছি মরুভূমির মতন, রাত পোহালে চেয়ে দেখি মহাসমুদ্র—জল টইটম্বুর। সে জল দিনকে দিন অদৃশ্য হয়ে যায়, সমুদ্র কিন্তু তখনও—সবুজ সমুদ্র। জল বড় নজরে আসে না, যেদিকে তাকাই ধান-চারা দিগন্তের শেষসীমা অবধি। ডোঙা যেখানে যত ছিল, ভেসে উঠে ছুটো-ছুটি লাগিয়েছে ধানবনের আক্কসন্ধি জুড়ে। গাঙ খাল থেকে ডিঙি এসে পড়ছে অনেক। এবং ছোটখাট দু-দশটা পানসিও। হাট-করা মাছ-মারা ঘাস-কাটা সমস্ত ডিঙি-ডোঙায় চড়ে। গাড়ি-ঘোড়ায় চড়া শহরে বাবুভেয়ের মতন গেঁয়ো মানুষরাও এখন মাটিতে পা ঠেকায় না। অব্যবহারে পায়ে মরচে ধরবার গতিক।

এই অকূল সমুদ্রে লাইটহাউস বানিয়ে দিয়েছিলেন সোনাখড়িরই চাঁদবাবু, মন্তার-মা বুড়ি আছেন—তাঁর স্বামী। পোশাকি নাম চন্দ্রকান্ত ঘোষ। উদ্ভট খেয়ালের মানুষ চাঁদুবাবু—কাজকর্ম ধরন-ধারণ অন্য দশজনের সঙ্গে মেলে না। দেখা গেল, ভালকোবাঁশের ঝাড় থেকে বাছ বাছা বাঁশ কেটে ডাঁই করা হয়েছে। বাঁশ চেঁচে-ছুলে একটার সঙ্গে আর একটি জুড়ে জুড়ে বিস্তর লম্বা করা হল। বাঁওড়ের ধারে এক প্রাচীন তালগাছ—একজনকে চাঁদুবাবু তালগাছের মাথায় তুলে দিলেন দড়ির বাণ্ডিল হাতে দিয়ে। বাগড়োয় বসে লোকটা দড়ি ছেড়ে দিল, মাপ পাওয়া গেল তালগাছের। বাঁশের গায়ে গায়ে দড়ি ধরে দেখলেন জোড়-বাঁশ ঐ উঁচু তালগাছও ছাড়িয়ে গেছে। তবে আর কি—বিলের কিনারে নিয়ে বাঁশ পুঁতে ফেললেন। বাঁশের মাথায় কপিকল খাটানো। কাচের বিশাল চৌখুপি লণ্ঠন ফরমাস দিয়ে বানানো হয়েছে। লণ্ঠনের ভিতরে মেটে প্রদীপ—সে-ও ফরমাসি জিনিস। প্রদীপ দোতলা—নিচের খোপে জল, উপরে রেড়ির তেল। ঐ প্রক্রিয়ায় জল রাখলে তেল নাকি কম পোড়ে। দেড়পো তেল ধরত সেই প্রদীপে, কড়েআঙুলের মতন মোটা সলতে।

কার্তিকের পয়লা তারিখ সন্ধ্যাবেলা চাঁদুবাবু নিজ হাতে দড়ি টেনে প্রদীপ আকাশে তুলে দিলেন। সারা রাত জ্বলল। রাতে উঠে উঠে বিলের ধারে এসে চন্দ্রকান্ত দেখে যায়। চাঁদুবাবুর আকাশপ্রদীপ।

কিন্তু মুশকিল হতে লাগল। বিলের উথলপাথাল বাতাস, মাঝেমধ্যে এ-সময়টা ঝড়ও ওঠে—চৌখুপি থাকা সত্ত্বেও প্রদীপ নিভে হঠাৎ কখনো-বা অন্ধকার হয়ে যায়। প্রতিবিধান কি হতে পারে চন্দ্রকান্ত ভেবে পান না। বিচক্ষণেরা উপদেশ দেন: আয়েন্দা সন পিদিম অত উঁচুতে তুলো না। একটা বাঁশই যথেষ্ট। আর সে বাঁশ বিলের সামনে ফাঁকার মধ্যেই বা পুঁততে যাবে

কেন, ঘরের কানাচে যেখানটা কচুবন ঐখানে পুঁতে দাও। আড়াল পড়বে, অত বেশি বাতাসের ঝাপটা লাগবে না।

পরামর্শ চন্দ্রকান্তের মনে ধরল না। নতুনবাড়ির দোতলা দালানের চিলে-কোঠার ছাত হল গ্রামের মধ্যে উঁচু। তার চেয়েও উঁচু বাঁওড়ের ধারের তাল-গাছটা। আকাশপ্রদীপ সে তালগাছ ছাড়িয়ে আরও উপরে আলো দিচ্ছে। আলো বিল-কিনারে বলেই বিশখানা গ্রাম থেকে নজরে আসে। কার আলো? লোকে আঙুল দেখিয়ে বলাবলি করে: সোনাখড়ির চাটুবাবুর—কোন ব্যাপারে কারো চেয়ে যিনি খাটো হন না।

বিজ্ঞদের পরামর্শ বাতিল করে চন্দ্রকান্ত জবাব দেন: ঘর-কানাচেই বা কেন, পিদিম ঘরের মধ্যে আড়ার সঙ্গে ঝুলিয়ে দিলেই তো নিশ্চিন্ত। চৌখুপি না থাকলেও কোন ক্ষতি হবে না।

আরও এক কাণ্ড। চাটুবাবুরই জামাই মন্তার বর ডিঙিতে বিল পাড়ি দিয়ে শ্বশুরবাড়ি আসছে। আজকের এই দেবনাথের মতো। শ্রাবণ মাস, বিষম বৃষ্টিবাদলা, কালীবর্ণ আকাশ। সন্ধ্যা হতে না হতে নিশ্ছিদ্র আঁধারে চতুর্দিক ঢেকে গেল। তেপান্তর বিলে পথ হারিয়ে রাতদুপুরে বাবাজি সোনা-খড়ি ভেবে সাগরদত্তকাটি সর্দারপাড়ার ঘাটে নেমে পড়ল। কী কষ্ট তার পরে! বৃষ্টিতে ভিজে কাদা ভেঙে পিছল পথে আছাড় খেয়ে শেষরাত্রে শ্বশুরবাড়ির দরজায় উপস্থিত। দরজা খুলে চন্দ্রকান্ত স্তম্ভিত হলেন জামাইয়ের অবস্থা দেখে। রাতটুকু পোহানোর অপেক্ষা—সকাল থেকেই মাহিন্দার সহ কোমর বেঁধে লাগলেন। সাঁজের বেলা বাঁশের আগায় আকাশপ্রদীপ।

আজব কাণ্ড চাউর হয়ে গেছে। গোপাল ভটচাজের পিতা শ্রীধর ভটচাজ লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে এসে শুধালেন: আকাশপ্রদীপ শ্রাবণ মাসেই তুলে দিলে হে?

চন্দ্রকান্ত সংক্ষেপে বললেন, আগামী সন আষাঢ়ে তুলব ভটচাজ্জিখুড়ো।

শ্রীধর বললেন, আকাশপ্রদীপ কার্তিক মাসে দিতে হয়। খুশিমত দিলে হয় না। হেতুটা বোঝ?

চন্দ্রকান্তের তুড়ুক-জবাব: শুঁয়াপোকার উৎপাত এড়াতে। জোরালো আলোর টানে পোকা সব উপরে উঠে যায়, ঘরবাড়িতে ঝামেলা করে না।

তোমার মাথা! শ্রীধর চটেমটে বলে উঠলেন: ব্যাপারটা হল পিতৃপুরুষ-দের আলো দেখানো। মহালয়ার তর্পণের পর তাঁরা পিতৃলোক থেকে নামেন। ছেলেপুলের তর্পণের টানেই নেমে পড়েন, বলতে পারো। তাঁদের চলাচলের সুবিধের জন্য কার্তিক মাসে আকাশে আলো দেখায়।

আমি নরলোকেও আলো দেখাব ভটচাজ্জিখুড়ো।

দিগ্‌ব্যাপ্ত বিলের দিকে বিশালদেহ চন্দ্রকান্ত দীর্ঘ হাতখানা ঘুরিয়ে দিলেন। ধানগাছের সমুদ্র—তার ভিতরে হাজার হাজার ডিঙি ডোঙার চলাচল। রাত্রিবেলা পথ ভুল করে লোকে গ্রাম কোনদিক ঠাহর পায় না, ধানবনে ঘুরে ঘুরে মরে। আলো দেখে এবারে সোনাখড়ির হদিস পেয়ে যাবে। এবং সেই থেকে সাগরদত্তকাটি, হল্দে রাজীপুর, মদারডাঙা—বিলকিনারে সকলে গ্রামের আন্দাজ পাবে।

হেসে উঠে আবার বললেন, তা বলে পিতৃপুরুষদেরও বঞ্চিত করছিনে। আলো কার্তিক অবধি জ্বলবে। ধরে নিন শেষের মাসটা সেকেলে মুরুব্বদের জন্য।

চাঁদবাবুর আকাশপ্রদীপ খুবই কাজে আসত, রাত্রিবেলা মাঝ-বিলে লোকে আলো দেখে দিক ঠিক করত। দেবনাথের তরুণ বয়স—গ্রামবাসীদের মধ্যে বাইরের খবরাখবর তিনিই সকলের বেশি রাখতেন। 'বঙ্গবাসী' কাগজ আসত তাঁর নামে, আর 'জন্মভূমি' মাসিকপত্রিকা। চাঁদবাবুর লাইটহাউস—কথাটা তিনিই চালু করলেন। শুনে শুনে আরও দশ বিশ জনে ঐ নাম বলত। সোনাখড়ির লাইটহাউস।

আরও এক অনাচার। হেরিকেন লণ্ঠন চালু হল এই সময়। সদরে খুঁজে খুঁজে চন্দ্রকান্ত ডিক্সন-মার্কা এক ঢাউস হেরিকেন কিনে কেরোসিন ভরে ঐ লণ্ঠন তুলে দিলেন বাঁশের মাথায়। এই আলো ঝড়-জলে নেভার ভয় নেই, নির্বিঘ্নে সারারাত জ্বলবে। আরও সতর্কতা, প্রকাণ্ড এক ধামা ঝুলিয়ে দিলেন হেরিকেনের উপর দিকটায়। বৃষ্টির জল ধামা গড়িয়ে পড়বে, লণ্ঠন স্পর্শ করবে না।

ভটচাজমশায় ক্ষিপ্ত। কেরোসিনের আকাশপ্রদীপ—দিনকে-দিন আরম্ভ হল কী? চন্দ্রকান্ত বোঝানোর প্রয়াস পান: শাস্ত্রে কেরোসিন লেখে না, যেহেতু শাস্ত্র বানানোর আমলে কেরোসিনের চল হয় নি। আলো দেওয়া নিয়ে কথা—রেড়ির তেল না সর্ষের তেল না কেরোসিন তেল কোন বস্তু পোড়ানো হচ্ছে সেটা আদৌ ধর্তব্য নয়।

কিছুতে কিছু নয়। শেষটা চন্দ্রকান্ত সন্ধিস্থাপনা করলেন। কার্তিক মাসেই যখন আসল আকাশপ্রদীপ এবং বাকিটা ভুয়ো, কার্তিক মাসটা শুদ্ধাচারে তেলের প্রদীপ জ্বালানো হবে, অন্য মাসগুলোয় কেরোসিনের হেরিকেন।

চলল তাই। চন্দ্রকান্ত তারপরে মারা গেলেন, চাঁদবাবুর লাইটহাউস সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার। পাঁচ মেয়ের বিয়ের এবং নানারকম আজব খেয়ালে পয়সা খরচা করে একেবারে ফতুর তিনি, মরার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের অবস্থা প্রকাশ পেল। অমন দাবরাবের মানুষটার বাস্তুভিটের একখানা দোচালা ঘর টিমটিম

করে এখন। বিধবা মেয়ে সন্তান নিয়ে সন্তান-মা কায়ক্লেশে থাকেন। আর মানুষ পেলে সেকেলে সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ বাপ ও স্বামীর কাণ্ডবাণ্ড নিয়ে গল্প ফেঁদে বসেন।

বেলা পড়ে আসে। আসাননগরের বিলে এসে গেল—এখান থেকে কোণাকুণি পাড়ি মেরে সোনাখড়ি। একটা জায়গায় সমান হঠাৎ চওড়া হয়ে খালের মতো হয়েছে, খালের মুখ পাটা দিয়ে মাছ আটকানো। খসখস আওয়াজ তুলে নৌকো পাটার উপর দিয়ে খালের ভিতর পড়ল। পাটার একদিকে টোঙ। মাঝবিলে জলের মধ্যে খুঁটি পুঁতে একটা দুটো লোকের শোওয়া-বসার উপযোগী মাচা, বেড়া নেই, উপর থেকে দুটো চাল নেমে মাচার সংলগ্ন হয়েছে—টঙ এই বস্তুর নাম। দিবারাত্রি টোঙে মানুষ থাকে—জাল ফেলে তারা, ঘুনি-আটল-বানা পাতে। পাটায়-ঘেরা জলের মাছ চুরি-চামারি না হয়ে যায়, সদাসর্বদা কড়া নজর রাখে।

নৌকা থামিয়ে দেবনাথ জিজ্ঞাসা করেন: ও পাড়ুয়ের পো, মাছটাছ পেলে কিছু?

কই আর পেলাম। চুনোচানা চাট্টি—

ঝোড়াটা তোলো না কর্তা। দেখা যাক।

টোঙের লোক কলকে ধরানোয় ব্যস্ত। বেঁদা ভেঙে খানিকটা কলকের উপর ঠেসে দিয়ে জোরে জোরে টানে। গলগল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে—নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ধোঁয়া উদ্গীরণ করল খানিকটা। হুঁকোর মাথা থেকে কলকে নামিয়ে এগিয়ে ধরল: খাও—

দেবনাথ বললেন, কলকেয় খাওয়া আমার অভ্যেস নেই। তামাক খাইও না আমি বেশি।

ধ্বজি চেপে কাদায় পুঁতে ডিঙি মাঝি দ্রুত এসে কলকে ধরল। টোঙের মানুষ ঝোড়া তুলে ধরল জল থেকে। মাছ খলবল করে উঠল—লাফাচ্ছে।

নেবা নাকি?

দেবনাথ বললেন, দাও চাট্টি—

নয়না, পুঁটি তারাবাইন, টোরা-কই—হরেকরকমের মাছ। বরকন্দাজ পাত্রের অভাবে গামছা পেতে ধরল—শাকিতে মাছ তুলে এক শানকি ঢেলে দিল গামছায়। আরও দিতে যাচ্ছে, দেবনাথ আপত্তি করে উঠলেন: উঁহু, আর নয়। বুড়োমাছ কোটা-বাছা করবে কে এত? পৌঁছুতে সন্ধ্যে গড়িয়ে যাবে—ঘরে কি আছে না-আছে, তাই কিছু সম্বল করে যাওয়া। কত দিতে হবে, বলো।

দাও যা হয়। হাটবাজার নয়, টোঙে এসে মাছ চাইলে—দরদাম কি

কষতে যাব? যেমন খুশি দিয়ে দাও।

দেবনাথ বললেন, আমি বাইরে থাকি, দরদাম কিছু জানি নে। মাঝি, তুমিই বলে দাও উচিত-দাম কি হতে পারে।

গামছার মাছ মাঝি একটু উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখল। বলে, সিকি একটা দিয়ে দেন বাবু—

গেঁজে খুলে দেবনাথ বললেন, টাকার ভাঙানি হবে তো?

টোকা-ভরা মানুষ ঘাড় নাড়ল: উঁহু, বিলের মধ্যে কেনাবেচা কোথা? তা ছাড়া পয়সাকড়ি কিছু এলে সঙ্গে সঙ্গে অমনি বাড়ি রেখে আসি।

দেবনাথ বললেন, খুচরো চার আনা তো হচ্ছে না—আনা দুই হতে পারে। এক কাজ করো, অর্ধেকগুলো মাছ তুলে নাও তুমি।

যা দেওয়া হয়েছে, আবার তা তুলতে যাব কেন? যা আছে দিয়ে যাও। বাকি পয়সা যে দিন হয় দিয়ে যেও। না দিলেই বা কী?

॥ সতেরো ॥

ঘাটে ডিঙি লাগল। ভর সন্ধ্যাবেলা। বাড়ির লাগোয়া উলুক্ষেত ইটখোলা ও আমবাগান দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সামান্য কয়েকখানা ধানক্ষেত পার হয়ে গিয়ে। শুকনোর সময় একদৌড়ে গিয়ে ওঠা যায়। এখন ডাঙা-পথে অনেকখানি ঘুরে প্রায় অর্ধেক গ্রাম চক্কোর মেরে বাড়ি পৌঁছতে হবে। দেবনাথ চললেন, বরকন্দাজ দু-জন নৌকো আগলে রইল।

নতুন মণ্ডপে ছেলেপুলের ভিড়। প্রতিমা চিত্তির হচ্ছে। দু-পাশে দুই ঝুলন্ত-লণ্ঠন, আলোয় অনেক দূর অবধি উজ্জ্বল হয়েছে। কমল-পুঁটিও সেখানে—সকলের আগে কমল দেখেছে, 'বাবা' 'বাবা' করে ছুটতে ছুটতে এসে সে বাপের হাত ধরল। মণ্ডপের সামনে এসে দেবনাথ মুহূর্তকাল দাঁড়ালেন। চার কারিগর কাজে লেগে আছে—রাজীবপুরের পালেদের চারজন।

দেবনাথ বললেন, এখনো সারা হয় নি? চালচিত্তির ধরোই নি, দেখতে পাচ্ছি।

মাতব্বর কারিগর বলে, যত রাতই হোক হাতের কাজ সারা করে বেরুব। দিনমানের কাজ আমাদের গাঁয়ে ভট্টাচাজ্জি-বাড়িতে। কাল সন্ধ্যায় আবার আসব, এসে চালচিত্তির ধরব। চার হাতে কাজ—ক'দিন লাগবে? হয়ে যাবে সময়ের মধ্যে। এক বাড়ি তো নয়, সব বাড়ি সমানভাবে সামাল দিয়ে বেড়াচ্ছি।

হাটবার আজ। কৃষ্ণময় আর মহিন্দার অটলকে নিয়ে ভবনাথ হাটে চলে গেছেন। রীতিমতো ওজন্দার কেনাকাটা--সেই কারণে শিকে-বাঁক ধামা-ঝুড়ি গেছে। বাড়িতে মানুষ কিলবিল করছে। আত্মীয়কুটুম্ব অনেক এসেছেন, আরও কেউ কেউ আসবেন। দেখে দেবনাথ বড় খুশি—এমন নইলে যজ্ঞবাড়ি কিসের? পায়ের গোড়ায় ঢিবঢাব প্রণাম করছে—অধিকাংশই দেবনাথ চেনেন না। বিদেশে পড়ে থাকেন—না-চেনা আশ্চর্য নয়। কিন্তু ভবনাথ চিরকাল দেশঘরে থেকেও তো চিনতেন না—ছোটকর্তার ফর্দ অনুযায়ী নেমন্তন্ন পাঠিয়েছিলেন, আসবার পরে চেনা-জানা হয়েছে! উমাসুন্দরী দেবনাথের কাছে পরিচয় দিচ্ছেন: অমুকের অমুক ইনি। আর দেবনাথ বয়স বুঝে প্রণাম করছেন। না করলে ফিরে গিয়ে নিন্দেমন্দ করবে: দেখ, দুটো পয়সা রোজগার করে বলে ঘাড় নিচু হয় না মোটে। এক বৃদ্ধার পায়ের ধুলো নিতে গেলে ফোকলা মুখ নাচিয়ে না-না করতে করতে তিড়িং করে তিনি পিছিয়ে গেলেন: কী সর্বনাশ, পায়ে হাত পড়লে পাপ হবে, হিসাব মতন তুমি যে খুড়ো আমার।

উমাসুন্দরী বললেন, বয়েসে তবু তো কত ছোট—

ওটা কি বললে কেষ্টর-মা, সাপটা ছোট বলে বিষ তার কিছু কম হয়ে থাকে?

হিরণ্ময় শিশুবরকে নিয়ে নৌকোয় মালপত্র আনতে ছুটল। দু'জনে কি হবে -চাষাপাড়া থেকে শিকেবাঁক সহ আরও ক'টিকে জুটিয়ে নিল সঙ্গে। তিনটে কাপড়ের বাণ্ডিল দুমদাম করে রোয়াকে এনে ফেলল। কপালের ঘাম মুছে হিরণ্ময় বলল, কলকাতার দোকানের যত কাপড়—কাকা সমস্ত তুলে এনেছেন।

দেবনাথ হাসতে হাসতে বললেন, নতুন কাপড় পরে পূজো না দেখলে পূজো কিসের? কিন্তু সকলের জন্য তো হয়ে উঠল না—বাছাই-বিবেচনা করে দিতে হবে। অগ্নিমূল্য হয়েছে—লাট্টু ধুতি এই সেদিন চোদ্দ পনের আনা জোড়া ছিল—পাঁচ সিকের কমে তা ছাড়তে চায় না। বেশি মাল নিচ্ছি বলে শেষটা তিন আনা রফা হল। এত দূর হলে লোকে তো কাপড় পরা ছেড়ে সেকালের মতন বাকল পরবে।

তরঙ্গিণী ঘরে ঘরে ডেকে বেড়ান: ওঠো, ঢেঁকিশেলে চলো। চিঁড়ে কোটা হবে আর কখন? এখন তো পর পরই আসতে থাকবে। গোলমালে ঘটে উঠবে না। কলসি কলসি ধান ভেজানো হল, নামাতে হবে তো সেগুলো।

তরঙ্গিণীর মাথায় জট নড়ে। রাতের এখনো কী হয়েছে—টেমি ধরে ঘরে ঘরে ডেকে তুলছেন। শীত-শীত লাগছে বেশ, আঁচলের মুড়ো ভাল করে জড়িয়ে নিলেন। এখন শীত—ভানা-কোটা শুরু হয়ে গেলে এ শীত উড়ে পালাবে।

ষষ্ঠীর দিন থেকে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজো অবধি ঢেঁকির পাড় পড়তে নেই। কত লোক আসবে, কাজকর্ম করবে—বহু চিঁড়ের বিস্তর খরচ। গা এলিয়ে শুয়ে পড়ে থাকলে হবে কেন?

ওঠ রে বিনি, ওঠো বড়বউ, উঠে এসো বসন্তর মা। বলি তিন কলসি ধান ভিজিয়েছ কাল, মনে আছে সে কথা?

শুধু ওই এক বাড়ি নয়, বাড় বাড়ি এমনি। চ্যাঁ-কুচকুচ চ্যাঁ-কুচকুচ—সব ঢেঁকিশালে, শোন, শেষরাত্রি থেকে পাড় পড়ছে।

গ্রাম গুলজার। নিত্য দল মানুষ এসে পড়ছে। পূজোর সময় বরাবরই আসে এমনি। কাজকর্মে বাইরে থাকে ছুটি পেয়ে তারা বাড়ি আসে। অন্যান্য বছর পূজো ছিল না, তবু এসেছে—পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়, সেটা বড় কম কথা নয়। গ্রামে পূজো বলে এবারে অতিরিক্ত ভিড়। গ্রামবাসী ছাড়াও ভিন্ন জায়গার মানুষ পূজো দেখবার ইচ্ছায় কুটুম্ববাড়ি আসছে। জোড়া তাল-তলার ঘাটে যখন তখন ডিঙি ডোঙা এসে লাগে, জুতো হাতে নিয়ে নেমে পড়ে মানুষ। আবার নাগরগোপ থেকে দেড় ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটেও আসছে সব। চিঠি লেখা আছে, অমুক দিন যাচ্ছি। সময় আন্দাজ করে পাকারাস্তার উপর লোক বসে থাকে। খালি-হাতে কেউ আসে না, কাপড়চোপড় মিষ্টিমিঠাই ফরমাসের টুকিটাকি থাকবেই—সেই সমস্ত মাল বয়ে নিয়ে যাবে। বাড়ির ছেলেপুলে ঘন ঘন হরিতলা অবধি চলে যায়। ফিরে এসে বলে, নাঃ, এলো না আজকে। হঠাৎ মোড় ঘুরে মানুষটি দেখা দিল, পিছনের লোকের মাথায় বোঁচকাবুঁচকি। এ সেছে, এসেছে—করতে করতে খুচরো এটা-ওটা মানুষটির হাত থেকে নিয়ে ছেলেপুলেরা দৌড় দিল, বাড়িতে আগে আগে গিয়ে খবরটা দেবে। উনুনের আগুন নেভে না আজকাল আর—এক খাওয়া মিটতে না মিটতে আবার চড়ে যায়। বউরা খেটে খেটে খুন হয়ে নিচ্ছে। গ্রামের দিন আজকাল ফুড়ুত করে যেন উড়ে চলে যায়, টেরই পাওয়া যায় না। রাত্রে ঘুমে যখন চোখ বড্ড জড়িয়ে আসে, যেখানে হোক একটা মাদুর নিয়ে গড়িয়ে পড়ে। পলকে রাত আবার হয়ে যায়।

হাটে কেনাকাটার খুব ধুম। সব বাড়ি থেকে হাট করতে যাচ্ছে, ভাল মাছটা শাকটা কেনার জন্য কাড়াকাড়ি। নিতান্ত গরিব মানুষটাও টাকার অবস্থা ভুলে বসে আছে: আহা, দেশে ঘরে থাকে না, ক দিনের তরে এসেছে—নিজেরা খাই না খাই ওদের পাতে কিছু ভালমন্দ যাতে পড়ে, দেখতে হবে বইকি।

এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় চলতে-ফিরতে কত রকম টানের কথা কানে এসে

চোকে। দত্তবাড়ির বউটা খাস কলকাতার মেয়ে—এলুম-গেলুম-হলুম বলে কথা বলে। চারি সুরি ফুন্টি বেউলো মেয়েগুলো হেসে কূল পায় না। ওরা আরও জুড়ে দেয় : গেলুম হলুম হালুম-হুলুম। হালু-হুলুম করে গলায় বাঘের আওয়াজ তোলে, আর হেসে লুটোপুটি খায়। তেমনি এসেছেন উত্তরবাড়িতে যজ্ঞেশ্বরের শালা—ঢাকার বাসিন্দা তিনি। বললেন, ওয়ান থনে আইতে বড় কষ্ট। জল্লাদটা পাড়ায় এসে সেই টানের অনুকরণ করে, আর লোক হাসিয়ে মারে।

নেমন্তন্ন-আমন্তন্ন লেগেই আছে, কোন বাড়ি কোন দিন বাদ নেই। তোমার জামাইর নেমন্তন্ন পশ্চিমবাড়ি, আবার তোমার বাড়িতেই ঐদিন, দ্বারিক পালের ভাগনি দুটো বারান্দি থেকে এসেছে, তাদের নেমন্তন্ন দিয়ে বসে আছে। চিরদিন তো থাকতে আসে নি, পূজো কাটিয়ে টেনেটুনে আরও হয়তো পাঁচ-সাতটা দিন রাখা যাবে। অতএব দেরী করে রয়ে-সয়ে খাওয়ানোর জো নেই, সময়ে বেড় পাবে না। তাড়াহুড়ো না করলে হাতনের বসিয়ে দুটো ভাত খাওয়ানো আর ঘটে উঠবে না।

আহ্লাদ বৈরাগীর গলা পাওয়া যায় ভোরবেলা এক-একদিন। মায়ের পিছন পিছন মায়ের দু-কাঁধে দু-হাত রেখে বাড়ি বাড়ি ঘুরছে। পূববাড়িতে এসেছে, বাড়ির সকলে এখনো ওঠে নি। উঠানে দাঁড়িয়ে বৈরাগী আগমনী ধরেছে :

ওঠো গো মা গিরিরাণী
ঐ এলো নন্দিনী তোর—
(ও মা) বেহুঁশ হয়ে রইলি পড়ে
এমনি বিষম ঘুম-ঘোর।

তরঙ্গিণী রান্নাঘরে গোবর দিচ্ছিলেন। ন্যাতা হাতে দ্রুত বেরিয়ে দাওয়ায় দাঁড়ালেন। শুনতে শুনতে দু-চোখে জল টলমল করে ওঠে। মর্ পোড়ারমুখী গিরিরাণী মেনকা-মা, মেয়ে এসে উঠানে দাঁড়িয়ে আছে, ঘুম তবু দু-চক্ষু ছাড়ে না।

বাইরের উঠানের ওদিকটায় উঁকিঝুঁকি দিলেন একবার। ষষ্ঠীর দিন চঞ্চলা আসবে, সুরেশ নিয়ে আসবে—দুটো দিন বাকি তার এখনো। হিসাবের বাইরেও তো সংসারে কত জিনিস ঘটে! কোন কারণে, ধরো, সুরেশের অফিস আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎ গিয়ে পড়ে অবাক করে দেবে—সেই জন্য, ধরো, আজকে এখনই যুগলে এসে হাজির।

গান শেষ করে বৈরাগী চাল-কাঁচকলা-পয়সা বিদায় নিয়ে আর এক বাড়ি গেল। তরঙ্গিণী নিশ্বাস ফেলে আবার গোবর-লেপার কাজে গিয়ে লাগলেন।

দেবেন্দ্র চক্রবর্তী এসে উপস্থিত—দেবনাথ যাকে মিতে-মিতে করেন, কাজেম শুকুর পাঠশালায় যার সঙ্গে পড়তেন। সেবারে দেখা হয় নি। মেয়ের বাড়ি ছিল সে তখন। মাঝে এসে খবর নিয়ে গেছে, ঘাড়ে এঁদের পূজো চেপে পড়েছে—পূজোর সময় দেবনাথের না এসে পরিত্রাণ নেই। হিসাব করে: দেবীচতুর্থী'র দিন সে পুববাড়ি এসে হাজির। কালো রোগা লম্বা আকৃতি—সব মিলিয়ে প্রায় এক তালগাছ। হেঁটে আসছে—পা একখানা এখানে, পরের খানা ফেলল হাত পাঁচ-ছয় এগিয়ে। মানুষের পা এত দীর্ঘ কী করে হয়—সন্দেহ জাগে, দুই পায়ে দুই রণপা লাগিয়ে ছুটছে। ছুটুক আর যা-ই করুক, হুড়ুপ-হুড়ুপ আওয়াজ তুলে হুঁকো টানার বিরাম নেই। কষে এক-একটা দম দিয়ে যাবতীয় ধোঁয়া মুখাভ্যন্তরে পুরে ফেলছে, ছেড়ে দিচ্ছে ক্ষণ পরে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে আগ্নেয়গিরির ধূম-উদ্গীরণের মতো। ঠোঁটের উপরে গোঁফ আছে এবং নিয়ে সামান্য দাড়ি—সেগুলোর কালো রঙ তামাকের ধোঁয়ার জলে জলে কটা হয়ে গেছে। হুঁকোই বা কী? আয়তনে বিপুল—ডাবা খোলের নিচের দিকটা সূক্ষ্ম হতে হতে একেবারে সূচিমুখ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কালোকুঁদ আবলুসকাঠের নলচে নিয়মিত তেল মাখানোর গুণে আদ্যন্ত ঝিকমিক করে, হাত থেকে পিছলে যাবে শঙ্কা হয়। নলচের গলায় বাঁধা রয়েছে হুক আর ঝাঁঝরি-কাটা টিনের চাকতি। হুক থাকায় যত্রতত্র টাঙিয়ে রাখা চলে। আর কলকের আগুন ঝাঁঝরি চাপা দিয়ে দেয় ফলে আগুন উড়ে গিয়ে অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে পারে না।

দেবেন চলল তো তার শখের হুঁকোও চলল সঙ্গে সঙ্গে। এক কলকে শেষ হয়ে গেলে পথের মাঝেই উবু হয়ে বসে নতুন এক ছিলিম সেজে নেবে। যতক্ষণ জাগ্রত আছে, হুঁকো টানা লহমার তরে কামাই না যায়! রাতের বেলা ঘুমানোর সময় চাল কি বেড়ার সঙ্গে হুঁকো টাঙিয়ে রাখে—কিন্তু ঘুম আছে নাকি পোড়া চোখে? তামাকের পিপাসায় তড়িঘড়ি উঠে পড়ে। কুটুম্ববাড়ি গিয়ে সাজা তামাক সঙ্গে সঙ্গে পেলো তো ভাল, নয়তো নিজেই সাজতে লেগে যাবে—মান টাঙিয়ে ভদ্র হয়ে বসে থাকার ধকল সইবে না। মোকদ্দমায় সাক্ষি দিতে কাঠগোড়ায় উঠেছে—হুঁকো বাঁ-হাতে ঝুলানো। মাঠেঘাটে বনেবাদাড়ে যেখানেই যাক, হুঁকো ছাড়া দেবেন নেই। রথের বাজারে পোড়ামাটির খেলনা-হুঁকো পাওয়া যায়—লোকে গল্প রটিয়েছে জন্মের সময় দেবেন নাকি অমনি এক সেট হুঁকো-কলকে মুঠোয় নিয়ে মাতৃগর্ভ থেকে পড়েছিল। এবং যেদিন সে শ্মশানের মহাযাত্রায় যাবে, পড়শি-স্বজনেরা ঠিক করে রেখেছে জলন্ত চিতায় মড়ার সঙ্গে শখের হুঁকো-কলকে এবং কিছু তামাক টিকে দিয়ে দেবে। অচেনা পরলোকে গিয়ে তামাকের অভাবে গোড়াতেই সে

চোখে অন্ধকার না দেখে।

যাকগে, যা হচ্ছিল। সোনাখড়ি পুববাড়ি দেবেন এসে উপস্থিত। কাঁধে যথারীতি ক্যাম্বিশের ব্যাগ, হাতে চটি, গলায় চাদর, মুখে হুঁকো। ব্যাগ খুলে পুঁটুলিতে বাঁধা পাশার সরঞ্জাম বের করতে করতে ক্ষুব্ধ স্বরে বলে, বোশেখ মাসে এসেছিলে—তখন আমি রেণুর বাড়ি গোঁসাইগঞ্জে। ন'মাস-ছ'মাসের পথ নয়—কাকপক্ষীর মুখে একটু খবর পেলে হামলা দিয়ে এসে পড়তাম।

সভয়ে তাকিয়ে দেবনাথ বলেন, ও কি মিতে, ছক পাতছ সকালবেলা এখন—

দেবেন বলে, এখনই ভাল হে। কাজের-বাড়ি জমে উঠতে উঠতে আমাদের এক-বাজি দু-বাজি সারা হয়ে যাবে তার মধ্যে।

দেবনাথ হেসে বলেন, এক বাজিতে সানায় না—দু-বাজি! আশা বলিহারি যাই।

দেবেন বলছে, উঃ, তোমার সঙ্গে কত দিন বসি নি! তখন তো পাশা তোমার হুকুমের গোলাম। হাঁক পেড়ে বললে ছ-তিন-নয়—তাই পড়ল। বললে, কচ্চে-বারো—ঠিক তাই। এখন কি রকম?

ভাব চটে গেছে মিতে, পাশা আমায় ভুলে গেছে। ছুঁই নি পাশা কত দিন। সময়ই নেই।

সেকালের দুই পরম সুহৃদ—পাশা এবং দেবেন চক্রবর্তী। তাদের সামনে পেয়ে, কাজের দায়িত্ব যতই থাক দেবনাথ না বলতে পারলেন না। পাশা তিনটে তুলে দু-হাতে রগড়ে নিলেন একবার। হাত শুড়শুড় করছে দান ফেলবার জন্য। বললেন, দুজনে কি হবে? খেড়ি কই?

এসে পড়বে। সাজিয়ে নিই আগে—কাতার দিয়ে আসবে। ঠেলে কূল পাবে না।

সত্যি তাই। একে দুয়ে বেশ কিছু মানুষ। হারু মিত্তির কোন দিকে ছিল—সরো সরো করতে করতে মানুষজন ঠেলে দেবনাথের খেড়ি হয়ে বিপরীতে বসে গেল। দেবেনের সঙ্গে যজ্ঞেশ্বর বসলেন। ঝণ্টু অক্ষয় ভুলো সিধুরাও খেলে ভাল, কিন্তু হিরন্ময়ের জুড়ি ও সমবয়সি হয়ে কাকামশায়ের সঙ্গে খেলা চলে না। খেলা দেখছে তারা—চতুর্দিক ঘিরে জুত দিচ্ছে, কলহ ও কথা-কাটাকাটি করছে, সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠছে মাঝেমধ্যে।

দেবনাথ সুবিধা করতে পারছেন না। চর্চা নেই তো বটেই, তার উপর লোকজন মিনিটে মিনিটে এসে মনোযোগে বাধা ঘটাচ্ছে। হাজু ময়রার ফর্দটা কারকাছে? চণ্ডীপাঠের কথা পাকা হয়ে গেছে তো? হ্যাজাকের ম্যান্টল

না থাকে তো গঞ্জে লোক যাচ্ছে—নিয়ে আসুক। ইত্যাকার হরেক প্রশ্ন ভবনাথের। অক্ষক্রীড়া ব্যসন বিশেষ—অগ্রজ গুরুজন হয়ে নিজে তিনি এই আসরে আসতে পারেন না, লোকমুখে ঘন ঘন প্রশ্ন পাঠাচ্ছেন।

ঘাড় তুলে দেবনাথ একবার নজর ঘুরিয়ে দেখে আঁতকে উঠলেন: আরে সর্বনাশ, কাজের মানুষ সব ক'টি যে এখানে! তাড়াতাড়ি সরো মিতে। দাদা গরম হচ্ছেন—ঘন ঘন লোক পাঠানোর মানেটা তাই।

এতক্ষণ যজ্ঞিবাড়ির হুঁকোয় চলছিল, এইবারে দেবেন নিজের হুঁকো নামিয়ে নিয়ে সাজতে বসল। কলকেও ফরমায়েসি—কলকে নয়, ভাতের হাঁড়ির সরা একখানা যেন উল্টো করে বসানো। সেই কলকের কানায় কানায় তামাকে ভরতি করল। এতএব বলে দিতে হয় না, দেবেন চকোত্তিও এইবার বেরিয়ে পড়বে—পথ হাঁটবে।

দেবনাথ বললেন, এক্ষুনি কেন মিতে? পাকশাক করো এখানে, ও-বেলা যেও!

মালসা থেকে ঘুঁটের আগুন কলকের উপর তুলে ভুড়ুক-ভুড়ুক কয়েকটা টান দিয়ে দেবেন বলল, খাজনার তিনটে টাকা দেবো-দেবো করে হরিশ কুণ্ডু আজ চার-পাঁচ মাস ঘোরাচ্ছে—তার বাড়ি হয়ে যাবো এখন। দেবীর ঘটস্থাপনা হয়ে গেলে তারপরে আর টাকা বের করবে না—ছুতো পেয়ে যাবে।

ছক-গুঁটি-পাশা ব্যাগে ভরতে ভরতে বলল, আজ কিছু হল না, তাড়া-হুড়োর জিনিস নয়। মচ্ছব মিটেমেটে যাক—

দেবনাথ সোৎসাহে বলেন; কোজাগরী রাত্রে পঞ্জিকার বিধান রয়েছে—

থাকবে সেই অবধি?

দেবনাথ বললেন, কালীপুজোর পরেও আছি। ভাইদ্বিতীয়ায় দিদির হাতের ফোঁটা নিতে এবছর, ঐজন্যে তিনি থেকে যাবেন।

একগাল হেসে দেবেন বলল, পাকা হয়ে রইল কিন্তু মিতে। নিশি-জাগরণ অক্ষক্রীড়া চিপিটক-নারিকেলোদক ভক্ষণ—শাস্ত্রের বিধান অক্ষরে অক্ষরে মানব আমরা। আমার খেড়ি আমি নিয়ে আসব, তোমার খেড়ি তুমি ঠিক-ঠাক করে ফেল এর মধ্যে। কেমন?

দুর্গাপুজো সকলের সেরা। পুজো মাত্র নয়, উৎসব—দুর্গোৎসব। এদিকে-সেদিকে কিছু খুচরো পরবও আছেন। দুর্গাপুজো দেরিতে—কার্তিক মাসে। খুচরোরা এবারে আগে এসে যাচ্ছেন।

তিরিশে আশ্বিন, সংক্রান্তির দিন। মণ্ডপে প্রতিমা রং-চিত্তির হচ্ছে, ওদিকে

বিলের ধানবনের মধ্যেও একটুকুও ব্যাপার। এক ধরনের পূজোই—ধানবনকে সাধ-খাওয়ানো। হাঁটুভর কাদা ভেঙে বুড়োমানুষ ভবনাথ নিজেই বিলে চলে গেলেন, সঙ্গে শিশুবর। এ পূজোর পুরুত বলতে হবে শিশুবরকেই।

আশ্বিন যায় কার্তিক আসে,
মা-লক্ষ্মী গর্ভে বসে,
সাধ খাও মা, সাধ খাও—

—এই হল মন্তোর। মন্তোর বলে শিশুবর ক্ষেতের ধারে এক ফেরো দুধ ঢেলে দেবে। ধানের ভেতরের দুধ, শস্যের যা আদি অবস্থা সেটা যেন খুব ভাল হয়—এই কামনা। দুধ দিয়ে তারপর বাতাসা ছড়িয়ে দেবে, অর্থাৎ চালের স্বাদ যেন মিষ্টিও হয়। শিশুবর চাষবাসও করে—অতএব ক্ষেত হল তার মেয়ে। গর্ভবতী মেয়েকে আপনজনেরা সাধ খাওয়ায় না—ক্ষেতকে মা ডেকে শিশুবর সাধ খাওয়াচ্ছে, দেখুন।

আবার সেই সংক্রান্তির রাতটা ভাল করে না পোহাতেই ভিন্ন এক পরব। গারসি। পোহাতি-তারা আকাশে। বাদুড়ের ঝাঁক কালো কালো ছায়া ফেলে বাসায় ফিরছে। তরঙ্গিণী উঠে ডাকাডাকি করছেন: ওঠো সব। কমলকে তুলে বসিয়ে দিলেন: ওঠ্ রে, গারসি করবি নে?

সবাই উঠেছে—সধবা-বিধবা ছেলে বুড়ো বলে বাছাবাছি নেই। শরিক বংশীধরের বাড়িতেও উঠে গেছে, শুধুমাত্র সিধু বাদ। দক্ষিণের ঘর ও দালানের মাঝে খানিকটা উঁচু ফাঁকা জায়গা—'বারাণ্ডা' নামে জায়গাটুকুর পরিচয়। আপনা-আপনি একটা কাঁঠালচারা জন্মেছে যেখানে, আর কয়েকটা কৃষ্ণকলি ফুলের গাছ। গারসি করতে এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি থেকে ঐ একটা জায়গায় এসে সব জমল।

আশ্বিনে রেঁধে কার্তিকে খায়,
যে বর মাঙে সেই বর পায়—

ছড়া কেটে বিনো পুকুরঘাটে দৌড়ল ঘটি নিয়ে। রীতকর্মে জলটা শুধু টাটকা লাগে, আর সমস্ত বাসি। রাতটুকু পোহালেই যে দিন, তার মধ্যে উনুনে আগুন দেওয়া যাবে না—চিঁড়ে মুড়ি বাসি-পান্তা খেয়ে সব থাকবে। বিলের উপরে গ্রাম বলে এরই মধ্যে বেশ শীত-শীত ভাব। এক-আঁটি পাটকাঠি নিয়ে মাহিন্দার অটল এসে গেল—খালি গা-হাত-পা, আবরণ বলতে হাঁটুর উপরে তোলা এক চিলতে কাপড়। তুর-তুর করে কাঁপছে সে। বড়গিন্নি বললেন, জড়িয়ে আয় রে গায়ে একটা-কিছু—

অটল অবহেলায় উড়িয়ে দিল: কিছু লাগবেনে মা ঠাকরুন। জাড় আর কতক্ষণ?

কমল পুঁটিকে বলে, সিগারেট খাব আমি দেখিস।

পুঁটি বলে, আমিও—

কমল অবাক হয়ে বলে বলে, সেকী রে, তুই যে মেয়েছেলে।

আজকে অত মেয়েছেলে-বেটাছেলে নেই। গেল-বছর খাইনি অসুখ ছিল বলে। জানলার উপরে চুপচাপ বসে বসে দেখলাম।

কমলের স্ফূর্তি মিইয়ে গেল। দিদিটাও খাবে—তবে আর পুরুষমানুষ হয়ে কী হল, ধুস!

বিনো জল নিয়ে ফিরেছে। হলুদ-বাটা সর্ষে-বাটা মেথি-বাটা তেল ঘি বাটিতে-বাটিতে। কুলগাছের নতুন পাতা একটা বাটিতে বেটে রেখেছে। কাজলপাতায় কাজল পাড়ানো। মুঠোখানেক কাঁচাতেঁতুল। থরে থরে সমস্ত কুলোয় সাজিয়ে নিমি কাঁঠালতলায় ঐখানটা এনে রাখল।

পাটকাঠির কাঁড়ুতে আগুন ধরিয়ে দিল। ঘটির জলে হাত ধুয়ে নিয়ে আগুনে হাত সেঁকছে সবাই, পা সেঁকছে। পাটকাঠির আগুনে কাঁচাতেঁতুল পোড়াল—খোলার নিচে তেঁতুল ক্ষীরের মতন হয়ে গেছে। এবারে তেলে-হলুদ-বাটায় মিশিয়ে রগড়ে রগড়ে গায়ে মাখে. মেথি তেঁতুলপোড়া ইত্যাদি মাখে। ঘি-ও মাখে ঈষৎ। মাথার চুলে কিন্তু ঘি মেখো না, খবরদার। চুল সাদা হয়ে যাবে। একফোঁটা এই যে কমলবাবু, রাতারাতি সে পাকাচুলো বুড়ো হয়ে গেছে দেখবে।

পাটকাঠির এক-এক টুকরো ভেঙে সকলকে দিচ্ছে—এক মুখে তার আগুন ফকফক করে টানছে—কমল যাকে বলছিল সিগারেট খাওয়া। খেতে হয় এই রকম—গারসির বিধি। সর্বসমক্ষে মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের করা—কী মজা, কী মজা! কিন্তু কাশি পেয়ে যায় যে বড্ড।

ভোর হতেই আহ্লাদ বৈরাগীর গলা। পয়লা কার্তিক আজ—আহ্লাদ ও মা বগলা আজ থেকে টহলধারি ধরলেন। বৈশাখ আর কার্তিক বছরের মধ্যে এই দুটো মাস প্রভাতী গাইতে হয়। গাইছেন আজ আগমনী-গান। ক'দিন পরে বিসর্জনী—মানুষ কাঁদাবেন বিসর্জন গেয়ে গেয়ে। দুর্গোৎসব চুকেবুকে যাওয়ার পর হরিকথা, কৃষ্ণকথা—বরাবরকার যে সমস্ত গান। কিৎ-কিৎ-কিৎ-কিৎ, ডু-উ-রে ল্যাং-চাং সোনা দিয়ে বাঁধাবো ঠ্যাং—ইত্যাকার দম ধরেছে, আওয়াজ আসে নতুনবাড়ির ওদিক থেকে। এই সকালে জল্লাদের দল হা-ডু-ডু খেলায় নেমেছে। ভোরের খেলাধুলা গারসিরই অঙ্গ—গারসির দিন এমনি দৌড়ঝাঁপের খেলা খেলে শীতকাল আসছে—গারসি করলে হাত-পা কাটার ভয় থাকে না।

আজই আবার সন্ধ্যাবেলা ও-পাড়ায় শশধর দত্ত মহাশয়ের উঠানে আকাশ-প্রদীপ আকাশে চড়ে বসবেন, প্রতি সকালে ভুঁয়ে নামবেন। পুরো কার্তিক জুড়ে প্রদীপের এই ওঠা-নামা। আগে চাঁদুবাবু করতেন. তিনি গত হবার পরে আজ ক'বছর শশধর ধরেছেন।

কলকাতায় থাকার দরুন কালিদাস খানিক নাস্তিক হয়ে পড়েছে—জিনিসটা বাপের উদ্ভট খেয়াল বলে মনে করে সে। দু-ভায়ে হাসিতামাসা চলে—কালিদাস বলে, সারারাত ধরে এক-পদ্দিম তেল পুড়িয়ে গুচ্ছের মরা-পোকা আকাশ থেকে নামিয়ে আনা। এছাড়া আর কোন মুনাফা নেই।

আছে রে আছে। হিসাবি মানুষ বাবা—হুট করে কিছু করেন না, পিছনে গভীর মতলব থাকে। এই আমাদের ভাইদের নামের ব্যাপারে দেখ্। দাদার নাম ছিল হরিদাস, আমার নাম নারায়ণদাস, তোর নাম কালিদাস। সেই কতকাল আগে ভেবেচিন্তে বাবা নামকরণ করেছেন।

নামকরণের দুটো তাৎপর্য নারায়ণদাস শুনেছে, ভাইকে সে বুঝিয়ে দিল : ওহে হরি, ওরে নারায়ণ, ওরে কালী—ছেলেদের শশধর হরবকত তো ডাকবেন, ভগবানকেও অমনি ডাকা হয়ে যাবে। বিনি খাটনিতে আপনা আপনি পুণ্যলাভ। এতদূর অবধি তলিয়ে দেখেন উনি—ইহলোক-পরলোক কোন দিকে দৃষ্টি এড়ায় না। আকাশপ্রদীপ চালু করার মধ্যেও পারলৌকিক তদ্বির। মহালয়ার পার্বণশ্রাদ্ধ নিতে স্বর্গীয় কর্তারা পিতৃলোক থেকে ভূলোক নেমে পড়েছেন—বুড়োমানুষরা অনভ্যাসে হোঁচট না খান, সেই জন্যে তেল পুড়িয়ে আলো দেখানো। বয়স হয়েছে শশধরের—অচিরে উনিও ঐ স্বর্গীয়দের দলে গিয়ে পড়বেন। আলো-টালো দেখিয়ে ওঁদের সঙ্গে যথাসম্ভব খাতির জমিয়ে রাখছেন।

॥ আঠারো ॥

প্রতিমা চিত্তির সারা হতে চতুর্থী অবধি লেগে গেল। চালচিত্রে এখনো হাত পড়েনি—দুই কারিগর দুই পাশ দিয়ে ঘোর বেগে লেগে গেল। রাজার শিরে রাজছত্র ধরে—সেই রকম খানিকটা। আধেক গোলাকার জায়গাটুকুতে নানান পৌরাণিক ছবি—ঠিক মাঝখানে দেবী দুর্গার মাথার উপরে মহেশ্বর, ডাইনে-বাঁয়ে পর পর ব্রহ্মা বিষ্ণু রামরাজা দেবর্ষি-নারদ সমুদ্রমন্থন দক্ষযজ্ঞ দশমহাবিদ্যা। সর্বশেষ দুই প্রান্তে দেবী রক্তবীজ ও শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ করছেন।

নাগাল পায় না বলে প্রতিমার সামনে তারা বেঁধে নিয়েছে, সেখানে বসে কাজ করে।

বেলগাছের গোড়ায় মাটির বেদী—বোধনতলা। কাঁচাবেদীতে এবারের ঘটস্থাপনা। মা যদি করুণা করে বছর বছর এমনি আসেন, ইঁটে-গাঁথা পাকা-বেদী হতে পারবে।

ঢাক বাজে, ঢোল বাজে। বড়-পালমশাই নিশিরাত্রে কখন প্রতিমার মুখে ঘামতেল মাখিয়ে গেছেন—ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়ি এসে পার্বতীর মুখখানা হাসিতে ঝিকমিক করছে। কলাবউকে স্নান করিয়ে আনল নতুন পুকুর থেকে—পুকুর কাটা সার্থক। শুধু এক পুববাড়ির পুজো কে বলে—গ্রাম জুড়ে পুজো লেগে গেছে। বাড়ি বাড়ি আলপনা, চৌকাঠের মাথায় সিঁদুর। সন্ধ্যা হলে ধূপ জ্বালিয়ে দেয় প্রতিটি ঘরে, সন্ধ্যা দেখায়, গাল ফুলিয়ে শঙ্খ বাজায় মেয়ে-বউরা। কত মানুষ এসে পড়েছে ছোট গ্রামে, মানুষ কিলবিল করছে। আসার তবু কামাই নেই এখনো। এ-হে ও-হো—হাঁক পেড়ে পালকি আসে, ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ তুলে গরুর-গাড়ি আসে, ধ্বজি ঠকঠকিয়ে জোড়া-তালগাছতলায় ডোঙা-ডিঙি এসে লাগে। কাজকর্ম ফেলে তরঙ্গিণী ক্ষণে ক্ষণে বাইরের উঠানের হুড়কোর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। না, সুরেশ-চঞ্চলা নয়—ষষ্ঠী পার হয়ে যায়, মেয়ে-জামাই চিঠিপত্র অবধি বন্ধ করে আছে।

ফুল—অনেক তো ফুল চাই। ফুলের শখ আর ক'জনের। সব ফুলে আবার পুজোও হয় না। গাঁদা দোপাটি টগর কৃষ্ণকলি অপরাজিতা জবা ঝুমকোজবা পদ্ম স্থলপদ্ম—কার বাড়ি কী আছে, দেখে রাখো। তিন-চার-দিনের পুজো, তার উপরে এত মানুষের অঞ্জলি—গাঁয়ের ফুলে কুলোবে না, গড়ডাঙা মাদারডাঙা সাগরদত্তকাটি অবধি ফুল খুঁজে বেড়াতে হবে।

হিরু বলে, জল্লাদকে বলো মা। পাইতকের কোথায় কি, সমস্ত তার জানা। মিষ্টি-মুখে বললে জান কাবুল করবে—অমনটি আর কাউকে দিয়ে হবে না।

সে-কথা সত্যি, তবু উমাসুন্দরী ঈষৎ ইতস্তত করেন: দায়িত্বের কাজ। যতই হোক, একফোঁটা বালক ছাড়া কিছু নয়।

হিরন্ময় নিজেই জল্লাদকে ডাকিয়ে বলল, ভোরবেলা ফুল তুলে আনতে হবে। বুঝলি রে জল্লাদ, ভারটা তুই নে।

জল্লাদ বিনে প্রশ্নে ঘাড় নেড়ে দিল: আচ্ছা—

বড় দায়িত্বের কাজ রে। গ্রামসুদ্ধ মানুষ পুষ্পাঞ্জলি দেবে, আর পুজোও এক নাগাড়ে চারদিন ধরে। ফুল বিস্তর লাগবে।

বুক চিতিয়ে জল্লাদ বলল, লাগুক না—

তোর দলবল সব রয়েছে—বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে আসুক, কাউকে ফুল তুলতে না দেয়। একটা ফুলও নষ্ট না হয় যেন। তোর উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকছি তা হলে।

কথা জল্লাদ মনে গেঁথে নিয়েছে, হুঁ—বলে অন্যমনস্ক ভাবে সে জবাব দিয়ে দিল।

প্রহর রাত হতে চলল, নতুনবাড়িতে তবু সে মগ্ন হয়ে বসে থিয়েটারের মহলা দেখছে। কোলকাতার প্লেয়ারমশায়রা এসে গেছেন—তাজ্জব ব্যাপার! মণ্ডপের প্রতিমার চেয়ে এঁরাই আপাতত বড় আকর্ষণ।

কমলও আছে। বছরের এই ক'দিন বাঁধাবন্ধ নেই, এই রাত্রি অবধি বাড়ির বাইরে আছে তাই। অনভ্যাসে অস্বস্তি লাগছে, চুপিচুপি একবার সে বলল, উঠবে, না জল্লাদ-দা?

আজকেও পড়বি নাকি?

ক্ষুরধার ব্যঙ্গের হাসি জল্লাদের মুখে। বলে, যা, যা, আছিস কেন এতক্ষণ? ভালছেলে তুই, বাড়ি গিয়ে বই নিয়ে বোসগে। একলা যেতে পারবি নে বুঝি, পদা গিয়ে পথ দেখিয়ে আসছে।

কমল মরমে মরে যায়। ভালছেলে বলে রব উঠে গেছে, এর চেয়ে লজ্জার কাণ্ড সংসারে আর হতে পারে না। তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে বলে, বাড়ি যেতে কে চাচ্ছে? ফুল নষ্ট না হয়, পাড়ায় ঘুরে বলে আসতে হবে না? গড়ভাঙ্গা মাদারডাঙ্গাতেও তো যেতে হবে।

জল্লাদ বলল, আমি ভার নিয়েছি, পূজোর ফুল ঠিক পৌঁছে দেবো। তা বলে ফকির-বোষ্টমের মতন বাড়ি বাড়ি ফুল ভিক্ষে করতে যাচ্ছি নে।

মাথায় কোনো মতলব নিয়েছে ঠিক, খুলে বলছে না। নিত্যসঙ্গী পদা মনে করিয়ে দিল: ফুলের কিন্তু অনেক দরকার—

অনেক ফুলই আসবে।

নিঃসংশয় জবাব দিয়ে একটুখানি ভেবে জল্লাদ বলল, হরিবোল দিয়ে কচ্ছপ জড় করব না। বেশি লোকের গরজ নেই। তুই যাবি, আমি তো আছিই। আর জোয়ান-মরদ একটা-দুটো, ভাল ধ্বজি মারতে পারবে যারা। ফড়ুকে দেখছি নে তো—ফড়ু গেল কোন চুলোয়?

ফড়ু বসে ছিল না, কলাপাতা-কাটার দলের মধ্যে সে। লগির মাথায় কাস্তে বেঁধে সারা দিনমান তারা পাতা কেটে বেড়িয়েছে। হাত-পা ধুয়ে খানিকটা ভদ্র হয়ে এবারে নতুনবাড়ি রিহার্শালের জায়গায় যাচ্ছে। পথে দেখা।

জল্লাদ বলে, পাতা কাটছিস—বেশ করছিস। ফুল তোলার কাজেও দুটো তিনটে দিন আয় দিকি। তোর পাতারও তাতে অনেকখানি আসান হয়ে যাবে। পোহাতি তারা উঠলে তেমাথার ডুমুরতলায় এসে দাঁড়াবি, পদা ডেকে-ডুকে আরও সব হাজির করবে। ওখান থেকে এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়ব।

ফড়ু ইতস্তত করে বলে দিনমানে খোঁজ পড়ে না—রাত্রে বেরুনো তো মুশকিল। আজ্ঞামশায় এক লহমা ঘুমোয় না। আওয়াজ একটু পেয়েছ কি, হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠবে।

পদা বলল, বেরুতে কোনো-মশায়ই দিতে চায় না রে। তবু বেরুই। দুয়োর খুলেই চোঁচা-দৌড়—তখন আর কে পাত্তা পাচ্ছে? ফিরে এসে গণ্ডগোল—

জল্লাদ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলে, গণ্ডগোল আর কি! দুটো কথার বকা-বকি—খুব বেশি তো দু-ঘা ঠেঙ্গানি।

এড়ু বলে, মোটে দু-ঘা? তেমনি পাত্তোরই বটে!

না হয়, দশ ঘা'ই হল। মেরে ফেলবে না তো! পেল্লাদ মাস্টারমশাইর হাতে-পাতে নিত্যি দু-বেলা খাচ্ছি—ঘরের মারই বা ভয় করতে যাব কেন?

জল্লাদ তা করে না বটে। মুখের মিছা বাগাড়ম্বর নয়, এ বাবদে তার ভূরি-প্রমাণ অভিজ্ঞতা। পাঠশালায় ও ঘরে উঠতে পেটায় তাকে, বসতে পেটায়। সে দৃকপাত করে না।

ফড়ু দেখেছে সে জিনিস। প্রসঙ্গ যখন উঠে গেল, অন্তরঙ্গ সুরে সে বলে, গায়ে তোমার মোটে সাড় লাগে না জল্লাদ-দা। দেখেছি, দেখে অবাক হয়ে যাই।

নেই বললে সাপের বিষ থাকে না রে, মনে করলেই হল লাগছে না। আরও কায়দা আছে, শোঁ-ও-ও করে নিশ্বাস টেনে বুকের মধ্যে বাতাস ভরে নিবি। মারতে আসছে—না-হক ছুটোছুটি করে হাঁপিয়ে পড়ে অনেকে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে শান্তভাবে ততক্ষণ নিশ্বাস টেনে যাবি তুই। ভিতরে বাতাস ঢুকে গেলে ব্যথা লাগে না। ফুটবল, দেখিস নে, এত লাথি মারছে—ভিতরে বাতাস বলে লাথি গায়ে বসতে পারে না।

নিজের বেলা জল্লাদ এই কৌশলই নিয়ে থাকে, সকলে চাক্ষুষ দেখে। মার-গুতোন খাবার সময় একেবারে চুপচাপ থাকে—চেঁচায় না, কাঁদে না, পালাতে যায় না। প্রহারকর্তা ক্লান্ত হয়ে এক সময় মার বন্ধ করে, জল্লাদও নিশ্চিন্তে পূর্বকর্মে লেগে যায় তখন।

বারবার এই রকম হয়ে আসছে। ছোঁড়াটাকে মেরে শাসন করা যাবে না, আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলে বুঝে ফেলেছে। তা সত্ত্বেও মারে—মেরে বেশ হাতের সুখ পাওয়া যায়। খাসা একখানা ক্ষেত্র পাওয়া গেছে, যত খুশি সেখানে

নির্বিবাদে মার চালানো যায়--হেলাফেলায় তেমন জিনিস ফেলে রাখতে যাবে কেন ?

ভালছেলে ইত্যাদি গালি খাওয়ার পরেও কমল এ যাবৎ সঙ্গ ছাড়ে নি, পিছু পিছু চলেছে। অধ্যবসায়ে প্রীত হয়ে জল্লাদ হঠাৎ সদয় কণ্ঠে বলল, যাবি তুই সত্যি সত্যি ?

ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল, সেই জল্লাদই আবার এখন ভরসা দিচ্ছে : ভালছেলে তা কি হয়েছে, ভাল বলে বুঝি ঠুঁটো-জগন্নাথ হয়ে থাকতে হবে। ভাবিস নে তুই—এই বেড়াল বনে গিয়ে বনবেড়াল হয়। তেমাথার ডুমুরতলায় চলে যাবি, আমরা সব থাকব।

নিজেই আবার খেয়াল করে বলছে, একলা যেতে ভয় করবে তোর—অভ্যেস তো নেই। বাড়ি থেকেই নিয়ে আসব। টুরের আমতলায় দাঁড়িয়ে শেয়াল ডাকব, টিপি-টিপি বেরিয়ে আসিস।

ভালছেলে হলেই অপদার্থ হয় না, কায়দা পেয়েছে তো কমলও সেটা প্রমাণ করে ছাড়বে। তরঙ্গিণীকে বলে রাখল, পূজোর ফুল তুলতে যাবে সে। পূজোর নামে মা কিছু বলবে না, জানে। জল্লাদের নামগন্ধ করল না। ঘরে মেয়েলোক ঠাসা, মেজেয় ঢালা-বিছানা পড়েছে। মেয়েরা থাকলেই কুচোকাচা কিছু থাকবে—শেষরাত্রি থেকে ট্যা-ভ্যা লেগে যায়। এসো জন বসো-জন আত্মীয়-কুটুম্বে পূজো-বাড়ি গিজ-গিজ করছে। বাইরে-বাড়ি পুরুষেরা যে যেখানে পারে মাদুর বিছিয়ে গড়িয়ে পড়ে, মেয়েরা ভিতর-বাড়িতে। পোহাতি তারার সঙ্গে তরঙ্গিণী উঠে পড়েন, বারোমেসে অভ্যাস। পূজোর উদ্বেগে এখন তো চোখের ঘুম একেবারে হরে গেছে। উঠে তরঙ্গিণী দরজা খুলে বাইরে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে কমলও উঠে বসে শেয়াল-ডাকের প্রতীক্ষা করছে।

ডাক পেয়ে বেরিয়ে এলো।

আকাশে তারা, রাত্রি আছে এখনো। পাখপাখালি ডাকছে। ডুমুরতলার আঁধার আরও চারজন—কাঁধে ধ্বজি, হাতে ঝুড়ি। ঝুড়ি ভরে ফুল নিয়ে আসবে। জল্লাদ ও কমল এসে যোগ দিল। জল্লাদ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসেছে—হেঁসো-দা, কাস্তে।

গ্রামপথে সকলে চলেছে। রাতের বেলা বেরুনো কমলের এই প্রথম—পূজোর নামে এতদূর হতে পারল। পড়তে শিখেছে এখন কমল, পড়ার বড় ঝোঁক। হাতের কাছে যা পায়, পড়ার চেষ্টা করে। শব্দ করে না, চোখ দিয়ে পড়ে যায়। নিতান্তই যদি না বোঝে, মনে মনে কষ্ট পায়—ভাণ্ডারে কত কি জিনিস, তাকে যেন ধরতে ছুঁতে দিচ্ছে না। গল্প একটা পড়ে ফেলে

নিজেকে সেই গল্পের মধ্যে দাঁড় করায়। এই যেমন মনে হচ্ছে, আমুণ্ডসেনের মতো মেরু বিজয়ে চলেছে তারা। অথবা শিবাজীর মতন দুর্গ-আক্রমণে। ডানদিকে বাঁ-দিকে ক্ষেতের বেড়া—বেড়ার জিওল ও ভেরেণ্ডার কচাগুলো সৈন্যদলের মতন সেলাম ঠুকে সারিবন্দি অ্যাটেনসন দাঁড়িয়ে আছে যেন। নতুনবাড়ি ছাড়িয়ে গিয়ে সমুদ্দুর-পুকুরের পাড় (সমুদ্র নয়, সুমুখদুয়ার থেকে সমুদ্দুর হয়েছে। প্রহ্লাদ মাস্টার-মশায় একদিন বলছিলেন)। পুকুর-পাড় ধরে যাচ্ছে তারা। হাওয়া দিচ্ছে মাঝে মাঝে—গাছের পাতা নড়ছে, পুকুরের জল কাঁপছে। পথ সংক্ষেপে হবে বলে এরা উঠান ও কানাচ ধরে যাচ্ছে এক এক সময়। মানুষজন বেহুশ হয়ে ঘুমুচ্ছে, ঘরবাড়িগুলোও যেন। পাখিরাই কেবল জেগেছে—উড়ছে না, তেমন কিচিমিচি করছে। আম-কাঁঠালের বাগান তরিতরকারির ক্ষেত, খেজুর বাগান একটা। খড়বন আড়াআড়ি পার হয়ে সুঁড়িপথে পড়ল। আশশ্যাওড়া ভাঁট কালকাসুন্দে আর যাদুর জঙ্গল দু'ধার দিয়ে এঁটে ধরেছে। বিশাল বাঁশবাগান—অন্ধকার বাঁশতলা দিয়ে পথ। বাঁশের পাতার আওয়াজ তুলে শিয়াল চলে গেল রাস্তার এধার থেকে ওধারে—হেই, হেইও, কেডা তুমি ? কনে যাবে ?—জল্লাদ অকারণ হাঁক পাড়ছে। জন্তু-জানোয়ার সাপখোপ যা থাকে, মানুষের গলা পেয়ে সরে যাবে। ফড়ু এর মাঝে গান ধরল হঠাৎ। গানে ভয় কাটে। নাথ, রাম কি বস্তু সাধারণ, ভুতার হরিতে অবনীতে অবতীর্ণ সে ভবতারণ—গানের ভিতরে রামের নাম। রাম-নামের বিশেষ সুবিধা, ভূতও ত্রিসীমানায় থাকবে না। এবং ফাঁকতালে খানিকটা পুণ্যার্জনও হয়ে যাচ্ছে।

ফড়ু একবার বলে উঠল, এখনো রাত পোহানোর নাম নেই, কত রাত থাকতে আনলি পদা ?

পদা কিছু বলল না, জবাব জল্লাদ দিল : রাত যেমন আছে, রাতের কাজও রয়েছে। পা চালিয়ে চল্।

আগে আগে জল্লাদই জোর পায়ে চলল। মতলবটা পদাও পুরোপুরি জানে না, প্রশ্ন করে : যাচ্ছি কোথায় রে ?

চৈতন মোড়লের বাড়ি।

যেতে যেতে জল্লাদ বিশদ করে বলল, মোড়লবাড়ির নিচে ডোঙা রেখেছে। আনকোরা নতুন ডোঙা, এই বছরের বানানো। ঘাস কেটে এনে টেমি ধরে ধুয়েছে অনেকক্ষণ ধরে। চাইলে তো দেবে না, না চেয়ে নিয়ে বেরুব।

নতুনবাড়ি রিহার্শাল থেকে বেরিয়ে যে যার ঘরে চলে গেল—তারপরেও জল্লাদ একাকী গ্রাম চক্কোর দিয়েছে। চৈতনের ডোঙাটা পছন্দ করেছে সেই

সময়, ঐ ডোঙা কাজে নেবে। বিল-কিনারায় চৈতনের বাড়ি, বিলের মাটি তুলে বাড়ির জমি উঁচু করেছে—চতুর্দিকে বেশ একটা পরিখার মতন হয়েছে। ডোঙা সেখানে।

ফড়ু বলল, এতজন আমরা উঠলে ডোঙা তো ডুবে যাবে।

জল্লাদ বিরক্ত হয়ে বলে, উঠতে কে বলছে। ডোঙায় চড়ে নবাবি করবি, সেই জন্যে বুঝি এসেছিস? ডাঙায় তোল ডোঙা, উপুড় করে মাথায় নিয়ে নে। এতজনে সেই জন্যে আমরা।

মাথার দিকটা ভারী বলে জল্লাদ নিজে সেই দিকে মাথা ঢুকিয়েছে, পিছনে অন্যেরা। পদা সকৌতুকে বলল, মানুষে ডোঙায় চড়ে যায়, সেই ডোঙা আজ আমাদের উপর চড়ে চলেছে।

সকলের আগে জল্লাদ—ডাইনে-বাঁয়ে যেদিকে বাঁক নিচ্ছে, যেতে হবে সকলকে। অধীর কণ্ঠে ফড়ু বলে, নিয়ে চললি কোথা বল্ দিকি?

রহস্য ভাঙে না জল্লাদ। সংক্ষেপে বলে, চল্ না—

নিঃশব্দ পথ। সোনাখড়ি ছেড়ে মাদারডাঙায় ঢুকছে। ঢিবির উঁচুতে উঠল, নেমে গিয়ে এক্কার-বক্কারের দীঘি। রাতও শেষ হয়ে এসেছে, ফিকে অন্ধকার। তারারা নিভে আসছে, ঝিরঝিরে শীতল হাওয়া। দীঘির কিছু নেই, নামেই শুধু দীঘি। কারা এক্কার-বক্কার, কেউ জানে না। নলখাগড়া হোগলা, চেঁচো, ঘন সতেজ সবুজ কচুরিপানা আর মালিঘাস। হঠাৎ মনে হবে উর্বর ফসলের ক্ষেত একটা। নজর দূরে ফেললে পদ্মবন চোখে পড়বে। বড় বড় পদ্মপাতা, জলের খানিকটা উপরে উল্টোনো ছাতার মতন, জায়গাটা একেবারে ঢেকে দিয়েছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে পদ্ম—এখন পাপড়ি বন্ধ, রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শতদল হয়ে ফুটবে।

জল্লাদ দেমাক করে বলে, এক জায়গা থেকেই আমাদের কাজ হয়ে যাবে।

সঙ্গীরা শিউরে উঠে: পদ্ম তুলবি এই দীঘির?

জল্লাদ বলে, দীঘি আর কোথা, শুধুই পদ্মবন। যত খুশি তুলে নাও। ফকিরের ভিক্ষের মতন এর কানাচে ওর ছাঁচতলায় ফুল তুলে তুলে ঘুরব কেন রে? একখানে ঝুড়ি বোঝাই। শুধু ফুল কেন, পাতাও নেবো। বৃহৎকর্মে পদ্মপাতেও লোকে খেতে পারবে। গোড়া থেকেই আমি ভেবে রেখেছি—ঘাবড়ে যাবি তোরা, সেই জন্য বলিনি। আর বাবার কানে গিয়ে পড়লে তো আমাকে আচ্ছা একচোট পিটুনি দিয়ে ঘরে তালাবন্ধ করে আটকাত।

ফ্যা-ফ্যা করে হেসে নিল খানিক। হাত তুলে জায়গা দেখিয়ে দেয়: ঐই যে চেঁচোবন, ঐখানে ডোঙা ফেলব। গরু ঘোড়া নেমে নেমে ঘাস খায়—

ধাপের মধ্যে শয়ালের মতন হয়েছে। কাল আমি হেঁটে দেখে গেছি, ধ্বজি মেরে ডোঙা বেশ চালানো যাবে।

যথাস্থানে নিয়ে মাথার ডোঙা ফেলল। বর্ষার জল যৎসামান্য আছে, গাদই বেশি। জল্লাদ বলে, পয়লা খেপে তিনজন। আর সব দাঁড়িয়ে থাক্, পরের খেপে যাবি। ডোঙায় ভার বেশি হলে পাঁকে কামড়ে ধরবে, ঠেলে কূল পাওয়া যাবে না। আমি যাচ্ছি, ফড়ু আসুক, আর কে আসবি রে? রাখাল, তুই বরঞ্চ আয়।

পদা বলল, সাপটাপ আছে, নজর ফেলে সামাল হয়ে এগোবি।

একার-বকারের দীঘির সাপের কথা সবাই জানে, বলে দিতে হয় না। শরবনের ধারে ভাঙা-শামুকের গাদা—শামুক-ভাঙা কেউটেমশায়রা আহারাদি সেরে উচ্ছিষ্ট ফেলে গেছেন। গরু-ঘোড়া ঘাস খেতে নেমে প্রতি বছরই দুটো-পাঁচটা কাটিঘায়ে ঘায়েল হয়।

জল্লাদ বলল, সুভালাভালি ফিরে মা-মনসার দুধ-কলা দেবো, মানত করেছি। মনে মনে সকলে তোরা 'আস্তিকস্য' পড়ে নে, সাপে কিছু করতে পারবে না।

হেঁসো-দা হাতে জল্লাদ ডোঙার ঠিক মাথার উপরে হাঁটু গেড়ে বসেছে, ডাইনে বাঁয়ে হেঁসো চালিয়ে জঙ্গল ও দাম কেটে :পথ করে দিচ্ছে। সাপ পড়লেও হেঁসোর মুখে কচাত করে দু-খণ্ড হয়ে যাবে। দু-পাশে দু-জন, ফড়ু আর রাখাল ধ্বজি মেরে প্রাণপণ বলে এগুচ্ছে। একটু গিয়েই হুশ হল জল্লাদের : রাখ্ রাখ্ আরও একজন চাই। পদ্মবনে গিয়ে ফুল তুলবার মানুষ কই? ধ্বজি ফেলে তোরা পারবি নে, হেঁসো ছেড়ে আমিও না।

ফড়ু বলল, তিন মানুষের বোঝা এমনিই বেশি, এর উপর আবার তো আবার পদ্ম-ফুল পদ্মপাতার চাপান পড়বে।

জল্লাদ ডাঙার তাকিয়ে দেখছিল। বলল, কমলটা আসুক,—এক-ফোঁটা মানুষ—ওর আর ওজন কি। ওদের বাড়ির পুজো—ভালই হবে, নিজের হাতে ফুল তুলবে।

কাস্তে দিল কমলের হাতে : টুক-টুক করে কেটে যাবি, কেটে সঙ্গে সঙ্গে ডোঙার তুলে ফেলবি।

কী মজা কমলের। না কেটে ফুল-পাতা উপড়ে তোলাও যায়—উঁহু, উপড়াতে গিয়ে সরু হাল্কা ডোঙা কাত হয়ে ডুবে যেতে পারে। ডুববে জলে নয়, গাদের ভিতর। এক-মানুষ সমান গাদ এখানটা। জলে ডুবলে জেলে ডেকে জালাজ করে দেহটা অন্তত পাওয়া যায়—এখানে সেটুকুও নয়, পাকা-পাকি কবর। সেই এক যুগে একার-বকারের আমলে নিফুটি জল ছিল নিশ্চয়

লোকে স্নান করত, সাঁতার কাটত, কলসি কলসি জল নিয়ে যেত বউ-ঝিরা, ছেলেপুলেরা জল ঝাঁপাত। তারপরে ক্রমশ দীঘি মজে-হেজে গিয়ে জঙ্গল ডেকে উঠল, সাপের ভয়ে কেউ আর এ-মুখো হয় না। বিশাল পদ্মবন গ্রীষ্মে শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, বর্ষার জল পড়লে পাতা গজিয়ে ওঠে। ভাদ্রে কলি ফুটতে শুরু হয়, পরিত্যক্ত দীঘি তারপর পদ্মে পদ্মে আলো হয়ে থাকে সারা দিনমান— দূর থেকে পথিকজন দেখে যায়। আজকেই প্রথম পূজা উপলক্ষ করে দুঃসাহসী কয়েকটা গ্রামবালক পদ্মবনে ঢুকে লগি ঠেলছে, ফুল তুলছে।

আর ক্ষণে ক্ষণে জল্লাদ সামাল দিচ্ছে কমলকে : ভালছেলে তুই, তা খাসা তো বোঁটা কাটছিস। ডুবে না মরিস, সেই খেয়ালটা যেন থাকে। মুখ কাঁচুমাচু করতে লাগলি, মায়া হল, তাই নিয়ে এলাম। সুভালাভালি ডাঙায় ফেরত নিয়ে তুলতে পারলে যে হয়।

॥ উনিশ ॥

কাল ষষ্ঠীর বোধন হয়ে গেছে। চারটে ঢাক ছিল, তার উপর হাঁসাডাঙা থেকে এইমাত্র ঢোল-শানাই এসে পৌঁছল। মণ্ডপ জমজমাট। ছেলেপুলের ছুটোছুটি কলরবে তোলপাড় পড়ে গেছে। বড়গিন্নি উমাসুন্দরী নেয়েধুয়ে মাথার চুল চুড়া করে সামনের দিকে বেঁধে হেসে হেসে আদর-আপ্যায়ন করছেন সকলকে। নতুনপুকুরে কলাবউকে স্নান করিয়ে আনল। উমাসুন্দরী বলেন, সার্থক পুকুর-কাটা, সার্থক পুকুর-প্রতিষ্ঠা।

ভিতর-বাড়িতেও ছুটোছুটি হাঁকডাক। তরঙ্গিণী ওদিকে। রান্নাঘরের সামনের উঠোনটুকু তকতকে গোবর-নিকানো, সিঁদুর পড়লে প্রতিটি কণিকা তুলে নেওয়া যায়। আলু পটোল মিঠেকুমড়ে কাঁচকলা এনে ঢালল সেখানে, খান পাঁচেক বঁটি এনে ফেলল। মেয়েলোক বিস্তর জমেছে. তাদেরই কতক বঁটি পেতে বসল। তরকারি-কোটা ও গল্পগাছা। কুটনো কুটে বড় বড় ঝুড়ি-চাঙারিতে রাখছে, ধুয়ে আনছে সে সব পুকুরঘাট থেকে। আর একদিকে কেঠো-বারকোশ চাকি-বেলন হাতা-ঝাঁঝরি কড়াই-গামলা মেজে ঘষে সাফ-সাফাই করে গাদা দিয়ে রাখছে। জল ঝরে গেলে ঘরে তুলে নেবে এর পর।

এ দিকের ব্যবস্থা সেরে তরঙ্গিণী রান্নার দিকে ছুটলেন। অনেক মানুষ খাবে, ছেলেপুলে বিস্তর তার মধ্যে। ব্যঞ্জনা খানিকটা নরম হলে খাই-খাই রোল উঠে যাবে, তখন আর দিশা করতে দেবে না। বাঁশে খড়ে ঘর তুলতে ভবনাথের আলস্য নেই—রান্নাঘরের গায়েই এক চালাঘর উঠে গেছে ইতিমধ্যে

—অস্থায়ী রান্নাঘর। চার উনুন সেখানে—রাবণের চুল্লি। এ ক'দিন দিনে ও রাত্রে কোন না কোন উনুন জ্বলছেই। কখনো বা চার উনুন একসঙ্গে। গাঁয়ের ঝি-বউ একটিও বোধহয় বাড়িতে নেই—কাপড়চোপড় গয়নাগাটি পরে পূজো দেখতে এসেছে। বাড়ি থাকার গরজও নেই—খাওয়া সবসুদ্ধ আজ এখানে।

ফড়ুর মা কি কাজে এদিকে একবার এসেছেন, চেয়ে চেয়ে তরঙ্গিণীর ছুটোছুটি দেখছেন। বললেন, পূজোর এত সোরগোল—ছোটবউ সেই রাঁধা-বাড়া নিয়ে রান্নাঘরেই পড়ে আছ।

তরঙ্গিণী বললেন, কলাবউ নিয়ে যাচ্ছে তখন একবার গড় করে এসেছি। অঞ্জলির সময় আবার গিয়ে বসব। কি করব দিদি, এদিকে না থাকলেও তো চলে না।

ফড়ুর মা খোশামুদি সুরে বলেন, তোমারই সার্থক পূজো ছোটবউ, মা জগদম্বা হাত পেতে তোমার অঞ্জলি নেবেন। যেমন মন, তেমনি ধন। এই মনের গুণেই ছোটঠাকুরপোর এতখানি সুসার-পশার।

কাজের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে তরঙ্গিণীর বুকের ভিতরে টনটন করে ওঠে, কাজ ফেলে মুহূর্তকাল পাঁচিলের দরজায় গিয়ে দাঁড়ান। পঞ্চমী ষষ্ঠী গিয়ে মহাসপ্তমী এসে গেল, মা-দুর্গা ছেলেমেয়ে এপাশে ওপাশে নিয়ে মণ্ডপ আলো করে আছেন তাঁর মেয়ে এলো না বোধহয় আর। চঞ্চলা-সুরেশ আসার হলে এদ্দিনে এসে পড়ত—আর কবে আসবে? শাশুড়ির চক্রান্ত, সে আর বলে দিতে হবে না। বউকে চোখে হারান—বাড়ির বার হতে দিতে বুক চড়-চড় করে। স্বার্থপর—নিজেরটাই দেখেন শুধু, অন্যদের কেমন হচ্ছে সেটা একবার ভাবেন না। দিয়ে দেবেন শেষে একটা অজুহাত—বাসের সিট পাওয়া গেল না। বলে দিলেই হল। বিয়ে দেওয়ার পর চঞ্চলা তো ওঁদেরই হয়ে গেছে—'পাঠাব না' স্পষ্টা-স্পষ্টি না বলে ঘুরিয়ে বলে দেওয়া। লোকজনের ভিড় আর কাজকর্মের চাপে এক দণ্ড তরঙ্গিণী নিরিবিলি হতে পারছেন না। দেবনাথকেও একটু কাছা-কাছি পাচ্ছেন না যে মেয়ের কথা বলে মন কিছু হাল্কা করবেন।

চড়া রোদ। মণ্ডপে বেলোয়ারি-ঝাড় ঝুলানো। ঝাড়ের গায়ে রোদ ঠিকরে পড়ছে। ঠাকুরমশায় গম্ভীর সুরে চণ্ডীপাঠ করছেন—সেদিকে সামান্য লোক, বুড়োবুড়ি গোণাগণতি কয়েকজন। বলির বাজনা বেজে উঠতে সকলে রে-রে করে ছুটল। মণ্ডপের ভিতরে-বাইরে উঠানে সামিয়ানার নিচে লোকে লোকা-রণ্য। সন্ধিপূজায় পাঁচ-কুড়ি-পাঁচ পদ্ম লাগে—জোটানোর ভাবনা হয়েছিল। আর এখন দেখ, পদ্মের পাহাড়—অঞ্জলি দিচ্ছে আস্ত এক এক পদ্ম নিয়ে। নিম-ন্ত্রিত অভ্যাগত গ্রামবাসী সকলে প্রসাদ পাবেন, পুরোদস্তুর পাতা পেতে

খাওয়ানো—লুচি তরকারি মিষ্টামিঠাই। মণ্ডপের সামনে সামিয়ানার নিচে পুরুষরা, মেয়েরা ভিতরবাড়ি। সোনাখড়ি গাঁয়ের মধ্যে আজ উনুন জ্বলবে না—উমাসুন্দরী বিনোকে পাঠিয়েছিলেন, বাড়ি বাড়ি গিয়ে সে বলে এসেছে।

সন্ধ্যা হতে না হতেই আলো। চতুর্দিকে আলো—আলোয় আলোয় দিনমান করে ফেলেছে। প্রতিমার দু-পাশে বাতিদানে চারটে করে বাতি, মাথার উপর কাচের হাঁড়িতে বাতি জ্বলছে। হ্যাংলং-লণ্ঠন ও হেরিকেন ঝুলিয়ে দিয়েছে এখানে ওখানে। কারবাইডের আলো। আর আছে সরার আলো কলার ভেউড়ের মাথায় সরা বসিয়ে তুষে-কেরোসিনে ধরিয়ে দিয়েছে, দাউদাউ করে জ্বলছে। দিনমান কোথায় লাগে! আরতির সময় চার চারটে ঢাকে তোল পাড়। মানুষজন ভেঙে এসে পড়েছে। ঢাক থামলে ঢোল আর মিষ্টি-মধুর শানাই। কাঁসর বাজছে ঢং-চঙা-ঢং। ধূপের ধোঁয়ায় মণ্ডপ আচ্ছন্ন। এক হাতে পুরুত পঞ্চপ্রদীপ ঘোরাচ্ছেন। আর হাতে ঘণ্টা নাড়ছেন—

কলকাতার প্লেয়ার দুটি, সিরাজ ও করিম চাচা, মহালয়ার দিনে নয়—তার পরের দিন পৌঁছে গেছে। কালিদাস নিয়ে এসেছে। এসে আর দেরি নয়—ফুল-রিহার্শাল সেই দিন থেকে। এবং সপ্তমীতে চুল-দাড়ি-গোঁফ পরে স্টেজে না-নামা পর্যন্ত প্রতিদিনই চলবে। বলে, সড়গড় করে নিই সকলের সঙ্গে—সকলকে বাজিয়ে দেখব, দূত-সৈনিকও বাদ থাকবে না। অতদূর থেকে কষ্ট করে এসে ধাষ্টামো হতে দিচ্ছি নে।

মাদার ঘোষ হারু হিতিরকে বলেন, কি বলছে শুনেছ ?

হারু বড়াই করে : ডরাই নে, হবে তাই। চার মাস একনাগাড় ঘোড়ার-ঘাস কাটিনি আমরা।

ঢংঢং ঢংঢং নতুনবাড়ির রোয়াকে দাঁড়িয়ে যথারীতি সে ঘণ্টা বাজিয়ে দিল। বৈঠকখানা ভরে গেছে। যাদের পার্ট নেই, তারাও অনেকে এসেছে কলকাতার প্লেয়ারের নামে। ফরাসের ঠিক মাঝখানটিতে সিরাজ জেঁকে বসেছে। দাগ-চোক-কাটা রংবেরঙের জামা গায়ে, ঝুলপি ও গোঁফ মুখে, কথাবার্তায় বাঁকা টান। করিম-চাচা তার গা ঘেঁসে পাশে বসেছে, সে মানুষটি একবারে নিঃশব্দ—ঘাড় নাড়ছে একটু আধটু, কদাচিৎ ফিসফাস করছে একেবারে সিরাজের কানের উপর মুখ নিয়ে।

সিরাজ বলল, লুৎফউন্নিসা কে মশায় ? তিনি উঠুন। তাঁর সঙ্গে কয়েকটা ভাল ভাল কাজ আমার। একটু দেখেশুনে বাজিয়ে নিতে চাই।

ওঠো হারু—

বলে গায়েধাক্কা দিয়ে মাদার তাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। চার মাস ধরে সকলের খবরদারি করে এসেছে, সময় কালে এখন তার নিজেরই বুক ঢিবঢিব করছে।

সিরাজ বলে, ধরুন—দানসা-ফকিরের দরগায় সিন। উম্মৎ কই? মেয়ে কোলে জড়িয়ে নিন।

উম্মৎ জহুরা হবে বলাই। সে এসে হারুর গায়ে গড়িয়ে পড়ল। হারু নির্বাক।

সিরাজ হাঁক পাড়ে' হল কি মশায়? আরম্ভ করে দিন—'আহা, বাছা আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়েছে, নবাব-দুহিতা ভিখারিনীর অন্ন। যে সুবাসিত সুশীতল জল দেখে মুখ ফিরিয়েছে—'প্রম্পটার কোথায়, ধরিয়ে দিন না।

মাদার সগর্বে বলেন, প্রম্পটারের ধার ধারিনে, টনটনে মুখস্থ। প্রম্পটার লাগবে না আমাদের।

সিরাজ সহাস্যে বলে, আমার কিন্তু লাগবে-ব্যবস্থা রাখবেন। প্লে নিতিদিন লেগেই আছে, পালারও অন্ত নেই। আপনাদের মতন একটা-দুটো নয়—কাঁহাতক মুখস্থ করে বেড়াই?

কিন্তু এ কী হল, হারুর একটি কথাও যে মনে পড়ে না। ঘেমে উঠল সে। গোঁফ-ঝুলপি সহ বড় বড় চোখ মেলে সিরাজ তাকিয়ে আছে, তাতে যেন আরও ভয় লাগে।

বিরক্ত স্বরে মাদার বলেন; বোবা হয়ে গেলে একেবারে, হল কি তোমার।

হারু সকাতরে বলল, জল—

ঢকঢক করে পুরো গেলাস জল খেয়েও অবস্থার ইতর-বিশেষ হল না। বোঁ বোঁ করে মাথা ঘুরছে। সকলকে পাঠ শিখিয়েছে, সকলের উপর তম্বি করে এসেছে, নিজের বেলা লবডঙ্কা। লুৎফ'র পাঠ একবর্ণও মনে আসে না। বই খুলে সিরাজ নিজেই তখন লেগে গেল। গোড়া ধরিয়ে দিলেও হয় না, সম্পূর্ণ পড়ে যেতে হয়। শ্রাদ্ধের মন্ত্রপাঠের মতন হারু কোন রকমে আবৃত্তি করে যায় কথাগুলো।

মাদার দেমাক করেছিলেন, লজ্জায় এখন মাথা তুলতে পারেন না। হারুর পানে চোখ-কটমট করে বললেন, ছিঃ—

হারু কৈফিয়ৎ দিচ্ছে: গোড়া গোঁফ নিয়ে বেগমের পাঠ আসে না মাদার দা। সকালে উঠে কাল সকলের আগে পরামাণিক ডাকব।

অন্যদেরও মুখ শুকিয়েছে। ঝন্টু মীরজাফর সাজবে—ফিসফিসিয়ে অক্ষয়কে বলল, ম্যানেজারের এই হাল—না-জানি আমাদের কপালে কী আছে!

এর মধ্যে আনকোরা-নতুন হলেও বাহাদুর বলতে হবে বলাই মণ্ডলকে। নর্তকী বলে নেওয়া হয়েছিল—আট নর্তকীর একজন। সমস্ত বর্ষাকালটা হারু মিত্তির কাঁধে কাঁধে রয়েছে। তা কাঁধে বওয়ার ছেলেই বটে—চেহারাটা যেমন, নাচগানেও তেমনি উতরেছে। ড্যান্সিংমাস্টার নরেন পাল বলে, আস্ত প্রতিভা একখানা। কিন্তু নরেন পালের হাতেও রইল না পুরোপুরি—নর্তকী থেকে উন্মৎ জহুরায় প্রমোশন। দেখতে সুন্দর, বয়সটাও কাঁচা—মানিয়েছে তাকে চমৎকার। উন্মতের গান আছে, এবং গানের সঙ্গে মুখচোখের ভঙ্গিমা আছে রীতিমত। কয়েকটা দিনের পেরাজের পরে দুটো জিনিসই বলাই এমন দেখান দেখাল, ঝানু থিয়েটার-দর্শক কালিদাসের চোখে জল এসে যায়। হুবহু পাবলিক থিয়েটারের উন্মৎ জহুরার ছবি। বলিহারি বটে! বলে মহোল্লাসে পিঠ ঠুকে দিল সে বলাইর।

বলে, কলকাতায় যাবি তো বল্। আমাদের অফিস ক্লাবের ড্রামায় তোকে নিয়ে নেবো। আমিই ক্লাবের সেক্রেটারি। এই বয়সে এমন—আরো যে কদ্দুর উঠবি ঠিকঠিকানা নেই। এখানকার হাঙ্গামা চুকে-বুকে যাক, কলকাতায় নিয়ে যাব তোকে, অফিসে যাতে ঢোকানো যায় দেখব। লেখাপড়া কদ্দুর করেছিস রে?

হিমচাঁদের সর্বব্যাপারে রংতামাসা। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, এম-এ পাশ দিয়েছে।

হেসে কালিদাস বলে, এম-এ কে চাইছে, এম-এ'রাই বরঞ্চ চাকরি বিনে ফ্যা-ফ্যা করে বেড়ায়। বলি, ইংরেজি-বাংলা পড়তে-টড়তে পারিস?

বলাই বলে, বাংলা পারি—

হিমচাঁদ টিপ্পনী কাটলেন: আমাদের হারু যদি বই ধরে বসে। উন্মতের পাঠ পড়ানোর সময় কম বেগ দিয়েছে! ওকে কলকাতা নাও তো হারুকেও ওর সঙ্গে নিতে হবে।

কালিদাস বলে, বাংলা আর ইরেজি একটু একটু শিখে নে, অফিসের বেয়ারা হতে পারবি। বেশি কিছু নয়—নামটা-আসটা পড়তে পারলেই হবে।

গাওনা সপ্তমীর দিন—মাঝের ক'টা দিন ঘোর বেগে রিহার্শাল চলল। সকাল সন্ধ্যা দুইবার কোন কোন দিন। বিচিত্র কুর্তাধারী সিরাজ ফরাসের কেন্দ্রস্থলে, বাকাহীন করিম চাচা পাশটিতে বসে। পাঠ বলা ছাড়া করিমের ঠোঁট নড়ে না, পাঠও বলে মিনমিন করে—নিজে ছাড়া কেউ বুঝতে পারে না।

মাদার ঘোষ জিজ্ঞাসা করলেন: আসরেও এইভাবে নাকি?

সিরাজ অভয় দিয়ে সহাস্যে বলে, গগন ফাটাবে, শুনবেন তখন। অকারণে ফুসফুস খাটাতে যাবে কেন, কথাবার্তাতেও তাই কঞ্জুস। শক্তি জমিয়ে রাখছে স্টেজে গিয়ে ছাড়বে।

প্রতিমার ঠিক সামনাসামনি উঠান সম্পূর্ণ পার হয়ে আশফল গাছটার ধারে স্টেজ বেঁধেছে। প্রকাণ্ড উঠান, দেদার মানুষ বসতে পারবে। তাতেও না কুলায়, রাস্তা অবধি ঝাঁটপাট দেওয়া রইল—পাটি মাদুর নারকেলপাতা যা পাওয়া যায় নিয়ে সব বসে পড়বে।

সন্ধ্যা হতে না হতে লোক আসা শুরু হল। নাম এতদূর ছড়িয়েছে, নিজেদের অমন চালু থিয়েটার সত্ত্বেও রাজীবপুর থেকে এই পথ ঠেঙিয়ে হারাণ পূর্ণশশী এবং আরও পাঁচ-সাত জন এসে পড়ল। তার মধ্যে দূরগ্রামের—কপোতাক্ষ-পারেরও একজন, পূর্ণশশীর শালা কুটুম্ববাড়ি পূজো দেখতে এসে কলকাতার প্লেয়ারের টানে সোনাখড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেছে।

আসুন, আসুন—বলে হিরু পথ অবধি এগিয়ে আপ্যায়ন করে। চোখ টিপে দেয়—সপ সতরঞ্চি মাদুর কিছু কিছু এ বারে পেতে দিক।

বলে, বসুন, পান-তামাক খান। প্লের অনেক দেরি, সেই রাত দশটা। হাটে হাটে কাড়া দেওয়া হয়েছে, শোনেননি? আপনাদের ওখানেও তো তাই নইলে হয় না, খাইয়ে-দাইয়ে হেঁসেলের পাট চুকিয়ে মেয়েলোকে এসে বসবেন। তাঁদের নিয়েই তো থিয়েটার।

বসা তো সারারাত্তির ধরেই আছে। ঘটকপূর্র হয়ে এক্ষুনি কেন বসতে যাব?

বসল না রাজীবপুরে দল, চতুর্দিক ঘুরে ঘুরে দেখছে। মণ্ডপের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। হারাণ টিপ্পনী কাটে: মা-দুর্গা যে কচি খুকি—মুখ টিপলে দুধ বেরোবে। সিংহি কই গো, এ তো একটা হুলোবেড়াল।

পূর্ণশশীও জুড়ে দেয়: গণেশের কেবল শুঁড়েই বাহার—ভুঁড়ি কই? গণেশ কারে কয়, আমাদের মুৎসুদ্দি-বাড়ি গিয়ে দেখে আসুক।

প্রতিপক্ষ রাজীবপুরেরা কী না-জানি রাজা-উজির মারছে—সোনাখড়ির জন কয়েক আশেপাশে এসে পড়ল। হিমচাঁদ শুধালেন: কি বলছেন?

হারাণ বলল, সারা সোনাখড়ির মধ্যে এই তো সবেধন-নীলমণি—তা নজর ধরে কই? রাজীবপুরে আমাদের সাত-সাতখানা পূজো। সামান্য লোক ভূষণ দাস, বাজারখোলায় দোকান করে খায়—তার বাড়ির ঠাকুরখানাই মেপে দেখগে। অন্ততপক্ষে এর দেড়া।

পূর্ণশশী বলে, আর মুৎসুদ্দি-বাড়ির ঠাকুর দেখলে তো ভিরমি লেগে যাবে।

তোমাদের গণেশ ভুঁড়ি-শূন্য, হাত-ধরাধরি করেও তাঁদের গণেশের ভুঁড়ি বেড়ে আনতে পারবে না। নাদায় করে গরুকে জাবনা খাওয়ায় না—সেই নাদা আস্ত একখানা কাঠামের সঙ্গে বেঁধে তার উপরে মাটি লেপে ভুঁড়ি বানিয়েছে।

হারাণ বলে, তোমাদের দুর্গা দেখতে পাচ্ছি, এক ফচকে ছুঁড়ি। দশহস্তে দশ প্রহরণ ধরে অসুর নিধন করবেন—এই দুর্গা দেখে কেউ ভরসা পাবে না। হাঁ, মা-দুর্গা কারে কয় দেখে এসো মুৎসুদ্দি-বাড়ি। লম্বা-চওড়া পেল্লায় মূর্তি—মাথার মুকুট চণ্ডীমণ্ডপের ছাতে গিয়ে ঠেকেছে।

পূর্ণশশী বলল, দালানকোঠা বানানোর সময় মিস্ত্রিরা ভারা বেঁধে কাজ করে। এ দুর্গা গড়তেও তেমনি ভারা বাঁধতে হয়েছিল। সাজপত্তোর পরিয়ে কাজ সম্পূর্ণ করে পঞ্চমীর দিন ভারা খুলে দিয়েছি। না খুললে লোকে ঠাকুর দেখতে পায় না।

দত্তবাড়ির নারায়ণদাস বলল: ভারা তো খুললেন—কিন্তু আরতির ভাবনা ভেবেছেন? ঠাকরুনের মুখের উপর পঞ্চপ্রদীপ ঘোরাতে হয়। তার কোন্ উপায়?

খুব সোজা—। উপায় হিমচাঁদ সঙ্গে সঙ্গে বাতলে দেন: প্রতিমার সামনে একটা বাঁশ পুঁতে বাঁশের মাথায় কপিকল খাটিয়ে নাও গে। পুরুতের কোমরে দড়ি-বাঁধা—আরতির কপিকলে দড়ি টেনে পুরুতকে ছাত অবধি টেনে তুলবে। পঞ্চপ্রদীপ ঘোরানো হয়ে গেলে নামিয়ে দেবেন।

কালিদাসও এসে পড়েছে—সে বলল, সে না-হয় হল—বিসর্জনে কি হবে? মণ্ডপ-এর ছাতে মাথা ঠেকেছে, যাকে তো আস্ত বের করা যাবে না। টুকরো করতে হবে।

পূর্ণশশীর বিদেশী শ্যালকটি বলল, তাতে দোষ হয় না। বিসর্জনের মন্তোর পড়া হয়ে গেলে প্রতিমা তখন আর দেবী থাকেন না, পুতুল হয়ে যান।

কালিদাস বলল, আমাদের কলকাতাতেও একবার ঠিক এমনি হয়েছিল। চুনোপুকুর আর বেনেপাড়ায় পাল্লাপাল্লি। চুনোপুকুর ঐ মুৎসুদ্দি-বাড়ির মতোই ঠাকুর গড়ে বেনেপাড়াকে গো-হারান হারিয়ে দিল। প্রতিমাকে দুই খণ্ড করে তবে বিসর্জন হল। তাই নিয়ে বেনেপাড়া এমন শোধ তুলল, চুনোপুকুর আর মুখ দেখাতে পারে না।

হিমচাঁদের দিকে তাকিয়ে সহাস্যে প্রশ্ন করে: বলো তো হিমে-দা, কী হতে পারে?

হিমচাঁদ বললেন, আমার মাথায় আসছে না, খুলে বলো। আমাদেরও তো

করতে হবে তাই।

গণেশের বিসর্জনটা বাদ রেখে বেনেপাড়া তাকে কাচা পরাল, গলায় ধড়া ঝুলাল—গুরুদশায় লোকে যেমন সাজ নেয়। চুনোপুকুরের বাড়ি বাড়ি সেই গণেশ দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। কী ব্যাপার? গণেশের মা অপঘাতে গেছেন প্রাচিত্তিরের (প্রায়শ্চিত্ত) জন্য কিছু কিছু ভিক্ষে দিন আপনারা।

আসরে সপ পড়েছে—কিন্তু ভদ্রলোকে বসবেন কি, ছেলেপুলে যেখানে যত ছিল ধুপধাপ করে বসে পড়ল। মাথার উপর সামিয়ানা ছাতের মতন, নিচের ঘাসবন চাপা দিয়ে সপ পেতেছে—বেশ কেমন ঘর-ঘর লাগে। বসেও সুখ হয় না, গড়িয়ে পড়া—পাক খেতে খেতে গাড়ির চাকার মতন এদিক-সেদিক গড়িয়ে বেড়াচ্ছে। জায়গা নিয়ে কলরব, ধাক্কাধাক্কি। ভদ্রলোক এর মধ্যে বসেন কোথা, দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বিশেষ রাজীবপুর থেকে এই যে ক'টি এসেছেন।

হিরু এসে রে-রে করে পড়ল: কি হচ্ছে—আসর পাতা হল তোদের জন্য নাকি? থিয়েটার তো রাত-দুপুরে। খেয়েদেয়ে কায়েমি হয়ে বসবি, তা নয় এখন থেকেই উঠোনে কুমোড়-গোড় লাগিয়েছে দেখ।

সিরাজ-করিম কলকাতার প্লেয়ার—পূজোবাড়ির ধুমধাড়াক্কার মধ্যে নেই, তারা স্বতন্ত্র। সমুদ্দুরপুকুরের বাঁধানো চাতালে কামিনীফুল-তলায় চুপচাপ বসে বসে সিগারেট ফুঁকছে। আকাশে চাঁদ, জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভরে গেছে, ফুলের গন্ধ বাতাসে ভুর ভুর করছে।

ম দার ঘোষ যাচ্ছিলেন—দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে বলেন, আপনারা এখানে? ভদ্রলোকেরা আসছেন, সবাই আপনাদের কথা জিজ্ঞাসা করছেন। কথাবার্তা বলবেন চলুন।

সিরাজ ঘাড় নাড়ল: উঁহু, বলুন গিয়ে খুঁজে পাচ্ছিনে। কথাবার্তা যত-কিছু স্টেজের উপর থেকে। ঐ ভয়েই তো পালিয়ে আছি। এখনই কথাবার্তায় লেগে যাই তো স্টেজের কথা শুনতে যাবে কেন লোকে?

লোকে লোকারণ্য। রোয়াকে চিক টাঙানো, মেয়েদের জায়গা সেখানে; তাতে কুলোয়নি, উঠানের সামিয়ানার নিচে একদিকে বৃদ্ধা ও ছোট মেয়েদের আলাদা ভাবে বসানো হয়েছে। বসে বসে পারে না আর লোকে। সামনে ড্রপসিনে অরণ্য-পাহাড়—সে পাহাড় অচল অনড় হয়ে রয়েছে।

জল্লাদ বলল, দশটা বাজুক, তবে তো নড়বে।

দশটা আর কখন বাজবে শুনি? সকাল হতে চলল, এখনো এদের দশটা

বাজে না।

বক্তা রাজীবপুরের এক ভদ্রজন। কালো কারে বাঁধা ট্যাঁকঘড়ি ঝুলিয়ে এসেছেন। পকেট থেকে ঘড়ি বের করে দেশলাই জেলে দেখে নিয়ে বললেন, এগারো বাজতে চলল—দশ মিনিট বাকি।

গ্রামের উপর শ্লেষ-বিদ্রূপ পড়ছে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজীবপুর দলের মধ্যে থেকে—জল্লাদের আর ধৈর্য থাকে না। বলল, ঘড়ি নয়—আপনার ওটা ঘোড়া। লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। কালিদ সদা কলকাতা থেকে তোপের সঙ্গে ঘড়ি মিলিয়ে এনেছেন, চালাকি নয়। সেজেগুজে তৈরি আছে সব, দশটা বাজা মাত্তোর পাহাড় সড়-সড় করে উপরে উঠে যাবে, রাজদরবার বেরুবে।

বলে তো দিল—কিন্তু মনের মধ্যে বিষম উদ্বেগ, সাজঘরে কী কাণ্ড হচ্ছে না জানি! রাজীবপুরেরা দলবদ্ধ হয়ে খুঁত ধরতে এসেছে, ক্রমশ সেটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। ড্রপ তুলতে সত্যি সত্যি সকাল করে না ফেলে। এখন সাজঘরে ঢুকতে দেবে না, সিংহের ঘোরতর আপত্তি, বাজে লোক ঢুকে গেল গোঁফ চুল ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে, স্পষ্ট বলে দিয়েছে!

শুনতে পেয়ে জল্লাদ আগেভাগে উপায় করে রেখেছে। সাজঘরের বেড়া ফুটো করে রাখবে, গোড়ায় ভেবেছিল। তাতে কারো না কারো নজরে পড়ে যাবে, গরু-ছাগলের মতন তাড়িয়ে তুলবে। চালের উপরে উলুর ছাউনি—ভেবেচিন্তে তারই খানিকটা সে ছিঁড়ে-খুঁড়ে রাখল। বৃষ্টি-বাদলা না হলে উপর দিকে কেউ নজর দিতে যায় না। আশফল-গাছের ডালে বসে অধীর উৎকণ্ঠায় জল্লাদ সাজঘরের ভিতরটা একনজরে দেখছে, আর গজরাচ্ছে ওদের গয়ংগচ্ছ কাজকর্মের জন্য।

তড়াক করে একসময় গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ল।

কি রে, কি পড়ল ওখানে?

খোড়েল-টোড়েল হবে। কে একজন বলল।

উইংস-এর পাশে এক হাতে পেটাঘড়ি আর হাতে হাতুড়ি নিয়ে একজনে দাঁড়িয়েছে। ড্রপসিনের দড়ি ধরে আছে একজন—ঘণ্টা দিয়েছে কি সিন উঠে যাবে। এইবার, এইবার—আহ্লাদে লাফাতে লাফাতে জল্লাদ আসরে ছুটল। আচমকা চেঁচিয়ে ওঠে: সাপ, সাপ—

লোকজনে ঠাসাঠাসি, সাপের আতঙ্কে সব উঠে পড়েছে।

উঁহু, সাপ তো নয়—লতাপাতা দেখে সাপ ভেবেছিলাম।

খিলখিল করে হেসে জল্লাদ মনের মতন জায়গা নিয়ে বসে পড়ল।

মাদার ঘোষ বলেন, শয়তান, কি রকম দেখ। জায়গা পাচ্ছিল না, চালাকি করে জায়গা নিয়ে নিল। এতও মাথায় আসে ওর।

থিয়েটার চলছে। লোকে সাংঘাতিক রকম নিয়েছে, খানিক এগুতেই বোঝা যাচ্ছে। বিশেষ করে করিম-চাচা আর মীরজাফর যখন স্টেজে আসেন। ঝণ্টু মীরজাফর সেজেছে। করিম-চাচা এতদিন যে মুখ খোলেনি—ওস্তাদের মার শেষরাত্রে, সেই খেল দেখাবে বলেই বোধহয়। মুখের কথা না ফুটতেই হেসে লোক লুটোপুটি খাচ্ছে।

মাদার ঘোষ আসরে বসেননি, ঘুরে ঘুরে তদারক করেছেন। উত্তেজিত-ভাবে তিনি সাজঘরে ঢুকে কালিদাসকে ধরলেন: দেখেশুনে খরচ-খরচা করে তোতলা প্লেয়ার নিয়ে এলে তুমি?

কালিদাস বলে, আমি আর দেখলাম কোথা? অজিতবাবুর মতন অতবড় প্লেয়ার সার্টিফিকেট দিলেন, তার পরে স্কুলের ছেলের মতন আমি কি আর পাঠ ধর'তে যাব? খালি সার্টিফিকেটই নয়, বলে দিলেন, করিম-চাচা না নিয়ে আমিও সিরাজ হয়ে প্লে করতে যাচ্ছিনে।

কথাবার্তার মধ্যে সিরাজ এগিয়ে এসে পড়ল: কি হয়েছে?

মানে ঐ করিম-চাচা ভদ্রলোক একটুখানি—

তোতলা। একটু নয় অনেকখানি। কিন্তু দোষ কি হল তাতে? করিম-চাচা ইতিহাসের কেউ নয়, কল্পনায় বানানো। কল্পনা আরও একটু খেলিয়ে নিন না, যে মানুষটা ছিল তোতলা। সিরিও-কমিক পার্টে কমিকের ভোজটা কিছু বেশি করে দিচ্ছি। ভালই সেটা, লোকে বেশী মজা পাচ্ছে।

অগত্যা মাদার ঘোষ করিমকে ছেড়ে স্বগ্রামবাসী ঝণ্টুকে নিয়ে পড়লেন: তোর মীরজাফর দেখে লোকে হেসে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। বলি, অমন কূটকৌশলী সেনাপতি তাকে একেবারে ভাঁড় বানিয়ে ছাড়লি?

ঝণ্টু কাতর কণ্ঠে বলে, লোকে হাসলে আমি কি করব? তোতলামি করছি নে, পাঠও টনটনে মুখস্থ আমার।

মুখ ভেংচে উঠিস কথায় কথায়—ও কি রে?

আমি ঐ মাদার-দা, দাড়িতে করাচ্ছে। ওর মধ্যে ছারপোকা না কি—মুখে লাগালে কুটকুট করে। বদলে দিতে বলছি, সে নাকি হবার জো নেই। গোড়ায় যেমটি নিয়ে বেরিয়েছি; সারাক্ষণ তাই চালাতে হবে।

গজর গজর করছে: দুনিয়া সুদ্ধ মানুষ চুল-দাড়ি ছাঁটে, গরজে কামিয়েও ফেলে, মীরজাফর যদি ছেঁটেছুটে দাড়িখানা একটু অদল-বদল করে নেয় তাতে

মহাভারত একেবারে অশুদ্ধ হবে নাকি।

সপ্তমী অষ্টমী নবমী তিনদিন কাটল। বিজয়াদশমী, মচ্ছবের অবসান আজ, প্রতিমা-বিসর্জন। ভোর হয়নি, শুয়ে শুয়ে আহ্লাদ বৈরাগির গান শোনা যাচ্ছে, বৈরাগির মা বগলা খঞ্জনি বাজাচ্ছেন :

মা তোরে আর পাঠ'বো না।
বলে বলবে লোকে মন্দ
কারু কথা শুনবো না।
আমরা মায়ে-ঝিয়ে করব ঝগড়া
জামাই বলে মানব না।

লাফ দিয়ে কমল উঠে পড়ে মণ্ডপে ছুটল। শেষ দিন। সোনাখড়ি বারোমাস নিত্যিদিন যেমন, আজকের দিনটা বাদ দিয়ে কাল থেকে আবার তেমনিধারা হয়ে যাবে। মাঝের এই দিনগুলোয় আমোদের জোয়ার এসেছিল।

আকাশ প্রসন্ন আজ। মন্দ বাতাসে পাতা কাঁপছে, পাতার শিশির টপটপ করে ঝরে পড়ছে। পুঁটি আগেই উঠে এসে দাঁড়িয়েছে। আরও সব এসেছে। প্রতিমায় আঙুল দেখিয়ে কমল বলে, দেখ্ দিকি, মা যেন কাঁদছেন। ভাল করে দেখ—তাই না ?

ঠিক তাই। ভিজে চোখ মা-দুর্গার—কেঁদেছেন খুব, মুখের উপরেও যেন অশ্রু-চিহ্ন। কার্তিক গণেশ লক্ষ্মীরও তাই। সরস্বতীর নয় কেবল।

বিনো বলল, সরস্বতী-ঠাকরুন বাপ-সোহাগী মেয়ে—মামার বাড়ির চেয়ে বাপের কাছে, মহাদেবের কাছে ওঁর বেশি পছন্দ।

ঘোড়ার ডিম !

প্রতিমার কাছে মাটির মেজেয় জল্লাদ পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিল, জেগে উঠে সে কথা বলে উঠল। প্রতিমার পাহারায় সে, পূজোআচ্চা মিটে লোকজন সমস্ত বিদায় হয়ে গেলে আরও ক'জনের সঙ্গে পালা করে সারা রাত জাগে ঘুমোনোর সময় এখানে ঘুমোয়। পূজোর ক'দিন একদম বাড়ি যায় নি। অহোরাত্রি বাইরে থাকার মওকা জুটেছে, বাড়ি আর যেতে যাবে কেন ? মা-দুর্গার সেবায় দেবীর পদাশ্রয়ে পড়ে আছে—বাপ যজ্ঞেশ্বরও এ বাবদে জোরজার করতে সাহস পান না। দেবী চটে যাবেন।

জল্লাদ বলে উঠল, কান্না না কচু। ঠাকুরমশায় কাল রাত্রে চুপিসারে গর্জন-তেল মাখিয়ে গেছেন। আমরা ক'জনেই জানি কেবল।

গর্জনতেল মাখিয়ে থাকেন, বেশ করেছেন। না মাখালেও কাঁদতেন ঠাকরুন ঠিক। এত জনের চোখ ছলছল, ও'র চোখ কতক্ষণ আর শুকনো থাকতে পারে বিশেষ করে মেয়েছেলে যখন।

ফুলের আজও খুব দরকার—ফুল আর বেলপাতা। বেলপাতায় দুর্গানাম লিখবে—সেই বেলপাতা ও ফুলে অঞ্জলি দেবে মা দুর্গার কাছে। দুর্গার পতিগৃহে যাত্রা—যারা অঞ্জলি দিচ্ছে, তাদেরও বছরের যাত্রা সারা হয়ে থাকল আজকে এই একদিনে। পাঁজিতে দিনক্ষণ খুঁজে বেড়াতে হবে না—অদিনে-কুদিনে যেমন খুশি যাতায়াত চলবে। আজ যাত্রা করে নিলে অতঃপর সর্বক্ষণই মহেন্দ্রযোগ-অমৃতযোগ।

রাত থাকতেই তাই ফুল তোলা লেগে গেছে। সাজি নিয়েছে কেউ, কেউ ডালা, কেউ-বা পথের পাশের মানকচু-পাতাই ছিঁড়ে নিয়েছে। স্বর্ণচাপা-গাছের মাথায় জল্লাদ। শিশিরে-ভেজা ডালপালার উপর পা সরে সরে যাচ্ছে—মগডাল অবধি বেয়ে ফুল তুলে বেড়াচ্ছে, কোঁচড ভরতি করছে। স্থলপদ্ম মেলা ফুটেছে—দেখতে দেখতে সকল পাডার সবগুলো গাছ ন্যাডা হয়ে গেল। গাঁদা টগর বেলা যুঁই গন্ধরাজও অল্পবিস্তর মিলল। এবং শিউলি—

শিউলিতলায় ছোট ছোট মেয়ে--পায়ে মল, নাকে নোলক, কর্মকারপাডার এরা সব। জনা দুই-তিন গাছ ঝাঁকাচ্ছে, ফুরফুর করে ফুল পড়ছে খুঁটে খুঁটে আঁচলে তুলছে মেয়েরা। ফুল ছিঁড়ে শিউলির বোঁটায় কাপড ছোপাবে। এমনি সময় জল্লাদের দঙ্গল এসে পড়ল। মেয়েগুলো তো দৌড়—দে-দৌড়। মল বাজে ঝুন ঝুন করে—শজারু পালানোর সময় যেমন হয়।

শানাই বাজে শেষরাত থেকে। এক শানাইদার পোঁ ধরে আছে, অপরে সুর খেলাচ্ছে। কান্নার সুর—কথা নেই, কিন্তু একটু শুনলেই চোখে জল বেরিয়ে আসে। গিরিকন্যা বাপের-বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। সে বড় দুঃখকষ্টের সংসার—জামাই ভিখারি বাউণ্ডুলে গেঁজেল। মা মেনকার মনে বড় ব্যথা। সেই ব্যথা শানাই-এর সুর হয়ে মানুষের কলজে নিংড়ে কান্না বের করে আনে।

দেড প্রহর বেলার মধ্যে যাত্রা সারা করতে হবে, দেবেন্দ্র চক্রবর্তী পাঁজি দেখে বলে গিয়েছেন। তাড়াহুড়ো পডে গেল। পূজা অন্তে পুরুতঠাকুর শান্তিজল ছিটোবেন এইবার। শ্রীশ্রীদুর্গাসহায়-লেখা বেলপাতা কোঁচার খুঁটে শাড়ির আঁচলে বেঁধে এসেছে সব। কাপড়চোপড়ে সর্বশরীর পরিপাটিরূপে ঢাকা—শান্তিজলের ছিটে পায়ে না লাগে।

শাস্ত্রীয় কাজকর্ম শেষ। এই ক'দিন দেবী হয়ে ছিলেন। ছোঁয়া চলত না

—ভক্তিভরে প্রণাম করে লোকে জোড়হাতে দূরে দাঁড়িয়ে থাকত। সেই গৌরবের বিসর্জন হয়ে গিয়ে এখন যিনি মণ্ডপে আছেন, নিতান্তই ঘরের মেয়ে ছাড়া তিনি কিছু নন। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। সংস্কৃত মন্ত্রপাঠের ইতি—ঘরোয়া বাংলা কথাবার্তা সেই মেয়েটির সঙ্গে। অপরাহ্নবেলা ঢাক-ঢোল-শানাইয়ে পূজাবাড়ি তোলপাড়। গাঁয়ের মধ্যে যত মেয়ে আর বউ আছে. আসতে কারো বাকি নেই। বিদায়ের বরণ—সধবা ও কুমারীরা একের পর এক প্রতিমার সামনে এসে হাতের কারুকৌশল দেখাচ্ছে।

ঢোল-কাঁসি বাজছে, সানাই বাজছে। সধবা-কুমারীরাই শুধু এর মধ্যে, বিধবারা বাদ। হয়ে গেলে বড়গিন্নি উমাসুন্দরী একটা রেকাবিতে সন্দেশ নিয়ে এলেন—ভেঙে একটু একটু দুর্গা ও তাঁর ছেলে-মেয়েদের মুখে দিলেন। পানের খিলি এনেছেন—মুখে ছুঁইয়ে মুখশুদ্ধি করালেন তাঁদের। বলেন, সম্বৎসর ভালো রেখো মা সকলকে। অসুখ অনটন কারো যেন না হয়। সামনের বছর আবার এসো কিন্তু—আসবে তো?

প্রতিমার মুখে তাকিয়ে রইলেন একটুখানি—হাঁ-না কি জবাব পেলেন তিনিই জানেন। সিঁদুরকৌটো এনেছে মেয়েরা—মা-দুর্গার কপালে সিঁদুর পরিয়ে সেই সিঁদুর একটু নিজের কৌটায় তুলে নিয়ে তারপর এ ওকে সিঁদুর পরাচ্ছে। মনের কথা চেঁচিয়ে তো বলা যায় না, মা-দুর্গার কানের উপর মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলছে। হারু মিস্তিরের বউ মনোরমা মরাঞ্চে পোয়াতি—মনে তার বিষম কষ্ট, অকালে রক্তের দলা পড়ে পেট থেকে। বার তিন-চার এমনি হয়ে গেছে। ছেলেমেয়ে দূরস্থান—হাত-পা মাথা সমন্বিত চেহারাই নেয় না তখনো। মা-দুর্গার কানে ফিসফিসিয়ে মনোরমা দেয়ালপাটের মতন খোকা চাইল একটি। উত্তরবাড়ির ফেক্সি মেয়েটার আরও কোন বেশি গোপন কথা—মুখে বলতেই লজ্জা, গোটা কাঁচা-অক্ষরে কাগজে লিখে এনেছে সে। পাকিয়ে দলা করে কাগজটুকু দুর্গার আঁচলে বেঁধে দিল। কানে কানে বলে, লেখা রইল সব, এক সময়ে দেখো। ডামাডোলের ভিতর এখন হবে না—শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ধীরে-সুস্থে ঠাণ্ডা মাথায় দেবী পড়ে দেখবেন, এই অভিপ্রায়।

এরই মধ্যে যজ্ঞেশ্বরের থুনথুনে মা বাচ্চা কোলে নিয়ে উপস্থিত। বুড়ির মাজা বাঁকা—কিন্তু কী আশ্চর্য, বাচ্চা কাঁখে তুললেই লাঠির মতন টনটনে খাড়া হয়ে যায়। বুড়োমানুষ দেখে সকলে পথ করে দিল। বলে, নিজে চলতে পারে না বুড়ি, আবার এক বাচ্চা ঘাড়ে করে এসেছে দেখ। পথের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে নি সে-ই ঢের। বাচ্চা যারা দিয়েছে, তাদেরও বলিহারি আক্কেল।

মন্তব্য শুনে এক ঝলক তাকিয়ে বুড়ি কোটরগত চোখ দুটো দিয়ে আগুন ছড়ান। সোজা প্রতিমার কাছে গিয়ে বলছে, ছাদে মা, আমাদের অক্ষয়ের খোকা হয়েছে। যাচ্ছিস চলে. তাই এট্টু দেখতে নিয়ে এলাম। চার মাস উতরে পাঁচে পা দিয়েছে—তা কী রকম বজ্জাত হয়েছে, সে যদি দেখিস মা। আশীর্বাদ করে যা আমাদের খোকাকে।

নতুনপুকুরে বিসর্জন হবে, একবার কথা হয়েছিল। ভবনাথের কাছে ছোঁড়ারা আড় হয়ে পড়ল : গাঁয়ে কতকাল পরে দুর্গা উঠলেন—আমোদ-আহ্লাদেরও কোন অঙ্গে কসুর পড়ে নি. বাভির পুকুরে চুপিসারে ডোবাতে যাবো কেন? বাঁওড়ে নিয়ে যাবো সব—আমরাই বা কম হলাম কিসে? আমরাও যাবো।

ঢাক-ঢোল বাজিয়ে তল্লাট জুড়ে জানান দিয়ে যাওয়া—ভবনাথও চান তাই। পাশাপাশি দুটো ডিঙিতে বাঁশ ফেলে তার উপরে প্রতিমা তুলতে হয় —কিন্তু বিলের ভিতর ধানবনের শয়াল ধরে সে বস্তু নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কাটাখালি পড়তে পারলে তখন টানা খাল—তারপরে আর অসুবিধা নেই। কিন্তু অতটা পথ নিয়ে যায় কে?

আমরা, আমরা—

তেজি ঘোড়ার মতো ছোঁড়াগুলো টগবগ করে লাফাচ্ছে। বুকে থাবা মেরে বলে, গতর বাগিয়েছি. কুমড়ো-কচু আর্জে খাবার জন্যে নয়। প্রতিমা ঘাড়ে নিয়ে আমরা কাটাখালির ঘাটে পৌঁছে দেবো।

সেই বন্দোবস্ত পাকা। কাটাখালির ঘাটে জোড়াডিঙি তৈরি হয়ে আছে, প্রতিমা বয়ে নিয়ে ডিঙিতে তুলে দেবার অপেক্ষা।

হাঁকডাক হৈ-হল্লোড়ে ভবনাথেরই পুলক বেশি, কিন্তু সময়কালে তাঁর পাত্তা পাওয়া যায় না। লোকজন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে দক্ষিণের দালানে ঝিম হয়ে তিনি বসে আছেন।

দেবনাথ এসে বললেন, তুমি এখানে দাদা? রওনা হচ্ছে এবার, তোমায় সব খোঁজাখুঁজি করছে।

ভবনাথ ক্লান্তস্বরে বললেন, শরীর বেজুত লাগছে। কি বলে, তুমি গিয়ে শোন গে।

শরীর নয়, মন—দেবনাথ বোঝেন সেটা। বাইরে দাদা কড়ামানুষ, ভিতরে ভিতরে অতিশয় নরম। প্রতিমা বিদায় হয়ে গিয়ে শূন্য মণ্ডপ খাঁ-খাঁ করবে, এ জিনিস চোখের উপর দেখতে পারবেন না, সেই জন্যে এড়িয়ে আছেন।

ভবনাথ আবার বলেন, করবার কিছু নেই। গিয়ে দাঁড়াওগে একটু,

ভাঙেই হবে।

দাঁড়ালে হবে না দাদা। জেদ ধরেছে, প্রতিমার সঙ্গে যেতে হবে। তুমি, নয়তো আমি। হাঁটতে না চাও, ডোঙায় বিল পাড়ি দিয়ে কাটাখালি গিয়ে উঠবে। সেখান থেকে ওরা ডিঙিতে তুলে নেবে।

ভবনাথকে কিছুতেই রাজি করানো গেল না: তুমিই যাও তবে। আমি পারব না।

বাঁশে বেঁধে প্রতিমা কাঁধে তুলে নিল। মুখ বাড়ির দিকে—যতক্ষণ দৃষ্টিগোচর থাকবে, মুখ কদাপি না ঘোরে—খেয়াল রাখতে হবে। প্রতিমার মাথার কাছে প্রকাণ্ড ছাতা তুলে ধরে একজনে আগে আগে চলেছে। ঢাক-ঢোলের তুমুল বাজনা।

গ্রাম ছেড়ে দলটা ফাঁকা মাঠে এসে পড়ল। তেল-চকচকে প্রতিমা-মুখের উপর পড়ন্ত সূর্যের আলো। এ ওকে দেখায়: বাপের-বাড়ি ছেড়ে যেতে কি কান্নাটা কাঁদছেন দেখ। ঠিক তাই—যারা দেখছে, তাদেরও চোখ ভরে জল আসে। কাটাখালির ঘাটে জোড়া-ডিঙি—কয়েকটা মোটা বাঁশ আড়াআড়ি ফেলে শক্ত করে বাঁধা, বাঁশের উপর প্রতিমা। যারা বয়ে নিয়ে এসেছে দু-পাশের দুই ডিঙিতে ভাগাভাগি হয়ে উঠল। বাজনদাররাও উঠেছে। পিছনে আরও কত নৌকো—ভাসান দেখতে বিস্তর লোক যাচ্ছে। গানবাজনা করে আচ্ছা রকম জমিয়ে যাচ্ছে সব।

বাঁওড়ে এ-দিগরের সাতখানা ঠাকুর এসে গেছেন, কিনারা ধরে আছেন আপাতত। সোনাখড়ির ঠাকরুন গিয়ে পড়ে আটে দাঁড়াল। ভাসানের মেলা—মাথার কালো সমুদ্র অনেক আগে থেকে নজর পড়ে, কলরব কানে আসে। নৌকা-বাইচ, এই উপলক্ষে বিস্তর কাল থেকে হয়ে আসছে। লম্বাধিড়িঙ্গে ছিপনৌকো বাইচের জন্য বিশেষভাবে তৈরি। পিতলে-মোড়া গলুইয়ে রোদ পড়ে ঝিকঝিক করছে। এদিকে ওদিকে দুই সারি দাঁড়িরা বসেছে, পাছনৌকোয় মাঝি। মালকোঁচা-সাঁটা সকলে, মাঝি তার উপর মাথায় রঙিন গামছার পাগড়ি বেঁধে নিয়েছে। আর একজন মাঝির দিকে মুখ করে পাটার উপর হাঁটু গেড়ে বসেছে, আসল মানুষ সে-ই—মোড়ল। বাইচের নৌকো তার হুকুমে ছাড়বে, হাত তুলে সে-ই নৌকো থামিয়ে দেবে। পাশাপাশি ছিপগুলো—তোড়জোড় সম্পূর্ণ হয়ে যেতে ঝপাস করে সব নৌকোর সবগুলো দাঁড় একসঙ্গে জলে পড়ল। ছুটেছে নৌকো। মোড়ল সামনে পিছনে দোলাচ্ছে নিজ দেহ, সেই তালে তালে দাঁড় পড়ছে। নৌকো-বাইচে সব চাইতে বেশি মেহনত বুঝি মোড়লের। দর-দর করে ঘাম পড়ছে।

নাচ পড়ে গেছে বাঁওড়ের ভাসান ও আনুষঙ্গিক নৌকো-বাইচের। জনারণ্য। ফ্ল্যাটের কোন বাড়িতে বুঝি আধখানা মানুষ নেই। ভাল দেখতে পাবে বলে বাচ্চাগুলোকে কাঁধে তুলে নিয়েছে। পাড়ের গাছগাছালির ডালে ডালে মানুষ। দশমীর জ্যোৎস্না উঠেছে, জ্যোৎস্না ডালপালার উপর পড়েছে। ডালে ডালে কত মানুষ-ফল ধরে আছে, দেখ তাকিয়ে। জকার উঠছে, আকাশ ফেটে যাবার গতিক। তীরের বেগে নৌকো পাল্লা দিয়ে ছুটেছে।

কদমতলার ঘাটে গিয়ে দৌড়ের শেষ। বালুচর খানিকটা—ছিপগুলো চরের পাশে লাগবে। সেই চরের উপরে দুটো বেঞ্চি পেতে দিয়েছে—কর্মকর্তারা তার উপরে বসে দূরের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন। কানায় দড়ি বেঁধে প্রকাণ্ড এক পিতলের-কলসি কদমের ডালের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়েছে। বেঞ্চির ধারে এক বাণ্ডিল চাদর। যে-ছিপ জিতবে, তার মোড়লের হাতে কলসি তুলে দেবে। আর দাঁড়ি-মাঝি সকলকে সারবন্দি দাঁড় করিয়ে চাদর জড়িয়ে দেবে গলায়।

ফচকে ছোঁড়া কতগুলো আছে, তিন-চার কাঁদি কাঁচকলা এনে কদম গাছে ঝুলিয়েছে। যারা হারবে কাঁচকলা উপহার দেবে তাদের নাকি। পরাজিতেরা আসছে হাত পেতে তোমাদের কাছ থেকে কাঁচকলা নিতে! বয়ে গেছে!

নৌকোয় নৌকোয় মশাল, মানুষের হাতে হাতে হাতে মশাল। হাওয়া দিয়েছে, মশালের আলো জলের উপর কাঁপছে। রাত্রিকাল কে বলবে—আলোয় আলোয় দিনমান। বাঁশের উপর থেকে প্রতিমা এইবার জলে নামিয়ে দিচ্ছে। হরি- হরিবোল রোল উঠছে চতুর্দিকে। প্রতিমার সঙ্গে মানুষও ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঠেসে ধরে প্রতিমা জলতলে ডুবিয়ে দিল। জায়গায় নিরিখ রইল—আমাদের প্রতিমা বাঁশবনের কাছ বরাবর, ওদেরটা বাবলাগাছের পূবে। থাকুন ঠাকরুনরা জলতলে এখন কিছুকাল--পরে এক সময়ে পাট-কাঠাম তুলে নিয়ে বাড়ি রেখে দেবে সামনের বছরের জন্য।

হরি-হরিবোল! এ ওর গায়ে জল ছিটোচ্ছে, সাঁতার কাটছে ডুব দিয়ে প্রতিমার গায়ের রাংতা কুড়োচ্ছে। হুড়োহুড়ি, এ-ওকে জড়িয়ে ধরছে—ভিজে কাপড়েই আলিঙ্গন, শত্রু-মিত্র বিচার নেই।

তারপরে বাড়ি ফেরা। ডোঙা-ডিঙি, সামনের মাথায় যে যেমন পেলো, উঠে পড়েছে। না-পেলো তো হাঁটনা। আড়ঙের মেলা শেষ, বাঁওড় নির্জন। বছর ঘুরে ভাসানের দিন এলে আবার তখন মেলা-মচ্ছব, নৌকো-বাইচ, অগণ্য মানুষের আনাগোনা।

নিরঞ্জন-অন্তে সকলে ঘরে ফিরে এসেছে। পায়ে গড় করছে, বুকে জড়িয়ে কোলাকুলি করছে—যার সঙ্গে যে রকম সম্পর্ক। উমাসুন্দরী আশীর্বাদের ধান-দূর্বা নিয়ে দক্ষিণের দাওয়ায় বসেছেন। অলকা নিমি পুঁটি ছুটোছুটি করে রেকাবিতে মিষ্টি এনে দিচ্ছে—মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছাড়াছাড়ি নেই। হিম-চাঁদের বাড়িতে পাথরের খোরায় সিদ্ধি ঘুঁটছে—ইয়ার-বন্ধুদের দিচ্ছেন তিনি: খেতেই হবে আজকের দিনে।

অলকা গলায় আঁচল বেড় দিয়ে শাশুড়ির পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করল। উমাসুন্দরী বললেন, জন্মএয়োস্ত্রী হও মা, পাকাচুলে সিঁদুর পরো।

দেবনাথ এসে পায়ের ধুলো নিলেন। উমাসুন্দরী বললেন, ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর হও।

বাপের পিছু পিছু এসে কমলও ঢিপ করে প্রণাম করল। উমাসুন্দরী বললেন, সোনার দোয়াত-কলম হোক। মাথার যত চুল, তত পরমায়ু হোক।

বউঠান তো হলেন, দাদা কোথায়?

প্রণাম করবেন বলে দেবনাথ জ্যেষ্ঠের খোঁজাখুঁজি করছেন। বাড়ির মধ্যে এই দুই প্রণম্য তাঁর। দিদি মুক্তঠাকরুন এলে আর একজন হতেন। তিনি এলেন না—আসতে দিল না গ্রামসম্পর্কীয় ভাসুরপোরা। উঠানে দাঁড়িয়ে ভূপতি মেজাজ দেখাতে লাগল: পূজো বন্ধ এবারে। কেমন করে হবে—এক হাতে যিনি গোছগাছ করে আসছেন, নিজের পূজো ছেড়ে তাঁর এখন ভাইয়ের বাড়ি যাওয়া লাগল। ফটিক সর্দার যথারীতি আনতে গিয়েছিল। মুক্ত-ঠাকরুন অসহায় কণ্ঠে বললেন, রাগারাগি করছে ওরা সব, গাড়িতে উঠলে পিছন থেকে টেনে ধরে রাখবে। চোখে দেখে যাচ্ছিস, দাদাকে বলিস সব।

'দাদা' 'দাদা' করে দেবনাথ ভিতর-বাড়ি বাইরে-বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছেন—কে-একজন বলে দিল, মণ্ডপের মধ্যে আছেন—দেখুন গে যান।

শূন্য মণ্ডপ—আলো নেই, বাজনা নেই, একটা মানুষের চিহ্ন দেখা যায় না কোন দিকে। এ কয়দিনের সমারোহের পর অন্ধকার বড় উৎকট লাগে। একলা বসে দাদা কি করছেন এখানে?

দেবনাথ পায়ে হাত দিতেই ভবনাথ তাঁকে জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন: সর্বনাশ হয়ে গেছে, বুড়ি-মা নেই। ষষ্ঠীর দিন এসে পড়বে—যাবার সময় জনে জনের কাছে বলেছিল। ডুমুরতলা অবধি গিয়েও পালকি থেকে মুখ বাড়িয়ে হাসিমুখখানা মা একবার দেখিয়ে গেল। আর সে আসবে না। সকালবেলা কুসুমপুরের লোক এসে খবর দিল, সোনার প্রতিমা বিসর্জন হয়ে গেছে। সেই থেকে আড়ালে-আবডালে বেড়াচ্ছি।

জ্বর হয়েছে বউয়ের—অন্নপথ্য করেই সুরেশের সঙ্গে চলে যাবে—ঠিক ষষ্ঠীর দিনে হয় কি না-হয়, তবে যাবে নিশ্চয় পূজোর ভিতর—এই রকম খবর ছিল। সেই জ্বর সান্নিপাতিক বিকারে দাঁড়াল। বাপের বড় আহ্লাদী মেয়ে শ্বশুরবাড়ির সোহাগিনী বউ বারো দিনের দিন সকলকে কাঁদিয়ে চোখ বুঁজেছে।

।। কুড়ি ।।

চঞ্চলা নেই, তারপর তিন তিনটে বছর কেটে গেছে। এক ঘুমের পর এখনো এক এক রাত্রে দক্ষিণের-ঘর থেকে কান্না ওঠে। অতি ক্ষীণ—কান্না বলে হঠাৎ কেউ বুঝবে না। মনে হবে গান—গানের মতোই সুরেলা। কান পেতে থাকলে কথাগুলো একটু একটু পরিষ্কার হয়ে আসবে: কোথায় গেলি মা আমার, ফিরে আয়। আমি যেতে দিতে চাইনি, মন আমার ডেকে বলেছিল, জেদ করে তুই চলে গেলি—

কোলের মধ্যে কমল কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোয়—বিন্দুবিসর্গ সে টের পায় না। পূবের-কোঠায় ভবনাথ চমকে জেগে দরদালানে উমাসুন্দরীর গা ধরে নাড়া দেন: কী ঘুম ঘুমোচ্ছ বড়বউ, শুনতে পাও না? ওঠো শিগগির, দেখ গিয়ে—

উমাসুন্দরী ছুটে গিয়ে দক্ষিণের-ঘরের দরজা ঝাঁকাচ্ছেন, আর 'ও ছোট-বউ' 'ও ছোটবউ' করে ডাকছেন। সুর অনেক আগেই থেমেছে, ঘরের মধ্যে চুপচাপ। ডাকাডাকিতে তরঙ্গিণী সাড়া দিলেন—যেন কিছুই জানেন না এমনিভাবে সহজ কণ্ঠে বললেন, কি দিদি, কি হয়েছে? কান্না বেকবুল যান। কিম্বা হতে পারে সম্পূর্ণ ঘুমের ভিতরের কান্না—জেনেবুঝে তিনি কাঁদেন নি।

কমলের গা'য়ে হাত পড়ে চমক লাগল—একি, গা ছাঁৎ-ছাঁৎ করে যে! চঞ্চলার চলে যাওয়া থেকে এদের নিয়ে সদা-উদ্বেগ। পুঁটিকে তত নয়—তার খাওয়া-শোওয়া আবদার-অভিমান উমাসুন্দরীর সঙ্গে। কিন্তু কমলের জন্য সামান্যে উতলা হয়ে পড়েন। শত্রুরা পেটে এসে একের পর এক দাগা দিয়ে বিদায় নিচ্ছে। গোড়ায় বিমলা, তারপরে চঞ্চলা: মায়াবিনী চঞ্চলা—সামান্য কয়েকটা দিন পরের ঘরে গিয়েও সেখানে সকলকে মায়ায় বেঁধে ফেলেছিল। সুরেশের আবার বিয়ে হয়ে নতুন বউ এসেছে—তবু এখনো শাশুড়ি নাকি চঞ্চলার জন্য বুক ছেড়ে কাঁদেন। কসবায় একদিন কৃষ্ণময়ের সঙ্গে সুরেশের দেখা হয়েছিল—সে-ও খুব দুঃখ করল: বাইরে সবই করে যেতে হচ্ছে বড়দা, কিন্তু মনের ঘা এ জীবনে শুকোবে না।

কমলের জ্বর হল না কি? ছটফট করছেন তরঙ্গিণী, রাতটুকু কতক্ষণে পোহাবে। প্রত্যুষের নিমন্ত্রিত ছড়াঝাঁট বাদ গেল - অলকা-বউ ও বিনোকে ডেকে বললেন, তোরা যা পারিস কর্। খোকার জ্বর হয়েছে, ওকে ছেড়ে ওঠা যাবে না। বিনো গিয়ে ভবনাথকে বলল, সর্বকর্ম ফেলে তিনি চলে এলেন। উমাসুন্দরীও তাঁর পিছু পিছু। হাতের উল্টোপিঠ কপালের উপর রেখে তাপের আন্দাজ নিলেন ভবনাথ, তারপর নাড়ি দেখছেন। ভবনাথ বলেন কেন, সব বাড়িতেই মুরুব্বিরা অল্পবিস্তর নাড়ি দেখতে পারেন। ভাসুরের সামনে থেকে দাওয়ায় বেরিয়ে তরঙ্গিণী কবাটের আড়ালে দাঁড়িয়েছেন। অভয় দিয়ে ভবনাথ বলেন, নাড়িতে সামান্য বেগ। বৃষ্টিবাদলায় ভিজে ঠাণ্ডা লেগে গেছে। চিন্তার কিছু নেই। ধনঞ্জয় আসুক, সে কি বলে শুন।

নিজেই চলে গেলেন ধনঞ্জয়ের বাড়ি। কবিরাজ ধনঞ্জয়নাথ নাথ—বেঁটেখাটো দোহারা মানুষটা, পাকা চুল, পাকা গোঁফ। বয়স ষাটের কাছাকাছি। মেটেঘরের দাওয়ায় বসে রোগী দেখছেন—ভবনাথকে দেখে সসম্ভ্রমে তালপাতার চাটকোল এগিয়ে দিলেন: বসুন বড়কর্তা। সকালবেলা কি মনে করে?

শেষরাত্রেও বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ঠাণ্ডার মধ্যে বেরুনো বলে কবিরাজ নগ্ন গায়ে একটা হাত-কাটা পিরান পরে নিলেন। খালি পা, গলায় যথারীতি চাদর জড়ানো। চাদর সব ঋতুতেই—চাদরের মুড়োয় অষুধ বাঁধা। টুকরো টুকরো কাগজে রকমারি অষুধ মোড়ক-করা, মোড়কের উপর অষুধের নাম। সবগুলো মোড়ক একটা মোটা কাগজে বলের সাইজে জড়ানো—তার উপরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দড়ির বাঁধন।

দাওয়ার উপর পিঁড়ি পড়ল কবিরাজের জন্য। এই নিয়ম। আপাতত না বসে ধনঞ্জয় ঘরে ঢুকে গেলেন। তক্তাপোষে উার কমল শুয়ে আছে। গোড়ায় কিছু মৌখিক প্রশ্ন। জলতৃষ্ণা পাচ্ছে কিনা, কাঁপুনি হয়েছিল কিনা জ্বর আসার মুখে মাথার যন্ত্রণা ছিল কিনা। পেটে টোকা দিয়ে দেখলেন। তারপরে নাড়ি দেখা—রোগির মণিবন্ধের উপর আঙুল রেখে নিবিষ্ট হয়ে আছেন কবিরাজ। ধ্যানে ডুবে গেছেন এমনিতরো ভাব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হচ্ছে এসব। বসবেন না—রোগীর তক্তাপোশে নয়, আলাদা টুল-চেয়ার আনিয়ে দিলেও নয়। ধনঞ্জয়ের নাড়িজ্ঞান ভাল, লোকে বলে থাকে। অনেকক্ষণ ধরে নাড়ি দেখে 'হুঁ' বলে তারপর বাইরে এসে পিঁড়িতে বসলেন। চাদরের প্রান্ত থেকে অষুধ খোলা হচ্ছে এইবার।

ভবনাথ শুধালেন: লালবড়ি?

হ্যাঁ। সহাস্যে ধনঞ্জয় বললেন, মৃত্যুঞ্জয় রস—মৃত্যুকে করিতে জয় নাম হইল

মৃত্যুঞ্জয়। অনুপান তুলসীরপাতার রস, পিপুলের গুঁড়ো আর মধু। বাড়ি গিয়ে গোটাতিনেক পাঁচন বেঁধে পাঠাব, আধসের জলে সিদ্ধ হয়ে আধপোয়া থাকতে নামাবেন। তিনদিন সকালে এই পাঁচন একটা করে।

কানে গিয়ে কমল ঘরের মধ্য থেকে কেঁদে উঠল: পাঁচন আমি খাবো না জেঠামশায়।

কবিরাজ লোভ দেখাচ্ছেন: তিন পাঁচনের পরেই অন্নপথ্য।

রাজি নয় কমল, আওয়াজ তুলছে: ওয়াক-থু:—

উৎকট স্বাদ পাঁচনের—বিশেষ করে ধনঞ্জয়ের বাঁধা যে-সব পাঁচন। গুলঞ্চ ভাঁদলার-মুখো ভুঁইকুষ্মাণ্ড বামনআটি বাসক বচ কণ্টিকারি—জঙ্গল খুঁজে খুঁজে যেখানে যেটি পান কবিরাজ নিয়ে আসেন. গঞ্জ থেকেও দুষ্প্রাপ্য রকমারি বকাল কেনাকাটা করেন। সমস্ত মিলিয়ে বাড়িতে বিপুল সংগ্রহ। যে রোগ যেমন খাটে, নিক্তিতে মেপে মেপে প্যাকেট বাঁধেন—পাঁচন বাঁধা তাকে বলে। জলে সিদ্ধ করে ক্বাথ বের করে—সেই বস্তু একবার যে খেয়েছে, দ্বিতীয়বার তাকে খাওয়ানো দুঃসাধ্য। এবং ধনঞ্জয় গর্ব করে বলেন, রোগের ক্ষেত্রেও হুবহু তাই—একবার সেবনের পরে আবার দ্বিতীয়বার সেবন হবে, সেই ভয়ে রোগ পাঁই-পাঁই করে পালায়।

বাড়ির উপর ধনঞ্জয়ের আগমন—হেন ক্ষেত্রে কেবল একটি রোগী দেখেই ছুটি হয় না। এবং রোগী ছাড়া নীরোগদেরও দেখতে হয়। দাওয়ার উপরে স্ত্রীলোক অনেকে ঘিরে বসেছে কবিরাজকে। ও-বাড়ির সিঁদুর মা এবং নতুন-বাড়ির মেজবউও এসেছেন। বদ্যি দেখলে নানা রোগ মনে এসে উদয় হয়—কারো হজম ভালো হচ্ছে না, অম্বলের ঢেকুর ওঠে, কারো ঘুম হয়নি কাল রাত্রে, কারো বা গলা খুসখুস করছে। কবিরাজ পুঁটলি খুলে কাউকে ওষুধ দিলেন, কাউকে বা এটা কোরো সেটা কোরো বলে মুষ্টিযোগ দিচ্ছেন। রোগের ব্যবস্থা একরকম চুকলো তো হাত চিত করে এবারে সব সামনে এনে এনে ধরছে। নাড়ি দেখা শুধু নয়, ধনঞ্জয় হাত দেখতেও পারেন। এবং এই ব্যাপারে তিনি কল্পতরু-বিশেষ—যার যে রকম বাঞ্ছা, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ করে দেন, কাউকে নিরাশ করেন না। বন্ধ্যা মেয়েটার বাঁ-হাতে অনামিকার নিচে পাশাপাশি তিনটে রেখা দেখিয়ে বলে দিলেন, একটা নয়—তিন তিনটে সন্তানের মা হবে সে, হাতে বাধা। পালেদের বেউলোকে বললেন, বছরের মধ্যে বিয়ে হবে তার—সুন্দর সুপুরুষ বর, অবস্থা মধ্যম রকমের। নতুনবাড়ির মেজবউয়ের সাত বছুরে ছেলে ফণীর সম্বন্ধে বললেন, দিকপাল বিদ্বান হবে সে। ছেলেটাকে কবিরাজ-বাড়ি পাঠিয়ে দিতে বললেন, হাতখানা নিরিবিলি

আরও খুঁটিয়ে দেখবেন। এমন একখানি হ'ত যত্রতত্র মেলে না।

পাঁচন একটার বেশি লাগল না। পরের দিনই কমলের জর-ত্যাগ। আরও হল—কপাল গুণে দীননন্দন গ্রামের উপর উপস্থিত। যজ্ঞেশ্বরের মার পেট ফুলে ঢাক—জল উদরি না কি হয়েছে। এতদিনে এইবারে বুড়ি যাবেন ঠেকছে। বয়সের কোন গাছপাথর নেই। যজ্ঞেশ্বরের গর্ভধারিণী—সেই যজ্ঞেশ্বরই ঘাটের কেঠায় পৌঁছে গেছেন। তবু মাতৃভক্ত যজ্ঞেশ্বর দীননন্দনকে দিয়ে একবার দেখিয়ে দিচ্ছেন। দীননন্দনের দেখা মানে চিকিৎসার চরম হয়ে গেল—তার উপরে যদি কিছু থাকে, সে হল গঙ্গাজল ও হরিতলার মাটি।

ডাক্তার দীননাথ নন্দন, জাতে কাংসবণিক, দীনন্দন নামেই খ্যাত। ঘোড়ায় চেপে রোগীর বাড়ি আসেন, সঙ্গে স্টেথেসকোপ থাকে। আর থাকে ভারি ওজনের অষুধের বাক্স সহিসের মাথায়। বাক্স-মাথায় ঘোড়ার পাশে-পাশে পাল্লা দিয়ে দৌড়য়। তাই পারে কখনো, পিছিয়ে পড়ে বেশ খানিকটা। রোগীর বাড়ি তক্তাপোশের উপর তোষক-চাদর পাতা আছে, থাকবেই অতি-নিশ্চিত—ঘোড়া থেকে লম্ফ দিয়ে নেমে ক্লান্ত দীননন্দন কোট-প্যান্ট সুদ্ধ গড়িয়ে পড়লেন বিছানার উপরে। ঘোড়া এদিক সেদিক চরে বেড়াচ্ছে—স হস এসে বাক্স নামিয়ে দিয়ে ঘোড়ার তদ্বিরে লেগে গেল। দীননন্দনও বিশ্রাম নেবার পর এবারে রোগী দেখতে গিয়ে বসলেন। স্টেথেসকোপের একদিকে নল—নলের মাথা কানে ঢুকিয়ে নিয়েছেন অন্য কানের ফুটো বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলে চেপে ধরে রোগীর বুক পরীক্ষা হচ্ছে।

ডাক্তারের ফী দুই টাকা। আর সহিস ঐ যে অষুধের বাক্স বয়ে আনল এবং পুনশ্চ ফেরত নিয়ে যাবে তার প্রাপ্য এক সিকি। রোগী দেখে ব্যবস্থা দিয়ে ভিজিটের টাকা পকেটে ফেলে ডাক্তার অমনি ঘোড়া ছুটিয়ে দেবেন—পাড়াগাঁয়ের সে নিয়ম নয়। ভিন্ন গ্রামে এসেছেন, না খাইয়ে ছাড়বেই না কিছুতে। আর যজ্ঞেশ্বরের বাড়ির খাওয়া—সর্বনেশে খাওয়া রে বাবা! পুরোপুরি শয্যাশ্রয়ী করে ছাড়েন এঁরা।

দিবানিদ্রার পরেও রওনা হতে দেরি হয়। ভবনাথ এসে পড়লেন--গাঁয়ের উপর এত বড় ডাক্তার তো ছাড়বেন কেন?—চলুন ডাক্তারবাবু, আমাদের মনুকে একটু দেখবেন।

দেখেশুনে দীননন্দন বললেন, জর না ঘোড়ার ডিম! বাতিক আপনাদের—ভাত বন্ধ করে সুস্থ ছেলে শুইয়ে রেখেছেন।

গ্রামের উপর এক বাড়ি থেকে ভিন্ন বাড়ি এক টাকা ফী। দীননন্দন টাকা নেবেন না: না মশায়, রোগ না পীড়ে না—ফী কিসের?

ভবনাথ বললেন, হয়েছিল জ্বর--সত্যি সত্যি হয়েছিল। ধনঞ্জয়ের রাঙাবড়ি আর পাঁচনে পালিয়ে গেছে।

তবু দীননন্দন অবিশ্বাসে ঘাড় নাড়লেন। বলেন, চাকরে ভাই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পাঠাচ্ছেন—কিসে খরচা করা যায়, ছোঁক-ছোঁক করে বেড়ান। তখন এমনি সব ফন্দি মাথায় আসে—নীরোগকে রোগী বানিয়ে দশ-বিশ টাকা খরচ করে ফেলা।

মিত্তিরবাড়ির ঘরজামাই অম্বিক দত্ত একপাল ছেলেপুলের বাপ। আবাদে গুরুগিরি করে, ছুটির মরশুম চলছে বলে গ্রামে আছে। দুটো টাকা হাওলাত নেবে বলে সকাল থেকে ভবনাথের পাছে পাছে ঘুরছে। অম্বিক টিপ্পনী কাটে : উল্টোটি দেখবেন আমাদের বাড়ি গিয়ে। আসে রোগ, যায় রোগ-- এটা জ্বরে ধুঁকছে, গাছ থেকে পড়ে ওটা খোঁড়া হয়ে আছে, সেটার পেট নামছে। হর ঘোষের গোয়াল—কে কার খবর রাখে। বউ ঐ অবস্থায় পুকুরে চুবিয়ে চুবিয়ে রান্নাঘরে ঠেলে দেয়। পচা পান্তা যা পায়, গব গব করে খেয়ে নিল। রোগ দেখে, কেউ কোন আমল দেয় না, ভারি অবহেলা—একবেলা আধবেলা থেকে আপনা-আপনি সরে পড়ে।

তিরিশে আশ্বিন জাতীয় রাখিবন্ধন ও অরন্ধন : নতুন পরব—আগে ছিল না, এই বছর কয়েক ধরে চলছে। পাঁজিতে পর্যন্ত উঠে গেছে। পুববাড়ি পুজোর মধ্যে সেই যে সেবার অঘটন ঘটল। তারপরেও পুজো আর দু-বার হয়ে গেছে। নিতান্তই নমো-নমো করে। ভবনাথ বলতেন, ধর্মকর্ম আমাদের বংশে সয় না, মা-দুর্গাকে আনতে গিয়ে আমার বুড়ি-মাকে হারালাম। না করে তবু উপায় নেই। দুর্গোৎসব একবার আরম্ভ করলে তিন বছরের কমে ছাড়া যায় না। রীতরক্ষে করে যেতে হল সেই কারণে।

কিন্তু দেবনাথ আসেন নি—পুজোর সময় বাড়ি আসা সেই থেকে ছেড়েছেন। পরের বছরেই অবশ্য আসতে হয়েছিল--সেটা বিজয়া-দশমী কেটে যাওয়ার পরেই। এসেছিলেন আসলে কুশডাঙায় দিদি মুক্তকেশীর বাড়াবাড়ি অসুখের খবর পেয়ে। ভাল হয়ে গেলেন মুক্তঠাকরুন। তখন একবারটি দেবনাথ সোনাখড়ি ঘুরে যাচ্ছে। রাখিবন্ধন পড়ে গেল সেই সময়। শহরে খুব হৈ-চৈ —গ্রামে, বিশেষ করে সোনাখড়িতে কী রকমটা এরা করে, দেখবেন।

গ্রামে এসে ইদানীং চুপচাপ থাকেন তিনি, গাঁয়ের আমোদে মচ্ছবে বড় একটা মেশেন না। কিন্তু রাখিবন্ধন হল আলাদা জিনিস। বলেন,

আমোদ নয়—আমাদের শোক। এবং সঙ্কল্প। মাতৃঅঙ্গ ছেদ করেছে—বঙ্গ দণ দুই টুকরো। সেই সর্বনাশ আমরা স্মরণ করি, মায়ের দুঃখ ঘোচানোর সঙ্কল্প নিই।

'একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি'—আহ্লাদ বৈরাগীর গান। কত্তাল বাজিয়ে মা বগলা আগে আগে যাচ্ছেন। ভাল করে ভোর হয় নি, মুখ-আঁধারি এখনো। গাইতে গাইতে মা-ছেলে সোনাখড়ি এসে উঠলেন।

বল্টু দলবল ডেকে বেড়াচ্ছে। মেলা কাজ আজকে, এই প্রত্যুষেই পুকুরে নেমে স্নান সেরে নিতে হবে। আহ্লাদকে বলল, একদিন আগে কেন ঠাকুর? কার্তিক মাস তো কাল পড়বে।

নিত্যি সকালের সে সব গান নয়। স্বদেশি গান, শোনেন ভাল করে—। বলে বৈরাগী গাইতে গাইতে চললেন: একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি—হাসি হাসি পরব ফাঁসি, দেখবে ভারতবাসী।

উত্তর-বাড়ির ফেক্সির মা শুনেই ধরে ফেলেছেন: ঠাকুর-দেবতার গান কই? এ তো ভিন্ন গান বৈরাগীঠাকুর।

আহ্লাদ বলেন, এঁরাও মা ঠাকুর-দেবতার চেয়ে কম যান না।

উদ্দেশে বৈরাগী যুক্তকরে নমস্কার করলে। মা বগলাও কত্তাল দুটো কপালে ঠেকালেন।

গান শুনে নতুনবাড়ির বিরজাবালার প্রাণে মোচড় দিয়ে ওঠে। দু চোখে জল। আপন মনে বলে উঠলেন, পোড়াকপালী মা! ঘুরে আসবে না আরো-কিছু! আসবে না—আসবে না আর ও-ছেলে।

পুঁটি আর কমল ভাই বোনে বাইরে-বাড়ি ছুটে এসে হুড়কো ধরে দাঁড়িয়েছে। আহ্লাদ বৈরাগী গাইছেন: অভিরামের দ্বীপান্তর মা ক্ষুদি-রামের ফাঁসি, বিদায় দাও মা ঘুরে আসি—

ভবনাথ আশশ্যাওড়ার দাঁতন ভেঙে নিয়ে আসছেন। পুঁটি শুধায়: অভিরাম ক্ষুদিরাম কারা জেঠামশায়?

সাহেবদের উপর ক্ষুদিরাম বোমা মেরেছিল, ভবনাথের জানা আছে। সাহেবরাও ছাড়নপাত্র নয়—চারিদিকে ধুন্দুমার লাগিয়েছে। এমন হয়েছে, তরঙ্গিণী কিম্বা অলকা-বউয়ের উদ্দেশে বউমা বলে ডাকতে অনেক সময় ভবনাথের ভয় লাগে—হতে পারে, ঘর-কানাচে টিকটিকি অলক্ষ্যে ওত পেতে আছে। 'বউমা' শুনতে সে 'বোমা' শুনে ফেলল। তারপরে আর দেখতে হবে না—হাতকড়া এঁটে টানতে টানতে নিয়ে চলল। হুবহু এই নাকি হয়েছে কোথায়, ভবনাথের একজন অন্তরঙ্গ বলেছে। বিপদ হয়েছে, দেবনাথ এই সবে

আস্কারা দেন। অথচ মুখ ফুটে কিছু বলবার জো নেই। যার কাছে বলতে যাবেন—অ্যাঁ, আপনার মুখে এই কথা! এর চেয়ে গেঁয়ো অসভ্য কথা যেন হয় না। অগত্যা নির্বাক থাকেন তিনি—মনে মনে ঘোরতর বিরক্ত।

দিদির দেখাদেখি একফোঁটা কমলও বলল, জেঠামশায়, ক্ষুদিরাম কে?

দেবনাথকে জিজ্ঞাসা করগে, যা বলবার সে বলবে—। বলে মুখ বেজার করে ভবনাথ রোয়াকে উঠে গেলেন।

এই ভবনাথেরই ভিতর বাড়িতে বন্দেমাতরম ধ্বনি। দিব্যি একটা দল বেরিয়ে আসে—দেবনাথ অগ্রবর্তী। টুকরো টুকরো হলদে সুতো, যার নাম রাখি, পুরানো হিতবাদী কাগজে জড়ানো। রাখির প্যাকেট দেবনাথ নিজে নিয়ে আসছেন। পিছু পিছু আসে হিরু অটল শিশুবর আর শরিকদের সিধু ও তাদের ভৃত্য নন্দ প্রধান। বংশীধর ঘোষের ছেলে সিধু অর্থাৎ সিদ্ধিনাথ এদের সঙ্গে এক দল হয়ে বেরুচ্ছে—সদর আদালতে যে বংশীধর ও ভবনাথে ফৌজদারি-দেওয়ানি দুই এক নম্বর লেগেই আছে সর্বদা। জন পাঁচ-সাত নিয়ে ঝন্টুও এসে গেছে নতুনপুকুরের ঘাটে। ভুচুত ভুচুত করে ডুব দিয়ে সব শুচি হয়ে উঠল। হিমচাঁদ-নারায়ণদাসের দল, পশ্চিমবাড়ির হারু-বলাই-অশ্বিনীর দল, উত্তর বাড়ির যজ্ঞেশ্বর-অক্ষয় জল্লাদ-পদার দলও এসে পড়ল। বাড়ি থেকে চানটান সেরে এসেছে তারা। জল্লাদের উপর নিশানের দায়িত্ব—সরু সরু কঞ্চির মাথায় রঙিন কাগজের উপর বড় বড় অক্ষরে বন্দেমাতরম্ লেখা। এ-ওর হাতে রাখি বেঁধে দিচ্ছে: বঙ্গভঙ্গ হলে কি হয়—মানুষ আমরা আরও বেশি করে ঐক্যবন্ধনে বাঁধা পড়ে যাচ্ছি, দেখ। তুমুল বন্দেমাতরম্ ধ্বনি—আকাশ ফেটে যায় বুঝি-বা! কোনো বাড়ি বুঝি আর মানুষ রইল না—পূব-বাড়ির পুকুরঘাটে সব ছুটেছে। শশধর দত্ত লাঠি ঠুক-ঠুক করতে করতে এসে বললেন, হয়ে গেল নাকি তোমাদের? আমার হাতে দাও একটা পরিয়ে।

সকলে মিলে-মিশে এখন একটা দল। হাতে হাতে নিশান তুলে ধরেছে, বাতাসে নিশান পত-পত করছে রং-বেরংয়ের পাখির পাখনা-উড্ডয়নের মতো। গ্রামপথ ধরে চলেছে। কোন রান্নাঘরে আজ উনুন জ্বলবে না। দুঃখের দিন বঙ্গভঙ্গ ভেঙে দিয়েছে এই দিনে। বন্দেমাতরম্ আর স্বদেশী গান—গানের পর গান। অশ্বিনী খোল বাজাচ্ছে—পাথরঘাটায় গাইয়ে মতিলাল এসে পড়েছেন, ধরতা দিচ্ছেন তিনি। 'ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে মাতঙ্গী মেতেছেন আজ সমররঙ্গে'। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।' 'ভেঙ্গে দাও কাচের চুড়ি বঙ্গনারী।' বিলাতি শাড়ি-ধুতি মেয়েরা সব বেঁধে রেখেছে—বিকালের সভায় পোড়ানোর জন্য পাঠাবে।

কাচের চুড়ি ভেঙে চুরমার—হাতে রয়েছে কেবল শাঁখা। বাড়ি ঢোকবার মুখে দেখে শুনে পা ফেলো হে—চুড়ির টুকরো পায়ে না বেঁধে।

সভা হাটখোলায়। কমল বায়না ধরল, সে ও যাবে। পুঁটি বাগড়া দিচ্ছে—যেহেতু নিজে সে যেতে পারবে না, মেয়েলোক কেউ যায় না। তরঙ্গিণীর কানে তুলে দিল—ভালমানুষ হয়ে বলে, মা, খোকন নাকি সভায় যাবে? তরঙ্গিণী এক-কথায় কেটে দিলেন: যাবে না আরো-কিছু! ছেলেপুলেরা যায় না। আমি আজ একলবোর গল্প বলব। সে দিন বলতে বলতে হল না—অতিথি এসে পড়ল, রান্নাঘরে ঢুকে গেলাম। গল্পটা আজ শেষ করব।

গল্পের উপর যত টানই থাকুক—সে জিনিস আজ আর নয়। সভায় যাওয়ার ঝোঁক চেপেছে। গুম হয়ে আছে কমল। হিরুর গলা পেয়ে তার কাছে ছুটে গেল। তাকে সুপারিশ ধরল।

হিরুও বসিয়ে দিল একেবারে। বলে, সভায় গিয়ে কি করবি তুই? বক্তৃতা হবে—উঠে দাঁড়িয়ে একনাগাড়ে বক-বক করবে। একজন থামল আর একজনে। একটা দুটো স্বদেশি গান—সকালে তো দেদার শুনেছিস।

হেনকালে দেবনাথ এসে পড়লেন: কি বলছেন কমলবাবু?

হিরু বলে, সভায় যেতে চাচ্ছে—

দেবনাথ গম্ভীর: যাবে। তার জন্য কি—

হিরু বলছে, গিয়ে শুধু বসে থাকে। কিছু তো বুঝবে না।

বড় হয়ে বুঝবে—অন্তত এটুকু বুঝবে, একরত্তি বয়সেও দেশের ডাকে গিয়েছিলোম। সে-ই তো অনেক।

হিরু মিন-মিন করে তবু একটু বলে, হাটখোলা অবধি পারবে যেতে?

দেবনাথ বললেন, হেঁটে যেতে পারবে না। দরকার কি? অটল যাবে, শিশুবর যাবে—ওরা কেউ নিয়ে যাবে কাঁধে করে। বলে দিচ্ছি।

মানুষজন ভালই আসছে। আগের হাটে ঢেঁড়ি দিয়েছিল। ঢোল আর কে আনতে যাচ্ছে—দোকান থেকে কেরোসিনের এক খালি-কেনেস্তারা চেয়ে নিল হারু মিত্তির, এদিক-ওদিক তাকাতে কেতু ঋষি নজরে পড়ে গেল কেতুর হাতে কেনেস্তারা দিয়ে হারু বলল, ঢেঁড়ি দাও। অর্থাৎ টিন বাজাও। হাটের ভিতর দিয়ে কেতু টিন বাজাতে বাজাতে চলল। লোকে জিজ্ঞাসা করে: কি ব্যাপার? হারু পিছন থেকে বলে যাচ্ছে, পরশুদিন তিরিশ তারিখে ঐ বটতলায় স্বদেশি-সভা—সভার শেষে বিলাতি নুন-কাপড় নষ্ট করা হবে, আসবেন সকলে।

পাইতক্কের যাবতীয় গাঁ-গ্রামে খবর গিয়ে পৌঁছেছে, দুপুর থেকে লোক আসতে লেগেছে।

কমল অটলের কাঁধে। বাড়ি থেকে বেরুনোর সময় একটি কথাও বলে নি সে—প্রথমভাগের গোপাল নামক বালকটির মতন সুশীল, সুবোধ। শক্ত অনেক বাড়িতে—কিছু বলতে গেলে যাওয়াটাই বা পণ্ড হয়ে যায়! বেশ খানিকটা চলে আসার পর কমল গোঁ ধরল, কাঁধে চড়ে সে যাবে না। হাট-খোলার কাছাকাছি তখন। দলে দলে মানুষ সভায় যাচ্ছে। পায়ে হেঁটে যাচ্ছে সবাই—শুধুমাত্র কমল কাঁধের উপর। আকুলি-বিকুলি করছে নেমে পড়বার জন্য। দেরি করলে হয়ত লাফিয়ে পড়বে—গতিক সেই রকম। বেটাছেলে হয়ে কাঁধে চেপেছে, রাস্তার লোক সব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে —ছি:!

ছেলে একফোঁটা, জেদ পাহাড়-প্রমাণ। নামাতে হল কাঁধে থেকে। গুটি-গুটি হাঁটছে কমল। অটল একখানা হাতে ধরেছে—পড়ে-টড়ে না যায়। তা-ও হবে না—হাত ছাড়ানোর জন্য ঝুলোঝুলি। রেগেমেগে অটল বলল, ভারি পা হয়েছে তোমার! অমন করো তো জোর করে কাঁধে তুলব, কাঁধে করে বাড়ি ফেরত নিয়ে যাব।

ধমক খেয়ে কমল চুপ। সভায় ভিড় খুব--ফুলবেড়ে কোণাখোলা পাথরঘাটা গড়ভাঙা থেকেও এসেছে। একখানা মাত্র চেয়ার সভাপতির জন্য—হাতেম আলি ফকিরকে সেখানে বসানো হয়েছে। অন্য সকলে ভুঁয়ের উপর। চেয়ারের পাশে গাদা-করা নুন ও কাপড়। সভা অন্তে বিলাতি কাপড়ে আগুন দেবে, বিলাতি নুন অদূরবর্তী পুকুরের জলে ফেলবে। বক্তৃতার জন্য ঠিক করা হয়েছে সোনাখড়ি থেকে দেবনাথ ও সকল নাটের গুরুমশায় হারু মিত্তিরকে। মাদার ঘোষ আসতে পারেন নি—সদরেও এই মচ্ছব, সেখানে আটকে ফেলেছে। থাকলে তিনিও নিশ্চয় বলতেন। ফুলবেড়ে ইত্যাদি গ্রাম থেকে একজন করে বাছাই হয়েছে। তাই তো অনেক হয়ে গেল।

হিমচাঁদ কী কাজে গড়ভাঙায় গিয়ে পড়েছিলেন। ছুটতে ছুটতে এলেন, সভার কাজ তখন আধাআধি সারা। এসে অক্ষয়কে চুপিচুপি বললেন, গঞ্জ থেকে ছোট দারোগা রমজান খাঁর বাড়ির চুরির তদারকে এসেছে। অক্ষয়ের কানে ফিসফিসিয়ে বলা আর হাটে-বাজারে জয়ঢাক পিটিয়ে বলা—উভয়ের ফল একই প্রকার। ঐ জনারণ্যের মধ্যে খবর জানতে কারো বাকি রইল না। চুরি হয়ে গেছে চারদিন আগে, থানার টনক এদ্দিনে নড়ল। বেছে বেছে আজকেই বা কেন—হাটখোলায় স্বদেশি-সভা যে তারিখটায়?

এমনি সন্দেহ হিমচাঁদের মনেও উঠেছিল। নিজের কাজ সেরে তিনি রমজানের বাড়ি চলে গেলেন যদি কোন পাকা হদিশ মিলে যায়। সেখানে এক আচ্ছা মজা জমে উঠল—ছেড়ে আসা সহজ নয়। সভায় পৌঁছুতে সেই জন্য দেরি।

তদারক সারা করে ছোট-দারোগা এবারে রওনা দেবে। গঞ্জ থেকে পালকি করে এসেছে। বলে, চলে যাবো এবারে মিঞাসাব—পালকি-ভাড়ার ব্যবস্থা করো।

রমজান রগচটা মানুষ, দেশশুদ্ধ সবাই জানে। তার উপরে সর্বস্ব চুরি হয়ে গিয়ে মেজাজ সুনিশ্চিত তিরিক্ষি। জমবে এইবারে—হিমচাঁদ নড়েচড়ে খাড়া হয়ে বসলেন।

কিন্তু বিপরীত। রমজান সাতিশয় শিষ্ট। সবিনয় বলল, হচ্ছে ব্যবস্থা। একটুখানি সবুর করতে হবে হুজুর।

দলিজঘরের দাওয়ায় সকলে জমিয়ে বসেছে। ভুড়ুক-ভুড়ুক করে দারোগা হুঁকো টানছে, চপর-চপর করে পান চিবোচ্ছে। গোয়াল থেকে গরু খুলে নিয়ে রমজান চলল।

কোথায় চললে হে? দারোগা বলে, এদিককার মিটিয়ে-মাটিয়ে তারপরে যেও।

রমজান বলল, গরু নিয়ে সেই জন্যে তো যাচ্ছি। দুধাল একটা গরু কিনবেন, আখেজ-ভাই বলছিলেন—

এমন গরুটা বেচে দেবে? —হিমচাঁদ জিজ্ঞাসা করলেন।

না বেচে উপায় কি? চোরে সর্বস্ব নিয়ে গেছে। ভাঙা-থালাখানা ফুটো-ঘটিটা অবধি রেখে যায়নি। কলার-পাতা কেটে ভাত খাচ্ছি। চুরির পরদিন ভোরবেলা থানায় এজাহার দিয়ে এসেছি। এদ্দিনের পর তো এলেন—এসে পালকি-ভাড়া চাচ্ছেন। গরু না বেচে দাবি কেমন করে মেটাই?

হিমচাঁদ বললেন, এর পরে কি হল সঠিক বলতে পারব না। হাসি সামলাতে পারছিনে—আর দেরি করলে ফটাস করে দম ফেটে ওখানেই পড়ে যেতাম। রাস্তায় এসে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রাণ খুলে হেসে নিলাম। তার পরে ছুটতে ছুটতে এসেছি।

খবর এলো, গড়ভাঙা থেকে দারোগা বেরিয়ে পড়েছে। পালকি এই হাটখোলার দিকেই আসছে। দক্ষযজ্ঞ অতএব আসন্ন। সরছে মানুষ পাঁচটা দশটা করে, ভিড় পাতলা হচ্ছে। পালকি সত্যি সত্যি দেখা গেল, পালকির এপাশে-ওপাশে বন্দুক হাতে কনস্টেবল। সভার অদূরে থেমে গেল পালকি—

ছুঁয়ে নামে নি, বেহারার কাঁধের উপর আছে। লোকে দুড়দাড় পালাচ্ছে ; দরজার ফাঁকে ঘাড় লম্বা করে দারোগা তাকিয়ে দেখল। গণ্ডগোল কিছু নয়—আবার চলল পালকি।

রাত পোহাবার আগে থেকেই যেন বান ডেকেছিল। মানুষের বন্যা—তরঙ্গের পর তরঙ্গ। সন্ধ্যায় সব শান্ত—প্রবল জোয়ার শেষ হয়ে গিয়ে ঝিরি-ঝিরি ভাঁটা নেমে যাবার মতন। সভার শেষে ক্লান্ত দেবনাথ দক্ষিণের দাওয়ায় তাকিয়া ঠেশ দিয়ে গড়াচ্ছেন। কমলকে ডাকলেন, সে এসে বসল। বললেন, আমার বক্তৃতার সময় এক-নজরে কমলবাবু মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন—আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। কতই তো বললাম—বুঝেছ কিছু?

বুঝেছে কমল ঘোড়ার-ডিম—ভারী ভারী কথা বোঝার বয়স কি এখন? সপ্রতিভভাবে তবু ঘাড় নেড়ে টানা-সুরে বলে দিল, হ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ—

দেবনাথও নাছোড়বান্দা : কী বুঝেছ, বলো একটু শুনি।

একটু-আধটু তখনও কমলের মনে ছিল—বিশেষ করে ক্ষুদিরামের কথা-গুলো। মুখস্থর মতো গড়গড় করে সে বলে গেল।

ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে দেবনাথ উঠে বসলেন। গল্পে পেয়ে বসল তাঁকে—ক্ষুদিরাম-প্রফুল্লচাকি কানাই-সত্যেন যত স্বদেশি ছেলের গল্প। 'আমার বেত মেরে কি মা ভোলাবি'—সভায় যে গান হয়েছিল, তারও মানে বোঝালেন। ইংরেজ বেত মারছে 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ করলে—যে কথার মানে হল 'মাকে বন্দনা করি'। মা বলতে বঙ্গমাতা—যাঁকে খণ্ডবিখণ্ড করেছে ওরা। ভয় মানে না আমাদের ছেলেরা—হাসতে হাসতে তারা জেলে যাচ্ছে, ফাঁসিতে যাচ্ছে···

কারা ইংরেজ, কমল সঠিক জানে না। কে যেন বলেছিল, ধবধবে ফর্সা তারা—দেখতে ভারি সুন্দর। তা চেহারা যত সুন্দরই হোক, মানুষ তারা ভাল নয়। কাজকর্ম শুনে কমলের ঘেন্না হয়ে হয়ে গেল। হঠাৎ কমলকে টেনে দেবনাথ বুকের ভিতর নিলেন। কণ্ঠস্বর আর এক রকম। বললেন, ঐ ছেলে-দের মতন হয়ে তুমিও জেলে যেও কমল, দরকারে ফাঁসিতে যেও। আমি যদি বেঁচে না থাকি, যেখানেই থাকি তোমায় আশীর্বাদ করব।

পরবর্তীকালে, বাবার স্মৃতি কুয়াশাচ্ছন্ন, বাবার চেহারাটা অবধি কমল মনে আনতে পারে না—কিন্তু এই দিনটা হঠাৎ কখনো কুয়াশা ভেঙে দপ করে জ্বলে ওঠে। বাবার এই কোলের মধ্যে নিবিড় করে টেনে-নেওয়া। দেবতার

প্রত্যাদেশের মতন বাবার এই আশ্চর্য কণ্ঠধ্বনি। মৃত্যুর পরে পাবে আবার বাবাকে—তখন আচ্ছা রকম ধমক দেবেন মনে হয়: শুধুমাত্র মুখের বুকনি আর কাগজের কলমবাজিতে দায়িত্ব সেরে এলি রে খোকন, গায়ে একটা আঁচড় তো দেখতে পাচ্ছিনে—ছি-ছি।

॥ একুশ ॥

কামাররা বুঝি ঘুমোয় না। ঠনঠন ঠনাঠন আওয়াজ আসে। শুনতে শুনতে কমল ঘুমিয়ে যায়। ভোররাত্রে আবার সে জাগে, তরঙ্গিণী তখন বাইরে নিয়ে যান একবার। চারিদিকে ফরসা-ফরসা ভাব. গাছে গাছে পাখি ডেকে উঠছে দিনমান ভেবে। নুলেবাছুরদের গলা শুকিয়েছে ডাকছে গোয়ালের ভিতর। এ-বাড়ির ও-বাড়ির ছেলেপুলে কেঁদে কেঁদে উঠছে। তখনও কামার বাড়ি থেকে লোহা পেটানোর আওয়াজ।

ওরা ঘুমোয় না, মা?

তরঙ্গিণী বলেন, একটুখানি চোখ বুজে নেয় এক ফাঁকে। ঘুমুতে দিলে তো! গাছমরশুমের মরশুম—খেজুরগাছ কেটে রস বের করবে সেজন্য দা গড়ানোর হিড়িক লেগে গেছে।

ভট্টচাজ-বাড়ি ছাড়িয়ে সামান্য ঘুরে কামারশালা। ঘিঞ্জি বসতি—একই উঠান নিয়ে দু-তিন ঘর গৃহস্থ। এর হয়তো পশ্চিম-পোতার ঘর, ওর উত্তর-পোতা আর-একজনের পুবের-পোতা। কামারশালাগুলো পাড়ার বাইরে বাঁশবনের ছায়ায় রাস্তার এদিকে আর ওদিকে। কমল একদিন কোথায় যেন যাচ্ছিল—হাপর চালিয়ে কামারশালায় তখন পুরোদমে কাজ চলেছে। দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। হিরু ছিল সঙ্গে, সে হাঁক পেড়ে উঠল: হাঁ করে কি দেখিস? আয়, চলে আয়।

দেখারই বস্তু—সারাদিন ঠায় দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছা করে। কিন্তু হিরুর তাড়ায় লহমার বেশি দাঁড়াতে পারে নি।

গাছ-কাটা দা গড়ে কূল পাচ্ছে না—তার উপরে আবার ধান কাটা লেগে গেছে, কাস্তে গড়ার ফরমাস। সাধ্যে কুলোয় না—কামারের দোষ কি? খদ্দেরের কাছে পালিয়ে বেড়ায়—'আজ দেবো' 'কাল দেবো' বলে ভাঁওতা মারে।

প্রহরখানেক রাতে ভবনাথ হাটখোলা থেকে হাট করে ফিরছেন। ধামা ঘাড়ে অটল মাহিন্দার পিছনে। সেথা কর্মকারের সঙ্গে দেখা। গুল্লাটের

মানুষের হাটঘাট সারা, হাট ভাঙো-ভাঙো—মেঘা সেই সময় ধামা-খালুই নিয়ে চলেছে।

ভবনাথ বললেন, এখন যাচ্ছ মেঘনাদ—হ'টে কি আর আছে কিছু? মাছের মধ্যে ঘুসোচিংড়ি, তরকারির মধ্যে শাকের ডাঁটা।

মেঘা বলল, খাটনির গুঁতোয় ফুরসত করতে পারিনে বড়কর্তা। তা-ও তো লোকের গালমন্দ খেয়ে মরি।

মরশুমের মুখে এখন হয়তো কথাটা খুবই সত্যি। কিন্তু কর্মকারপাড়ায় বারমেসে নিয়ম এই। বিশেষ করে মেঘার। হাট ভাঙে-ভাঙো অবস্থায় জিনিসপত্র কিছু সস্তায় মেলে। ক্রেতেল পারতপক্ষে ফেরত নিয়ে যেতে চায় না, লোকসান করেও দিয়ে যায়। মেঘা কর্মকার সেই সস্তাগণ্ডার খদ্দের।

মুখোমুখি পেয়ে গেছেন তো ভবনাথই বা ছাড়বেন কেন! সেই কবে থেকে একজোড়া কাস্তের কথা বলছেন—গড়ে দেবে কি ধান-কাটা কাবার হয়ে যাবার পর? বললেন, গালমন্দ লোকে এমনি-এমনি দেয় না। এই সামান্য কাস্তে দুটোর জন্য কত আর ঘোরাবি বল্ দিকি?

মেঘার তুড়ুক-জবাব: সে তো কবে হয়ে আছে।

পিছন থেকে অটল বলল, হয়ে আছে—তা একটু বলে পাঠাতে পারো নি? সকালে কাল গিয়ে নিয়ে আসব।

মেঘা বলে, কাল নয়। ধার কেটে উকো ঘসে দেবো—কালকের দিনটা বাদ দিয়ে পরশু যেও—

বলে আর মুহূর্তমাত্র দাঁড়ায় না, হন হন করে পলক দৃষ্টির বাইরে চলে যায়।

অটল বলল, বেটা কিচ্ছু করে নি। ভাব দেখলেন না? গড়েই নি এখন তক। নেহাৎপক্ষে দশ বার এর মধ্যে তাগিদ হয়ে গেছে।

ভবনাথ বললেন, তাগিদ দিয়ে লাভ নেই—সামনে বসে কাজ ধরাতে হবে। তোকে দিয়ে হবে না—নিজে আমি কাল চলে যাবো। 'ধোপার বাসি, কামারের আসি'—বলে না?—ওটা জাতের ধর্ম।

ধোপার বাড়ি বাসি কাচাতে দিলে সে কাপড় কবে পাবে, ঠিকঠিকানা নেই। তেমনি কামারও যদি 'আসি' বলে একবার সরে পড়তে পেরেছে, আর নিশানা পাবে না। ছড়াটা সেইজন্য চলিত হয়েছে।

সকালে উঠে ভবনাথ কাজকর্মের বিলিব্যবস্থা করছেন। শিশুবর সাগর-বড়কাটি পাঁচু সর্দারের বাড়ি চলে যাবে—নিজেদের ধানই কাটছে তারা, বর্গা-জমি বলে নাজিরবন্দে আজও কাস্তে ছোঁয়াল না। ঠিকরি-কলাই পেকে

গেছে বস্তির-ভুঁইয়ে—গিয়ে অটল তুলতে বসে যাক। আর তিনি নিজে চললেন কামারবাড়ি—

কামারবাড়ির নাম কানে যেতে কমল বায়না ধরল: আমি যাবো জেঠামশাই, আমি যাবো—

তুই যাবি কেন রে?

ঠং-ঠন ঠনাঠন লোহা পেটানো তখনই শুরু হয়ে গেছে। নাচন দিল কমল কয়েক বার: যাবো—

অন্যেরা ভবনাথের বড়-একটা কাছ ঘেঁষে না—একটুতে একটু হলেই খিঁচুনি দিয়ে ওঠেন তিনি। সে বড় বিষম জিনিস—হাতে মারা খিঁচুনির চেয়ে অনেক ভালো। সেই মানুষ কমলের বাবদ একেবারে ভোলা-মহেশ্বর। 'হবে না' 'হবে না' করে এই ছেলে, কনিষ্ঠ দেবনাথের একমাত্র বংশধর। আদর দিয়ে দিয়ে তাই তিনি মাথায় তুলেছেন, লোকে বলে। শিশুর বেশি জোরজুলুম জেঠামশায়ের কাছে। যাবো—করতে করতে চোখ বড় বড় করে দীর্ঘ টানা-সুরে সে বলে উঠল, আমি যাবো-ও-ও—

হুঁ—বলে ভবনাথ চাদরটা কাঁধে তুলে নিলেন।

চলল কমল তবে তো! পুঁটির ভাল লাগে না—বাগড়া দিয়ে এসে পড়ে: তোর পাঠশালা আছে না কমল?

কমল বলে, মাস্টারমশায় কাল বাড়ি গেলেন না—আজ পাঠশালা দেরিতে বসবে।

ভবনাথ নিজেই অমনি সমাধান করে দিলেন: আসবার সময় মধুকে আমি নতুনবাড়ি বসিয়ে দিয়ে আসব। পুঁটি তুই পাতা-দোয়াত বইপত্তর পৌঁছে দিয়ে আয়।

যাচ্ছেন ভবনাথ—কমল তাঁর আগে আগে। পুঁটির পানে হাসিমুখে তাকিয়ে পড়ল সে যেন—পুঁটির অন্তত মনে হল তাই। ছোট ভাই হয়ে দিদিকে দেমাক দেখাচ্ছে। গজর-গজর করে: উনি চললেন কামারবাড়ি, আমার পাঠশালায় বই-খাতা বয়ে নিতে হবে—

বলছে খুবই মনেমনে—জেঠামশায়ের কথার উপরে কথা শব্দ করে বলা যায় না!

কামারশালা চারটে—পথের এধারে-ওধারে সামান্য দূরে দূরে। প্রথমেই মেঘা কর্মকার। দোচালা ঘরে মানুষে মানুষে ছয়লাপ। খদ্দেরই বেশি, বাজে লোকও জমেছে কিছু। চাচতলায় বাখারির বেঞ্চি বানানো, সারবন্দি সেখানে বসেছে। আবার চালের নিচে ঘরের মধ্যেও বসেছে—কেউ চাটকোলে, কেউ বা তক্তার টুকরো-টাকরা টেনে নিয়ে। দাঁড়িয়ে আছে কতক কতক।

ভবনাথ গিয়ে বসলেন, কই, দেখি আমার কাস্তে। ধার-কাটা শুধুমাত্তোর বাকি—বের করো দেখব।

ঘাড় তুলে দেখে মেঘা তটস্থ হল : আসেন বড়কর্তা, বসেন—

মুরুব্বি লোকদের জন্য জলচৌকি আছে একটা। কারা বসেছিল, ভবনাথকে দেখে শশব্যস্তে উঠে হাত দিয়ে চৌকিটা ছেড়ে দিল। ভবনাথ বসলেন।

পাশের জায়গা দেখিয়ে কমলকে মেঘা বলে, বোসো খোকা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

বসবে কি—কমলের চোখের মণি তো ঠিকরে বেরুনোর গতিক। কী কাণ্ড রে বাবা! হিমাংশুর সঙ্গে যেতে যেতে রাস্তা থেকে সেই পলক মাত্র দেখেছিল—আজ সামনের উপর একেবারে হাত পাঁচ-সাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছে। দু-চোখ ভরে দেখছে। হাপরের দড়ি মেঘা পা দিয়ে টানছে—ফোঁস-ফোঁস করছে হাপর কেউটেসাপের মতন, টানে টানে কাঠ-কয়লার আগুন দপদপ করে উঠছে। লোহা সেই আগুনের মধ্যে—জ্বলেপুড়ে লোহা রক্তবরণ ধরেছে। সাঁড়াশি দিয়ে লোহাখানা নেহাই-এর উপর নিয়ে কর্মকার হাতুড়ি ঠুকছে। সেটা ছোট হাতুড়ি। আর দশাসই এক মদ্দ—মেটে-মেটে রং, হাপরের আগুন ও লোহার জলন্ত আভা গায়ের উপর ঠিকরে পড়ে দৈত্যের মতন দেখাচ্ছে তাকে—দাঁড়িয়ে পড়ে সেই লোক দুহাতে প্রকাণ্ড হাতুড়ির ঘা মারছে লোহার উপর। মেঘা কর্মকার প্রয়োজন মতো সাঁড়াশি দিয়ে এদিকে সেদিকে ঘোরাচ্ছে গনগনে লাল লোহা। নিজে ঠুকঠাক করে মারছে—আর বড়হাতুড়ি ঠনঠন ঠনঠন অবিরত এসে পড়ছে। দা কি কাস্তে কুড়ুল—পিণ্ড থেকে দেখতে দেখতে জিনিসের আদল এসে যায়। নেহাই-এর পাশটিতে মেজেয় নাদা পোঁতা, নাদার মধ্যে জল। খেজুরডাঁটার গোড়ার দিকটা পিটিয়ে ফেস্টো-ফেস্টো করে জলে ডোবানো—সেই বস্তু মেঘা ঘন ঘন তুলে জল ছিটিয়ে দেয় গরম লোহার উপর। আবার হাপরের আগুনে ঢোকায়, তুলে এনে আবার পেটায়। জোড়া হাতুড়ির ঘায়ে ফুলকি ছিটকে পড়ছে চারিদিকে তারাবাজির মতো। শঙ্কিত কমল তিড়িং করে লাফ দিয়ে সরে যায়।

মেঘা হেসে বলল, পালাও কেন খোকা? তোমা অবধি যাবে না। আর গেলেই বা কি—ওতে পোড়ে না, পড়তে না পড়তে নিভে যায়।

হাপরে কাঠকয়লার আগুন—কলকে এগিয়ে ধরলে মেঘা সাঁড়াশি দিয়ে তার উপরে আগুন তুলে দিচ্ছে। হাতে হাতে কলকে চলে। আর নানান গল্পগাছা—পাঁচখানা গাঁয়ের সুখ দুঃখ অনাচার-অবিচার রং-তামাসা ফষ্টিনষ্টি শোন এই কামারদোকানগুলোয় বসে।

একখানা কাচকাটা-দা গড়ানোর দরকারে কুঞ্জ ঢালি অনেকক্ষণ থেকে বসে আছে। কমলকে পেলেই ঠাট্টা-বটকেরা করে সে, আবার খেতেও দেয় রস-পাটালি ফলপাকড়—চাষার বাড়িতে যখনকার যে জিনিস। কমলকে সে শুধায়: এত সমস্ত সরঞ্জাম দেখছ—বলো দিকিন খোকা, কোন্ জিনিস বিনে কামারের দোকান একেবারে কানা? তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ ভাল করে, দেখে তারপর জবাব দাও।

আরও বিশদ করে বুঝিয়ে বলে, মেধো কর্মকার আমায় আজ চার মাস ঘোরাচ্ছে। রেগেমেগে খরো আজ মতলব করে এসেছি, দোকানের এমন এক জিনিস নিয়ে দৌড় দেবো যাতে তার কাজকর্ম বন্ধ হবে, কর্মকার বেকায়দায় পড়ে যাবে। কোন সে জিনিস?

ছোট্ট মানুষ কমলকে উদ্দেশ্য করে বলা—উপস্থিত সকলের সবগুলো চোখ তাকিয়ে পড়ে জবাব খুঁজছে। কিন্তু জবাব চায় নি কুঞ্জ ঢালি—গল্প ফাঁদছে তারই এটা ভূমিকা। কামার বায়না নিয়ে বসে আছে—জিনিস গড়ে দেয় না, বায়নার টাকাও ফেরত দেয় না। মানুষটা বুদ্ধিতে রীতিমত খাটো কর্মকারকে জব্দ করবে মতলব নিয়ে আজ কামারশালে এসে বসেছে। দু পাঁচটা ঘা মেরেই হাতুড়ি রেখে খেজুর-ডাঁটা দিয়ে জল ছিটায়—বিস্তর ক্ষণ থেকে ঠাহর করছে সে। কামারের কাছে খেজুর-ডাঁটাই অতএব সবচেয়ে দরকারি- তড়াক করে উঠে সেই খেজুর-ডাঁটা তুলে নিয়ে একলাফে পথের উপর পড়ে দৌড়।

'কী করো' 'কী করো'—হাসি চেপে কর্মকার চেঁচাচ্ছে। বোকা মানুষটা বলে, আমার বাড়ি এসে বায়নার টাকা কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিয়ে দিলে তবে জিনিস ফেরত পাবে। ছুটে বেরিয়ে গেল সে। কর্মকার তো হেসেই কূল পায় না। খেজুর-ডাঁটার অভাব কি—চাঁচ দেবার পর গাদা গাদা তলায় পড়ে থাকে—একটা কুড়িয়ে আনল তখনই।

কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকায় রোগা মানুষটি, বগলে পুঁটলি গায়ে ফতুয়া হাঁটু অবধি কাপড় তোলা, বিল পাড়ি দিয়ে কামারদের সর্ষে ক্ষেতে এসে উঠলেন। পর ক্ষণে অদৃশ্য। হাত-পা ধুতে ডোবার ঘাটে নেমেছেন। ফটিক মোড়ল নজরে চিনেছে। বলে, গুরুঠাকুর মশাই—

ভবনাথ বললেন, বিল শুকিয়ে উঠল—পায়ের ধুলো একবার হরহামেশা পড়বে।

হরিসেবক ভট্টাচার্য, নিবাস পাড়ালা-ঘুঘুদহ—সোনাখড়ির সাত-আট ক্রোশ দূরবর্তী, বড় বড় কয়েকটা বিল মাঝে পড়ে। সেইজন্য বর্ষা পড়লে গুরুঠাকুরের

সোনাখড়ি পোস্টপিস নেই—চিঠিপত্র রাজীবপুর পোস্টাপিসে আসে। বিষ্যুৎবার আজ। পিওন যাদব বাঁড়ুয্যে চিঠি বিলি করতে এসেছেন। রবিবার আর বিষ্যুৎবার হপ্তার এই দুটো দিন আসেন তিনি সোনাখড়িতে। তাঁর ধরণ-ধারণ হরিসেবকের একেবারে বিপরীত। ভোজনবিলাসী মানুষ—রাঁধাবাড়ার কাজে অতিশয় উৎসাহী। রাঁধেনও চমৎকার—খেয়ে মুখ ফেরে না। দত্তবাড়ি গিয়ে সর্বাগ্রে চিঠিপত্র যা দেবার দিলেন। তারপর খবরাখবর নিচ্ছেন, দুধ হয় ঘরে কেমন, তরিতরকারি কি মজুত আছে, মাছের ব্যবস্থা হতে পারবে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। শশধর দত্ত পুলকিত। বাড়িতে ব্রাহ্মণের পাত পড়বে সে জন্যে তো বটেই, তা ছাড়া রাঁধাবাড়া পিওনঠাকুর শুধু নিজের মতন করেন না—সবাইকে খাইয়ে তাঁর আনন্দ, বাড়িসুদ্ধ সবাই প্রসাদ পেতে পারবে। খাওয়াটা উপাদেয় হবে।

দত্তগিন্নি বলেন, বেলা তো বেশ হয়েছে। স্নান-আহ্নিক সেরে জলটল মুখে দিয়ে লেগে যান, উনুনে ধরিয়ে দিচ্ছি আমি।

কিন্তু উপকরণ তেমন জুতের নয়, পিওনঠাকুর দ্বিধান্বিত। বললেন, বোসো মা। পাড়ার কিছু চিঠি আছে, সেইগুলো সেরে আসি। তার পরে।

নাছোড়বান্দা গিন্নি বললেন, সিধেপত্তোর গোছাচ্ছি আমি কিন্তু।

তাড়া কিসের? ফিরে আসি আমি, তখন।

এই মক্কেল একেবারে বাতিল করে যেতে চান না—অন্য বাড়ির অবস্থা চেয়েও যদি খারাপ হয়?

নতুনবাড়ি ঢুকলেন। হ্যাঁ, সার্থক হল এ বাড়ির চিঠি বিলি করা। বড় রুই ও শোলমাছ জিয়ানো আছে, গাজর, বাজারে নতুন গোলআলু উঠেছে—তা-ও নিয়ে এসেছে কাল। নলেন-পাটালি আর গোবিন্দভোগ চাল আছে—দিব্যি পায়েস হতে পারবে। তার উপরে মাদার ঘোষ বাড়ি এসেছেন, পুকুরে মাছ গিজগিজ করছে—তাঁর প্রস্তাব: পাশখেওলা ফেলে এক্ষুনি একটা কাতলামাছ তুলে দিচ্ছে, কৃপা করে একখানা মুড়িঘন্টের তরকারি পাক করতে হবে।

এর উপরে কথা কি! কাঁধের চিঠির ব্যাগ নামিয়ে পিওনঠাকুর আসন নিলেন। পাড়া-বেড়ানি পুঁটি এসে দাঁড়াল—তাদের বাড়ির চিঠি থাকে তো নিয়ে যাবে। পিওনঠাকুর বললেন, দত্তবাড়ি খবরটা দিয়ে যাস তো মা। মাদার ছাড়ছেন না, পাকশাক এইখানে করতে হচ্ছে।

পুববাড়ি এদিকে হরিসেবকের স্নানাদি সারা। রোয়াকের উপর আহ্নিকে বসেছেন। রান্নাঘরের দাওয়ায় ভাত ফুটছে টগবগ করে—দেখা যাচ্ছে রোয়াক থেকে। নাক টিপে বিড়বিড় করে মন্তোর পড়তে পড়তে গুরুঠাকুর আঙুলের

ইসারায় বিনোকে উনুনের জাল ঠেলে দিতে বললেন। এমনি সময় পুঁটি ফিরে এসে অলকা-বউকে বলছে, চিঠি নেই—জিজ্ঞাসা করে এসেছি। থাকলে উনি নিজেই তো দিয়ে যেতেন।

তারপর কলকল করে বলছে, রান্নায় বসেছেন পিওনজেঠা। মাদারকাকা পুকুরে জাল ফেলাচ্ছেন। মস্তবড় এক মাছ দড়াম করে উঠোনে এনে ফেলল—

হরিসেবক উৎকর্ণ। সোনাখড়িতে কত কালের আসা-যাওয়া—পিওন-ঠাকুরকে জানেন তিনি, খুব জানেন। রান্নাও তাঁর কতবার খেয়েছেন। আহ্নিক সম্ভবত সারা হয়ে গেছে, তড়াক করে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। উমাসুন্দরীকে ডেকে বলেন, কেষ্টর মা শোন। মাদার এসেছেন, অনেকবার উনি খাবার কথা বলেন। আমি নতুনবাড়ি চললাম। ঐ ভাত নামিয়ে তোমরা রান্নাঘরে নিয়ে যাও। রাতের বেলা তোমাদের এখানে খাব। শোবও এই বাড়ি।

বাইরে-বাড়ি দোচালা বাংলাঘরে তক্তপোশের উপর গুরুঠাকুর মশায়ের বিছানা। অটল নিচে মাদুর পেতে পড়েছে।

রাতদুপুরে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড—অটল চেঁচামেচি করছে, কাঁদছে। ঘুম ভেঙে ভবনাথ ছুটলেন। হিরুও বাপের পিছু পিছু।

কি রে অটলা, কাঁদিস কেন? কি হয়েছে?

অটল ঘরের বাইরে এলো: ঠাকুরমশায় মেরেছেন।

হরিসেবকও বেরুলেন। আকাশ থেকে পড়লেন তিনি: সে কী কথা! দোষঘাট করিস নি, আমি কেন মারতে যাব মিছামিছি?

অটল গরম হয়ে বলে, মারেন নি লাথি? ঠাকুর-মানুষ হয়ে মিছেকথা বলছেন। পৈতে ছুঁয়ে বলুন তবে।

হাল আমলের ছোঁড়া হিরু—গুরু-পুরুত গো ব্রাহ্মণ সম্পর্কে এরা তেমন ভক্তিমান নয়। অটলের পক্ষ নিয়ে সে বলে, সারাদিন খেটেখুটে বেহুশ হয়ে ঘুমুচ্ছিল। রাতদুপুরে উঠে আপনার নামে মিথ্যে বানিয়ে বলছে, তাই বলতে চান?

হরিসেবক আমতা-আমতা করে বলেন, মিথ্যেটা ইচ্ছে করে না বলুক, পাকেচক্রে তাই তো হয়ে দাঁড়াচ্ছে বাবা। পা লেগেছে ওর গায়ে—সেটা মিথ্যে নয়। তা বলে লাথি মারি নি। বিনি দোষে লাথি কেন মারতে যাব?

তবে?

রাতে দু-তিন বার আমায় উঠতে হয়। অন্ধকারে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে

আছে—পা বেধে বুড়োমানুষ আছাড় খেয়ে মরব? ঠিক কোন খানটায় খুঁজে দেখছিলাম, লেগে গেল দৈবাৎ।

হিরন্ময় জেরা করছে: খোঁজার কথা তো হাত দিয়ে।

আমি পা দিয়ে খুঁজেছি। সেটা ওরই মঙ্গলের জন্য।

কৌতূহলী হয়ে ভবনাথ বলেন, কি রকম—কি রকম?

হরিসেবক বলেন, হাতে খুঁজতে গিয়ে অন্ধকারে যদি দৈবাৎ হাত ওর পায়ে গিয়ে লাগত? ব্রাহ্মণের অঙ্গে শূদ্রের পা পড়া—কি সর্বনাশ হত, ভাবো দিকি। সে পাতকের কঠিন প্রায়শ্চিত্ত। পাতক বাঁচাতে গিয়েই এই গণ্ডগোল। আমার পা-দিয়ে খোঁজা ও ভেবে নিয়েছে পায়ের লাথি।

অটলের কান্না একেবারে বন্ধ হয় নি তখনো। ফোঁপাচ্ছে। ভবনাথ বুঝিয়ে বলেন, শুনলি তো সব। মারেন নি—পা এমনি লেগে গেছে। দোষ-ঘাট করিস নি, লাথি কি জন্যে মারতে যাবেন?

বিরক্ত হয়ে ভেড়ে উঠলেন: গায়ে পা ছুঁয়েছে কি না-ছুঁয়েছে—ব্যথা কি এখনো লেগে আছে? ভারি কুলীন হয়েছিল, উঁ—টনটনে অপমানবোধ।

কান্নার কারণ অপমান নয়—হাত ঘুরিয়ে অটল পিঠের দিকে দেখিয়ে দিল। ফোঁড়া হয়েছে, ক'দিন থেকে বলছিল বটে। পায়ের ঘা লেগে ফোড়া ফেটে গেছে, টাটাচ্ছে খুব।

বেশ তো, ভালই তো! হরিসেবক এবারে বলার জুত পেয়ে গেলেন: ফেটে গিয়ে তো ভালই হয়েছে রে। ফোড়া হারে-মুক্তোর অলঙ্কার নয় যে গায়ে পরে থেকে শোভা বাড়াবি, দায়ে-বেদায়ে বন্ধক দিবি, বিক্রি করবি। ডাক্তার-বদ্যি লাগল না, এমনি এমনি ফোড়া ফাটিয়ে আমি তো উপকারই করেছি তোর।

॥ বাইশ ॥

ডুগডুগি বেজে উঠল একদিন দেড়প্রহর বেলা। কানাপুকুর-পাড়ের ওদিক থেকে। জঙ্গলের আড়াল বলে এখনো নজরে আসছে না। তারপর ফাঁকায় এসে গেল। দু'জন মানুষ। পিছনের জনের মাথায় টিনে-বানানো বেঢপ আকারের বাক্স—টিনের উপর রংবেরঙের ফুল-লতা আঁকা। চার গোলাকার মুখ—মুখ চারটে কালো কাপড়ে ঢাকা। আগের-জন বেশ খানিকটা বাবু-মানুষ—গায়ে কামিজ পায়ে জুতো মাথায় টেরি। এই লোকের হাতে ডুগডুগি, কাঁধে বাঁশের তেপায়া। ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে আসছে, আর চেঁচাচ্ছে: বাক্সকল

—পেল্লায় পেল্লায় ছবি—বত্রিশ দফা। সস্তায় যাচ্ছে—মাত্তোর দু-পয়সা। চলে এসো, চলে এসো সব। সস্তায় যাচ্ছে—দু'পয়সায় বত্রিশ মজা—

গানের মতন সুর ধরে লোক জমাচ্ছে: কলকাতার শহর দেখ, চিড়েখানার হাতি দেখ—

অটল বলে, সোনাখড়িতে কলকাতা এনে দেখাচ্ছে?

দুটো পয়সা ফেলে কাচে চোখ দাও। কলকাতা দেখা থাকে তো রাস্তা-ঘাট ট্রামগাড়ি ঘরবাড়ি মিলিয়ে নাও।

পুববাড়ির হুড়কোর ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। ভবনাথ বাড়িতে না—এক কাঁঠালগাছ নিয়ে শরিক বংশীধরের সঙ্গে জেদাজেদির মামলা, সেই বাবদে তিনি সদরে গেছেন। পুঁটি কোনদিকে ছিল—ছুটে এসে পড়ল। হাঁপাচ্ছে সে। পাঁচিলের দরজায় বিনির আর নিমির মুখ দেখা যায়। বাক্সকলের সঙ্গে অটল দরদস্তুর করছে: দু-পয়সা কম হল নাকি? বিশ হাত মাটি খুঁড়ে দেখ, দুই কেন আধেলা পয়সাও উঠবে না। যতই চেঁচাও আর ডুগডুগি বাজাও, দু-পয়সায় কেউ তোমার ছবি দেখবে না। কম-সম করে নাও—মেলা খদ্দের হবে।

চাউর হয়ে গেল, পুববাড়ি বাক্সকল এসে রকমারি ছবি দেখাচ্ছে। প্রহ্লাদের পাঠশালায় সুর করে নামতা হচ্ছে তখন—ঝন্টু এসে বলল, যাবেন না মাস্টারমশায়? প্রহ্লাদ উড়িয়ে দেন: দূর, ছবি আবার পয়সা দিয়ে ঘটা করে কী দেখতে যাব?

কিন্তু নামতায় তারপরে আর জুত হয় না—সর্দার-পোড়া অবধি অন্যমনস্ক, এটা বলতে ওটা বলে উঠছে। ছুটি দিয়ে দিলেন প্রহ্লাদ—ছেলের দল ছুটল। কমলও আছে। আর দেখা যায়, স্বয়ং প্রহ্লাদ-মাস্টার গুটিগুটি পা ফেলে চলেছেন সকলের পিছনে—কৌতূহল সামলাতে পারেন নি।

এক পয়সায় রফা করে লোকটা ইতিমধ্যে ছবি দেখাতে লেগে গেছে। লতাপাতা-আঁকা রহস্যময় বাক্সকলে পাশাপাশি চারটে ছিদ্র—চারজনে সেখানে চোখ রেখেছে—পুঁটি বিনি নিমি আর অলকা-বউ। হাতল ঘোরাচ্ছে লোকটা আর তারস্বরে চেঁচাচ্ছে: লাটসাহেবের বাড়ি দেখ, চিড়েখানার হাতি দেখ, গড়ের দেখ, হাওড়ার পুল দেখ—

পাঠশালার ছেলের দল হৈ-হৈ করে এসে পড়ল। বাইরের লোকও জুটেছে। বউমানুষ অলকা এতক্ষণ যা দেখে নিয়েছে—আর এখন দেখা সম্ভব নয়। ঘোমটা টেনে সে পাঁচিলের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। কমল আর দেরি করে— এক ছুটে গিয়ে বউদাদার সেই জায়গায় চোখ রাখল। বাক্সকলের

লোকটা বিবেচক, গলা উঁচু করে ভিতরবাড়ির দিকে চেয়ে প্রবোধ দিচ্ছে: এদের সব হয়ে যাক—কাল আমি ভিতরে নিয়ে যাব মায়েরা। এসেছি যখন, সকলকে দেখাব। যতবার দেখতে চান, দেখিয়ে যাব।

সুর ধরল সঙ্গে সঙ্গে: হাওড়ার পুল দেখ, খিদিরপুরের জাহাজ দেখ, পরেশনাথের বাগান দেখ, ফাঁসির ক্ষুদিরামকে দেখ, সুরেনবাবুর সভা দেখ, লাটসাহেবের বাড়ি দেখ—

ক্ষুদিরামের গল্প দেবনাথ বলেছিলেন—ধ্বক করে তাই কমলের মনে এসে গেল। আর আহ্লাদ বৈরাগী গেয়েছিলেন: একবার বিদায় দাও মা—। ঐ গান পরে কমল অন্যের মুখেও শুনেছে, নিজেও একটু-আধটু গায় কখনো-সখনো। ক্ষুদিরামকে জানে সে, আজকে তার চেহারা দেখল: কোঁকড়া-চুল রোগা রোগা চেহারার খাসা ছেলেটি। একরকম মন্ত্র পড়ে নাকি অদৃশ্য হওয়া যায়। কমল যেন তাই হয়েছে! প্রহ্লাদ মাস্টারমশায়ের জোড়া-বেত হাতে না নিয়ে অদৃশ্য-কমল লাটসাহেবের বাড়ি ঢুকে গেছে। সপাং সপাং করে বেত মারছে—'বাবা রে' 'মলাম রে' করছে লাটসাহেব। অথচ কে মারছে দেখা যায় না। বন্দেমাতরম্ বলার জন্য বেত মেরেছিলে—তারই শোধ তুলে আসবে, কমলকে কেউ যদি অদৃশ্য হবার মন্ত্রটা শিখিয়ে দেয়।

লোকটা বলে চলেছে, লাটসাহেবের বাড়ি দেখ, কালীঘাটের মন্দির দেখ, জগন্নাথের রথ দেখ, আগ্রার তাজমহল দেখ, গয়া দেখ, কাশী দেখ—

উমাসুন্দরী তারিফ করে বলেন, গয়া কাশী শ্রীক্ষেত্র সমস্ত দেখাচ্ছ তুমি?

লোকটা হাসিতে দাঁত বের করে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, উঠোনের উপর দাঁড়িয়ে সমস্ত দেখতে পাচ্ছেন। খরচা একটা পয়সা মাত্তোর—

কমলের ছবি দেখা হয়ে গেছে, বাক্সকলটা এবারে ঠাহর করে করে দেখছে। আয়তনে এত ছোট—এর মধ্যে লাটসাহেবের বাড়ি হাওড়ার পুল গয়া কাশী ইত্যাদি বড় বড় জিনিস অবলীলাক্রমে ঢুকিয়ে দিয়েছে। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি—তারও চেয়ে তো অনেক বেশি তাজ্জব।

বর্ষার সময়টা বাড়ির উঠানে জঙ্গল ডেকে ওঠে, একেবারেই সাফসাফাই লেপাপোঁছার ধুম পড়ে গেল। আগাছা ও ঘাসবন উপড়ে ফেলছে, একটা দূর্বাঘাস অবধি থাকতে দিচ্ছে না। উঁচু জায়গা ছেঁটে চৌরস করল, গর্ত থাকলে মাটি দিয়ে ভরাট করে দিল। তারপরে গোবরমাটি লেপে পরিপাটি করে নিকায়। একদিন দু'দিন নিকিয়ে হয় না, নিত্যিদিন। ঝাঁটপাট দিচ্ছে, ধুলোর কণিকাও থাকতে দেবে না এমনি যেন পণ। ঝকঝক তকতক করছে।

ইচ্ছাসুখে উঠোনে এখন গড়াগড়ি খেতে ইচ্ছে করে। শুধু এই পূববাড়ি বলে নয়, যে বাড়ি পা ফেলছ এইরকম। গৃহবাড়ি ঠাকুরদেবতার মন্দির বানিয়ে তুলেছে।

কে যেন বলছিল কথাটা। উমাসুন্দরী অমনি বলে উঠলেন, মন্দিরই তো। মা-লক্ষী মাঠ থেকে বাস্তুর উপর উঠছেন, মন্দির ছাড়া তাঁকে কি যেখানে সেখানে রাখা যায় ?

এক-আধ বাড়ি কেবল বাদ—ধনসম্পত্তি যা-ই থাকুক, অভাগা তারা। যেমন মন্তার-মা'র বাড়ি। এক-কাঠা ধানজমি নেই, এক আঁটিও ধান ওঠে না। প্রজা-বিলি গাঁতিজমি আছে কিছু, আদায়পত্র করে সংসার মোটামুটি চলে যায়। তাহলেও অঘ্রাণ-পৌষে বুড়ি ও তাঁর বিধবা মেয়ে মন্তার ভাল ঠেকে না, প্রাণ হু-হু করে ফাঁকা উঠানের দিকে তাকিয়ে।

ধান পাকতে লেগেছে। কাটাও শুরু হয়ে গেল। লক্ষ্মীঠাকরুন বিল ছেড়ে গৃহস্থর উঠোনে উঠে গুটি গুটি আসন নিচ্ছেন। গোড়ায় অল্পসল্প—এই পাঁচ-দশ আঁটি করে। ক্রমশ যত পাকছে, কাটারও জোর বাড়ছে ততই। জনমজুরের দুনো দর। আরও উঠবে—তেদুনা, এমন কি টাকা অবধি উঠে যায় কোন কোন বারের মরশুমে। ধান কেটে কেটে আঁটি বাঁধে। ঘোর হয়ে গিয়ে যখন আর নজর চলে না. সেই সব আঁটি উঠানে বয়ে বয়ে এনে ফেলে। বোঝার ভারে বাঁকের নাচুনি—মজা লাগে কমলের দেখতে। দিনের পর দিন মাসের পর মাস জলরাজ্যে কাটিয়ে এসে আঁটির গায়ে সোঁদা-সোঁদা গন্ধ—শুফ-শুফ করে কমল নাক টানে, গন্ধ নিতে বেশ ভাল লাগে।

দেখতে দেখতে সব ধান পেকে গেল। তেপান্তরের বিলে সবুজের একটা গোছাও পাবে না কোন দিকে কোথাও। সোনা চতুর্দিকে—সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে নজর যত দূর চলে, পাকা ধানের সোনা ঢেলে দিয়েছে। সারাটা দিন, এবং চাঁদনি রাত হলে রাত্রিবেলাতে চাষা ক্ষেতে পড়ে আছে—ভাতের গ্রাসটা, মুখে দেবার ফুরসত পায় না। আঁটি বওয়া বাঁকে কুলোয় না আর এখন, গরুর-গাড়ি বোঝাই হয়ে আসে। মাঝবিলের কাদা-জলে গাড়ির চাকা বসে যায়, গরুতে পারে না বলে মানুষেই টেনে নিয়ে আসে তখন। বোঝার ভারে চাকা-দুটো ক্যাঁচ-কোঁচ কান্নার সুর তুলে বাড়ি এসে ঢোকে। আঁটি উঠোনে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিল। গাড়ি খালাস, কমলও মনে মনে সোয়াস্তি পেয়ে যায়।

বারান্দার চারা-কাঁঠালগাছ ঠেসান দিয়ে সে একনজরে দেখছে। একলা কমল। পুঁটির হাত ধরে টেনেছিল: দ্যাখসে দিদি। 'দিদি' বলা সত্ত্বেও পুঁটি ভেজেনি। তাচ্ছিল্য করে বলেছিল, আঁটি এনে ফেলছে দেখব কি রে তার? সে তো আর ছেলেমানুষ নয় কমল কিংবা টুকটুকির মতন—তার বলে কত

কাজ! প্রদীপের সামনে পা ছড়িয়ে পুতুলের বাক্স খুলে বসেছে—ছেলে-মেয়েগুলো শোবে এবার। মাথার-বালিশ পাশের-বালিশ নিমিকে দিয়ে বানিয়ে নিয়েছে। অল্প অল্প শীত পড়েছে, গায়ের উপর চাদর চাপা দিতে হবে—নয়তো ঠাণ্ডা লেগে যাবে পুতুলদের। পুঁটির এখন কত কাজ—বসে বসে তার কি ধানের পালা-দেওয়া দেখার সময় আছে।

কমল দেখছে মগ্ন হয়ে। অন্ধকার—আবছা-আবছা! জোনাকি উড়ছে, উঠানময় চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছে। আঁটি এনে এনে ফেললেই হল না—আঁটির উপর আঁটি সাজিয়ে পালা দিচ্ছে। যত রাত্রিই হোক, পালা সাজানো শেষ করে বাড়ি যাবে। ভবনাথ কোন দিক দিয়ে এসে পড়লেন। হাঁক পেড়ে বলছেন, শোন হে, ফী ক্ষেতের আলাদা পালা। এর আঁটির সঙ্গে ওর আঁটি মিশে না যায়। কার ক্ষেতের কি ফলন, পৃথক পৃথক হিসেব থাকবে। গোলে-হরিবোল হবে হবে না। ফলেন পরিচীয়তে—ফল বুঝে সামনে বছরের বিলিব্যবস্থা।

হচ্ছে তাই। একসঙ্গে তিন-চারটে পালা এদিকে-সেদিকে। পালা খানিকটা উঁচু হলে উপরে গিয়ে উঠছে একজনে, আর একজনে নিচে থেকে আঁটি তুলে দিচ্ছে। গোল করে সাজিয়ে যাচ্ছে উপরের সেই মানুষ। ক্ষেতের নামে পালা—বড়বন্দের পালা, তেলির চকের পালা, নাজিরবন্দের পালা ইত্যাদি। বিলের ভিতর পূববাড়ির যেসব ধান-জমি, শুনে শুনে কমলের অনেকগুলো মুখস্থ হয়ে গেল: বড়বন্দ, ছোটবন্দ, তেলির চক, মণির চক, মোড়লের চক, নাজিরবন্দ, মেছের ভুঁই আরও কত। অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়েছে। মানুষ-গুলোর মুখ দেখা যায় না আর তেমন। মানুষই নয় যেন, একপাল দত্যিদানো উঠানের উপর নেমে এসেছে।

এরই মধ্যে শিশুবর কলকে টানতে টানতে এলো। হাত বাড়িয়ে কলকে একজনের হাতে দিয়ে বলে, খাও। টানছে লোকটা ফক-ফক করে—আরও সব এসে ঘিরে ধরেছে, চারিদিকে হাত বাড়ানো। দু-চারবার টেনে লোকটা অন্য হাতে কলকে দিয়ে দেয়। সে-লোক দিল আবার অন্য হাতে। কলকে টেনে কিছু চাঙ্গা হয়ে তক্ষুনি আবার কাজে লেগে যায়। কাজ সারা করে তারপর বাড়ি যাওয়া। সকাল হতে না হতে আবার ক্ষেতে গিয়ে পড়বে। চাষার এখন নিশ্বাস ফেলার ফুরসত নেই।

কমলের হাই উঠছে, জোর করে তবু বসে ছিল। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে তরঙ্গিণী দক্ষিণের-ঘরে যাচ্ছেন, দেখে তিনি শিউরে উঠলেন: অ্যাঁ খোকন, তুই এখানে? আমি জানি, ঘরের মধ্যে পুঁটির সঙ্গে আছে। ঘরে আয়, ঘরে আয়। শুয়ে পড়্ এবারে, রাত হয়েছে।

ঘরে গিয়ে কমল শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে খসখসানি আওয়াজ পায়, মাঝে-মধ্যে কথা এক-আধটা। উঠানে কাজ চলছে। সকালবেলা বাইরে এসে তো অবাক। নিচু পালা দেখে শুয়েছিল, মাথার উপর আঁটি উঠে উঠে উঠে তারা অনেক উঁচু হয়ে গেছে। নতুন পালাও উঠেছে। পুঁটিকে আঙুল দেখিয়ে গম্ভীর সুরে কমল বলে, সমতলভূমির উপর রাত্রের মধ্যে কত পাহাড় উঠে গেছে, দেখ।

কায়দা পেলেই কমল আজকাল ভূগোলের ভাষায় কথা বলে। প্রহ্লাদের ইস্কুলে যাওয়া এমনি-এমনি নয়।

॥ তেইশ ॥

আরও ক'দিন গেল। উঠানের জায়গা দিন-কে দিন আঁটো হয়ে গোলকধাঁধা এখন। বাড়ি ঢুকে সাঁ করে দাওয়ায় উঠে পড়বে—তা পথ পাবে কোথা? পালা বের দিয়ে ঘুরে ঘুরে উঠতে হয়। অতিথিকুটুম্ব এসে তাল রাখতে পারে না—এ-ঘরে যেতে ও-ঘরে উঠে পড়ে। আমার মা-লক্ষ্মী যেহেতু উঠোনোর উপর—জুতো পায়ে কেউ এদিকে না আসে। বড়রা তো নয়ই—বাচ্চাদেরও পায়ে জুতো আঁটা থাকলে হাঁটা নিষেধ, কোলে তুলে নিয়ে নাও। পূববাড়ি এই—নতুনবাড়ি পশ্চিমবাড়ি পালের-বাড়ি উত্তরবাড়ি সর্বত্র এই। মন্তার-মা'র মতন ক'জনই বা সোনাখড়ি গাঁয়ের মধ্যে!

খেলার বড্ড জুত। দিনমানে তো খেলেই, রাতের বেলাও ছাড়ে না—চাঁদনি রাত যদি পেয়ে যায়। সন্ধ্যায় খাওয়া-দাওয়া সেরে ছেলেপেলেরা এসে জোটে—কেউ চোর হয়, কেউ বা চৌকিদার—পালা বেড় দিয়ে ছুটে বেড়ায়। চোর চোর খেলা না বলে শিয়ালঘুল্লি বলাই ঠিক। চালাক-পণ্ডিত শিয়াল—মাথায় তার নানান ফন্দি-ফিকির, তাড়া খেয়ে বনের গাছগাছালির মধ্যে পিছলে পিছলে বেড়ায়। এদের খেলাও তাই—এই পালা থেকে ও-পালার আড়ালে ঝুপ করে বসে পড়ছে।

উমাসুন্দরী বকাবকি লাগিয়েছেন: ছ্যামড়া-ছেমড়ি তোরা সব বাড়ি চলে যা। নতুন হিম লাগাস নে, অসুখ করবে। পুঁটি খোকন তোরা ঘরে আয়—

বড়গিন্নির কথা কেউ কানে নেয় না। ক'টা দিন তো মোটে—তার

পরেই একটা একটা করে পালা ভাঙবে, পালা ভেঙে মলন মলবে। সারা উঠোন ফাঁকা—আগে যেমনটা ছিল অবিকল তাই।

কত ইঁদুর যে জুটেছে—গর্ত খুঁড়ে । [illegible] -লা করছে। আঁটি থেকে ধান কুটুর-কুটুর করে দাঁতে কেটে গর্তের ভাণ্ডারে তোলে, ধীরেসুস্থে তারপর ভিতরের চাল খেয়ে চিটে করে রাখে।

ভবনাথ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ক্ষেতেলদের তাগিদ দেন : কষ্টের ফসল সবই যে ইঁদুরের গর্তে চলে গেল। মলে ডলে ফেল্ বাপসকল—তোদের অংশ মেপেজুপে ঘরে নিয়ে যা, আমাদেরটা গোলায় তুলে ফেলি।

সেটা জরুরি বটে, কিন্তু ক্ষেতেলেরই অবসর কই? ধান দাওয়া, আঁটি খলেনে তোলা, বয়ে বয়ে গৃহস্থের উঠানে আনা, কলাই-মুসুরি তোলা, এ-সবের উপরে আছে গাছ-মহল—খেজুরগাছ কেটে ভাঁড় পাতা, রস পাড়া ইত্যাদি। সারা দিনমান এবং প্রহর রাত অবধি খেটেও কুলিয়ে উঠতে পারেন না। তা সত্ত্বেও ধান-মলাটা ঐ সঙ্গে ধরতে হবে, ফেলে রাখলে আর চলে না। বিস্তর ধান বরবাদ হচ্ছে।

হাত তিনেক মাপের চাঁচা ছোলা টুকরো বাঁশ—যাকে বলে মেইকাঠ—ঘিরে খুব ভাল করে আবার লেপা-পোঁছা হল। সিঁদুরটুকু পড়লে কণিকা হিসাব করে তুলে নেওয়া চলে। চার গরু নিয়ে মলন মলতে এসেছে। ধানের আঁটি খুলে খুলে মেইকাঠ ঘিরে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়। এক দাড়তে পাশাপাশি চার-গরু জুড়ে দিল—দড়ির প্রান্তে মেইকাঠে বাঁধা। মেইকাঠের চতুর্দিকে গরুরা ঘোরে, খুরের চাপে পোয়াল থেকে ধান খুলে খুলে পড়ছে। গরুর মুখে ঠুলি-আঁটা—নয়তো চলার সময় ধানসুদ্ধ পোয়াল খেয়ে দফা সারবে। তা-ও ছাড়ে নাকি—ঠুলি-ঢাকা মুখ পোয়ালে ঢুকিয়ে দিয়ে জিভ বের করে এক-আধ গোছা টেনে নিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে নড়ির ঘা পড়ে পিঠের উপর। লেজ মলে হেই-হেই আওয়াজ তুলে গরু ছুটিয়ে দেয়। ছুটছে তবু গ্রাস ফেলে না—চিবোতে চিবোতে দৌড়য়।

শীত পড়েছে বেশ। কমল আর পুঁটি ভাই-বোন মুড়ি-সুড়ি দিয়ে দাওয়ায় বসে মলন-মলা দেখছে। আগ-বাঁশের মাথায় সামান্য কঞ্চি রেখে আঁকুশি বানিয়ে নিয়েছে—মলনের মধ্যে আঁকুশি ঢুকিয়ে উল্টেপাল্টে নিচ্ছে। ধান নিচে পড়ে গিয়ে উপরটায় এখন শুধুমাত্র পোয়াল। গরু এবারে মেইকাঠ থেকে খুলে গোয়ালের খুঁটির সঙ্গে বাঁধল, ঠুলি খুলে দিয়ে চাট্টি চাট্টি পোয়াল দিল মুখে। আহা, অনেক খেটেছে, খেটে কাজ তুলে দিয়েছে—খাবে বইকি এবার। আঁকুশি দিয়ে যাবতীয় পোয়াল একদিকে সরিয়ে গাদা

করে ফেলল। পড়ে আছে গোবর-নিকানো পরিশুদ্ধ উঠোনে উপর মা-লক্ষ্মীর দেওয়া নতুন ধান। ঝিকমিক করছে। ভক্তিযুক্ত হয়ে উমাসুন্দরী কুড়িয়ে এক জায়গায় করলেন। জুতো পায়ে ইদিকে কেন রে—যা, যা—। বড়রা বোঝে, তারা আসবে না—পশ্চিমবাড়ির বাচ্চা একটাকে তাড়া দিয়ে উঠলেন। কাঁচাধান ঝট করে গোলায় তোলা যাবে না—কাল দিনমানে উঠোনে মেলে দিয়ে পুরো খাইয়ে নিতে হবে। একদিনের একটা রোদে যদি না হয়, পরশু দিনও। শিশুবরকে ডেকে লাগিয়ে দিলেন, কুলোয় তুলে তুলে ধান উড়োক। চিটে একেবারে সমস্ত বাদ দেবে না—অল্পসল্প থাকবে। চিটের মিশাল থাকলে ধানটা থাকে ভাল।

মলন-মলা এখন এক খেলা হয়ে গেছে কমলদের। কমল যতীনরা সব গরু, পুঁটি চাষা। মেইকাঠ কমল বাঁ-হাতে জড়িয়ে ধরেছে, ডান-হাতটা ধরল যতীন। যতীনের ডান-হাত পটলা এসে ধরে, পটলার ডান-হাত নিমু। হঠ্‌ হঠ্‌ করছে পুঁটি, নড়ি উঁচিয়ে তাড়া দিচ্ছে—গরুরূপী এরা চারজন দৌড়চ্ছে ততই। মেইকাঠ বেড় দিয়ে ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে কেমন হয়ে যায়—চারিদিককার ঘরবাড় গাছগাছালিও ঘুরছে, মনে হয়। ধপ করে বসে পড়ল গরুরা। পুঁটি বলল, ঘুল্লি লেগেছে। জল খেয়ে নে এট্টু, সেরে যাবে। কাঁচা সুপুরি খেয়ে দেখ্‌ তাতেও ঠিক এমনি হবে।

ধান তুলে-পেড়ে রাখা এর পর উঠোনের গোলায়, ঘরের ভিতরের আউড়িতে কুনকে মেপে মেপে ধান তোলা হচ্ছে—ভবনাথ নিজে সামনে দাঁড়িয়ে কোন জমির দরুন কত ধান উঠল, খাতায় টুকে নিচ্ছেন। ধানের নামেই তো প্রাণ কেড়ে নেয়: কাজলা, অমৃতশাল, নারিকেলফুল, গজমুক্তা, সীতাশাল, গিন্নি-পাগলা, শিবজটা, সোনাখড়কে, সূর্যমণি, পায়রাউড়, বাদশাপছন্দ। আরও কত! মিহিজাতের ধান লক্ষ্মীপুজো ধান খয়েধান—এই সমস্ত আলাদা আলাদা থাকবে, মিলেমিশে গোলে-হরিবোল হলে হবে না। বীরপালা-কুমড়োগোড় নামক মোটা ধানটারই ফলন বেশি—বারোমাসের নিত্যিদিনের খোরাকি ঐ ধানে চকের-মাহিন্দার জন-কিষাণ যত আছে, সরু চালের ফুরফুরে ভাতে তাদের ঘোর আপত্তি: ও দেখতে শুনতেই ভাল—পেটে থাকে না, পলকে হজম হয়ে গিয়ে পেট চোঁ-চোঁ করে। এবং আকণ্ঠ গিলেও পেটে কিছুমাত্র ভর পাওয়া যায় না। দূর দূর—ও ভাত শহুরে বাবুভেয়েরা এসে খাবেন, এক গ্রাস মুখে ফেলেই যাঁরা অম্বলের ঢেকুর তোলেন। সরু ধান আউড়িতে উঠুক—কুটুম্ব এলে কিম্বা ক্রিয়াকর্মের ব্যাপারে কালেভদ্রে বেরুবে। খয়ে-ধান, যা ফুটিয়ে খই হবে, তা-ও আউড়িতে। আর থাকবে লক্ষ্মীপুজোর

ধান আউড়ির মধ্যে কলসি ও হাঁড়া বোঝাই হয়ে। কুদির-ডাঙা বলে একটু-করো জমি আছে জুড়ন মোড়লের হেপাজতে। নিষ্ঠাবান চাষী জুড়োন—তার ধানই বরাবর মা-লক্ষ্মীর নামে থাকে। রোদে নিয়ে ধরলে সোনার মতন ঝিকমিক করে সে ধান। একটি কালো ধান নেই তার মধ্যে—কালো ধান থাকলে পূজো হয় না। লক্ষ্মীপূজো পূববাড়িতে তিনবার—পৌষমাসে পৌষলক্ষ্মী, আশ্বিনের কোজাগরী এবং শ্যামাপূজোর দিন শ্যামাপূজো নিশি-রাত্তিরে—সন্ধ্যাবেলা আগেভাগে ঝাঁকিয়ে লক্ষ্মীপূজো হয়ে যায়।

হিরণ্ময় বলল, ক্ষেতের ধান বাড়ি উঠছে। ভেনে-কুটে আজই চাট্টি চাল বানিয়ে ফেল। নতুন চালের ফ্যানসা ভাত চাই কাল।

সকালবেলা বাড়ির লোকে ফ্যানসা ভাত খায়, প্রবীণেরা শুধু বাদ। নতুন চালের ফ্যানসা-ভাত অতি উপাদেয়—ভাত এবং তৎ-সহ বীচেকলা-ভাতে। হিরু তাই চাচ্ছে। সামান্য কথা—বিশেষ করে বাড়ি ছেড়ে যে ছেলে বিশেষ চাকরি করতে যাচ্ছে, তারই একটা আবদার! তা বলে কাল কেমন করে হবে—'ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে' হয় কি কখনো?

উমাসুন্দরী বলেন, নবান্ন হয়নি যে বাবা। ঠাকুরদেবতারা খেলেন না—আগেভাগে তোরা খাবি কি করে?

হিরণ্ময় বলল, সামনের বিষ্যুদের হাট অবধি দেখব। ঠাকুরদেবতা তার মধ্যে খেলেন তো ভাল—না খেলে নাচার আমি। একটা দিনও আর সবুর মানব না।

ভবনাথের তিন ছেলের মধ্যে হিরু সৃষ্টিছাড়া—ঠাকুরদেবতা নিয়ে তাচ্ছিল্যের কথা তার মুখে বাধে না। কম বয়সে কলকাতায় থেকে এই রকম হয়েছে। লেখাপড়া শিখিয়ে বিদ্বান বানাবেন, এই মতলবে দেবনাথ তাকে নিজের কাছে নিয়ে ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন।—লেখাপড়া লবডঙ্কা। দেবনাথের ভাল গুণ একটাও পায় নি—জেদটা পেয়েছে। আর পেয়েছে বেহ্মজ্ঞানীর মতন আলাপ-আচরণ।

হিরু জোর দিয়ে আবার বলে, তোমরা কেউ রেঁধেবেড়ে না দিতে চাও—বলে যাচ্ছি, উঠোনের উপর ঐ উনুনে নিজে আমি চাল ফুটিয়ে খাব। ঠেকিও তোমরা।

বলে জবাবের অপেক্ষা না রেখে হনহন করে বেরিয়ে পড়ল।

উমাসুন্দরী ভয় পেয়ে গেলেন। একরোখা ছেলে—যা বলল ঠিক ঠিক তাই করবে। ভবনাথের সঙ্গে এই নিয়ে লেগে যাওয়া বিচিত্র নয়। অটল বাহিন্দারকে ডেকে উমাসুন্দরী চুপি চুপি বলেন, সর্বকর্ম ফেলে তুই বাবা

বড়েঙ্গায় পুরুতঠাকুর মশায়ের বাড়ি চলে যা। এখন না, সন্ধ্যের পর যাস—ঠাকুরমশায়কে বাড়ি পেয়ে যাবি। মঙ্গলবার এসে অতি অবশ্য যেন নবান্নের কাজ করে দিয়ে যান। মঙ্গলবার নিতান্ত না পেরে ওঠেন তো বুধবার—তার ওদিকে নয়। কর্তার কানে না যায় দেখিস—কোথায় যাচ্ছিস, জিজ্ঞাসা করলে যা হোক বলে কাটান দিয়ে দিবি।

নতুন ধান চাট্টি রোয়াকের উপর মেলে দেওয়া হল। বাড়ির আশেপাশে কয়েকটি খেজুরগাছ—কুঞ্জ গাছি সেগুলো ভাগে কাটছে। চার ভাঁড় রস দিয়েছে সে আজ, রস জালিয়ে গুড় বানানো হচ্ছে ঘরের উনুনে। সন্ধ্যাবেলা বিনো আর অলকা-বউ ননদ-ভাজে ঢেঁকিশালে গেল—ক্ষেতের নতুন ধান প্রথম এই লোটের মুখে পড়ল। ঢ্যা-কুচকুচ ঢ্যা-কুচকুচ—অলকা পাড় দিচ্ছে, বিনো এলে দিচ্ছে। কতক্ষণের কাজ! দেখতে দেখতে হয়ে গেল। সেই নতুন চাল শিলে বেটে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে রাখল। নবান্নের উপকরণ।

পুরুত মঙ্গলবারেই আসবেন—বড়েঙ্গা থেকে অটল খবর নিয়ে এলো। সকাল সকাল কাজ সেরে দিয়ে চলে যাবেন—তাঁর নিজ গ্রামেই আরও দু-বাড়ি নবান্ন আছে।

রান্নাঘরের কানাচে আদার ঝাড়। ঝাড়ের গোড়ায় মরশুমে এখন নতুন আদা নেমেছে। বড়গিন্নী ও তরঙ্গিণী টেমি ধরে কিছু আদা তুলে আনলেন। চালের গুঁড়োয় আদার মিশাল লাগে।

আয়োজন সারা। সকালে কাপড়চোপড় ছেড়ে তরঙ্গিণী শুদ্ধাচারে গোটা দুই ঝুনোনারকেল কুরিয়ে ফেললেন। ঠোঁটেকলা ঘরেই আছে। নতুন চালের গুঁড়ো, নতুন গুড়, নতুন আদা, নারকেলকোরা এবং ঠোঁটেকলায় আচ্ছা করে চটকে মাখা হল। পাতলা করার জন্য জলের আবশ্যক—এমনি জল চলবে না ডাবের জল। দেবভোগ্য উপাদেয় বস্তু। তা বলে এখন জিভে ঠেকানোর জো নেই। পুজোআচ্চা হয়ে যাক—পরে।

পুজো অধিক-কিছু নয়। পুরুত এসে মন্তোর পড়ে নিবেদন করলেন—বাস্তুদেবতা পিতৃপুরুষ গুরুপুরুতের নামে নামে দেওয়া হল। গরুবাছুরের মুখে দেওয়া হল। তারপর কাকেদের মুখে। সকলের হয়ে গেল—পরিজনদের মুখে পড়তে আর বাধা নেই। সামান্য সময়ের ব্যাপার। দক্ষিণা ও নৈবেদ্য নিয়ে পুরুতঠাকুর বাড়িমুখো হন হন করে ছুটলেন।

হিরণ্ময় খুশি হয়ে তরঙ্গিণীকে বলল, কাল এই চালের ফ্যানসা-ভাত কোরো খুড়মা। বাঁচেকলা-ভাত মেটেআলু-ভাতে আর একটু সর-বাটা ঘি সেই সঙ্গে। খাওয়াটা যা হবে।

যা বলছে হবে তাই। বাড়িছাড়া গ্রামছাড়া অঞ্চল-ছাড়া হয়ে যাচ্ছে সে। দেবনাথ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন—বাদাবনে চলে যাচ্ছে, বনকরের কাজে ঢুকবে।

॥ চব্বিশ ॥

বড়ি দেওয়া কাল। আয়োজন সন্ধ্যেরাত থেকেই। রান্নাঘরের চালের উপর পাকা পাকা জাতকুমড়ো চুন-মাখানো চেহারা নিয়ে পড়ে আছে—একটা নামিয়ে এনে তাড়াতাড়ি চিরে বিনো হাতকুরুনি দিয়ে কোরাচ্ছে। ছাই-গাদার উপরের প্রকাণ্ড এক মানকচু তোলা হয়েছে। তলার দিকটা খাওয়া যায় না, গাল দুরে—বড়ির মধ্যে চালিয়ে দেওয়া ভাল। কচুর এঠে তরঙ্গিণী কুচি কুচি করে কাটছেন। সকালবেলা এক সঙ্গে সব ঢেঁকিতে কোটা হবে।

টেমি জ্বলছে কাঠের দেলকোর উপর, গল-গল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কমল ওত পেতে আছে—কুমড়োর শাঁস সবখানি বেরিয়ে আসার পর খোলা দুটো নিয়ে নেবে। খাসা দু'খানা নৌকো।

পুঁটি বলে, একটা কিন্তু আমার। মেয়ে শ্বশুড়বাড়ি পাঠাতে পারছিনে নৌকোর অভাবে।

কমল বলে, আমার নৌকো ভাড়া করবি—আমি পৌঁছে দিয়ে আসব। নিজের নৌকো লাগছে কিসে?

বিনো কমলের দিকে মুখ তুলে বলল, তুই তোকারি করছিস খোকন, দিদি হয় না? বড় হয়ে গেছিস এখন, লোকে নিন্দে করবে।

তা বড় বইকি—পাঠশালায় দ্বিতীয় মানে পড়ে কমল, তার উপর কাকা হয়ে গেছে। অলক-বউয়ের মেয়ে হয়েছে—টুকটুকি নাম। আরও কিছু বড় হয়েই তো সে কাকাবাবু বলে ডাকবে কমলকে। দেবনাথ যেমন হিরু-নিমিদের কাকা।

দরদালানে নিমি হামানদিস্তায় ঠনঠন করে পাত সেঁচছে ভবনাথের জন্য। জামরুলগাছটা জোনাকিতে ভরে গেছে—আরও কত চারিদিকে ঝিকমিকিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। অলকার মিহিগলায় ঘুমপাড়ানি-গান আসে পশ্চিমের-ঘর থেকে: ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আমার বাড়ি এসো, আমার বাড়ি পিঁড়ি নেই টুকটুকির চোখে বোসো—

ঘুমুতে টুকটুকির বয়ে গেছে। অলকা অবিরত থাবা দিচ্ছে চোখের উপর।

যখন থাবা পড়ে পাতা বুজে যায়, হাত ওঠানোর সঙ্গে সঙ্গে পিটপিট করে আবার সে তাকিয়ে পড়ে।

এই ইঁদোল, দেখ টুকুরানী বজ্জাতি করছে—ঘুমুচ্ছে না। ধরে নিয়ে যাও। এই যে এসে গেছে ইঁদোল—

এবং ইঁদোলের উপস্থিতির প্রমাণস্বরূপ অলকা গলা চেপে আওয়াজ বের করে—ইঁদোলই ডাক ছাড়ছে যেন। মেয়ে ভয় পাবে কি, উল্টো উৎপত্তি। যেটুকু ঘুমের আবিল এসেছিল, সম্পূর্ণ মুছে গিয়ে টুকটুকিও দেখি মায়ের স্বরের অনুকরণ করে। ফিক করে অলকা হেসে পড়ল : নাঃ, তোমার সঙ্গে পারবার জো নেই। বজ্জাত মেয়ে কোথাকার। দু'বছর বয়সে এই, বড় হয়ে তুমি তো সবসুদ্ধ চোখে তুলে নাচাবে—

ডিবে ভরতি সেঁচা-পান ভবনাথের শয্যার পাশে রেখে নিমি বারান্দায় এলো। অলকাকে ডাকছে : ঘুম পাড়াতে গিয়ে তুমিও ঘুমুলে নাকি বউদি? ডালে জল দিয়ে যাবে, এসো।

এই ডাল ভেজানোর বাবদে এক-একজন বড় অপয়া। অলকা-বউও বোধ-হয় তাই। গেল-বছর পরখ হয়ে গেছে। রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে সারাটা দিন, দেখেশুনে বউকে দিয়ে ডাল ভেজানো হল। পরের দিন আকাশ মুখ পুড়িয়ে থাকল, বড়ি শুকাল না। সন্ধ্যেবেলা ফোঁটা ফোঁটা পড়তে লাগল, তার পরের দিন বৃষ্টি দস্তুরমতো। ফাল্গুনে এই কাণ্ড। বড়ির কাই সামান্য কিছু বড়া ভেজে খেয়ে বাকি সব ফেলে দিতে হল। আরও একদিন এমনি নাকি হয়েছিল।

ব্যাপারটা সেই থেকে ঠাট্টার বিষয় দাঁড়িয়েছে। বিষম খরা যাচ্ছে—খাল-বিল শুকনো, মাটি ফেটে চৌচির, 'জল' 'জল' করছে লোকে চাতক-পাখির মতো, নিমি তখন টিপ্পনী কাটে : আমাদের বউদি ইচ্ছে করলেই হয়। চাট্টি ঠিকরির-ডাল ভেঙে বউদিকে দিয়ে ভিজিয়ে দাও। হুড়হুড় করে বৃষ্টি নামবে।

লজ্জায় অলকা আর সে-দিগরে নেই। আজ অলকা নিমিকে বলল, বড় ফুক্‌ড়ি তোমার ঠাকুরঝি। আজ তুমি জল ঢালবে। তোমারও পরখ হোক।

নির্মলার মুখ চকিতে কালো হয়ে গেল। বলে, পরখের কি আছে? আমি তো হেরেই আছি। সকল দিক দিয়ে আমি পোড়াকপালি। আমায় হারিয়ে দিয়ে আর কী লাভ বলো।

অলকা মরমে মরে যায়। হচ্ছে হালকা হাসি-তামাসা; তার মধ্যে বড় ব্যথার জিনিস টেনে আনে কেন? এই বড় দোষ ঠাকুরঝির—সকলের পিছনে লাগবে, তাকে ছুঁয়ে কিছু বলবার জো নেই।

তরঙ্গিণী মীমাংসা করে দিলেন : ঠেলাঠেলি কোরো না তোমরা। কারো জল ঢালতে হবে না, জল আমি ঢালছি। সুনাম হোক দুর্নাম হোক, আমার হবে।

খাওয়াদাওয়ার রাতে ডালে তিনি জল দিলেন। ভোরে বড়ি কোটা, রোদ্দুর উঠলে বড়ি দেওয়া।

চঞ্চলার মৃত্যু থেকে তরঙ্গিণীর ঘুম একেবারে কমে গেছে। তার উপর কাজের দায় থাকলে আর রক্ষে নেই। জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে, পাখপাখালি ডেকে উঠছে এক-একবার। রাত পোহালে বড়ি কোটা—তরঙ্গিণীর মাথায় গেঁথে আছে। দরজা খুলে বাইরে এলেন তিনি। ওমা, মাথার ওপরে চাঁদ, রাত ঝিমঝিম করছে। আবার দরজা দিলেন।

বার দুই-তিন এমনি। পোড়া রাত আর পোহাতে চায় না। পশ্চিমের-ঘরের কাছে গিয়ে অলকা-বউকে ডাকাডাকি করছেন। ওঠো বড়বউমা। বড়ি দেওয়া আছে না? ছড়াঝাঁটগুলো সেরে ফেলি, এসো এইবার।

খসর খসর আওয়াজে উঠোনে মুড়োঝাঁটা পড়ছে। ঝাঁট টপাটের পর গোবর জলের ছড়া। বাস ঘরবাড়ি পরিশুদ্ধ হয়ে থাকবে মানুষজন উঠে পড়ার আগে। চোখ মুছতে মুছতে অলকাও উঠে পড়েছে, গোবরজল গুলে ছড়াৎ-ছড়াৎ করে উঠোনময় ছড়াচ্ছে।

উত্তর-দক্ষিণে লম্বা উঠোন দুই শরিকের মধ্যে ভাগাভাগি। বেড়া নেই, একটা নালি উঠোনের ঠিক মাঝখান দিয়ে। বৃষ্টির জল ঐ পথে বেরিয়ে রাস্তার পগারে গিয়ে পড়ে। উত্তরে অংশ বংশীধর ঘোষের। বংশীধরের ছোট ছেলে সিধু নতুনবাড়ি আড্ডা সেরে রাতদুপুরে বাড়ি ফেরে। বাড়ির লোকে অঘোরে ঘুমোয় তখন। রান্নাঘরে ভাত ঢাকা থাকে, খেয়ে দেয়ে—উত্তরের-ঘরের দাওয়ায় খাট পাতা রয়েছে—খাটের বিছানায় সে শুয়ে পড়ে। নিত্যিদিনের এই নিয়ম। রোদে চারিদিক ভরে যায়, গৃহস্থালী কাজকর্ম পুরোদমে চলে। সিধু কিন্তু নিঃসাড়ে চোখ বুঁজে পড়ে আছে তখনো।

এসবে কিছু নয়, কিন্তু ঝাঁটার আওয়াজটা সিধুর কাছে অসহ্য— হয়তো বা শরিকি উঠোনের ঝাঁটা বলেই। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে কলহ করে : কী লাগালে ছোট-খুড়িমা, অর্ধেক রাত্রে এখনই উঠে পড়েছ? তোমার চোখে ঘুম নেই, তার জন্যে বাড়িসুদ্ধ আমরা যে না ঘুমিয়ে মারি।

পূবের-কোঠা থেকে ভবনাথের ডাক এলো : মনু—

তরঙ্গিণী উঠে গেছেন, আর অভ্যাস বশে কমলেরও অমনি ঘুম ভেঙেছে।

জেঠামশায়ের 'মনু' ডাকের জন্য উসখুস করেছিল সে, কাঁথা ফেলে তড়াক করে উঠে একছুটে পুবের-কোঠায় চলে যায়। একেবারে ভবনাথের লেপের মধ্যে।

বুড়ো হয়ে ভবনাথ শীতকাতুরে হয়ে পড়েছেন, অঘ্রাণেই লেপ নামাতে হয়েছে। কমল জেঠামশায়ের গায়ে গা ঠেকিয়ে গুটিসুটি হয়ে আছে। ব্রহ্মামুরারিস্ত্রি- পুরান্তকারী—' ভবনাথ স্তব পড়ছেন। সেকি একটা দুটো—একের পর এক পড়ে যাচ্ছেন: 'প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গাদুর্গাক্ষরদ্বয়ম্ আপদস্তস্য নশ্যন্তি—'। কমলের সব মুখস্থ, সুরে সুর মিলিয়ে সে-ও পড়ে যায়। সব পড়ার পর কৃষ্ণের শতনাম, দাতাকর্ণ, গঙ্গাবন্দনা—এক একদিন এক এক রকম।

সকলের শেষে প্রশ্নোত্তর: মনু, তোমার নাম কি?

শ্রীযুক্ত বাবু—

এই বুঝি! নিজের নামের সঙ্গে বাবু চলে না। শুধু 'শ্রী' বলতে হয়।

কমল সংশোধন করে বলল, শ্রীকমললোচন ঘোষ।

ব্যস, হয়ে গেল? বড্ড তুই ভুলে যাস মনু। নাম জিজ্ঞাস করলে নিজের নামের সঙ্গে বাপের নামও বলতে হয়। শ্রীকমললোচন ঘোষ, আমার ঠাকুর হলেন গে—

কমল পূরণ করে দিল: শ্রীযুক্ত বাবু দেবনাথ ঘোষ।

বেশ হয়েছে। পিতামহের নাম কি বলো এবারে—

শ্রীযুক্ত বাবু

উঁ-উঁ-হুঁ—করে উঠলেন ভবনাথ: তিনি যে স্বর্গে গেছেন। শ্রীযুক্ত নয়, বলতে হবে ঈশ্বর। ঈশ্বর হরেশ্বর ঘোষ।

তারপর, প্রপিতামহের নাম? বৃদ্ধ-প্রপিতামহ? অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ? কোন গোত্র তোমাদের। আহা, ঘোষ মাত্রেই সৌকালিন—এ নিয়ে ভাবাভাবর কিছু নেই। কোন গাঁই? কার সন্তান?

চেঁকিশালে পাড় পড়ছে—ধাপর-ধুপর ধাপর-ধুপর। আওয়াজ পেয়ে উমাসুন্দরী চলে গেলেন সেখানে: সরো, আমি একটু এলে দিই।

তরঙ্গিণীর ঘোর আপত্তি: দিদি, কক্ষনো না। একবারের সেই আঙুল ভেঙে আছে। একটুকু বাত কোটা—একেই বা কি দেবার আছে? তুমি নিজের কাজে যাও।

দাঁড়াতেই দিল না ঢেঁকিশালে। এই এক কাণ্ড—বড়গিন্নি কাজ করতে এলে বাড়িসুদ্ধ আড় হয়ে পড়ে। বলে, বয়স হয়েছে—তার উপর বাতের দোষ। চিরকাল খেটেছ, শুয়ে বসে আরাম করো এবার।

যেন শোওয়া এবং বসার মধ্যেই যত কিছু আরাম। কাজ না করে বড়গিন্নি থাকতে পারেন না। উঠানের উনুনে সকালের ফ্যানসা-ভাত রান্না হয়— সেই কাজটা তিনি নিয়ে নিয়েছেন। ঢেঁকিশালে তাড়া খেয়ে উমাসুন্দরী এইবার উনুন ধরানোর উদ্যোগে গেলেন।

পূবের-কোঠায় এতক্ষণে প্রশ্নোত্তর সারা। ভবনাথ শ্যামাসঙ্গীত ধরলেন : 'আমায় দাও মা তবিলদারি, আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী—'। সুরজ্ঞান আছে ঊষাকালে খালি গলায় নেহাত মন্দ শোনায় না। গান ধরার মানেই নাকি তামাক সাজার হুকুম—নিমি সেইরকম জেনে বুঝে আছে। গায়ে আঁচল জড়িয়ে টেমি ধরিয়ে নিয়ে শীতে তুরতুর করতে করতে সে এলো।

ভবনাথ বলেন, উনুন ধরে নি ?

ঘাড় নেড়ে নিমি ধরলে কি হবে ? বাঁশের-চেলার আগুন কলকের তুললেই নিভে যায়। নুড়ি ধরিয়ে দিচ্ছি।

তামাক সাজল, নারকেলের ছোবড়া পাকিয়ে গোল করে নুড়ি বানাল। টেমিতে নুড়ি ধরিয়ে কলকের ফুঁ দিতে দিতে হুঁকোর মাথায় বসিয়ে নিমি বাপের হাতে দিল। বিছানা ছেড়ে উঠলেন ভবনাথ। গায়ে বালাপোষ জড়িয়ে জলচৌকিতে উবু হয়ে বসে ভুড়ুক-ভুড়ুক হুঁকো টানছেন।

পুঁটি মেয়েটা তরঙ্গিণীর বটে কিন্তু মায়ের চেয়ে জেঠির সে বেশি ন্যাওটা। কমল হবার সময় তরঙ্গিণী আঁতুড়-ঘরে গেলেন, মেয়ের খাওয়া-শোওয়া আব দার-অভিমান সমস্ত সেই থেকে উমাসুন্দরীর কাছে। দরদালানে জেঠির কাছে সে শোয়। কমলকে এসে ডাকছে : উঠে পড়্ কমল, রস নিয়ে আসিগে।

রবিবার আজ। প্রহ্লাদ মাস্টারমশায় বাড়ি চলে গেছেন। পাঠশালার ঝামেলা নেই। বুঝেসুজেই পুঁটি এসেছে। ডুরে-শাড়িটা পরে তৈরি সে। দোলাইখানা কমলের গায়ে ভাল করে জড়িয়ে ভাই-বোনে বেরিয়ে চলল।

সুমুখ-উঠানে ধানের পালা, পা ফেলবার জায়গা নেই। পাছ-দুয়ারের আধেকখানি জুড়ে লাউ-কুমড়ো ঝিঙে-বরবটির মাচা। নিচেটা পরিপাটি করে নিকানো, সিঁদুরটুকু পড়লে তুলে নেওয়া যায়। বেশ দিব্যি ঘর-ঘর লাগে। মাচার বাইরে উনুন—আগুনের আঁচে গাছের যাতে ক্ষতি না হয়। বড়গিন্নি কড়াইতে ফ্যানসা-ভাত চাপিয়েছেন—ভাত টগ-বগ করে ফুটছে। বড়ি কোটা সেরে অলকা-বউ রান্নাঘরে গোবরমাটি দিতে লেগেছে। শীতের সকালে জল-কাদা ছেনে আঙুলের চামড়া ঠরসে গেছে, উনুনের ধারে এসে হাত সেঁকে যাচ্ছে এক একবার।

পুঁটি-কমলের দিকে বড়গিন্নি হাঁক দিয়ে বললেন, তাড়াতাড়ি আসিস রে। দেরি হলে ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে ই.দকে।

কালু গাছি রসের ভাঁড় বাঁকে করে এনে বাইনশালায় নামাল।

রস দাও কালু-চাচা—

কালু বলল, জর এয়েছিল—গণ্ডা চারেক মাত্র গাছ কেটেছিলাম কাল। কুল্যে এই ছ-ভাঁড় রস। পরশু-তরশু এসো একদিন, রস নিয়ে যেও।

অতএব অন্য বাড়ি যাচ্ছে। কালুর-মা বুড়ি—কুঁজো দেহটা কোমর থেকে ভেঙে মাটির প্রায় সমান্তরাল—অবিরত মাথা নাড়ে, লাঠি ঠুকঠুক করে বেড়ায়। কোন দিক দিয়ে বুড়ি এসে সামনে পড়ল। মুখের সামনে লাঠি তুলে ধরে আবার মাটিতে ফেলে। খোনা-খোনা গলায় বলে, আল্লা, শুধু-মুখে যাচ্ছ তোমরা? বানশালে এসে পড়েছ—নিদেন পেটে খেয়ে তো যাবে! বোসো আমার যাদুরা।

দু-খানা চাটকোল ফেলে দিল তাদের দিকে। দুটো খালি-ভাঁড়ে কিছু রস ঢেলে পাটকাঠি হাতে দিয়ে বলল, খাও। পাঠকাঠির নলে চোঁ-চোঁ করে টানে ভাই-বোন। রস খেয়ে তবে ছুটি।

আর এক বাড়ি—কুঞ্জ ঢালির বাড়ি। বটকেরা করে কুঞ্জ বলে, রস দেবানে—তার জন্যে কি। দোলাইখানা একবার তোল দিকিনি খোকনবাবু। কী-পেড়ে ধুতি পরে এয়েছ, দেখি।

বছর দুই আগে কমল বড্ড বেকুব হয়েছিল এই কুঞ্জর কাছে—তা বলে আজ? এখন বড় হয়ে গেছে না। বলা মাত্রই সে দেমাক ভরে দোলাই তুলে ধরল। সত্যিই ধুতি পরনে—পাক্কা পাঁচ-হাত ফুলপেড়ে ধুতি। দোলাইয়ে যখন পা পর্যন্ত ঢাকা, নিষ্প্রয়োজনে ধুতি পরার ঝামেলায় যেতে যাবে কেন?—এই অভ্যাস কমলের ছিল, এবং কুঞ্জ সেটা জানত। দোলাই তোলার কথা তাই বলেছিল সেবারে। শোনা মাত্র কমলের চোঁচা-দৌড় দোলাই চেপে ধরে। ধর্ ধর্—করে কয়েক পা পিছনে ছুটে কুঞ্জ ঢালি হাসিতে ফেটে পড়েছিল। কিন্তু সেবারে যা হয়েছিল, এখন তা কেন হতে যাবে। বড় হয়ে গেছে কমল এখন।

চোর, চোর—কলরব উঠেছে নুটো-গুণীনের বাড়ি। একেবারে লাগোয়া বাড়ি—এ-উঠোন আর ঐ-উঠোন। চোর দেখতে পুঁটি-কমল ছুটেছে, কুঞ্জও গেল। চোর ধরা পড়েছে—তা হাসাহাসি কিসের অত?

চোর কনে? কুঞ্জ ঢালি জিজ্ঞাসা করল। রস জাল-দেওয়া বাইনের পাশে দোচালা খোড়োঘর। হাসতে হাসতে নুটো সেদিকে আঙুল দেখিয়ে বলে,

বড্ড বেকায়দায় পড়ে গেছে—পালাবার জো নেই।

পাড়ার আরও ক'জন এসেছে—চোর দেখে হেসে কুটি-কুটি। গাছ থেকে সন্ধ্যাবেলা ওলার-রস পাড়ল, রাত-দুপুর অবধি জ্বালিয়ে দুটো ভাঁড়ে ঢেলেছে, আজকের হাটে গুড় দু-খানা বেচবে। গন্ধে গন্ধে পাগল হয়ে সিঁধ খুঁড়ে চোর ঘরে ঢুকে পড়েছে। সিঁধের কী বাহার দেখ—

দেখাচ্ছে দুটো। কাচনির বেড়ার নিচে বাঁশের গবরাট। তারই ঠিক নিচে গর্ত খুঁড়েছে সিঁধকাঠি বিহনে নখ দিয়ে। এদিক-সেদিক নখের মেলা দাগ। ঘরে গিয়ে ভাঁড় মুখে আটকেছে। মুখ বের করে আনতে পারে না, দেখতেও পাচ্ছে না চোখে। এই এখনই দোর খুলে দুর্গতি দেখতে পেলাম চোরের—

ঘরের ভিতর উঁকি দিয়ে অন্যেরাও দেখছে—হরি হরি! চোর হল শিয়াল একটা।

ফ্যানসা-ভাত নামিয়ে থালায় থালায় ঢালা—বীচেকলা-ভাতে এক এক দলা তার উপর। ভাটিয়াল-চালের মিষ্টি ভাত লোহার কড়াইয়ে রান্না হয়ে সবুজের আভা ধরেছে। ভাত তাতে আরও মিষ্টি হয়েছে যেন। শিশুবর ও অটলের ভাত মাচার নিচে কলাপাতায় দেওয়া হয়েছে। অন্য সকলে উনুনের ধারে গোল হয়ে বসল—কালীময়, নিমি এবং মাঝের-পাড়ার ভুলোর ছেলে-মেয়ে দুটো। ভুলোর পিসি-সম্পর্কীয় দৈবঠাকরুন—খুনখুনে বুড়ি—রোজ সকালে একটাকে কাঁখে তুলে নিয়ে আসেন, আর একটা তাঁর পাশে পাশে আসে। দৈববুড়িও তাদের মাঝখানে বসেছেন, একবার এর গালে একবার ওর গালে ভাত তুলে তুলে দিচ্ছেন। কালীময় দেওর হলেও অলকা তার সামনে খাবে না, নিজের ভাত নিয়ে সে রান্নাঘরে ঢুকল।

রসের ভাঁড় নিয়ে পুঁটি-কমল দেখা দিল। তাদের থালা দুটো দেখিয়ে কালীময় বলল, এত দেরি করলি কেন? বসে পড়্।

পুঁটি ক্ষুণ্ণ স্বরে বলল, রস না খেয়ে বসে গেছ যে তোমরা? বলে গেলাম রস আনতে যাচ্ছি।

কালীময় বলে, ভাতের পর খাব। খালি-পেটে পেট কনকন করে।

বড়গিন্নি রান্নাঘরের দাওয়ায় কুরুনি পেতে নারকেল কোরাচ্ছেন। উঠানের দিকের উনুনে তরঙ্গিণী খোলা-হাঁড়িতে চিঁড়ে ভাজছেন।

দৈবঠাকরুন জিজ্ঞাসা করলেন: সাত সকালে চিঁড়ে ভাজা কে খাবে?

বড়গিন্নী জবাব দিলেন: বিলে যাবেন উনি এখন। আল-ঠেলাঠেলি চলেছে—রাতারাতি আল সারিয়ে খানসুদ্ধ ভাব চুরি করে নিচ্ছে। তাই

বললাম হাসিমুখে যেও না—চাট্টি চিঁড়েভাজা মুখে দিয়ে যাও। বিলের মধ্যে মাথা ঘুরে পড়লে কি হবে।

একটু থেমে বেজার মুখে আবার বলেন, কপাল—বুঝলে ঠাকুরঝি? সমর্থ ছেলেপুলে থেকেও জমাজমির ঝামেলায় কেউ মাথা দেবে না, বুড়োমানুষকে জলকাদা ভেঙে খালে-বিলে ছুটোছুটি করতে হয়। উপায় কি—নয়তো মুখে যে ভাত উঠবে না।

তিন ভাইয়ের মধ্যে অন্য দু-জন বাড়ি-ছাড়া। কৃষ্ণময় এখন কাকার সঙ্গে থাকে। চঞ্চলা যেবারে মারা যায়, কৃষ্ণময়-ও বেরিয়ে পড়েছিল। এস্টেটের সদর-কাছারিতে বুড়ো খাজাঞ্চির সহকারী রূপে দেবনাথ তাকে বসিয়ে দিয়েছেন। হিরুও নেই—নিষ্কর্মা ভাত মারবে ও নতুনবাড়ির আড্ডাখানায় তাস পেটাবে—দেবনাথের কাছে অসহ্য হয়েছিল। ফরেস্টার অমূল্য দামের হেপাজতে হিরুকে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন, ভদ্রলোক বনকরের চাকরিতে হিরুকে ঢুকিয়ে নেবেন কথা দিয়েছেন। ছেলেদের মধ্যে কালীময়ই এখন একা রয়েছে। ঠেঁশটা অতএব তার উপর। ঝাঁঝালো কণ্ঠে সে বলে, জলকাদা ভাঙেন বুড়োমানুষ নিজের দোষে। জমাজমি ওঁর প্রাণ—কাউকে ছুঁতে দেবেন না। আমি না থাকি, আরও দুইভাই এতকাল পড়ে ছিল তো বাড়িতে, পড়ে পড়ে ভেরেণ্ডা ভাজত। তিতবিরক্ত হয়ে তারা বেরিয়েছে।

কালীময় যথারীতি শ্বশুরবাড়ি ফুলবেড়ের ছিল। ভবনাথ সকালবেলা হন্যে যাবেন আ'ল-ঠেলাঠেলির ব্যাপারে—শিশুবর হাটঘাট সেরে কাল রাত্রে খবরটা দিল। শুনেই কালীময় চলে এসেছে। দৈব-ঠাকরুনকে সালিশ ধরে সেইসব বলছে: ভোর থাকতে রওনা হয়েছি। বলি, হাঙ্গামা না হোক, বচসা কথা-কথান্তরের ভয় আছে—বাবার একলা যাওয়া ঠিক হবে না। বাড়ির সব না উঠতেই এসে হাজিরা দিয়েছি। আর কী করতে পারি বলো পিশি।

রোয়াকের উপর রোদ পিঠ করে বসে সবাই বড়ি দিচ্ছে। দৈবঠাকরুনও এসে বসলেন। হাঁ-হাঁ করে ওঠেন তিনি: কী হচ্ছে ছোটবউ, এক্ষুনি কেন? আরও ফেনাও, না ফেনালে বড়ি মুচমুচে হয় না।

তরঙ্গিণী হেসে বলেন, ফাঁপা-বড়িতে তেলের খরচ কত! তেলের ভাঁড় তেলের-বোতল এমনি তো আছড়ে আছড়ে ভাঙেন—ফাঁপা-বড়ির তেল জোগাতে বট্‌ঠাকুর ঠিক লাঠি-ঠেঙা নিয়ে মেরে বসবেন।

টুকটুকি এসে পড়েছে, বড়ি সে-ও দেবে। এদিকে হাত বাড়ায়, থাবা দিয়ে ধরে। তরঙ্গিণী আরও এলাকাড়ি দেন: বটেই তো! বাড়ির মেয়ে হয়ে সে-ই বা কেন বাদ থাকবে? একটুখানি কাই নিয়ে বাচ্চার হাতে

দিলেন : যাও, ঐ পিঁড়িখানার উপর বড়ি দাওগে তুমি। টুকটুকির বড়ি সকলের চেয়ে ভাল হবে দেখো।

কিন্তু ভবী ভোলে না। আলাদা পিঁড়ি সে নেবে না—সকলের মধ্যে বসে একসঙ্গে বড়ি দেবে। বড়ি দেবার নামে লেপটে নয়-ছয় করে দিচ্ছে। অলকা টেনে সরিয়ে নিতে গেল তো কেঁদে পা-দাপিয়ে অনর্থ করে।

তরঙ্গিণী বললেন, বাড়ির মধ্যে একজন এই হয়েছেন—আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে সকলে তোমরা মাথায় তুলেছ।

পুঁটিকে বললেন, ওঠ তুই পুঁটি, বড়ি দিতে হবে না। নিয়ে যা ওকে, ভুলিয়েভালিয়ে রাখ—

জোর করে পুঁটি বাচ্চাকে কোলে তুলে নিল। টুকটুকি নিদারুণ চেঁচাচ্ছে। পুঁটি মিছামিছি আঙুল দেখাচ্ছে : জামগাছে কেমন ঐ ল্যাজঝোলা পাখি দেখ্। আয় রে ল্যাজঝোলা, টুকিকে নিয়ে করোসে খেলা—:

ছড়া বকছে আর মেয়ে নাচাচ্ছে।

এক স্ত্রীলোক এসে দর্শন দিল। শতচ্ছিন্ন ময়লা কাপড়ে আধেক-দেহ জড়ানো। বিড়-বিড় করে আপন মনে সব বকছে। কারো পানে তাকায় না, কারো কাছে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে না, ঘরবাড়ি যেন। কাটারি-খানা প্রায়ই চালের বাতায় গোঁজা থাকে—ঘাড় কাত করে সেখানটা সে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। তরঙ্গিণী দেখতে পেয়ে ঘরের মধ্যে থেকে কাটারি ছুঁড়ে দিলেন। হাসি-হাসি মুখে বলেন, যাক, গুণমণির মতি হল। গামড়াগুলো শুকিয়ে খড়খড়ে হয়ে আছে, রান্না করে সুখ হবে আজকে।

পোয়ালগাদার আড়ালে স্তূপীকৃত নারকেলের গামড়া—গুণমণি তলায় তলায় কুড়িয়ে ঐখানে জড় করে রেখেছে। এক-একটা টেনে কাটারি দিয়ে চিরছে, মুখে অবিশ্রান্ত গালি। যত পরিশ্রান্ত হবে, গালির জোর তত বাড়বে। যখন কাজ করবে না, তখন বিড়-বিড় করে গালি।

মাথায় ছিট আছে। তা সত্ত্বেও কাজকর্ম ভারি পরিষ্কার। গাঁয়ের সব বাড়িতে গুণোর আদর-খাতির সেইজন্য। ডাকাডাকি করে আনা যাবে না, মর্জি মতন হঠাৎ এসে পড়ে। এসেই কাজে লাগবে, বলে দিতে হবে না। বললেও সেই জিনিস যে করবে, তার মানে নেই। বঁটি পেতে হয়তো বসে গেল নারকেল পাতা চিকিয়ে ঝাঁটার শলা বের করতে। অথবা, চিঁড়ের ধান ভিজানো আছে—ধানের কলসি কাঁখে নিয়ে গুণো ঢেঁকিশালে চলল চিঁড়ে কুটতে। অতএব অন্য কেউ তাড়াতাড়ি যাও এলে দেবার জন্য। চিঁড়ের পাড় দেওয়া বড় কষ্টের কাজ, দু'জনের একসঙ্গে দু'খানা পা লাগে। কিন্তু গুণমণির লিকলিকে দেহ হলে কি হয়, একলাই সে পুরো কলসি ধানের

চঁড়ে নামিয়ে দেবে। তবে গালির বন্যা বইয়ে দেবে সেই সময়টা কোন্ অলক্ষ্য শত্রুর উদ্দেশ্যে।

কাঁধে চাদর ফেলে ছাতা ও লাঠি হাতে ভবনাথ হন-হন করে বিল মুখো চললেন। কালীময় পিছনে। জোয়ানযুবো ছেলে বুড়ো বাপের সঙ্গে হেঁটে পারে না। এক-গোয়াল গরুর মধ্যে তিনেট গাই এখন দুধাল। দোওয়ার সময় হয়ে গেছে, খোয়াড়ে আটকানো ক্ষুধার্ত নুলেবাছুর হাম্বা-হাম্বা করছে। রমণী দাসী দু-বেলা গাই দুয়ে দিয়ে যায়। বড্ড দেরি করল আজ। এসে পড়তে উমাসুন্দরী রে-রে করে উঠলেন : বলি, আক্কেলটা কি রমণী? বাছুর মেরে ফেলবি নাকি? আমার বড়বউমারও দিব্যি বাঁটে হাত চলে। বিকাল থেকে আর তোকে আসতে হবে না, বড়বউমা যেটুকু পারে তাতেই হবে।

অপরাধী রমণী দাসী ছুটোছুটি করে খোয়াড়ের বাছুর খুলে দেয়। মিন-মিন করে দেরির কৈফিয়ত দিচ্ছে। ধান কাটার সময় ধান কিছু কিছু ঝরে পড়ে। ঝরা-ধান অনেকে ক্ষেতে কুড়িয়ে বেড়ায়, কপালে থাকলে এক-পালি দেড়-পালি হওয়াও বিচিত্র নয়। সেই কর্মে গিয়ে আজকে রমণী দাসীর—

বলে, পা তুলে দেখাই কেমন করে ঠাকরুন। ডান পায়ের তলা শামুকে কেটে অর হয়েছে। রক্ত থামেই না মোটে, । ॰ করি।

কিন্তু দুধে যে বিভ্রাট। বুধি-শুঁটকি ঠিক আছে—তারা যেমন দেয়, তেমনি দিল। পুণ্যর কি হয়েছে—ঘটির কানা অবধি দুধে ভরে যায়, আজকে তলার দিকে একটুখানি—পোয়াটাক হবে বড় জোর। নুলেবাছুরে পিইয়ে খেয়েছে, তা-ও নয়—বাছুর ঠিকমতো আটকানো ছিল, বড়গিন্নি নিজে খোয়াড়ে ঢুকিয়ে ছিলেন, সকাল থেকে কতবার দেখে এসেছেন।

রমণী দাসী প্রণিধান করে বলল, বুঝেছি, দাঁড়াস-সাপের কম্ম, বাঁট কানা করে গেছে। হচ্ছে এই রকম আজকাল। নুটো গুণীন আসুক—সে ছাড়া হবে না।

দাঁড়াস-সাপ ভারী চতুর। মাঠে গরু বাঁধা, গরুতে ঘাস খাচ্ছে—দাঁড়াস গড়াতে গড়াতে এসে পিছনের দুই পায়ে জড়িয়ে যায় দড়ি দিয়ে পা বেঁধে ফেলার মতন। গরুর আর চাটি মারার উপায় রইল না। সাপ তারপরে মাথা তুলে বাঁটে মুখ লাগিয়ে টেনে টেনে মজা করে দুধ খেতে লাগল। খেয়ে চলে যায়। এমন টানা টেনে গেছে, দুধ আর বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই বাঁটে। বাঁট-কানা বলে একে। ঝাড়ফুঁকের ওস্তাদ নুটোর শরণ না নিয়ে তখন উপায় থাকে না।

রমণী বলে, গুণীন এসে জল পড়ে দেবে। ফ্যানের সঙ্গে জল-পড়া খাইয়ে দিলে বাঁটে ফের দুধ আসবে। মণ্ডলপাড়ার যদুর গাইয়ের ঠিক এই হয়েছিল।

পুণ্যাকে আশফল-তলায় বেঁধে শিশুবর বুধি-গুঁটকিকে নিয়ে মাঠে চলল। গাইয়ের পিছনে বাছুর। ধান কেটে-নেওয়া দেদার মাঠ। খুঁটো পুঁতে পুঁতে সকালবেলা সেখানে অন্যগুলোকে বেঁধে এনেছে, দুধাল এই তিনটে কেবল বাড়ি ছিল। গোয়াল খালি এবার, বড়গিন্নি গোয়াল-বাড়াতে ঢুকলেন। খালি গোয়াল বলা ঠিক হল না—ঘোড়ায় রয়েছে। কমলের ঘোড়া—গুণতিতে দশটা-বারোটা হবে। ঘোড়া বের করে কমল বোধনতলায় রাখল।

গোয়ালে গরুর সঙ্গে ঘোড়া মিশাল—একটি-দুটি নয়, ডজনের কাছাকাছি। তা বলে ঘাবড়াবার কিছু নেই। ঘোড়ারা নির্জীব—খেজুর-ডেগোর দু-হাত আড়াই-হাত মাপের এক এক খণ্ড। ডেগোর মাথার দিকটা চওড়া, এবং বাঁকাও বটে—কাটারি দিয়ে সামান্য সুচাল করে নিলেই ঘোড়ার মুখের আদল এসে যায়। এক জোড়া কলার ছোটার এক মাথা ঘোড়ার মুখের সঙ্গে, অন্য মাথা পিছন দিকে বাঁধা। দুই কাঁধের উপর দিয়ে দুই ছোটা তুলে দিলেই ঘোড়ায় চড়া হয়ে গেল। ঘোড়ায় আর সওয়ারে সেঁটে রইল—পড়ে যাবার বিপদ নেই। আস্তাবলের ঘোড়া আপাতত বোধনতলায় এসে রইল—ঘাস নেই ওখানটা, ভুঁইচাঁপার ঝাড়। খায় তো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ঐ ভুঁইচাঁপা ফুলই খেয়ে নিক।

বেলা হয়ে গেছে। দোওয়া দুধ বাটিখানেক অলকা-বউ তাড়াতাড়ি বলক দিয়ে নিল। এইবারে সবচেয়ে যা কঠিন কাজ—দুধ খাওয়ানো টুকটুকিকে। আস্ত একখানি কুরুক্ষেত্রের ব্যাপার। আসনপিঁড়ি হয়ে কোলের উপর মেয়েকে শুইয়ে ফেলেছে। তারপর জোরজার করে পিতলের ঝিনুকে গলার ভিতর দুধ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। ফেলার কায়দা না পেয়ে বিচ্ছু মেয়ে গ্যাড়-গ্যাড় করে আওয়াজ তোলে গলার ভিতর। কিছুতেই গিলবে না তো নাক চেপে ধরতে হয়। নিশ্বাস নেবার জন্য তখন হাঁ করে, দুধ ঢুকে যায় অমনি।

দুধ খাইয়ে অলকা আঁচলে মেয়ের মুখ পরিপাটি করে মুছে পুঁটির কোলে তুলে দিল। পুঁটি বলে, চলো টুকি, পাড়া বেড়িয়ে আসি আমরা। কাচ-পোকা ধরে টিপ কেটে কেটে রেখেছে—ঘরে নিয়ে বড় একটা টিপ এঁটে দিল টুকির কপালে। পুঁটে বুলছে—টিপ বড় না হলে নজরে আসবে না। রুপোর নিমফলটা খোলা ছিল—কোমর বেড় দিয়ে পরিয়ে দিল সেটা। পায়ে আলতা পরাল। একফোঁটা মেয়ে কতই যেন বোঝে—সারাক্ষণ চুপ করে

আছে। সাজসজ্জা সমাপন করে মেয়ে নিয়ে পুঁটি পাড়ায় বেরুল।

বাড়িতে কাকে এসে ঠোকা না দেয়, নিমি পাহারায় আছে। রোয়াকে চাটকোল পেতে কাঁথার ডালা নিয়ে বসেছে—কাঁথা সেলাই ও বাড়ির পাহারা একসঙ্গে হচ্ছে। সেলাই করতে করতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়, আঙুলে সুঁচও বেঁধে কখনো-সখনো। এই বাড়ির উপর একই রাতে দুই বোনের বিয়ে হয়েছিল—গরবিনী বুড়ি ড্যাং-ড্যাং করে চলে গেল, তার নামে সকলে আজও নিশ্বাস ফেলে। আর পোড়া নিমির মরণ নেই—বাপের-বাড়ি দাসীবৃত্তি চেড়ীবৃত্তির জন্য বেঁচেবর্তে রয়েছে। আজ না হোক, মা বাপের অন্তে হবে ঠিক সেই জিনিস—বিনোর মতন হয়ে থাকতে হবে। এই সমস্ত ভাবে নিমি—ভেবে ভেবে খ্যাপাটে হয়ে যাচ্ছে, একটুখানি ছুঁয়ে কথা বলার জো নেই। হাতের চুড়ি-খাড়ু কথায় কথায় ভেঙে ফেলে। বলে, বিনো-দিদি যা, আমিও তাই। পাতের মাছ বিড়ালের মুখে ছুঁড়ে দেয়। ব্যাধিও ঢুকছে—মাঝেমধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। মৃগী রোগের লক্ষণ মিলে যায়। কলকাতার সুবিখ্যাত কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাভ সেনের সঙ্গে দেবনাথের কিছু ঘনিষ্ঠতা আছে। দেবনাথ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিমির রোগের লক্ষণাদি তাঁকে বলেছিলেন। তিনি কিন্তু গা করলেন না। বললেন, শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দাও, অষুধপত্তোর যত-কিছু সেখানে। পদ্মনাভ কবিরাজের রোগনির্ণয়ে কখনো ভুল হয় না। কিন্তু জামাই দুলালচন্দ্রের ঐ দশা—কেটে কুচি কুচি করে ফেললেও নিমি শ্বশুরবাড়ি মুখো হবে না।

একজোড়া কাঁথা সেলাই করছে সে—টুকটুকিকে দেবে। বউদির কোলের প্রথম সন্তান—গয়না জামা জুতো খেলনা কত জনে কত কি দিচ্ছে। দামের জিনিস নির্মলা কোথায় পাবে—ছেঁড়া কাপড় জোগাড় করে তার উপরে নানা রংয়ের সুতোর কল্কা ফুল পাখি গাছ ঘোড়া মানুষ ইত্যাদি তুলছে। শিল্পকাজে নিমির জুড়ি নেই—কাঁথা সেলাই দাঁড়িয়ে পড়ে দেখতে হয়, পলক ফেলতে মনে থাকে না। লেখাও তুলবে, কয়লা দিয়ে কাপড়ের উপর ছকে নিয়েছে: আদরের টুকুরাণীকে অভাগিনী পিশিমার উপহার। দেখে অলকা রাগ করে: কক্ষনো না। 'অভাগিনী' মুছে দাও—ও আমি লিখতে দেবো না। তোমার জিনিস সকলের সেরা। কাঁথায় আমি মেয়ে শোয়াবো না, পাট করে তুলে রেখে দেবো। মেয়ে বড় হয়ে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাবে, সকলকে দেখাবে: পিশিমা এই জিনিসটা দিয়েছিল আমায়।

বোতলের নারকেলতেল গলানোর জন্য রোয়াকে রেখেছে। চুল খুলে দিয়ে অলকা খানিকটা তেল থাবড়ে চুলের উপর দিল। চানে যাবে, চান

করে এসে হেঁসেলে ঢুকবে।

তরঙ্গিণী বললেন, মেঘের মতন ঘন একপিঠ চুল তোমার বড়বউমা। কিন্তু বিধাতা দিলেই তো হল না, পাটসাট করে রাখতে হয়। সাজগোজের বয়স তোমাদের—তা তোমার সে সব কিছু নেই, উদাসিনী যোগিনীর মতন বেড়াও। চুল ছাড়িয়ে তেল মাখিয়ে দিচ্ছি—ছটফট কোরো না, ঠাণ্ডা হয়ে বোসো।

কবলে পড়ে গিয়ে বড়বউর ঠাণ্ডা হয়ে না বসে উপায় কি। চুল জটা-জটা হয়ে গেছে, তার ভিতর দিয়ে তরঙ্গিণী তৈলাক্ত আঙুল চালাচ্ছেন। চুলে টান পড়ে আঃ-আঃ করছে সে, আর যন্ত্রণায় হাসছে। বলে, কাঁচাচুল ছিঁড়ে যাচ্ছে ছোটমা।

নিষ্ঠুর তরঙ্গিণী বললেন, যাক। যত্ন করবে না তো কি দরকার চুল রেখে। চুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাথায় টাক করে দেবো। এয়োস্ত্রীর মাথায় ক্ষুর ঠেকানো যায় না, নয়তো নন্দ পরামাণিককে দিয়ে মাথা ন্যাড়া করে দিতাম।

বলে হেসে পড়লেন তিনি।

কাঁখে ভরা-কলসি ভিজে-কাপড় সপসপ করতে করতে বিনো পুকুরঘাট থেকে ফিরল। এঁরা চানে যাচ্ছেন, তারই তোড়জোড় হচ্ছে—একলা সে ইতিমধ্যে কখন গিয়ে পড়েছিল, সেরেসুরে ফিরে এলো।

রান্নাঘরের দাওয়ায় কলসি নামিয়ে বিনো গামছায় মাথা মুছছে। তরঙ্গিণী বললেন, পাথরের গেলাসে রস রেখেছি। পেঁপে কলা মুগের-অঙ্কুর বাতাসা আছে। খেয়ে নে আগে। আমরা চান করতে চললাম। ততক্ষণ তুই লাউটা কুটে রাখিস। বেশ ঝিরঝিরে করে কুটবি, ঘণ্ট রাঁধব।

যা ভাবা গিয়েছিল—বিনো বলল, রাঁধব তো আমি।

তা বই কি! কাল একাদশীর কাঠ-কাঠ উপোস গেছে—সাত তাড়াতাড়ি নেয়ে-ধুয়ে এসে উনি এখন উনুনের ধারে চললেন। আমরা যেন কেউ নেই, হাতে যেন কুড়িকুষ্ঠ আমাদের—

বিনো বলে, একদিনের উপোসে মানুষ মরে না। তা-ও জলপানের তো গন্ধমাদন গুছিয়ে রেখেছ।

তরঙ্গিণী অধীর কণ্ঠে বললেন, ওসব জানিনে। কথার অবাধ্য হবি তো—আমি বলে যাচ্ছি বিনো, ফিরে এসে তোর এ-কলসি সুদ্ধ জল উনুনে উপুড় করব। বুঝবি তখন।

বিনো কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, নিত্যিদিন তোমার একটা করে অজুহাত ছোটখুড়িমা—

তরঙ্গিণী কিঞ্চিৎ করুণার্দ্র হয়ে বললেন, আচ্ছা, রাতে রাঁধবি আজ তোরা—তুই আর নিমি দু'জনে। নিমিটাও প্যান-প্যান করে। কথা হয়ে রইল, ব্যস। এখন গোলমাল করতে যাবিনে।

একই রান্নাঘরের এদিকটা আঁশ-হেঁসেল, ওদিকটা নিরামিষ। আঁশে-নিরামিষে কদাপি না ছোঁয়াছুঁয়ি হয়—খুব সামাল। মুক্তকেশী মাঝেমধ্যে আসেন—এ বাবদে বড় কঠিন পাত্র তিনি। আঁশের ছোঁয়া লাগলে নিরামিষ হেঁসেলের উনুন পর্যন্ত ডুবে যাবে, ঐ উনুনের রান্না ইহজন্মে তিনি মুখে তুলবেন না। আর ঐ যে সেদিনকার মেয়ে বিনো—নিমির চেয়ে সামান্য পাঁচটা সাতটা বছরের বড়—মুক্তঠাকরুনের উপর দিয়ে যায় সে। তিলেক অনাচারে রেগে কেঁদে অনর্থ করবে। তরঙ্গিণী নিজে তাই নিরামিষ হেঁসেলে থাকেন, আঁশ দিকটায় বড়বউ অলকা।

এক পাঁজা চেরা-গামছা গুণমণি রান্নাঘরের দাওয়ায় ঝপ করে এনে ফেলল। গোয়াল-বাড়ানো গোবরে ঝুড়ি ভরতি করে তক্ষুনি আবার বেড়ার ধারে চলে গেল সে। কঞ্চির গায়ে মশালের মতন গোবর চেপে চেপে বেড়ার গায়ে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। শুকনো মশাল পোড়াতে বড় ভাল। কোনটার পরে কি করবে, গুণমণিকে বলে দিতে হয় না। বললে হয়তো করবেই না আর-কিছু, ফরফরিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে। যতক্ষণ আছে, হাত দু-খানা চলছেই। উপর ওয়ালা কোথায় যেন চোখ পাকিয়ে রয়েছে—তিলার্ধ জিরান নিলে সে রক্ষে রাখবে না।

॥ পঁচিশ ॥

ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে গ্রামপথে—সামাল, সামাল। মস্তবড় দল—বিমু পটলা বদ্যিনাথ যতীন ইত্যাদি, এবং কমল তো আছেই। আগে পিছে লাইনবন্দী হয়ে জঙ্গলে সুঁড়িপথে দুরন্ত বেগে ছুটছে। পথ ছাড়ো—পাশে গিয়ে দাঁড়াও না। সওয়ারের দল চকিতে ছুটে বেরিয়ে যাবে, আবার তখন পথ চলবে।

আশশ্যাওড়ার ডাল ভেঙে চাবুক করে নিয়েছে—নির্মমভাবে চাবুক মারছে জোর ছুটানোর জন্য। ঘোড়া যেহেতু খেজুরডেগো, যতই মারো ক্ষেপে যাবার শঙ্কা নেই। মানুষজন সামনে পড়লে হাসতে হাসতে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়। তারিপ করে: বাঃ, ঘোড়া তোমাদের খাসা কদম-চালে ছুটেছে। একদিন

কোন্ দরকারে থানা থেকে দারোগা এসেছিলেন। ঘোড়সওয়ার কমল টের পায়নি—ছুটতে ছুটতে একেবারে সামনে পড়ে গেল। দারোগাও ঘোড়ায় চড়ে এসেছেন। বললেন, ঘোড়া একটুখানি দাঁড় করাও খোকা, দেখি। বাঃ, লাগাম-টাগাম সবই তো ষোলআনা আছে। আমার ঘোড়ায় তোমার ঘোড়ায় বদলা বদলি করি এসো। আমার ঘোড়া দু-আনার দানা খায় নিত্যিদিন, তোমার ঘোড়ায় একটি পয়সা খরচা নেই। রাজি থাকো তো বলো। কমল আর নেই সেখানে। জোর ছুটিয়ে ঘোড়া সহ পালিয়ে গেল।

জোর কদমে চলবার মুখে মাঝেমধ্যে ঘোড়া চি-হিহি ডাক ছাড়ে। ক্লান্ত ঘোড়ার পক্ষে যা করা উচিত। ডাকটা বেরোয় অবশ্য সওয়ারের মুখ দিয়ে। নতুনবাড়ির বাঁধাঘাটের সামনে কামিনীফুল-তলায় সওয়ারের কাঁধের ছোটা নামিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। জল খাইয়ে নিচ্ছে ঘোড়াগুলোকে—ডেগোর মাথা সিঁড়ি দিয়ে জলে নামিয়ে দিয়েছে। দূরের পথ—বিশ্রামের সময় নেই, তক্ষুনি আবার রওনা। তেলির-ভিটে হরিতলা টেপুর-মাঠ ভারি ভারি দুর্গম জায়গা পার হতে হবে। তারপর আক্রমণ লুঠপাট—'বর্গি এলো দেশে' বর্গিদের গল্প শুনেছে সে প্রহ্লাদ-মাস্টারমশায়ের কাছে—সেই বর্গিদের মতন।

তীরবেগে ছুটেছে। লক্ষ্যভূমে পৌঁছে গেল অবশেষে। সকলকে সবুজ মটরলতা—শুঁটি সামান্যই ধরেছে, অফুরন্ত বেগুনি ফুল। অতশত কে দেখতে যাচ্ছে—ঝাঁপিয়ে পড়ে অশ্বারোহী দল। দু-এক গোছা সবে উপড়ে নিয়েছে—

ক্ষেতের মধ্যে কারা?

তাজু গাছি পাশের খেজুরবনে মানুষ, কে ভাবতে পেরেছে। ভাঁড় পোড়াচ্ছে তাজু। খেজুররস ঢেলে নেবার পর খালি ভাঁড়গুলো এমুখ-ওমুখ করে সাজিয়ে দিয়েছে—বিচালির লম্বা বোঁদা মাঝখানটায়। বোঁদার দুই প্রান্তে আগুন ধরানো—ধিকি-ধিকি জলতে জলতে আগুন এগুচ্ছে, ধোঁয়া প্রচুর। ধোঁয়া ভাঁড়ের ভিতর ঢুকে যায়। ভাঁড় পোড়ানো এর নাম। ভাঁড়ে ধোঁয়া দেওয়া না হলে রস গেঁজে ওঠে।

ঝিউতপাল (ঝি-পুতের পাল?) কারা এসে পড়লি—দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা—

মুখের তড়পানি মাত্র নয়—কাজ ফেলে তাজু সর্দার মটরক্ষেতে লক্ষ দিয়ে পড়ল, হাতে বাঁক। এ হেন গোলমেলে জায়গায় তিলার্ধ কাল থাকতে নেই। যে যা তুলতে পেরেছে, লুঠের মাল নিয়ে বর্গিদল ঘোড়া ছুটিয়ে দিল আবার। ঘোড়ার সঙ্গে মানুষ কি করে ছুটতে পারবে—তাজু সর্দার ক্ষেতের উপর দাঁড়িয়ে আছে, বিজয়ীরা এক-একবার মুখ ফিরিয়ে দেখে নেয়। পরাজিত সর্দার হিঁ-হি

করে হাসছে : উৎপাত তো আছেই—গরু-ছাগল এসে পড়ে, শজারু-খরগোশ আসে রাত্তিরবেলা, সেই একবার পঙ্গপাল পড়েছিল। আর আছে জল্লাদের এইসব ছেলেপুলে। এই তো আর ক'টা দিন—কালই খোলাটে উঠে গেলে কেউ আর ক্ষেতে আসবে না।

ছুটছিল—ধুপ করে কমলরা ঘোড়া থামিয়ে দিল। মজার পর মজা—পাখি-ধরা এসেছে : গাছে গাছে বেলা পাখি—আজকে ঘুঘু ধরবে, যেহেতু খাঁচার মধ্যে ঘুঘুপাখি দেখা যাচ্ছে।

পাখি-ধরার এক হাতে সাতনলা, আর এক হাতে খাঁচা। সাতখণ্ড বাঁশের নল দিয়ে সাতনলা হয়। একেবারে সরু, তার চেয়ে সামান্য মোটা, তারও চেয়ে মোটা—এমনি সাতখানা। এক নলের গর্তে অন্য নল ঢুকিয়ে শেষমেশ একখানা লম্বা লাঠি হয়ে দাঁড়ায়। আর বাঁশের শলায় বানানো ছোট্ট খাঁচা—খাঁচার মধ্যে বাখারির দাঁড়ের উপর তালিম-দেওয়া পোষা ঘুঘু। দাঁড়ের খানিকটা বেরিয়ে আছে খাঁচার বাইরে—অতিথি-পাখির আসন হবে ওখানে।

এ-ডালে ও-ডালে ঘুঘু ডাকছে। পাখি-ধরা পা টিপে টিপে গাছের তলায় যাচ্ছে। জল্লাদ, দেখা যায়, এখানেও মাতব্বর। হাত তুলল—অর্থাৎ নিঃশব্দ আদেশ : এগোবি নে কেউ এদিকে। ঠোঁটে আঙুল-চাপা দিল—অর্থাৎ : মুখ দিয়ে এতটুকু শব্দ না বেরোয়, পাখি না ওড়ে। পাখি-ধরার হয়ে জল্লাদের কেন খবরদারি এত? পরে জানা গেল, সাগরেদ হয়ে পাখি-ধরা বিদ্যেটাও ষোল-আনা রপ্ত করে নিতে চায় সে। এই বিদ্যের এখন অবধি কিছুটা সে কমজোরি আছে।

কর্মারম্ভ। সরু নলের মাথায় ঘুঘুর খাঁচা বাঁধা। গর্ভগত নল একের পর এক বেরিয়ে আসছে—খাঁচা উঁচুতে উঠছে ক্রমশ। উঠতে উঠতে উঁচু ডাল একটা ছুঁয়ে ফেলল। বাস, স্থিত। খাঁচার পাখি ঘু-ঘুউউ-ঘু—ডাকছে ডাকের ভিতর ভিতর আদর গলে গলে পড়ছে বেশ বোঝা যায়। ডেকেই চলেছে। বৃথা হল না—বনের ঘুঘু উড়ে এসেছে। একটা চক্কোর দিল, তারপর বেরিয়ে আসা দাঁড়ের উপর বসে পড়ল। তখন খাঁচার জন ডাকছে, বনের জনও ডাকছে। অবস্থা ক্রমশ আরও ঘনিষ্ঠ—খাঁচার মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে পোষা জনের গায়ে ঠোঁট ঠেকাচ্ছে বনের জন। সাতনলা ওদিকে দ্রুত গুটিয়ে নিচ্ছে—নলের মধ্যে নল ঢুকিয়ে। বনের ঘুঘু পাখি-ধরার একেবারে নাগালে এসে গেল : হাতে আঠা মাখানো, আঠায় পা এঁটে গেছে—উড়ে পালাবে সে উপায় নেই। আরও আছে। খাঁচার গায়ে ফাঁস ঝুলানো—আদর করার মুখে সেই ফাঁসের মধ্যে গলা ঢুকে গেছে। যত টানছে ফাঁস এঁটে যাচ্ছে।

জল্লাদ পাখি-ধরার সমস্ত কায়দা জানে, শুধু আঠা বানানো শিখে শিলেই হয়ে যায়। সেই দরবারে লোকটার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে।

গ্রাম সোনাখড়ি রাজীবপুর পোস্টাপিসের এলাকাভুক্ত। পিওনঠাকুর যাদব বাঁড়ুয্যে রবিবার আর বিষ্যুৎবার গ্রামে এসে চিঠি বিলি করেন। হাট-বার এই দু-দিন—হাটেও কিছু চিঠি বিলি হয়। সারাদিন কাটিয়ে দিয়ে হাটে মাছ তরকারি কিনে প্রহর খানেক রাত্রে হাটুরে দলের সঙ্গে বাড়ি ফিরে যান। পদরেণু আজ তাঁর পূববাড়িতে পড়ল। বাইরের উঠান থেকে সাড়া দিচ্ছেন: কই গো, কোথায় সব?

রান্নাঘরে অলকা-বউ উসখুস করছে। এ-বাড়ির চিঠি এসেছে—চিঠি না থাকলে পিওনঠাকুর আসতে যাবেন কেন? কলকাতার চিঠি বিস্তর কাল আসেনি—হতে পারে, চিঠি সেখানকার। টুকটুকির বাপই হয়তো বা লিখেছে টুকটুকির মাকে। মানুষটার বিচিত্র স্বভাব। বাড়ি এলে আর নড়তে চায় না। দিনক্ষণ দেখে যাত্রা করে বাইরের-ঘরে উঠল, কোন-এক ছলছুতোয় যাত্রা ভেঙে নিজব পশ্চিমঘরে ঢুকে পড়ল আবার। বারম্বার এমনি যাত্রা-করা এবং যাত্রা-ভাঙা চলতে থাকে। শেষটা হুড়ো আসে কাকামশায় দেবনাথের কাছ থেকে। চিঠি পাঠান: এই হপ্তার ভিতরে হাজির না পেলে বরখাস্ত করব। নিজের ভাইপোকে চাকরি দিয়ে বদনামের ভাগী হয়েছি, এর উপরে কাজের গাফিলতি একটুও সহ্য করব না। তখন যেতে হয়। আর গিয়ে পৌঁছল তো বাড়ির কথা সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে মুছে একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল। চিঠির পর চিঠি দিয়ে এক ছত্র জবাব মেলে না। অলকার কথা ছেড়ে দাও—কিন্তু ননীর পুতুল একফোঁটা এই টুকটুকি আধো-আধো বুলিতে বা-বা বা-বা করে—এর কথাও কি এক লহমা মনে উঠতে নেই? এই সমস্ত ভাবে অলকা, ভেবে ভেবে নিশ্বাস ফেলে।

সেই যে সেবার দুর্গোৎসবের মধ্যে হরিষে-বিষাদ ঘটে গেল। কান্নায় কান্নায় বাড়ি তোলপাড়—একটি মানুষের চোখেই কেবল জল নেই। তিনি দেবনাথ। নিজে তো কাঁদেন না, অধিকন্তু তরঙ্গিণীকে বোঝাচ্ছেন: ও মেয়ে আমাদের নয়। আমাদের হলে নিশ্চয় থাকত। অতিথি হয়ে দু-দিনের জন্য এসেছিল।

ভাবগতিক দেখে ভবনাথ ভয় পেয়ে যান। বলেন, ভাই আমার ভিতরে ভিতরে কাঁদে। এ বড় সর্বনেশে জিনিস। ডাক ছেড়ে কান্না অনেক ভাল, বুক তাতে অনেকখানি হালকা হয়ে যায়।

কালীপুজোর পর ভাইদ্বিতীয়া অবধি দেবনাথ বাড়ি থাকবেন—কোজাগরীর

সন্ধ্যাবেলা মিতে দেবেন চকোত্তি খেড়ি সহ এসে পাশায় বসবেন, চিপিটক-নারিকেলোদক খেয়ে সারা রাত অক্ষক্রীড়া চলবে—পঞ্জিকা মতে কোজাগরী নিশি-জাগরণের যে বিধি। এত সব কথাবার্তা হয়ে আছে। কিন্তু মা-কালী মাথায় থাকুন—কোজাগরীরও দু-দিন আগে ত্রয়োদশীর দিন, সর্বসিদ্ধি ত্রয়োদশী, কোন সিদ্ধির তল্লাসে দেবনাথ যাচ্ছেন কে জানে—কিছুতে আর তাঁকে বাড়ি আটকানো গেল না।

উমাসুন্দরী ভবনাথের কাছে নালিশ জানালেন: ঠাকুরপো চলে যাচ্ছে।

ভবনাথ বললেন, তাড়িয়ে দিচ্ছ তোমরা, না গিয়ে করবে কি?

'তোমরা' ধরে বললেন—কিন্তু আর সবাই চুপ হয়ে গেছেন, এখন একলা তরঙ্গিণী। কাজ করতে করতে আচমকা থেমে সুর করে কেঁদে ওঠেন: ও মা বুড়ি, কোথায় গেলি রে—পূজোয় আসবি কত করে তুই বলে গেলি, ক্ষণে ক্ষণে আমি যে বাদামতলায় পথে গিয়ে দাঁড়াতাম—

উমাসুন্দরী ছুটে এসে পড়েন:- চুপ করো ছোটবউ। কেঁদে কি করবে, সে তো ফিরে আসবে না। কত জন্মের শত্তুর ছিল—বুকের মধ্যে ছ্যাঁকা দিতে এসেছিল, কাজ সেরে বিদায় হয়ে গেছে।

অলকা-বউও বলে, চুপ করো ছোটমা, কমল কী রকম চোর হয়ে আছে দেখ।

ভুলিয়েভালিয়ে কমলকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। বলে, সাপ-ঘুড়ি বানিয়ে দেবো তোমায়। ঝাঁটার-শলা আছে, বঙ্গবাসী-কাগজ আছে, শিশুবরকে দিয়ে দুটো বেল পাড়িয়ে বেলের আঠা নিয়ে নেবো—ব্যস।

ভবনাথ সভয়ে ভাইয়ের পানে চেয়ে চেয়ে দেখেন। আদরের মেয়ের জন্য এ ক'দিনের মধ্যে একটা নিশ্বাস ফেলতে কেউ দেখল না। এখনও তিনি নিরাসক্ত তৃতীয় পক্ষের মতন চুপচাপ দেখে যাচ্ছেন—সন্দেহ হয়, একটু সূক্ষ্ম হাসিও যেন মুখের উপর।

ভবনাথ উমাসুন্দরীকে বলেন, শুধু বউমাকে বলো কেন, দেবও কি কম যায়? জায়গা থাকলে আমিও কোনখানে চলে যেতাম।

রওনা হবার খানিক আগে কৃষ্ণময় বলল, কাকা আমিও যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।

দেবনাথ ভেবেছেন, নাগরগোপ অবধি গিয়ে বাসে তুলে দিয়ে আসবে। দাদার কাণ্ড—ভাইকে একলা ছাড়তে চান না, সঙ্গে ছেলে পাঠাচ্ছেন। এ জিনিস আগেও হয়েছে।

কৃষ্ণময় আরও বিশদ করে বলল, কলকাতায় যাচ্ছি কাকামশায়।

কেন কলকাতায় কি?

বাড়ি বসে বসে ভাল লাগে না। কোন-একটা কাজকর্মে লাগিয়ে দেবেন।

দেবনাথ সবিস্ময়ে তাকিয়ে পড়লেন। এমন সুবুদ্ধি হঠাৎ? তিনিই কতবার এমনি প্রস্তাব তুলেছেন। ক্ষেতের ধান বিল-পুকুরের মাছ প্রজাপাটকের বাড়ি ঘুরে ঘুরে টাকাটা-সিকেটা আদায়—খেয়ে-পরে মানসম্ভ্রম নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে বেশ একরকম কেটে যায়। ধানী-মানী গৃহস্থ বলে এদের। জোয়ানমরদ ছেলেগুলো গ্রামে পড়ে থেকে গজালি পেটে। দিনকাল দ্রুত পালটাচ্ছে—নিষ্কর্মার পেটে ভাত জুটবে না, তাদের দুঃখে শিয়াল-কুকুর কাঁদবে। কৃষ্ণময়কে দেবনাথ কতবার এসব বলেছেন—হুঁ-হাঁ দিয়ে সে সামনে থেকে সরে পড়ে। সেই মানুষই এবারে উপযাচক!

সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেবনাথ বললেন, ব্যাপারখানা কি বল তো।

কৃষ্ণময় থতমত খেয়ে বলল, বাবা বলছিলেন: বাসায় আপনি তো একলা থাকেন—আমি থাকলে তবু একটু দেখাশুনো করতে পারব।

দেবনাথ নিজের মতন অর্থ করে নিলেন: দাদা ভেবেছেন, মনের এই অবস্থায় আমি যদি কোন কাণ্ড করে বসি। তোকে তাই পাহারাদার পাঠাচ্ছেন।

আসল ব্যাপারটা কৃষ্ণময় চেপে গেছে। দেবনাথের সঙ্গে যাবার কথা ভবনাথ একবার শুধু বাপ বলতে পারেন—যেমন বরাবর বলে আসছেন: গিয়ে পড়লে কোন একটা ব্যবস্থা দেবনাথ নিশ্চয় করবে, কিন্তু তুই যে উঠোন-সমুদ্দুর পার হতে একেবারে নারাজ।

বংদাকান্ত থাকলে তিনি এ সঙ্গে টিপ্পনী কাটেন: যা বললে ভবনাথ। যত সমুদ্দুর আছে—তাদের সকলের বাড়া এক-চিলতে এই বাড়ির উঠোন। এ উঠোন পার হয়ে বিদেশ বিভুঁই-এ বেরনো যার তার কর্ম নয়। দস্তুরমতো সাহস-হিম্মত লাগে।

প্রায়ই তো ভবনাথ বকাবকি করেন—বিশেষ করে হাটবারে হাটে যাবার মুখটায়। জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য। দেখ না কেন, সর্ষের-তেলের সের একেবারে পুরো সিকেয় উঠে গেছে— আর কি হাটে তেল কিনতে হবে, তেলের ভাঁড় এনে হাজির করবে। ভবনাথ দুম করে ভাঁড় ছুঁড়ে দেন—মাটির ভাঁড় শতচুর হয়ে যায়। ফল এই হল, হাটে গিয়ে তেল তো কিনলেনই— সেই সঙ্গে নতুন তেলের ভাঁড়। ভাঁড় এযাবৎ কত যে ভাঙলেন আর কিনলেন, লেখা-জোখা নেই। কী করবেন, মেজাজ ঠিক রাখতে পারেন না। সেই সময়টা

কৃষ্ণময় সামনে পড়ে গেলে আর রক্ষে নেই: একলা ভাইটি কত দিকে কত সামলাবে। মাসে দশটা টাকা রোজগার করলেও তো বিস্তর সাশ্রয়। গায়ে বালি মেখে কাঠবিড়ালিও সেতুবন্ধনের কাজে লেগেছিল।

কৃষ্ণময় সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া, সে দিগরের মধ্যে আর নেই। বেশ খানিকক্ষণ গজর গজর করে ভবনাথ শিশুবরকে নিয়ে হাটে চলে যান।

বাপের বকাবকি অতএব নতুন কিছু নয়, গা সহা হয়ে গিয়েছিল। তারপর অলকা-বউ ঘাড়ে লাগল: বেরিয়ে পড়ো, চাকরি বাকরি করোগে। যেমন-তেমন চাকরি দুধ-ভাত, কথা চলতি আছে। চাকুরে-মানুষের বউয়ের মেয়েমহলে আলাদা খাতির—অলকার বড় ইচ্ছে, সকলে তাকে চাকুরের-বউ বলবে। এই একঘেয়ে গাঁয়ে পড়ে থাকা নয়—মাঝেমধ্যে বাড়ি আসবে কৃষ্ণময়। গরুর-গাড়ি নাগরগোপে—পাকারাস্তার পাশে। বাসের ছাদ থেকে মালপত্র নামছে তো নামছেই। যতদিন সে বাড়ি আছে, সকাল-বিকাল লোকের ভিড়ের অন্ত নেই—এ আসছে সে আসছে, নেমন্তন্ন-আমন্ত্রন্ন লেগেই আছে, দেবনাথ বাড়ি এলে যেমনটি হয়। অলকা-বউ ভাবে এ সব আর অতিষ্ঠ করে তোলে কৃষ্ণময়কে। একদিন রাত-দুপুরে অন্ধকার ঘরে কানে কানে কথাটা বলেই ফেলল, মা হতে যাচ্ছি—একটা পয়সার জন্যে শ্বশুর-শাশুড়ির হাত-তোলা হয়ে থাকা এখন আর চলে নাকি? তুমি যাও।

অলকার তাড়নার কথা কাকামশায়ের কাছে বলা যায় না, কৃষ্ণময় সম্পূর্ণ বাপের দোহাই পাড়ল। দেবনাথের দেখাশুনা হবে মনে করে ভবনাথই যেন পাঠাচ্ছেন।

পূজো তারপরে আরও দু-বছর হয়ে গেছে। নামেই দুর্গোৎসব—উৎসব কিছু নেই। ধর্মকর্ম বংশে সয় না ভবনাথ বলছিলেন। দুর্গোৎসব একবার ঠাকুরদাদার আমলেও হয়েছিল পুণ্যশীলা ঠাকুরমার ইচ্ছায়। বোধনের বেলগাছটা সেই সময়ের পোঁতা। দোল-দোল-দুর্গোৎসব তিন পার্বণই বরাবর করে যাবেন, ঠাকুরমার সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু বছরের মধ্যেই সাপে কাটল তাঁকে। ঠাকুরদাদা বললেন, যার জন্যে পূজো—দুর্গাঠাকরুন তাকেই নিয়ে নিলেন। ও ঠাকরুনের মুখদর্শন করব না আর আমি। সে তো হয় না—নিয়ম আছে, দুর্গোৎসব একবার করলে নিদেনপক্ষে তিনটে বছর পর পর চালিয়ে যেতে হবে। তা ঠাকুরদাদারও তেমনি জেদ—বাড়িতে প্রতিমা কিছুতে তোলা হবে না। পুরুতঠাকুরকে টাকা দিয়ে দিতেন। যজমানের হয়ে তিনি নিজের বাড়িতে পূজো সারতেন। দুটো বছর এইভাবে পূজো চালিয়ে দায়মুক্ত হয়েছিলেন ঠাকুরদাদা। এতকাল বাদে রাতবিরেতে

প্রতিমা ফেলে কারা পুজো চাপিয়ে দিল,—পুজোর ফলও মা হাতে-হাতে দিয়েছেন—

ভবনাথ রায় দেবার আগে উমাসুন্দরী দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, প্রতিমা-বরণের সময় মণ্ডপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি বলে দিয়েছি, আবার এসো মা। আনতে হবে. পুরুত বাড়ি-টাড়ি নয়, আমাদেরই মণ্ডপে। মায়ের যা ইচ্ছে তাই হবে, আমাদের কাজ আমরা করে যাব।

পুজো হল আরও দু-বছর। দেবনাথ আসেন নি, টাকা সহ কৃষ্ণময়কে পাঠাতেন। নিতান্ত রীতরক্ষের মতন নমো-নমো করে পুজো।

পিণ্ডনঠাকুর ভিতর-উঠানে এলেন এদিক-ওদিক চেয়ে বললেন, নেই বুঝি ঘোষমশায়—সদরে গেছেন? উঃ, পারেনও বটে। আমার তো এই দেড় ক্রোশ পথ হাঁটতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। আর উনি সদরের দশ ক্রোশ পথ হরবখত যাচ্ছেন আর আসছেন। অথচ বয়সে আমার চেয়ে সাত-আট বছরের বড় তো হবেনই। দেবনাথবাবু আর আমি প্রায় একবয়সি।

রান্নাঘরের কানাচে ক'টা উব্দোঝালের গাছ। উমাসুন্দরী লঙ্কা তুলছিলেন সেখানে গিয়ে, লাল লাল লঙ্কায় আঁচল ভর্তি করে এই সময় এসে দাঁড়ালেন। যাদব চাটুয্যের কথায় সায় দিয়ে বললেন. যা বলেছেন ঠাকুরপো। কী নেশায় ওঁকে পেয়ে বসেছে—পনেরটা দিন যদি মামলি-মোকদ্দমা না থাকে, হাঁসফাঁস করতে থাকেন। গায়ে যেন-জল-বিছুটি মারে।

হাসিমুখে পিণ্ডনঠাকুরকে আহ্বান করলেন: বসুন আপনি, হাত-পা ধোন। আছেন উনি। ধান-কাটা লেগেছে, কালীকে নিয়ে বিলে গেলেন। আজকের সেবা এইখানে কিন্তু। খাল সেঁচা বড় বড় কইমাছ দিয়ে গেছে, জিয়ানো আছে। পায়ের ধুলো যখন পড়ল, পাক শাক আপনার হাতেই হবে।

রন্ধনকর্মে যাদব বাঁড়ুয্যে এক-পায়ে খাড়া। আজ কিন্তু ইতস্তত করে বলেন, দীনু চক্কোত্তি মশায় আগাম নেমতন্ন দিয়ে রেখেছেন যে—

বিনো বলে উঠল. চক্কোত্তিবাড়ির তো বাঁধা নেমন্তন্ন। হবে, খাওয়াদাওয়া সেরে একপিঠে হয়ে বসে যাবেন।

না হে, খেলা নয়—খাবার নেমন্তন্ন আজ। চক্কোত্তিমশায় সেদিন বলে দিলেন, অথর্ব হয়ে পড়েছি—ক'দিন আর বাঁচব। সকাল সকাল চলে এসো, দুপুরবেলা একত্তর দুটো শাক-ভাত খাওয়া যাবে।

বিনো হেসে বলল, তার মনে রাঁধাবাড়ার সময়টুকুও মিছে নষ্ট হতে দেবেন না। গেলেই অমনি হাত ধরে দাবায় নিয়ে বসাবেন।

পিওনঠাকুর ভ্রূভঙ্গি করলেন : চক্কোত্তিমশায়ের সঙ্গে দাবাখেলা—খেলা না ঘোড়ার-ডিম। আগে যা-ও বা খেলতেন, বিছানায় পড়ে থেকে থেকে মাথা এখন ফোঁপরা হয়ে গেছে। ভুল চাল দেবেন, আর চাল ফেরত নেবেন। তবু বলতে হয়,—আতুর মানুষের কথা ঠেলতে পারিনে, কি করব।

দু-হাতে এক জলচৌকি তুলে নিমি রোয়াকে এনে রাখল। বলে, বসুন কাকা—

উমাসুন্দরীর দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে যাদব বলছেন, দাবাড়ে বটে একজন—আপনাদের দেবনাথবাবু। কত খেলেছি—সে এক দিন গিয়েছে। বলতেন, বাইশ চালে মাত করব। মুখে যা বললেন, কাজেও ঠিক তাই করে ছাড়তেন। পাশাতেও তেমনি, হাড়ের পাশা যেন ডাক শুনতে পায়। কচ্চে-বারো, ছ-তিন নয়, পঞ্জুড়ি—চোখ তাকিয়ে দেখ, দানেও ঠিক তাই পড়েছে। অনভ্যাসে এখন নাকি সব বরবাদ হয়ে গেছে—বললেন তো তাই সেবারে।

ছুটোছুটি করে নিমি গাড়ু-গামছা এনে জলচৌকির পাশে রাখল। বলে, বসুন কাকা, হাত-পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হোন।

হাত পা ধুয়ে কি হবে মা, চক্কোত্তিবাড়ি যাব এক্ষুনি।

বিনো বলল, চক্কোত্তি-খুড়িমা রেঁধেবেড়ে পাতের কোলে বাটি সাজিয়ে দেবেন, আর এখানে হলে নিজে রান্না করবেন। কোনটা ভাল, বিচার করে দেখুন পিওনকাকা।

প্রলোভন বিষম বটে। যাদব জলচৌকিতে বসলেন, গলার ঝুলন্ত ব্যাগ নামিয়ে পাশে রেখে দিলেন।

মিথ্যে করে উমাসুন্দরী আরও জুড়ে দিলেন : বেগুন দিয়ে কই-তেল রান্না হবে—বউমা ভয় পেয়ে যাচ্ছিল। আপনার গলা শুনে বলল, ঠাকুরমশায় এসে গেছেন—আর ভাবনা কি। ছাড়বে না ওরা, আপনার কাছে প্রসাদ পাবে বলে নাচানাচি করছে।

যাদব বাঁড়ুয্যে জল হয়ে গেলেন। বললেন, চিঠি ক'খানা বিলি করে আসি তবে। ঝঞ্ঝাট সেরে নিশ্চিন্ত হয়ে বসব।

কিন্তু বাড়ির মধ্যে পেয়ে ছাড়তে এরা রাজি নয়। ভাল মাছ অন্য বাড়িতেও থাকতে পারে। পারে কেন, আছেই। অঘ্রাণে বিলের জলে টান ধরেছে, কুয়ো সেঁচা হচ্ছে—সোল কই মাগুর সিঙ্গি সব বাড়িতে। যাদবকে পেলে হাতের রান্না না খাইয়ে কেউ ছাড়তে চাইবে না—নানান অজুহাতে করে ঠিক আটকাবে।

নিমি আবদারের সুরে বলল, এখন যাওয়া হবে না পিওন-কাকা। ছাড়ছে

কে, যে যাবেন? চিঠি বিলি বিকেলের দিকে হবে। না-হয় হাটে গিয়ে করবেন। যদি কেউ এখন এসে পড়ে, হাতে হাতে নিয়ে যাবে।

উমাসুন্দরী বিনোকে বললেন, দাঁড়িয়ে থাকিসনে মা, বেলা কম হয় নি—সিধেপত্তর গোছা গিয়ে এবার।

যাদবকে বললেন যান, একটা ডুব দিয়ে আসুন। আমরা উনুন ধরাতে লাগি।

বড়গিন্নি উনুন ধরানোর ব্যবস্থায় গেলেন। পুঁটি এসে বলে, চিঠিপত্তোর আছে পিওন-কাকা?

রাঁধাবাড়ার প্রসঙ্গে মত্ত হয়ে পিওনঠাকুর আসল কথাই ভুলে ছিলেন। এইবারে যেন মনে পড়ল। বললেন, থাকবে না মানে? তবে আর এসেছি কেন?

দেমাকের সুরে আবার বলেন, শুধু চিঠি কেন—চিঠি মনিঅর্ডার দুই রকম—

হাসিমুখে নিমি পুঁটিকে ধমক দিয়ে উঠল: চিঠিতে তোর কি দরকার রে? কে পাঠিয়েছে?

রান্নাঘরের অলকা-বউয়ের উদ্দেশে আড়চোখে তাকিয়ে নিমি নিম্নকণ্ঠে বলল, বড়দার চিঠি অনেক দিন আসে নি, বউদি তাই চিন্তিত হয়ে পড়েছে। বিষম চাপা, মুখে কিছু বলে না। বেড়ার ফাঁকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল আপনার গলা পেয়ে।

ব্যাগ হাতড়ে যাদব খামের চিঠি ও মনিঅর্ডার বের করলেন। নজর বুলিয়ে বললেন, ঘোষমশায়ের নামে দুটোই। মামলার জরুরি কথাবার্তা থাকে বলে ওঁর চিঠিপত্তোর অন্যের হাতে দেওয়া মানা। মনিঅর্ডার কলকাতার—জ্যেষ্ঠকে দেবনাথবাবু তিরিশ টাকা পাঠিয়েছেন। কুপনে খবরাখবর আছে। কুপন পড়তে বাধা নেই—

একটুকু পড়ে উল্লাসে বললেন, এই তো, কুশলে আছেন ওঁরা সকলে। তবে আর ব্যস্ত হবার কি?

বুড়োমানুষের কত আর বুদ্ধি হবে! কুশল-খবর জানলেই হয়ে গেল যেন সব। এর বাইরে মানুষের আর যেন উদ্বেগ থাকতে নেই। গোঁসাইগঞ্জের কুশল-খবর তো হামেসাই কানে আসে—যীতমত কুশলে আছে দুলাল। ফোঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে নির্মলা বলল, খামের চিঠি কোথা থেকে আসছে, দেখুন তো পিওন কাকা।

ঠাহর করে দেখে পিওনঠাকুর বললেন, জ্যাবড়া শিলমোহর—দেখে কিছু

বোঝবার উপায় নেই। আঁট-চিঠি ভবনাথ ঘোষে নামে—তাঁর হাতে দেবো, তিনি খুলবেন। মনিঅর্ডারের কুপনে লুকোছাপা নেই, তাই বরঞ্চ পড়ে দেখ—

গোটা গোটা সুস্পষ্ট হস্তাক্ষর দেবনাথের। শুধুমাত্র অক্ষর-পরিচয় থাকলেই আটকানোর কথা নয়। বিড়বিড় করে নির্মলা খানিক বানান করে নেয়। তারপর শব্দসাড়া করে পড়ে ওঠে, রান্নাঘরে অলকা-বউয়ের কান অবধি যাতে গিয়ে পৌঁছয়।

সর্দিকাশি ও জ্বর হইয়া আমায় একেবারে শয্যাশায়ী করিয়া ফেলিয়াছিল। এখন আরোগ্য লাভ করিয়াছি। শ্রীমান কৃষ্ণময় কুশলে আছে। আমাদের জন্য চিন্তা করিবেন না। অত্র তিরিশ টাকা পাঠাইলাম, ইহার অধিক সম্প্রতি সম্ভব হইল না। সংসার-খরচ দশ টাকার মধ্যে কুলাইয়া গেলে মামলা-খরচ বিশ টাকা হইতে পারিবে। আপাতত এইভাবে চালাইয়া লউন, মাসখানেক পরে আবার পাঠাইতে পারিব বলিয়া মনে করি।

যাদব হো-হো করে উচ্চহাসি হেসে উঠলেন: পেটে খাওয়ার যা খরচ, তার ডবল হল মামলার খরচ। দুই ভাই ওঁরা এক ছাঁচের। বিষয় না বিষ—সম্পত্তি থাকলেই ওই রকম হবে। নেই বিষয়, কসবার পথঘাটও তাই আমি চিনি নে। মাইনে যে ক'টা টাকা পাই, পেটে খেয়ে শেষ করি। দিব্যি আছি নির্ঝঞ্ঝাটে আছি।

আচমকা রাজির প্রবেশ। দত্তবাড়ির রাজবালা (বিয়ের আগের নাম রাজলক্ষ্মী), শশধর দত্তের নাতনী। শশধরের বড়ছেলে হরিদাস বহুদিন মারা গেছে তার মেয়ে। এ-বাড়ির নিমির সঙ্গে বড্ড ভাব—ডাকাডাকি কিন্তু 'চক্ষু-শূল' বলে। বলে সই পাতাইনি আমরা—সইয়ের বদলে 'চক্ষুশূল' পাতিয়েছি।

রাজিকে দেখে নিমি কলরব করে উঠল: পিওন-কাকা আসতে না আসতেই টনক নড়েছে। চিঠি নেই—কাকাকে আমি জিজ্ঞাসা করে নিয়েছি।

রাজি লজ্জা পেয়ে বলে, সেই জন্যে বুঝি। জলসাই পাড়তে যাবার কথা না এখন?

পিওনঠাকুর ওদিকে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন: আছে মা তোমার চিঠি। আছে—

ব্যাগের মধ্যে হাতড়াচ্ছেন তিনি।

নিমি বলে, নাঃ, পিওন-কাকা একটু চেপে থাকতে পারেন না। মুখের চেহারা কি হত, দেখতেন।

হাসতে হাসতে তার মধ্যে নিমি নিজেও একটা নিশ্বাস চেপে নিল।

বয়স হলেও বিনো চুপ থাকতে পারে না, এদের মধ্যে ফোড়ন কেটে ওঠে : চিঠি নেই, রাজি বিশ্বাসই করত না। জামাই বড্ড লিখিয়ে-পড়িয়ে—পিওন-কাকার একটা ক্ষেপও বাদ যায় না।

এই যে—। ব্যাগের ভিতর থেকে চিঠি বের করে চশমাটা নাকের উপর তুলে যাদব বাঁড়ুযো ঠিকানা পড়ে যাচ্ছেন : শ্রীমতী রাজবালা বসু, শ্রীযুক্ত বাবু শশধর দত্ত মহাশয়ের বাটি পৌঁছে। নাও তোমারই চিঠি।

সবুজ রংয়ের আটা-খাম, ফুল-লতা-পাতার উপর দিয়ে চিঠি মুখে একটা পাখি উড়ছে—তার ছবি খামের উপরে, এবং পাখির পাশে ছাপার অক্ষরে লেখা 'যাও পাখি বলো তারে—'। দিব্যিদিশেলা আছে খামের আঁটা-মুখের উপর : মালিক ভিন্ন খুলিবেন না—সাড়ে-চুয়াত্তর। এত ব্যাপারের পরেও সশব্দে ঠিকানা পড়ার কি আছে, সোনাখড়ি গ্রামের মধ্যে এমন চিঠি রাজি ছাড়া কার নামে আর আসতে পারে?

চিঠি এগিয়ে ধরলেন পিওনঠাকুর। রাজির লজ্জা—বরের-চিঠি হাত পেতে নেয় কী করে? মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

বিরক্ত হয়ে পিওনঠাকুর বললেন, সেদিনও এমনি করেছিলে। আমি ছুঁড়ে দিলাম, চিলের মতন ছোঁ মেরে নিয়ে ছুঁড়িগুলো পালাল। নিত্যি নিত্যি ও-রকম তো ভাল নয়। আজও ঐ দেখ কতকগুলো এসে পড়ল।

খবর হয়ে গেছে—চারি সুরি ফেক্সি বেউলো সমবয়সিরা সব আসছে। চোখ তুলে রাজি দেখল একবার—পিওনঠাকুরের দিকে তবু এগোয় না, নতমুখে আঙুলে আঁচল জড়ায়।

রাজির সই—সেই দাবিতে নিমি এসে হাত পাতল : আমায় দিন কাকা, আমি দিয়ে দিচ্ছি।

বেড়ালের উপর মাছের ভার—নইলে জুত হবে কেন? যাদব বাঁড়ুযো উচ্চহাসি হেসে উঠলেন। অলকা-বউ ওদিকে উৎসুক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে—না, তার হাতেও নয়। বিনোর ভারিক্কি বয়স, এবং ভক্তিমতীও বটে। দু-খানা মাত্র হাতে দশভুজা হয়ে সে রান্নাবান্নার ব্যবস্থায় আছে। এত সমস্ত সত্ত্বেও ফচকেমি আছে ষোলআনা—কাজকর্ম ভুলে দুই চক্ষু মেলে সে রঙ্গ দেখছে। ইতস্তত করেছেন পিওনঠাকুর। রোয়াকের উপর তরঙ্গিণী ফুলবড়ি কতটা শুকাল আঙুল টিপে টিপে পরখ করছিলেন, নেমে এসে বললেন, চিঠি আমায় দিন ঠাকুরমশায়—

মেয়েগুলোর দিকে দৃষ্টি হেনে বললেন, আমার কাছে কাড়তে আসবে, কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে দেখি।

খাম নিয়ে তরঙ্গিণী রাজির হাতে দিলেন। একেবারেই কাঠের-পুতুল—চিঠি দিয়ে হাতের মুঠো সজোরে বন্ধ করে দিতে হল। দক্ষিণের-ঘরে ঢুকে গেছেন—পটপরিবর্তন অমনি সঙ্গে সঙ্গে। রাজির উপর সবগুলো মেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তুমুল হুড়োহুড়ি—কেড়ে নেবে চিঠি, খুলবে পড়বে। রাজিও আর সে-রাজি নয়—বরের চিঠি মুঠোয় এঁটে কাঠের-পুতুল এখন ঘোরতর লড়নেওয়ালা। ধাক্কাধাক্কি করে একে ঠেলে ওকে চড় কষিয়ে দিয়ে চোঁচাদৌড়। মেয়েরাও ছুটছে। বাড়ি ছেড়ে পথে এসে। ধরবে রাজিকে—ধরবেই। সহজ নয় সেটা। দৌড়চ্ছে রাজবালা—মেয়ে সাত-আটটায় পৌঁছেছে, পিছন পিছন তারা। শিয়ালঘুল্লি দিচ্ছে রাজি—অর্থাৎ পালাচ্ছে একবার এদিক একবার সেদিক, শিয়ালে যে কৌশলে পালায়। পথ ছেড়ে হেড়াঞ্চিবনে ঢুকল। তারপর আম-বাগিচায়—চষা-ক্ষেতে পুকুরপাড়ে। ছুটতে ছুটতে প্রায় তো দত্তবাড়ি, শিন্দেদের বাড়ি, এসে পড়ল। রণে ভঙ্গ দিয়ে ওদিকে এখন মাত্র তিনে ঠেকেছে—চারি, ফেক্সি আর বেউলো। ফেক্সি কাতরাচ্ছে: চিঠি না দেখাবি, কি কি পাঠ দিয়েছে তাই শুধু বলে যা—

কী ভেবে রাজি দাঁড়িয়ে পড়ল। খাম না ছিঁড়ে পাঠের কথা কি করে বলবে। চারজনে তারপর পুকুরপাড়ে জামতলায় গোল হয়ে বসল। ছুটোছুটির মধ্যে নিমি নেই, দলছুট একা সে চিঠি দেখবে। দেখাতেই হবে তাকে, না দেখিয়ে উপায় নেই। চিঠির যথোচিত জবাব দিতে হবে না—সে মুশাবিদা গাঁয়ের মধ্যে এক নিমি ছাড়া অন্য কারো সাধ্য নেই।

মাথায় মাথা ঠেকিয়ে চারজনে পাঠোদ্ধারে মগ্ন। পাশ-করা বর হয়ে মুশকিল হয়েছে, শক্ত শক্ত কথা লেখে, বানান করে পড়তে হয়, বারো-আনা কথার মানেই ধরা যায় না। সাদামাটা 'হৃদয়েশ্বরী' 'চন্দ্রমুখী' 'প্রাণপ্রতিমা' পাঠ লিখে সুখ পায় না—ফলাও করে লেখে, 'হৃৎপিণ্ডেশ্বরী' লেখে 'অরবিন্দাননা'। বাপরে বাপ, উচ্চারণে দাঁত ভাঙে, জল তেষ্টা পেয়ে যায়। নতুন বউয়ের বিদ্যা কতদূর, প্রাজ্ঞ বর সঠিক হদিস পায়নি এখনো। এবং রাজলক্ষ্মী স্থলে রাজবালা—নব-নামকরণের ইতিহাসও সম্যক অবগত নয়। কনে দেখতে এসে পাত্রপক্ষ এতাবৎ গায়ের রং ও নাক-চোখ-মুখের গড়ন দেখত, বিনুনি খুলে মাথার চুল দেখত, হাঁটিয়ে চলন দেখত। এটা-সেটা জিজ্ঞাসা করে কণ্ঠস্বর শুনত। মোচার ঘণ্ট কোন প্রণালীতে রাঁধতে হয়, চালের উপরে ক' আঙুল জল দিলে আর ফ্যান-গালার প্রয়োজন থাকে না—অর্থাৎ সারাজন্ম যা করতে হবে, তার উপরে আজামোজা পরীক্ষা। পরবর্তীকালে আরও এক প্রশ্ন। মেয়ে কি কি শিল্পকর্ম জানে—আসন খাঞ্চপোশ

বোনা, কার্পেটের উপর উল দিয়ে রাধাকৃষ্ণের ছবি তোলা, এসমস্ত পারে কিনা? অসুবিধা নেই—এর-ওর কাছ থেকে দু-চারটে চেয়েচিন্তে এনে রেখেছে, বলে দিস মেয়ে সব নিজের হাতে বুনেছে। সামনে বসিয়ে দিনের পর দিন পরখ করবে কেমন করে?

এ পর্যন্ত ভালই। হুল্লকিল এক ধুয়ো উঠেছে, কনের লেখাপড়া কদ্দূর? বউ নিয়ে গিয়ে সেরেস্তায় বসিয়ে দাখিলে লেখাব, ভাবখানা এই প্রকার। কাগজ-কলম নিতে বলবে: নামটা লেখো দিকি মা—। ঠাকুরদাদা শশধরও তেমনি শক্রতা সেধেছেন—দুনিয়ায় আর নাম খুঁজে পান নি, সোহাগ করে নাতনির গাল-ভরা জাঁকালো নাম দিয়েছিলেন—রাজলক্ষ্মী। নাও ঠ্যালা। নাম নিয়েও দায়ে পড়তে হয়, তখন ওঁদের ধারণায় ছিল না। অ-আ ক-খ সাদামাটা অক্ষরগুলো কায়ক্লেশে যদি-ই বা সাজানো যায়, যুক্তাক্ষর রাজি কিছুতেই বাগাতে পারে না। অথচ নিজ নামেরই শেষে ক্ষ্মী—'ক'য়ে 'ষ'য়ে ক্ষ, তার নিচে একটা ম-ফলা এবং মাথায় দীর্ঘ ঈ-কার। অমন যে প্রহ্লাদ মাস্টারমশায়—তাঁকে দিলেও সম্ভবত গুলিয়ে ফেলবেন। দু-দুটো ভাল সম্বন্ধ ফেঁসে গেল শুধু ঐ নাম লেখার গণ্ডগোলে। নিজের ভুল বুঝে শশধর তখন 'রাজলক্ষ্মী' পাল্টে 'রাজবালা' নাম দিলেন। এবং একমাস ধরে সকাল-বিকাল মকসো করালেন। তবে বিয়ে গাঁথল।

রান্নাঘরের দাওয়ায় আলাদা একটা উনুন। অতিথ-অভ্যাগতের স্বপাক-ভোজনের গরজ পড়লে তখন এই উনুন জ্বলে। সকালের ফ্যানসা-ভাতটাও বর্ষাকালে উঠানে না হয়ে এই উনুনে হয়। বিনো সিধেপত্তোর গুছিয়ে যাদবকে ডাক দিল: আসুন পিওনকাকা—

উনুনের উপর পিতলের কড়াই। জলচৌকির উপর চেপে বসে খুন্তিটা সবে তুলে নিয়েছেন—যাদব চমক খেলেন: কানাচের দিকে কে যেন শাপ-শাপান্ত করছে কাকে?

ও গুণো, কাজকর্মে লেগেছে।—বিনো হেসে বলল, এখন এই। খেটে খেটে আরও কাতর হোক, তখন শুনবেন।

গোপাল নাথের বউ গুণমণি। গোপাল বসন্তরোগের চিকিৎসা করত, টিকা দিত। এখানকার চলতি গোবীজের টিকা নয়—বাংলা-টিকা। মানুষের মধ্যে কারো বসন্ত হলে (বসন্ত নয়, বলতে হয় 'মা-শীতলার অনুগ্রহ') তাই থেকে বীজ নিয়ে টিকা দিত। বড় সাইজের টিকা—গোলাকার রুপোর টাকার মতন। এই টিকা একবার নিলে সারা জন্ম আর বসন্তর ভয় থাকে না। বছর বছর

টিকা নিতে হয় না এখনকার মতো। তবে বাংলা-টিকায় হিতে-বিপরীত হত কখনো-সখনো আনাড়ি টিকাদারদের হাতে পড়ে, নীরোগ মানুষকে সাংঘাতিক বসন্তরোগে ধরত, সে-রোগের চিকিৎসা ছিল না—শেষমেশ রোগীকে চিতায় উঠতে হত। কিন্তু গোপাল নাথের হাতে এমন একটা-দুটোর বেশি ঘটেনি। সে-ও গোড়ার দিকে—হাত পোক্ত হয়নি তখন। নৌকো-দুর্ঘটনায় নির্বংশ হয়ে যাবার পর গুণমণি পাগল হল, গোপালও তারপরে আর নরুণ ধরে টিকা দিতে যায় নি কোথাও। শত অনুরোধ-উপরোধেও না।

গুণমণি সর্বক্ষণ এমনি বিড়বিড় করে। কাজে বসলে অলক্ষ্যে কার সঙ্গে যেন কথাবার্তা শুরু করে দেয়। ক্রুদ্ধ হয়ে ক্রমশ গালিগালাজ—শেষটা চিলের মত চেঁচাবে। ভবনাথ কি উমাসুন্দরী তখন গিয়ে কাজ থেকে তুলে আনবেন, অন্য কেউ সে মূর্তির সামনে এগোয় না। গলার জোর ক্রমশ নরম হয়ে শেষটা আবার বিড়-বিড় করে গালি।

যাদব শুধান: গালি দেয় কাকে?

তা কে জানে? যমরাজকেই বোধহয়। তিন তিনটে ছেলে ডুবিয়ে লহমার মধ্যে যিনি নির্বংশ করে দিলেন। গোপাল নাথকেও হতে পারে—দু'কুড়ি বয়স পার হয়ে গিয়ে কেশোরুগী এই গুণমণিকে বিয়ে করেছিল।

তাই বা কেমন করে? গোপালের উপর গুণমণির টান বিষম। গোপালের বাড়ি এ গ্রামে নয়, পাঁচারই—ভুঁড়িভদ্রা গাঙের উপর। এই মাস কতক আগে সোনাখড়ি এসে ঘর বেঁধেছে। নৌকোডুবিতে তিন তিনটে ছেলে মারা গেল—দহের মুখে পড়েছিল নৌকো। ছেলেদের সঙ্গে গুণমণিও ছিল, ঢেউয়ের মুখে কোনরকমে সে ডাঙায় গিয়ে পড়ে। মাথা খারাপ সেই থেকে। বাড়ি ছিল একেবারে গাঙের উপরে। পাগলের এক বাতিক হল, যখন তখন গাঙে ঝাঁপ দিতে যায়—বলে, ছেলেদের ডেকে নিয়ে আসি। গোপালের বয়স হয়েছে—তার উপর রোগে শোকে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। বিয়েয় কন্যাপক্ষকে ওদের মোটা পণ দিতে হয়—এই পণের সংগ্রহে বর বুড়ো হয়ে যায় অনেক সময়, বুড়ো বরে কচি মেয়ের বিয়ে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সেইজন্য কথা চলিত আছে: 'খুড়ি লায়েক হতে হতে খুড়ো চিতেয় ওঠে।' গোপালের সেই অবস্থা।

মামাতো-ভাই ভগবান দুঃসময়ে দেখতে এসে প্রস্তাব করল: পড়ুটে মানুষ তুমি পাগল-বউ কাঁহাতক চোখে চোখে রাখবে? গাঙের ধারে থাকাও ঠিক হচ্ছে না। চলো আমার বাড়ি। ধরে পেড়ে-সোনাখড়িতে তাদের নিয়ে এলো। নিজের বাস্তুভিটের পাশে আলাদা একটা চালা তুলে দিয়েছে।

এখানে এসে পাগলীর এক নতুন রোগ-লক্ষণ দেখা দিল। গোপালকে সে

চোখে হারায়। এক একদিন চাল বাড়ন্ত থাকে—সে দিন গুণমণি বাড়িতে না রেঁধে ভাত রোজগারে বেরোয়। একটানা খেটে যাবে দুপুর অবধি, তারপর কাঁসর পেতে ধরবে। গৃহস্থ ভাত দেয়। ভাত গুণমণি সেখানে বসে খাবে না, বাড়ি নিয়ে আসবে। একজনের ভাত দিলেও হবে না—দুজনের মতো। বাড়ি এসে গোপালকে ভাত বেড়ে দিয়ে নিজে সামনে বসে। বেশ করে না খেলে ঝগড়া করে। এমন কি সময় বিশেষে চড়টা-চাপড়টাও দেয় নাকি। ঠিক যেমন মরা ছেলেদের উপর করত।

বিনো আছে পিওনঠাকুরের কাছে। আচমকা এই কাজটা পেয়ে বর্তে গেছে সে। বাটনা বাটছে, জল এনে দিচ্ছে পুকুরঘাট থেকে। এটা দাও ওটা আনো—ফাইফরমাস খাটছে। ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়, সদাসতর্ক।

পাড়ার মধ্যে খবর হয়ে গেছে, পিওনঠাকুর গাঁয়ে এসেছেন। এবং পাড়ার বাইরেও কোন কোন বাড়ি। চিঠিপত্তোর এলো কিনা খোঁজ নিতে সব আসছে এমনিটাই হয়ে থাকে—জানা আছে যাদবের। রাঁধতে রাঁধতে চামড়ার ব্যাগ ছোঁবেন না—চিঠি বের করে শাক-ধোওয়া ডালায় রেখেছেন, চিঠির মালিক এসে পড়লে বাঁ-হাতের দু-আঙুলে তুলে আলগোছে সেই লোকের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছেন।

লাঠি ঠুক-ঠুক করতে করতে গৌরদাসের মা-বুড়ি পাঁচিলের দরজায় এসে দেখা দিল। সর্বনাশ, পিওন আসার খবর অদ্দুর ঐ মেঠোপাড়া অবধি পৌঁছে দিতে গেল কে? ফিচেলের অভাব নেই—মজা দেখবার অভিপ্রায়ে নিশ্চয় কেউ খবর দিয়ে এসেছে। তোবড়ানো মুখ বুড়ির—গালে একটি দাঁত নেই, কোনো এক কালের ফর্সা রং জ্বলেপুড়ে তামাটে হয়ে হয়ে গেছে। চোখ দুটো কোটরের মধ্যে তলিয়ে রয়েছে। তবু সে চোখের দৃষ্টি বাঘের দৃষ্টি। দৃষ্টিটা যাদব বাঁড়ুয্যে বড্ড ডরান। বাঘ সত্যি সত্যি একবার বাঁড়ুয্যে মশায় দেখে-ছিলেন, বাঘের একেবারে মুখোমুখি পড়েছিলেন। বাদার বাঘ মাঝে মাঝে তল্লাটে ঢুকে পড়ে, তেমনি একটা হবে। হাটুরে মানুষ দশ-বারোজন হাট-ফেরতা বাড়ি যাচ্ছে—যাদব বাঁড়ুয্যেও তাদের মধ্যে। জ্যোৎস্না রাত—পথের ধারে বেতঝোপের পাশে বাঘ তাকিয়ে রয়েছে। এতগুলো গলায় হাঁক পেড়ে উঠতে—যেন কিছুই নয় এমনি একটা অবহেলার ভাব নিয়ে বাঘ ঘনজঙ্গলে ঢুকে পড়ল। চকিত হলেও যাদব বাঘের দৃষ্টি দেখেছিলেন—সে-ও কিন্তু গৌরদাসের মা-বুড়ির মতন এমন ভয়ঙ্কর নয়।

এমনি তো ত্রিভঙ্গ-দেহ—রান্নাঘরের ছাঁচতলায় এসে লাঠির উপর ভর দিয়ে

কী আশ্চর্য! বুড়ি টান-টান হয়ে দাঁড়াল। মাজায় কড়াত করে আওয়াজও হল যেন। ভূমিলগ্ন সাপ ফণা তুলে হঠাৎ যেন খাড়া হয়ে ওঠে।

খোনা গলায় বুড়ি বলে উঠল, ঝোল ফুটছে কড়াইয়ের মধ্যে—তা অত কি দেখছ ঠাকুর? তাকাও ইদিকে। এলো আমার গৌরদাসের চিঠি?

যাদব ঘাড় নাড়লেন।

আজও নয়? চিঠি তুমি কতকাল দাওনি বলো তো ঠাকুর?

বিপন্ন যাদব বলেন, ভাল রে ভাল। ডাকে না এলে আমি দিই কেমন করে?

বিনোর দিকে চেয়ে অসহায় কণ্ঠে বললেন, অবুঝকে কী করে বোঝাই। তুমি মা বিনোদিনী চেষ্টা করে দেখ। ছেলে চিঠি দেবে না, তার চিঠি আমি লিখে আনব নাকি?

বুড়ি চোখ পাকিয়ে পড়ে: বটে! গৌরদাস আমার তেমন ছেলে নয়। চিঠি সে ঠিক লিখে যাচ্ছে. তুমি গাপ করে ফেল। বড়লোকের পা চাটা তুমি ঠাকুরমশায়। ব্যাগ ভরতি করে তাদের চিঠি গাদা গাদা আনতে পারো, আমার গৌরের একখানা চিঠি নিয়ে আসতে হাত কুড়িকুষ্ঠ ধরে তোমার। উচ্ছন্নে যাবে, খানেখরাপে যাবে, ভিটেয় তোমার ঘুবু চরবে—

নারদ, নারদ!

কানাচে কাং। খলখল করে হেসে উঠল। কলহের দেবতা নারদ—অলক্ষ্যে আবির্ভূত হয়ে জিনিসটা তিনি আরও জোরদার করবেন, এই জন্য ডাকাডাকি। ডেকেই দৌড়।

আঙুল মটকে মটকে বুড়ি গালি পাড়ছে। পিওনঠাকুর একেবারে চুপ। অপরাধী বটে তিনি, চিঠি সত্যিই গাপ করেছিলেন। আক্রোশ মিটিয়ে বাক্য-শেল নিক্ষেপ করে বুড়ি অবশেষে ফিরে চলল। পূর্ববৎ কুঁজো হয়ে গেছে—মাটি থেকে মাথা হাত দেড়েক মাত্র উঁচুতে। লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে গৌরদাসের মা বাড়ির বার হয়ে গেল।

মাথা নিচু করে আছেন যাদব বাঁড়ুয্যে। উনুনে কাঠ ঠেলে দেওয়া হয়নি—নিভে যাবার গতিক।

বিনো বলে, কি হল পিওনকাকা? বুড়ির কথা কানে নেবেন না। মাথার ঠিক নেই ওর।

হঠাৎ যেন সম্বিত পেয়ে যাদব উনুনে খান দুই গামড়া গুঁজে দিলেন। চিঠি গাপ করেছেন সন্দেহে বুড়ি শাপশাপান্ত করে গেল। ব্যাপারটা সর্বাংশে সত্য। সরকারি লোকের পক্ষে অতিশয় গর্হিত কাজ—কোন দিন কাউকে জানতে

দেবেন না। মাস তিনেক আগে এই গাঁয়ের নতুনবাড়িতে এমনিধারা এক-দিন রান্না চাপিয়ে বসে ছিলেন। 'হাঁ' এবং 'না' এর মধ্যে মন দুলছিল—হঠাৎ এক সময় পোস্টকার্ডের চিঠিখানা উনুনে ঢুকিয়ে দিলেন। পেটের দায়ে গৌরদাস জব্বলপুর নামে কোন এক সুদূর অঞ্চলে রেলের কাজ নিয়ে গিয়েছিল। ত্রিসংসারে ঐ ছেলে ছাড়া বুড়ির কেউ নেই। নতুনবাড়িতে আয়োজনও গুরুতর—প্রকাণ্ড রুইমাছ ধরেছে, সোনামুগের সঙ্গে মাছের মাথা দিয়ে মুড়িঘণ্ট পাক হচ্ছে। হাটবার বলে বুড়ি তো তক্কে তক্কে আছে, এক্ষুনি এসে পড়বে। চিঠিও এসেছে আজ—জব্বলপুরের চিঠি। পিওনঠাকুর ব্যাগ থেকে চিঠিখানা বের করে আলাদা করে রাখছেন। এমনি সময় নজরে পড়ে গেল গৌরদাসের মৃত্যুসংবাদ। গৌরেরই কোন বন্ধু পোস্টকার্ড লিখে মাকে খবর জানিয়ে দিয়েছে। এ চিঠি বুড়ির হাতে পৌঁছালে এক্ষুনি তো মড়াকান্না পড়ে যাবে। মুড়িঘণ্ট মাটি। শোকের আঘাতে বুড়ি নিজেই হয়তো মারা পড়বে।

যাদব বাঁড়ুয্যের বিস্তর দিনের চাকরি, চিরকাল নিষ্কলঙ্ক কাজকর্ম করে এসেছেন। অবসর নেবার মুখে দুষ্কার্য করে বসলেন, পোস্টম্যানের পক্ষে যার চেয়ে বড় অপরাধ হয় না। চিঠিখানা জ্বলন্ত উনুনে ঢুকিয়ে দিলেন। ছেলে বেঁচে নেই, গৌরদাসের মা আজও জানে না। কিন্তু মনে পাপ আছে বলে পিওনঠাকুর তাকে এড়িয়ে চলেন। বিট বদলে ফেলে এই সোনাখড়ি মুখোই আর হবেন না, অনেকবার মতলব করেছেন। কিন্তু পোস্টমাস্টারকে বলতে গিয়েও বলেন নি। গৌরদাসের মায়ের আতঙ্ক সত্ত্বেও এই গাঁয়ের দুটো দুর্বার আকর্ষণ—কয়েকটি উৎকৃষ্ট আড্ডা আছে, চিঠি বিলি উপলক্ষ্যে এসে সারা বিকালটা জমিয়ে দাবা পাশে খেলে যান। এবং যাবার মুখে হাটঘাট করে বাড়ি ফেরেন। সোনাখড়ির হাটে ভাল মাছ-তরকারির আমদানি হয় এবং দামে কিছু সস্তা। বিটের বার সে জন্য হাটবার দেখে ঠিক করেছেন।

দিগ্বিজয় অন্তে অশ্বারোহীরা যে যার বাড়ি যাচ্ছে। দল ভেঙ্গে গিয়ে কমল একা এখন। টুকটুকিকে নিয়ে পুঁটিও পাড়া বেরিয়ে ফিরল। সুপারিবনে খোলা পড়ল একটা—ছুটে গিয়ে কমল কুড়িয়ে আনে। এক খেলা সারা করে এলো তো আর এক খেলা মাথায় এসেছে। পুঁটিকে বলে, গাড়িতে চড়ে আয়। টুকটুকিকে বাড়ি দিয়ে আয় আগে। তুই টানবি, আমি বসব। তারপরে তোর বসার পালা।

ঘাড় ঝাঁকিয়ে পুঁটি আপত্তি জানায়: এই এতক্ষণ ঘোড়ায় চড়ে এলি, চড়ে চড়ে তোর আশ মেটে না খোকা। তুই নোস, আমি নই—আমরা কেউ

না, টুকটুকি চড়বে। ওর বুঝি গাড়ি চড়তে ইচ্ছা হয় না। তুই টান, আমি ওকে ধরে থাকব—ধরে ধরে চলে যাব। জোরে টানবি নে কিন্তু, গড়িয়ে পড়বে।

খোলার উপর বসিয়ে দিয়েছে। ইঁদুরের মতন চিকচিকে দাঁত ক'টি মেলে হাসছে কেমন টুকটুকি—মজা পেয়ে গেছে। পাতার আগা ধরে যেই না কমল টান দিয়েছে—দিব্যি তো হাসছিল, মুখভার কেমনধারা হয়ে গেল, কেঁদে পড়ে বুঝি এইবার। কাঁদল না, সামলে নিল। খোলায় বসে সমনের দিকটা কেমন শক্ত করে ধরেছে দেখ—একেবারে বড়দের মতন। পুঁটিরা হলেও ঠিক এই করত।

উঠানে এসে পুঁটি চেঁচাচ্ছে: ও বউদি, গাড়ি চড়ে তোমার মেয়ে বাড়ি এসেছে কেমন দেখ।

বেড়ার ফাঁকে হলকা এক নজর তাকিয়ে দেখল। দাওয়ায় পিতনঠাকুর, চেঁচিয়ে কথা বলতে পারে না। উঠে দাঁড়িয়ে টুকটুকির গাড়ি চড়ে আসা ভাল করে দেখবে, তা-ও সম্ভব নয়। ছোটশাশুড়ি নিরামিষ হেঁসেলে—তিনি ভাববেন, দেখ, রান্নাবান্না ফেলে হাঁ করে মেয়ে দেখছে। সে বড় লজ্জা।

উমাসুন্দরী কোন দিক দিয়ে এসে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন: দেখ, উদভট্টি কাণ্ড দেখ একবার, বাচ্চা নিয়ে খোলার উপব বসিয়েছে। মুখ থুবড়ে পড়বে এক্ষুনি। নামা বলছি, নামিয়ে কোলে করে আন। দুধ খাবার সময় হল, মায়ের কাছে এনে দে।

গুণমণির কাজ শেষ। আর এখন মাথা খুঁড়ে মরলেও কিছু করবে না। রান্নাঘরের পিছন দিকে এক দরজা—সেইখানে গিয়ে কাঁসর পাতল। বুড়ো গোপাল বাড়িতে চান-টান করে পথ তাকাচ্ছে। পেট চনচন করছে, অন্য কিছু না পেয়ে কলকের পর কলকে তামাকই টেনে যাচ্ছে শুধু। গুণমণি ঐ যে কাঁসর পেতে রেখেছে, সেখানে ভাত পড়বে দু-জনের মতন, প্রতিটি তরকারি সমান দুই ভাগে। হেরফের হলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গুণমণি গালির চোটে পাড়া তোলপাড় করবে।

ভাতের কাঁসর নিয়ে গুণমণি সুপারিবাগানের সুঁড়িপথ ধরে নাথপাড়ায় চলল।

পাথরের থালায় ভাত, বাটিতে বাটিতে তরকারি, প্রকাণ্ড দুধ-খাওয়া বাটিতে ঘন-আঁটা দুধ আমসত্ত ও নলেন-পাটালি। যাদব বাঁড়ুয্যে ডাকসাইটে রাঁধুনি, ভোজের রান্নায় ডাক পড়ে, তাঁর হাতের সাধারণ সামান্য ব্যঞ্জনেও অপরূপ এক তার--অন্য কারো রান্নায় সে জিনিস পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র

ভাত আর মাছের খোলটা নামিয়ে নিয়ে ভোজনের পাট তাড়াতাড়ি সেরে দাবায় বসবেন, এই মতলব করেছিলেন। নিমি বলল, পিওনকাকা, যেদিন আপনার পাত পড়ে পাঁচ রকম ভালমন্দ প্রসাদ পেয়ে থাকি আমরা। আজকে কেন তা হবে না? নিমি বলে যাচ্ছে, আর মাথার কাপড় একটু তুলে দিয়ে তরঙ্গিণী হাসছেন। নিমির কথা ছোটগিন্নিরও কথা এবং বাড়িসুদ্ধ সকলের কথা, বোঝা যাচ্ছে গৃহস্থর ইচ্ছায় এতগুলো পদ রাঁধতে হল পিওনঠাকুরকে।

রেঁধেবেড়ে এইবার খেতে বসবেন,—কাশীময় ভবনাথ বিল থেকে উঠে বাড়ি ঢুকলেন। কাশীময় গজর-গজর করছে: বয়স হয়েছে তা মানবেন না। অন্যের উপর ভরসা পান না, সব কাজে আগে বাড়িয়ে গিয়ে পড়বেন। শামুকে কেটে পায়ের তলা ফালা-ফালা হয়েছে, শামুকের কুঁচি বিঁধেও আছে দু-চার গণ্ডা। আ'লে পা হড়কে পড়েছিলেন—আমি না ধরে ফেললে হাডগোড় চূর্ণ হয়ে যেত আজ।

এ সমস্ত ভবনাথের কানে যাচ্ছে না, পিওনঠাকুরকে বাড়ির উপর দেখে পরমাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন: চিঠি-পত্তোর আছে আমার?

যাদব সহাস্যে বললেন, চিঠি আছে। আর সকলের বড় যা তা-ও আছে। মনিঅর্ডার?

দু-হাতের দশ আঙুল পাশাপাশি বিস্তার করে যাদব বললেন, তিনখানা।

অর্থাৎ দশ টাকার নোট তিনখানা মনিঅর্ডার এসেছে। বললেন, বসুন, টাকাটা দিয়ে দিই আগে, তারপরে খেতে বসব। পরের কড়ি যতক্ষণ আছে, ভারবোঝা হয়ে থাকে।

রান্না হচ্ছে বলে চামড়ার ব্যাগ যাদব চালের নিচে আনেন নি, উঠোনের সেইকাঠের গায়ে সর্বচক্ষুর সামনে ঝুলিয়ে রেখেছেন। সই করার জন্য ফরম হাতে দিয়ে হাসতে হাসতে বলেন, সংসার-খরচা হল দশ টাকা মামলা-খরচা তার দুনো—

ভবনাথ লুফে নিয়ে বলেন, দশ-ই বা লাগে কিসে সংসারে? খাওয়ার কুল্যে জনা বারো, না হয় পনেরোই হল। ধানচাল ডালকলাই তরিতরকারি সবই ক্ষেতের, গোয়ালে দুধাল গাই তিনটে, শুকনোর মাস ক'টা বাঁধ দিয়ে খালের মাছও নিখরচায় অল্পবিস্তর আসে। মামলার পক্ষে বিশ টাকায় অবশ্য কুলানো মুশকিল। সংসার-খরচা থেকে কিছু টানতে হবে ইদিকে।

কুপনে চোখ বুলিয়ে চিন্তিতভাবে বলে উঠলেন, দেবনাথের শরীরটা ইদানীং ভাল যাচ্ছে না। ব্যস্ত হব বলে আমায় কিছু জানায় না। কাকার খানা শুনে কেষ্টাটাও চাপা দিয়ে যায়। এত করে লিখছি, বাড়ি এসে মাস-তিন

ভায় থেকে যাও। ডাক্তার-কবিরাজ কিছু লাগবে না, এমনিতেই চাঙ্গা হয়ে যাবে।

খামের-আঁটা চিঠি। পিওনঠাকুর বললেন, পাটোয়ারি মানুষের নামে রকম-বেরকমের চিঠিপত্তোর আসে—এ চিঠি তাই কারো হাতে দিই নি।

ভাল করেছেন—

ঠিকানার লেখা ভবনাথ ঠাউরে ঠাউরে দেখেন। এমনি হল তো ঘরে গিয়ে চশমা-জোড়া নিয়ে এলেন। হাতের লেখা থেকে হদিস হল না। খামটা রোদে ধরে আন্দাজ নিলেন ভিতরের চিঠি কোন দিকটায়। ছুরি নিয়ে এসে সন্তর্পণে খামের মুখ কেটে চিঠি বের করলেন।

দু-দুটো পয়সা খরচা করে খামের চিঠি কে আবার লিখতে গেল—বড়গিন্নি এক নজরে তাকিয়ে আছেন। মুখ তুলে ভবনাথ বললেন, তোমার ছোটছেলের বিয়ে গো—

উমাসুন্দরীর বোধগম্য হয় না: কার বিয়ে বললে?

হিরুর বিয়ে এ মাসের তেইশে। তোমার ভাই নেমন্তন্ন পাঠিয়েছেন, সর্বারম্ভে গিয়ে পড়ে শুভকর্ম তুলে দিয়ে এসোগে।

উমাসুন্দরী অবাক হয়ে বলেন, বনকরের চাকরি করছে না সে?

চাকরি না ঘোড়ার-ডিম। বনকরে যেতে বয়ে গেছে তার। দেবনাথের টাকা সস্তা—চাকরির নামে এককাঁড়ি টাকা খসিয়ে মামার-বাড়ি বিয়ের বর-পাত্তোর হয়ে বসেছে।

ভবনাথ রাগে গরগর করছেন। বড়গিন্নিও দুঃখ হয়েছে—পেটের ছেলের বিয়ের পরের মতন নেমন্তন্নের চিঠি পাঠিয়েছে। তার মধ্যে ভরসাও যৎকিঞ্চিৎ: বিয়েথাওয়া হয়ে ঘরসংসারে মতি হয় যদি এবারে। বাড়িসুদ্ধ জ্বালাতন-পোড়াতন এই ছেলে নিয়ে। রাজীবপুর হাইইস্কুলে চেষ্টা হয়েছিল গোড়ায়। সুবিধা হয় না দেখে দেবনাথ নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে শহরের ইস্কুলে ভরতি করে দিলেন। পড়াশুনো হিরুর কাছে বাঘ—এক নিশিরাত্রে টিপিটিপি দুয়োর খুলে সে লম্বা দিল। ছেলেমানুষ একা একা রেল-স্টিমার করে এবং ক্রোশের পর ক্রোশ পায়ে হেঁটে বিস্তর ঘাটের জল খেয়ে অবশেষে বাড়ি এসে উঠল। আছে বাড়িতে—বয়সও হচ্ছে, সংসারের কুটোগাছটি নাড়বে না। খায় দায় আর সমবয়সি নিষ্কর্মা কতকগুলোর সঙ্গে তল্লাট জুড়ে উৎপাত করে বেড়ায়। নতুনবাড়িতে নিশিদিনের আস্তানা—তিনবেলা শুধু খাওয়ার সময়টা মিনিট কয়েকের জন্য বাড়ি আসে।

এমনি চলছিল। দেবনাথ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, ভবিষ্যৎ ভাবতে হবে বইকি।

জমিদারি এস্টেটের ম্যানেজার হওয়ায় বহু জনের সঙ্গে তাঁর জানাশোনা দহরম-মহরম। বাড়ির বড়ছেলে কৃষ্ণময়কে নিজ এস্টেটে ঢুকিয়ে নিয়েছেন। মেজো জন শ্বশুরবাড়ি গিয়ে আছে—শ্বশুর যা রেখে গেছেন, নেড়ে চেড়ে দিব্যি কেটে যাচ্ছে। ছোট হিরন্ময় মাথা ঠাণ্ডা করে একটা কিছুতে লেগে গেলে আর ভাবনা থাকে না। অনেক রকম করে দেখেছেন দেবনাথ—গোড়ায় ঠিকাদারি ফার্মে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। পরে উকিলের সেরেস্তায়, তারপরে মার্চেন্ট অফিসে এবং শেষে কাঠের গোলায়। কোথাও বনিয়ে থাকতে পারে না, ঝগড়াঝাঁটি করে চাকরিতে ইস্তাফা দিয়ে বেরোয়। এইবার এত দিনে ঠিক হয়েছে। ফরেস্টার অম্বুজাক্ষ দাম—খুঁজলে দেবনাথদের সঙ্গে বোধহয় একটু আত্মীয়-সম্বন্ধও বেরিয়ে যাবে—একটা চকের বন্দোবস্ত নেবেন বলে কিছু দিন ধরে খুব হাঁটাপেটা করছেন। বনকরের শিক্ষানবিশী কাজে দেবনাথ হিরুকে দাম-মশায়ের হেপাজত করে দিলেন। এইবারে ঠিক হয়েছে—বাড়ির সবাই নিশ্চিন্ত, বাদার জঙ্গলই হিরুর উপযুক্ত জায়গা। জঙ্গলে সঙ্গীসাথী ইয়ারবন্ধু নেই, মন বসিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে কাজকর্ম করতে পারবে। যেমন-তেমন চাকরি নাকি দুধ ভাত—বনকরের চাকরি তা হলে সেই নিরিখে দুধে-চান করা, আঁচানো। ফরেস্টার অম্বুজই তার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত—চকের পর চক কিনে যাচ্ছেন।

হরি, হরি! কোন কৌশলে কবে যে হিরন্ময় অম্বুজ দামের চোখ এড়িয়ে-বাদাবন ছেড়ে মামার-বাড়ি গিয়ে উঠেছে, অন্তর্যামী ঈশ্বর বলতে পারেন। আর পারেন খানিকটা বোধহয় মাতুল ভূদেব মজুমদার। চাকরিবাকরি বাতিল করে সে বিয়ে করতে চলল। দিন দশেক মাত্র বাকি সে বিয়ের।

॥ ছাব্বিশ ॥

বিয়েয় ভবনাথ যাবেন না, যেতে পারেন না। বাপ মা খুড়োখুড়ি এবং চারি চরণে সমস্ত বর্তমান থাকতে মামার-বাড়িতে মামার ব্যবস্থায় বিয়ে হতে যাচ্ছে—কোন মুখ নিয়ে ভবনাথ কাজের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াবেন? লোকে শুধায়: বিয়ে কোথায় হচ্ছে বড়কর্তা? কালো মুখ করে ভবনাথ জবাব দেন: আমি কিছু জানি নে, বাড়ির মধ্যে জিজ্ঞাসা করো গে।

বাড়ির মধ্যে অর্থাৎ উমাসুন্দরীর সঙ্গে মন-কষাকষি এই ব্যাপারে। বিয়েয় যাবেনই তিনি। অন্যায় তো এদেরই—অত রাগের কি আছে, ছেলেয় ভাগনেয় কি তফাত? দাদার ছেলে নেই, পুত্তের-বউর স্থলে ভাগনে-বউ এনে

সাধ মেটাবেন। আগের দু-ছেলের বিয়ে তোমরা দিয়েছ—দাদা-বউঠান দু'-জনে এসে পড়ে কাজ তুলে দিয়েছেন। হিরুর বিয়েটা এবারে তাঁরাই না-হয় দিলেন।

উমাসুন্দরী যাচ্ছেন। নেমন্তন্ন পেলে কালীময় পাধ্যপক্ষে কখনো ছাড়ে না—মাকে নিয়ে সে যাচ্ছে। কনিষ্ঠের বিয়ের বরযাত্রী হয়েও যাবে। এবং বুড়োমানুষ মামা কন্যাপক্ষের বাড়ি সশরীরে যদি না যেতে পারেন, কালীময়ই তখন বরকর্তা।

পুঁটি লাফাতে লাফাতে এসে বলল, আমিও যাচ্ছি রে। জেঠিমা বলেছে। কমল বলে, আমি?

তোকে নেবে না। তুই যে মা ছেড়ে থাকতে পারিস নে। আমি পারি—শুই-ই তো জেঠিমার কাছে।

চুপচাপ ভবনাথ হুঁকো টানছেন। কলকে নিভে গেছে, নলের মুখে ধোঁয়া বেরুচ্ছে না। ঠাহর পান নি ভবনাথ—টেনেই চলেছেন। বেহুঁশ!

দ্বারিক এসেছেন। কডচায় কয়েকটা উশুল দেবার আছে, দপ্তর খুলে কাজে লেগে গেলেন। তাঁর নজরে পড়ল। অটল তামাকের ক্ষেতে। ভবনাথকে কিছু না বলে অটলকে হাঁক দিয়ে বললেন, কলকে বদলে দিয়ে যা রে অটল, একদম নিভে গেছে।

দ্বারিক আশ্রিত অনুগত, এ বাড়ির ভাল-মন্দ সব ব্যাপারে আছেন। হিরুর হয়ে তিনি বলছেন, দশচক্রে ভগবান ভূত। মাতুল গুরুজন—তাঁর কথায় উপর বেচারি না বলতে পারে নি।

ভবনাথ স্বগতোক্তির মতো বললেন, নেমন্তন্নর চিঠি সরাসরি বাপ-খুড়োর নামে। বাপকে আমল না-ই দিল—অমন বাঘের মতন খুড়ো তাকে হেলা করে কোন সাহসে?

দ্বারিক বলেন, দিনকাল বদলে যাচ্ছে দাদা। মানিয়েগুছিয়ে নিতে হবে—উপায় কি? কত সব কাণ্ডবাণ্ড কানে আসে—এ তবু পদে আছে।

প্রবোধবাক্য কানের মধ্যে বিষের মতো জ্বালা করে। ভবনাথ উঠে পড়লেন। বাইরের উঠানের এক পাশে কাঠা পাঁচেক ভুঁইয়ে তামাকের ক্ষেত। চারা পোঁত হয়েছে—দিনমানটা কলার খোলায় ঢাকা ছিল, এখন আসন্ন সন্ধ্যায় অটল খোলা সরিয়ে গোড়ায় জল দিয়ে যাচ্ছে। সারা রাত্রি শিশির খাবে--সকালবেলা রোদের ভয়ে আবার খোলা মুড়ে দেবে। কিছুকাল চলবে এমনি—যত দিন না চারাদের শক্তিসামর্থ্য হচ্ছে।

ভবনাথ এসে ক্ষেতের পাশে দাঁড়ালেন। অটলকে এটা করো সেটা করো নির্দেশ দিচ্ছেন নিতান্তই অভ্যাসক্রমে—ছিরুর বিয়ে মন জুড়ে রয়েছে। দিনকাল বদলাচ্ছে, সন্দেহ কি। মেজ ছেলে কালীময়ের বিয়ে একলা ভবনাথের ব্যবস্থায় হয়েছিল। মেয়ে কালো, রোগা—দৃষ্টিশুভ নয়। ভবনাথ চোখ মেলেও তা দেখেন নি, দেখা আবশ্যক মনে করেন নি। আত্মীয়-পড়শি হয়তো মুখ বাঁকিয়ে ছিল, কিন্তু ভবনাথের সামনাসামনি নয়—সে তাগত ছিল না কারো। কালীময়ও কোনদিন মুখ ভার করে নি—বাপ পছন্দ করছেন, তার উপরে আবার কথা কি! ইয়ারবন্ধুরা কিছু বলতে গেলে কালীময়ের জবাব ছিল, দিনমানে বউ তো কাছে আসছে না, রাত্রে আসবে আলো নিভিয়ে অন্ধকার করে—কালা ধলা তখন সব একাকার।

দেখতে শুনতে যেমনই হোক, ফুলবেড়ের মাধব মিত্তিরের মেয়ে বীণাপাণি—একমাত্র মেয়ে, ষোলআনা ভূসম্পত্তির ওয়ারিশান। ভবনাথ তন্নতন্ন করে খোঁজখবর নিলেন—মেয়ের নয়, মাধবের ভূসম্পত্তির। তারপরে পাকাকথা দিয়ে দিলেন।

মাধব প্রশ্ন করেন: মেয়ে দেখলেন না?

ভদ্রলোকের মেয়ে, কানা নয়, খোঁড়া নয়—ঘটা করে দেখবার কি আছে?

তারপর মনে পড়ে গেল: মেয়ে তো দেখাই আছে বেহাইমশায়। রাতের বেলা আপনার বাড়ি খেতে বসেছিলাম, পাঁচ-সাতটা বেড়াল এসে পড়ল। মা-লক্ষ্মী বাঁশের চেলা নিয়ে বেড়াল তাড়াচ্ছিল।

মাধব মিত্তিরের সঙ্গে মুখ-চেনা ছিল, সেই প্রথম ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত। বিবাদি গরহাজির বলে মামলা হতে পারল না, কসবা থেকে ভবনাথ পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছেন। মণিরামপুর গঞ্জে হাজরা মশায়ের চালায় রান্না-খাওয়া ও বিশ্রাম। মাধবও মহাল থেকে ফিরছেন, এখানে আগে এসে উঠেছেন। মাধবই রাঁধাবাড়া করলেন--এক সঙ্গে দু'জনের খাওয়া-দাওয়া। তারপর বেশ খানিকটা গড়িয়ে নিয়ে একত্র রওনা। নাগরগোপের কাছাকাছি এসে আকাশ অন্ধকার করে এলো—দুর্যোগ আসন্ন। ফুলবেড়ে ওখানে থেকে সামান্য দূর। ভবনাথকে না নিয়ে মাধব ছাড়বেন না—বললেন, আপনাকে এই অবস্থায় পথের উপর ছেড়ে গেলে লোকে আমার গায়ে থুতু দেবে। গরিবের বাড়ি চলুন, রাত-টুকু কাটিয়ে সকালে চলে যাবেন। তুললেন নিয়ে বাড়িতে। তুমুল ঝড়বৃষ্টি—তার ভিতরেও পাঁঠা মারা হল। আদর-আপ্যায়নের অবধি নেই। খাওয়ার সময়টা ছোট্ট খুকী বীণাপাণি থোপা থোপা চুল নাচিয়ে বাঁশের চেলা হাতে বিড়াল তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল—

কনে-দেখা তাতেই চুকবুকে গেছে, তারই জোরে ভবনাথ পাকাকথা দিয়ে দিলেন। নির্গোল বিয়ে হয়ে গেল। বরাবর এমনিই হয়ে এসেছে—এবারেই তফাত।

চমক খেয়ে ভাবনা হঠাৎ ছিঁড়েখুড়ে গেল। ডা-ডা-ডাডা—আওয়াজ। দালানের কান চ'দয়ে পথ--উঁচু নিচু, এবড়ো খেবড়ো। পুকুর কাটার সময় মাটি পড়েছিল--কোদাল ধরে কে আবার তা সমান করতে গেছে? ডা-ডা-ডা উড়ে চল্ পক্ষীরাজ আমার--গাড়োয়ান গরু তাড়াচ্ছে। ঘট-ঘট ঘট-ঘট বদখত আওয়াজ তুলে ছুটছে গরুর গাড়ি।

অসহ্য, অসহ্য! হাঁক পাড়লেন ভবনাথ: এইও, কে রে—কে যায়?

গাড়ির মাথার দিকটা দেখা যাচ্ছে। শিশুবর হায় হায়--করে উঠল। শয়তান গরু সুপারি-চারা মুখে তুলে নিয়েছে। চিবোচ্ছে, আর ঝুলছে খানিকটা মুখের বাইরে। 'তিন নাড়ায় গুয়ো, কাঁঠাল নাড়ায় ভুয়ো'--চাষার শাস্ত্রে বলে। গুয়ো অর্থাৎ সুপারির চারা তিনবার তুলে পুঁততে হবে। গোড়ায় একফালি জমিতে ঠাসাঠাসি করে। চারা উঠল, বিঘত খানেক বড় হল--তুলে তুলে তখন সামান্য ফাঁক করে পুঁতে দাও। চারা আরও বড় হলে আবার তুলে পাকাপাকি ভাবে পোঁত। তবেই সুপারি ফলবে। কিন্তু কাঁঠালের বেলা বিপরীত। যেখানে চারা জন্মাবে, সেখানেই আমরণ থাকবে। তুলে অন্যত্র পুঁতলে ভুয়ো কাঁঠাল ফলবে—কাঁঠালে কোয়া থাকবে না, শুধুই ভুসড়ো। দালানের কানাচে বাখারির বেড়ায় ঘেরা সুপারির মাদা। বেড়ার মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে গরুতে চারা উপড়ে নিয়েছে। ভবনাথ দূর থেকে রে-রে করে উঠলেন। কে রে? নবনে না তুই?

কালোকোলো ছোঁড়া গাড়ির মাথায়—নাম বলল, শ্রীনবীনচন্দ্র মণ্ডল।

ফটকের ছেলে তো তুই। ফটকের ছেলে নবনে, তাই তো জানি—নবীনচন্দ্র হলি আবার কবে? যাচ্ছেতাই হ গিয়ে—গরুতে আমার গুয়োর চারা খায় কেন?

নবীন বলে, গরু কি বোঝে?

দি'চ্ছ বুঝিয়ে—

এমনিই ভবনাথের আজ মেজাজ খারাপ—ছোটমুখের পাকা-কথায় ব্রহ্মতালু অবধি জলে উঠল। একটানে একটা জিওলের ডাল ভেঙে গরুকে দমাদম পিটুনি।

নবীন আর্তনাদ করে ওঠে, ডালের বাড়ি যেন তারই গায়ে পড়ছে। এঁটে

ধরল ভবনাথের হাতের ডাল। এত বড় আস্পর্ধা! ক্ষেপে গেলেন ভবনাথ— সেই ডালে এবার ছোঁড়াকেই পেটাচ্ছেন। পেটাতে পেটাতে ডাল দু-খণ্ড হয়ে গেল। হাঁ-হাঁ করে দ্বারিক এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। গর্জাচ্ছেন ভবনাথ: ভিটেবাড়ির প্রজা, তিন পুরুষ ধরে চাকরান খাচ্ছে। পূববাড়ির মালপত্তর বয়ে বয়ে ওর বাপ ফটকের মাথায় টাক পড়ে গেল। সাত চড়ে সে রা কাড়ে না, আর ঐ ডেপো ছোঁড়া কিনা আমার দালান কাঁপিয়ে গরুর-গাড়ি চালায়, চ্যাটাং-চ্যাটাং বুলি ছাড়ে মুখে, হাতের লাঠি চেপে ধরতে আসে। ঘরের চাল কেটে বসত তুলে দেবো, বুঝবে সেদিন—

ভবনাথকে নিয়ে দ্বারিক রোয়াকে উঠে গেলেন। শিশুবর তামাক সেজে আনল। গরুর-গাড়ি খুব আস্তে যাচ্ছে এখন। নবীন গাড়িতেই ওঠে নি, পাশে পাশে হাঁটছে।

বড়গিন্নি বাপের-বাড়ি চললেন। গরুর-গাড়িতে যাওয়া কাঁথি দুমড়ে উপরে পাটি ফেলে ছঁই বানিয়ে নিল। পুঁটি আগেভাগে উঠে বসে আছে। সবাই গাড়ির কাছে এসেছে—ভবনাথই কেবল আহারান্তে বাইরের-কোঠায় যথারীতি শুয়ে পড়েছেন। কিছুই জানেন না এমনিতরো ভাব। কালীময়ের গায়ে কড়কড়ে ইস্ত্রি করা ডবলব্রেস্ট কামিজ, হাতে বার্নিশ-জুতো। জুতোর ফিতের ফিতেয় গেরো দিয়ে সে গাড়ির ভিতর ঢুকিয়ে দিল। বলে, জুতো পড়ে না যায় দেখো মা! ওঠো তুমি এবার, দেরি করলে ওদিকে রাত হয়ে যাবে।

বড়গিন্নির গাড়িতে ওঠা সে বড় চাট্টিখানি কথা নয়। উঠতে যাচ্ছেন—কয়েক পা গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। তরঙ্গিণীকে সতর্ক করে দিচ্ছেন: নতুন হিম পড়ছে বউ, খোকন ঠাণ্ডা না লাগায় নজর রেখো। কাঁচা জলে চান না করে নিত্যি নিত্যি চানেরই বা কি দরকার? টুকটুকিকে কাঁচাঘুম থেকে তুলে অলকা এসে দাঁড়াল। মেয়ে কেঁদে খুন হচ্ছে। দু-হাত পেতে আড়কোলা করে উমাসুন্দরী নিয়ে নিলেন। জোরে জোরে দোলাচ্ছেন, আর আগডম-বাগডম বকছেন মুখে। শান্ত হয় না কিছুতে।

কালীময় ওদিকে হাঁক দিচ্ছে: উঠবে গাড়িতে, না সারা বেলাস্ত এই চলবে? না যাবে তো বলো, আমি পথ দেখি—

মেয়ের কচি আঙুলে ঈষৎ কামড় দিয়ে উমাসুন্দরী মায়ের কোলে দিয়ে দিলেন। মায়া কাটানো হল এই প্রক্রিয়ায়—বাচ্চা হুতোশকড়া হবে না।

গাড়িতে উঠে বসেছেন এবার। তরঙ্গিণীকে কাছে ডেকে হাতে হাত দিয়ে

ছলছল চোখে বললেন, রইল সব। সামলানো কি সোজা—তোমার উপর বড্ড ধকল যাবে ছোটবউ। চিঠিপত্তোর দিও।

গলা ভারী, মুখে আঁচল দিলেন তিনি।

অলকা হাসছে: যাওয়া তো বাপের-বাড়ি—চোখে জল কেন মা? আমাদের বললে তো নাচতে নাচতে চলে যাই।

বিনো বলল, শুভকর্ম চোখের জল কেন খুড়িমা? ইচ্ছে না হলে যাবে না। মাথার দিব্যি তো নেই। গাড়ি ফেরত দিয়ে দাও।

উমাসুন্দরী রাগ করে বললেন, মনের ইচ্ছে তো তাই তোদের সকলের। একজনের বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আপদ-বালাই মানুষটা চলে যাচ্ছে, তা যেন চোখে দেখতেও মানা।

কমল মুখ চুন করে মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল। মুখ দেখে, আহা, বুকের মধ্যে আনচান করে ওঠে। হাত ধরে বড়গিন্নি তাকে কাছে নিয়ে এলেন। একটুকু ম্লানহাসি হেসে বললেন, যেতে ইচ্ছে করছে বুঝি? মা ছেড়ে থাকতে পারবে তো?

সত্যি সত্যি যেন খোকনকে তুলে নিয়ে চললেন, গিয়ে সে পুঁটির একাধিপত্যে ভাগ বসাবে। হি-হি করে হেসে, হাসির ধাক্কায় পুঁটি মতলবটা একেবারে উড়িয়ে দিতে চায়: নিও না জেঠিমা—কক্ষনো না। থাকতে পারবে না, রাত দুপুরে 'মা' 'মা' করে কেঁদে ভাসবে।

কমলের অপমান লাগে, রাগ হয়ে যায় পুঁটির মুখে এই সব শুনে। 'দিদি' আর বলবে না তো, এবার থেকে নাম ধরে ডাকবে। জেঠিমা বউদাদা বিনোদিদি সবাই হাসছে। এমন কি মা পর্যন্ত। না কি মাকে ছেড়ে থাকা অসম্ভব তার পক্ষে।

জেদ ধরল সে: আমি যাবো, আমি যাবো। তিড়িং-মিড়িং করে লাফাচ্ছে।

এবং মুখের কথামাত্রই নয়, গাড়িতে ওঠার জন্য একটা পা উঁচু করে তুলছে। কিন্তু উমাসুন্দরী তো জুড়ে বসে আছেন—পা কমল ফেলবে কোথা, বসবেই বা কোনখানে? ছঁইয়ের বাইরে একেবারে সামনেটা অবশ্য ফাঁকা গাড়োয়ানের জন্য। কিন্তু গরু—ওরে বাবা দু-দুটো দৈত্যাকার গরু সেই-খানটা জোয়ালের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছে। পা অতএব মাটিতে নামাতে হল। তা বলে রোখ ছাড়ে না: যাবো আমি জেঠিমা। থাকতে পারব, তুমি দেখো। কাঁদব না।

উমাসুন্দরী কোমল কণ্ঠে বুঝিয়ে বলেন, বেটাছেলে তুমি কত কত জায়গায় যাবে—এইটুকু পথ গুয়োতলি গিয়ে কেন আর থাকতে পারবে না? কিন্তু

পুঁটি চলে যাচ্ছে—তার উপর তুমিও যদি যাও, ছোটবউ একলা হয়ে যাবে, কাকে নিয়ে থাকবে সে তখন? কাঁদবে তো সে-ই—তুমি আর কি জন্যে কাঁদতে যাবে?

কমল বলে, একলা কেন, রাঙাদিদি বউদাদা সবাই তো রইল।

বড়দিদি হল বিনো, রাঙাদিদি নিমি আর বউদাদা অলকা। ছোটরা বড়দের কারো নাম ধরবে না। এমন কি বিনোদিদিও মঞ্জুর নয়—বিনো নাম তো বলাই হল, তার উপরে একটা দিদি জুড়ে দিয়ে দোষ খণ্ডাবে না। নিমির ফর্সা রং, সেই জন্যে রাঙাদিদি। আর অলকার বেলা বউদিদি না হয়ে বউদাদা—

পোড়ামুখি বিনোর কাণ্ড। একরত্তি ছেলেকে চুপিসারে শিখিয়েছে। বারো বছরে মেয়ে অলকা শ্বশুরঘর করতে এলো, কিন্তু বাপের-বাড়ি থেকে যথোচিত তালিম নিয়ে আসে নি। সন্ধ্যাবেলা ক্ষারে কাপড় সিদ্ধ হবে—উঠানের উনুনে জালুয়া চাপানো হয়েছে। খানকয়েক ভিজে কাঠ দিয়ে মাহিন্দার কর্তার সঙ্গে হাটে চলে গেছে। ফুঁ দিতে দিতে বড়গিন্নি নাজেহাল, কাঠ কিছুতে ধরে না, খালি ধোঁয়াচ্ছে। গোলার নিচে আঁটি-বাঁধা নারকেল-পাতা রয়েছে, সেইগুলো টানাটানি করছেন, আর গজর-গজর করে মাহিন্দাকে গালি দিচ্ছেন। হেনকালে কুড়াল পড়ছে—আওয়াজ আসে বাইরের দিক থেকে।

পুরানো পোয়ালগাদা ভেঙে দিয়েছে। ধান মলা সারা হলে নতুন পোয়াল-গাদা দেবার প্রয়োজন হবে, তখন নতুন মাচা বাঁধবে। পুরানো বাতিল মাচার বাঁশ তেঁতুলতলায় ছড়ানো—ঘুনে-খাওয়া, কিন্তু শুকনো মড়মড়ে। এই বাঁশ উনুনে দেওয়া যায়, পুড়বেও ভাল, কিন্তু ফেড়ে না দিলে দুড়ুম-দাড়াম করে গেরো ফুটবে বোমা ফাটার মতো আওয়াজ করে। একটু খুঁজে কুড়ালও পাওয়া গেল পেটা-কাটা ঘরের দাওয়ায়। অলকা ভেবেছে বাহাদুরি কাজ—চেলা বাঁশের বোঝা উনুনের ধারে ফেলে শাশুড়িকে অবাক করে দেবে। কোমরে আঁচল ফেরতা দিয়ে কুড়াল ধরেছে বারো বছুরে বউ—

কে রে বাঁশ ফাড়ে ওখানে?

সন্দেহ করে উমাসুন্দরী তেঁতুলতলায় গিয়ে পড়লেন। চক্ষু কপালে উঠল—গলা সঙ্গে সঙ্গে খাদে নেমে গেল: কী সর্বনাশ! কেমনধারা বউ গো তুমি? বড় রক্ষে হাটবার আজ, পুরুষরা বাড়ি নেই।

চাপা গলায় ধমকানি চলেছে: বাপের-বাড়ি এই সমস্ত করে বেড়াতে বুঝি? বাড়গেঁয়ে মেয়ে আনলে এমনি হবে, বলেছিলাম আমি। কেউ কানে নিল না। এ-বাড়ি ওসব মদ্দানি চলবে না, খেয়াল রেখো। বেয়ানঠাকরুনই বা কী রকম—মেয়ে পাঠালেন, তা একটু সমঝে দিতে পারেন নি।

অলকা তো মরমে মরে গেল। চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। বাহাদুরি নিতে গিয়ে কি বিপদ! তরঙ্গিণী কোন দিক দিয়ে এসে বউয়ের হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। আঁচলে চোখ মুছিয়ে দিলেন। ষেটের বাছা, আহা রে! তাঁর বড় মেয়ে বিমলা বিয়েথাওয়ার আগে প্রায় তো এই বয়সেই চলে গেল। কী বুঝত সে তখন?

বকাঝকার পরে উমাসুন্দরীও এবারে চুপ-চুপ করে বেড়াচ্ছেন। বুদ্ধির ভুলে করে বসেছে—ঢাক পিটিয়ে বেড়াবিনে কেউ তোরা, বাড়ির বাইরে কথা না যায়, বেটাছেলেরা না শোনে। সকলকে সতর্ক করলেন। কার দায় পড়েছে, কে আর বলতে যাচ্ছে—ভয় বিনোকে নিয়ে। এঁদেরই জ্ঞাতি এক-জনদের মেয়ে বাল-বিধবা। বাপের-বাড়ি শ্বশুরবাড়ি কোন কূলে কেউ নেই—মরেছেড়ে গেছে সব। বাপের-ভিটেয় সর্ষেবন এখন। শ্বশুরবাড়িতে দোচালা বাংলাঘর একটা আছে—সেখানে ভাগনে সম্পর্কের একজন বউ ছেলেপুলে নিয়ে উঠেছে। পুববাড়ির সংসারে বিনো রয়ে গেছে—এ বাড়িরই মেয়ে সে যেন। এই তো অবস্থা, আর বয়সের দিক দিয়েও তরঙ্গিণীর প্রায় সমতুল্য। কিন্তু ফচকেমি আছে ষোলআনা। তাছাড়া অলকার ননদিনী যখন, সম্পর্ক ঠাট্টাভালবাসার। বিনোকে তাই পই-পই করে মানা করা হল: হাসবে পাড়ার লোকে, ছেলেমানুষ-বউ লজ্জা পাবে, বাড়িরও নিন্দে। খবরদার, খবরদার!

পেট-পাতলা মানুষ বিনো, কথা পেটের মধ্যে ফুটতে থাকে—খালাস না পাওয়া পর্যন্ত সে সোয়াস্তি পায় না। তা সত্ত্বেও প্রাণপণে মুখ বন্ধ করে রইল। পুঁটি-কমলের জন্ম হল, তারপর অলকা-বউ নিজেও মেয়ের মা হল। বাপের বাড়িতে কুমারী বয়সের ডাংপিটেমি তা বলে একেবারে ছাড়েনি। মাঝে মাঝে মনের ভুলে এক-একটা কাজ করে বসে। সিঁদুরেগাছে আম পেকে টুকটুক করছে। বউ আর সামলাতে পারে না—এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল, মানুষ-জন নেই। দেখে টুক করে ডালে উঠে এক ঝাঁকিতে আম ক'টা পেড়ে আনল। বিলের জল ঝিরঝির করে পুকুরে পড়ছে। চান করতে গিয়ে বউ দেখল, মৌরলামাছের ঝাঁক নালার মধ্যে উজান উঠে পড়ছে। এক মুখে তাড়াতাড়ি কাদার বাঁধ দিয়ে গামছা ছেঁকে মাছ তুলে নিয়ে এলো। কেমন যেন হয়ে যায় তখন। বাড়ি এসে তারপরে খোশামুদি: বোলো না ঠাকুরঝি, ঘুণাক্ষরে কেউ যেন টের না পায়। বিনো বলেনি কাউকে, তবে একটুকু শিক্ষা দিয়েছে। বড় হয়ে কমলের কথা ফুটল—বউদিদি স্থলে বউদাদা বলতে শিখিয়েছে তাকে। দিদি নয় দাদা—অলকাকে কমল বউদাদা বলে।

একলা বিনোই বা কেন, এক দঙ্গল ননদিনী সংসারে—কেউ বড় কম যায়

না। অলকাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ত। ভাল ঘর-বর পেয়ে বাবা-মা এক-ফোঁটা মেয়ে পর-ঘরি করে দিলেন—হেসে হেসে আজও অলকা তখনকার কথা বলে, ছ'ভাইয়ের পর সকলের ছোট এক মেয়ে আমি বাড়ির মধ্যে—হাসলে মাণিক ঝরে, কাঁদলে মুক্তো পড়ে। পুতুলখেলা আর রাঁধাবাড়ি-খেলা ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি এসেছি—তা বলে হেহাই করেছ তোমরা ঠাকুরঝি?

অলকা ছিল বড় ঘুমকাতুরে। নতুন বউকে কাজকর্ম করতে দিত না, কোন-কিছুতে হাত দিলে সকলে হাঁ-হাঁ করে এসে পড়ত: আহা, তুমি কেন গো? বসে বসে অলকা কি করে—ঘুমিয়ে পড়ত যখন-তখন। তাই নিয়ে হাসিতামাসা, ফষ্টিনষ্টি। রাত্তিরে ঘুমোয় না ওরা, দিনে তারই শোধ তুলে নেয়—ফিসফিসিয়ে ননদিনীরা বলাবলি করত। একেবারে মিথ্যেও নয় সেটা। অলকা লজ্জায় মরে যায়, তবু ঘুম এসে পড়ে। হাজার চেষ্টা করেও ঠেকাতে পারে না, কি করবে।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর শুতে শুতেই অলকার ঘুম। বিনো, বুড়ি, নিমি—তিন ননদে মিলে একদিন ঘোর ষড়যন্ত্র করল। পাহারায় আছে, কেউ সে ঘরে না ঢোকে—অলকাকে ডেকে না তোলে। তরঙ্গিণী ও উমাসুন্দরীকে আগে থাকতে বলে রেখেছে। দেখবে আজ হদ্দমুদ্দ, নতুনবউ কতক্ষণ ধরে ঘুমোতে পারে।

সন্ধ্যা হল, রাত হল, রাতের রান্নাবান্না সারা—অলকা বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে। পিঁড়ি পারল ননদিনীরা খাটের পাশে ঘরের মেজেয়, দেলকোর উপর প্রদীপ জ্বালল। কাঞ্চননগরী থালায় পরিপাটি করে ভাত বেড়ে পিঁড়ির সামনে দিল। বাটিতে বাটিতে ব্যঞ্জন, গেলাসে জল। বাটার উপর পানের খিলি, ঘটিতে আঁচানোর জল অবধি রাখল। আঁচানোর সময় দাঁত খোঁচার প্রয়োজন হতে পারে তার জন্য খড়কে-কাঠিও আছে। সমস্ত সাজানো-গোজানোর পর বিনো অলকার পা ঝাঁকাচ্ছে: ওঠো বউ, একটু কষ্ট করে দুটো খেয়ে নিয়ে আবার শুয়ে পড়বে।

ধড়মড় করে অলকা উঠে পড়ল—খুকখুক খিলখিল এদিকে সেদিকে হাসির ফোয়ারা। শাশুড়ি হওয়া সত্ত্বেও তরঙ্গিণীর সায় রয়েছে, সন্দেহ হয়। মেয়ে-মানুষের এত ঘুম কি ভাল? প্রদীপে সলতে বাড়ানোর অছিলায় এ-ঘরে তিনি এক পাক ঘুরে দেখে গেলেন। ঘুম উড়ে গিয়ে লজ্জায় নতুনবউ কেঁদে ফেলল।

আর একবার। কৃষ্ণময় তখন কলকাতার চাকরিতে ঢুকেছে, বাড়ি এসেছে মাস সাতেক পরে। অলকা বউয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে একবার দু বার,

কিন্তু কাছাকাছি হতে পারেনি। লোক গিসগিস করছে—দিনমানে কাছাকাছি হওয়া অসম্ভব, রাত্রের আগে হবে না। এবারের ষড়যন্ত্রের মধ্যে দেওর হিরুও। হাটে ভবনাথ যান, সঙ্গে হিরু থাকে। কোনদিন হিরু একলাই হাট করে আনে। হাটে যাবার সময় বিনো হিরুকে বলে দিল, তাড়াতাড়ি ফিরবি রে। সারারাত বড়দা কাল রেলগাড়িতে কাটিয়ে এসেছে, সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়বে। বলে হাসিমুখে চোখ টিপল একবার অলকার দিকে। লজ্জা পেয়ে অলকা পালিয়ে যায়। চোখ বিনো আরও টিপেছিল হিরুর দিকে, অলকা সেটা দেখেনি—পরে মালুম পাওয়া গেল। হাট করে হিরু বেশ সকাল সকাল ফিরল। ভালমানুষি ভাবে বিনো বলে, মাছ কটা তাড়াতাড়ি কেটে নাও বউদি আমি একসম্বরা ঝোল চাপিয়ে তোমাদের বসিয়ে দিচ্ছি। অলকা বউ খালুইয়ের মাছ সব ঢেলে ফেলল। কুচো মাছ---মৌরলা আর তিতপুঁটি--আট আনায় খালুই একেবারে বোঝাই। কোট এখন বঁটি পেতে একটা একটা করে ঐ মাছ। রাত কাবার হয়ে ভোরের পাখপাখলি ডেকে উঠবে, মাছ কোটা তখনো সারা হবে না। কৃষ্ণময়কে খাইয়ে দিল, পথের ক্লান্তিতে ঘুম ধরেছে তার। অলকা কুটছে কুটেই যাচ্ছে—চোখে তার জল এসে গেল। শোওয়া আজ কপালে নেই। মাথার ঘোমটা টেনে দিয়ে চোখ মুছল একবার। ইচ্ছে করে, মাছ-কোটা বঁটির ঘায়ে পোড়া-জীবনের অবসান ঘটায়। তারপরে বুঝি দয়া হল ননদিনীদ্বয়ের। নিমি এসে বলল, ওমা, এখনো যে অনেক বাকি। সেজদাদার যেমন কাণ্ড—গুঁড়োমাছ এনেছে এক ঝুড়ি। অনেক হয়েছে, ওঠো এবারে, হাত ধুয়ে হেঁসেলে যাও, খুড়িমা ডাকছে। হাতাবিতি আমরা এগুলো সেরে দিচ্ছি। অলকাকে সরিয়ে নিমি লেগে গেল মাছ কুটতে, আলাদা এক বঁটি নিয়ে বিনোও এসে পড়ল। খুড়িমা অর্থাৎ তরঙ্গিণী হেঁসেলে ডাকছেন—তার মানে আলাদা করে খাইয়ে তাকে ঘরে পাঠাবেন। তাই হয় কখনো, লজ্জা করে না বুঝি। কথা কানে না গিয়ে অলকা গড়িমসি করে। কোটা-মাছ ডালায় ফেলে রগড়ে রগড়ে ধোয়া, নুন-হলুদ মাখায়। ইতিমধ্যে দক্ষ হাতে ঐ দু'জন কোটার কাজ শেষ করে ফেলেছে। নিমি-তরঙ্গিণীর পাশা-পাশি অলকা-বউ খেতে বসল--অনেক রাত্রি তখন।

জিওল ও ভেরেণ্ডা-গাছের বেড়া। বেড়ার গায়ে ঝিঙে বরবটি উচ্ছেলতা জড়িয়ে উঠেছে। অন্যদিকে পোড়োভিটায় ভাঁট-কালকাসুন্দে-আশশ্যাওড়ার জঙ্গল। মাঝখানের পথ দিয়ে গরুর-গাড়ি ক্যাঁচকোচ আওয়াজ তুলে চলল।

কমল একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। বাদামতলায় গিয়ে বাঁয়ে মোড় নিল, আর তখন গাড়ি নজরে আসে না। আওয়াজ আসছে শুধু। বড়গিন্নি চোখ মুছছিলেন—কঁ্যাচ-কোঁচ কুঁউ-কুঁউ, গাড়ি না বড়গিন্নি, কার এই বুক ছেড়ে কান্নাকাটি?

কালীময় আগে আগে যাচ্ছে। মালকোচা-আঁটা ধুতি, রাস্তার ধুলো-কাদা থেকে যতদূর বাঁচানো যায়। গলার চাদর কামিজের উপর দিয়ে কোমরে বেঁধে নিয়েছে। ঘাড় নামিয়ে ঘন ঘন কামিজের দিকে দেখছে—জুতোর মতন কামিজটাও খুলে মায়ের কাছে দিলে কেমন হয়? হবে তাই, এখন নয়—পর পর কয়েকটা গ্রাম এখন। মানুষজন বলবে, দেখ, পুববাড়ির মেজোবাবু চাষা ভুষোর মতন খালি-গায়ে কুটুমবাড়ি যাচ্ছে। গ্রাম ছাড়িয়ে বিলের-রাস্তায় পড়বে—মানুষজন বলতে একটি-দুটি চাষীলোক, সোনাখড়ির বাবু বলে চিনবে না, জামা খুলে তখনই হালকা হওয়া চলবে।

গাড়ি কোয়ানে যাবে? বেগুনক্ষেত নিড়াচ্ছে, ঘাড় না তুলে চাষী হাক পেড়ে উঠল।

গাড়োয়ান জবাব দিল: গুয়োতলি—

আসতিছ কোয়ান তে?

বিলেত মুলুক থেকে—

খিক-খিক করে গাড়োয়ান হেসে উঠল। বলে, আমি কোদা মোড়ল, গলা শুনে ঠাহর পাও না?

এমনি পরিচয় করার রীতি। আমার গায়ের উপর দিয়ে ঘরের পাছদুয়ার দিয়ে যাচ্ছ—মানুষটা তুমি কে, কী প্রয়োজনে কোথায় চলেছ, খবরবাদ নেবো না? এর পরেই, তামুক খেয়ে যাও ভাই—ডাকাডাকি করে বসবে, কলকে এগিয়ে দেবে। কোদা মোড়ল নিতান্তই প্রতিবেশী মানুষ—গাড়ির আওয়াজ কানে পেয়ে ডাকাডাকি করছিল, চোখ তাকিয়ে দেখে সামান্যে তার ছাড় হয়ে গেল।

কালীময় বলে, গাড়ির ধুরোয় কদ্দিন তেল দাওনি কোদা? ডাকে যে ত্রিভুবন জানান দিয়ে চলেছ।

কোদা মোড়ল বলে, কাটা-ঝাড়ার মরশুমে ফুরসত কখন যে তেল দিই? ধান বয়ে বয়ে গাড়িও তো জিরান পাচ্ছে না।

হুড়কোর খুঁটি ধরে কমল সেই থেকে একদৃষ্টে পথের পানে চেয়ে আছে। চড়ুই কতকগুলো কিচিমিচি করেছে, বেশ একটা ছন্দোময়ভাবে মাটিতে ঠোক দিয়ে দিয়ে কি যেন তুলে নিচ্ছে। কাঁচাঘুমে তুলে টুকটুকিকে বড়গিন্নির কাছে নিয়ে গিয়েছিল, শুইয়ে দুটো থাবা দিতে আবার সে ঘুমিয়ে গেল। অল্প শীতে

গা শিরশির করে—অবেলায় ঘুমুতে আর মন নেই। বাইরে এসে কমলকে ঐভাবে দেখে অলকা-বউ কাছে এলো : দাঁড়িয়ে আছ কেন খোকন? ঘরে চলো।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কমল গোঁজ হয়ে রইল।

অলকা বলে, চলো তবে কানাইবাঁশির তলায় গিয়ে দাঁড়াই গে। গরুর-গাড়ি আবার দেখতে পাবে।

বাইরের উঠানের পর রাস্তা, রাস্তা পার হয়ে আমবাগিচা। তারপরেই বিল। বাগিচার শেষ প্রান্তে বিলের কিনারায় বিশাল আমগাছ, যার আখ্যা কানাইবাঁশি। অর্ধেক ডালপালাই তার বিলের উপর। কমলের হাত ধরে অলকা-বউ কানাইবাঁশির তলায় এসে দাঁড়াল।

ধান-কাটা হয়েছে, বিল এখন শুকনো খটখটে। বিল ভেদ করে রাস্তা চলে গেছে। এদিকে সেই গ্রাম সোনাখড়ি আর অদিকে ঐ গ্রাম পাথরঘাটা—রাস্তা সেতুর মতন গ্রাম দুটো জুড়ে দিয়েছে। পাকা গাঁথনির মরগা-রাস্তা-টুকুর মাঝামাঝি, এ-বিলে ও-বিলে জল-চলাচলের পথ। পাশেই বাঁকা তাল-গাছ একটা, বিলের বিস্তর দূর থেকে নজর পড়ে। তেপান্তরের মাঝে ঐ তাল-গাছ নিশানা। বর্ষার সময় রাস্তা ভেসে গিয়েছিল—হাঁটুজল কোমরজল ভেঙে লোকের যাতায়াত। শীতকালে এখন মাটি ফেলে মেরামত হচ্ছে। রাস্তার ধারের নয়ানজুলি থেকে ঝুড়ি মাথায় কালো কালো মূর্তি পিল পিল করে উঠে মাটি ফেলছে। নেমে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। ক্ষণপরে উঠে আসে আবার। আবার নেমে যায়। চলেছে অবিরাম। কানাইবাঁশি তলা থেকে আবছা রকম দেখা যাচ্ছে।

বেশ খানিকটা পরে গরুর-গাড়ি দেখা দিল। রাস্তা এমন-কিছু দূর নয় এখান থেকে। কিন্তু ডাঙায়-ডাঙায় প্রায় অর্ধেক গ্রাম চক্কোর মেরে গাড়ি এসেছে—সেইজন্যে দেরি। গ্রাম ছেড়ে বিল পার হয়ে যাচ্ছে এবার। আগে আগে মেজদাদা কালীময় ঐ যে। পিছনে গাড়ির উপর জেঠিমা পুঁটি আর কোদা-গাড়োয়ান।

যাচ্ছে গাড়ি, যাচ্ছে। ফাঁকা রাস্তাটুকু পার হয়ে পাথরঘাটার গাছপালার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর নজরে আসে না। যাচ্ছে, তবু গাড়ি যাচ্ছে বাঁশঝাড়ের নিচে দিয়ে ঘরের কানাচ দিয়ে পুকুরপাড় দিয়ে তেঁতুলতলার নিরালা কবরটার পাশ দিয়ে গাড়ি চলেছে। গুয়াতলির সেই এক বাড়ির উঠানে আটচালা ঘরের সামনে কোদা-গাড়োয়ান শচ্-শচ্-শচ্—আওয়াজ তুলে থামিয়ে দেবে গরু, সকলে নেমে পড়বে। ততক্ষণ অবধি ক্রমাগত চলবে গাড়ি—

জেঠিমা আর পুঁটি কত মজায় চলেছে—কমলকে নিয়ে গেল না। চোখের পল্লব ঘন ঘন হঠাৎ কয়েকবার নাচল, মুখের ভাব কেমন-কেমন—

অলকা প্রবোধ দিয়ে বলে, ওমা, কাঁদছ তুমি খোকন, কান্না কিসের? বেটাছেলে তোমাদেরই তো মজা। বড় হয়ে নাও—কত জায়গায় যাবে, কত দেশবিদেশ দেখবে।

মাঝবিল দিয়ে হুশ হুশ করে এক-ঝাঁক বক উড়ে গেল। অলকা বলে, পুরুষমানুষ আর পাখি। কত মজা তোমাদের—ইচ্ছে মতন যেখানে খুশি চলে যাবে। মেয়েছেলে আমাদের পায়ে শিকল। বাপের-বাড়ি মা-বাপের কাছে যাবো—তার জন্যেও জনে জনের কাছে মত চেয়ে বেড়াও। তারপর পালকি রে গাড়ি রে—শতেক বায়নাক্কা।

টুকটুকির কান্না পাওয়া যাচ্ছে বিলের ধারে এই এত দূরেও। পিছনে তাকিয়ে দেখল, বিনো কোলে নিয়ে এদিক আসছে। বলে, তুমি এখানে—মেয়ে জেগে পড়ে ওদিকে বাড়ি মাথায় করছে। যা একখানা তৈরি করেছ—তুমি ছাড়া কেউ ঠাণ্ডা করতে পারবে না।

অলকা বলে, পোড়ারমুখির দু'চোখে একটু যদি ঘুম থাকে। কত করে এই ঘুম পাড়ালাম—বলি একলা খোকন মুখ চুন করে বেড়াচ্ছে, বুঝিয়ে শান্ত করে আসি। উঠে এই ক'পা এসেছি, অমনি টনক পড়ে উঠল।

মেয়েকে অলকা বুকে তুলে নিল। ক্ষিধে পেয়েছিল, আহা চুকচুক করে দুধ খাচ্ছে। একটুক্ষণ খেয়ে হাসে ঘাড় তুলে। ইঁদুরের মতন কুচি-কুচি দাঁত—হাসলে ভারি সুন্দর দেখায়। কে বলবে, এই মেয়ে একটু আগে ধুন্দুমার লাগিয়েছিল, ঠাণ্ডা করতে বাড়ির লোক হিমসিম খেয়েছে। বিনোকে দিয়ে শেষটা মায়ের কাছে পাঠাতে হল।

বিকাল। দুপুরে সবাই যে ঘুমায়, তা নয়। কাঁথার ডালা নিয়ে বসে, রামায়ণ পড়ে—কত কি। তবে আচ্ছন্ন আসল ভাব একটা। এইবারে এখন হুড়োহুড়ি লেগে যাবে। নতুনবাড়ির মেজগিন্নি বেড়াতে এলেন, তরঙ্গিণী পিঁড়ি পেতে দিয়ে নিজে সামনে আঁচল পেতে বসলেন। অলকা-বউ পান সেজে এনে দিল।

মেজগিন্নি বললেন, কেষ্টর-মা গেলেন রওনা হয়ে? আসব ভেবেছিলাম—তা কোটা-বাছা রাঁধাবাড়া সবই তো দু'খানা হাতে। ও-বেলা নিশ্বাস ফেলার ফুরসত থাকে না। নতুনবউ বাড়ি আসবে, না ওখান থেকেই অমনি বাপের-বাড়ি চলে যাবে?

চুল বেঁধে পাছাপেড়ে শাড়িটা পরে কপালে বড় করে সিঁদুরের ফোঁটা

দিয়ে নিমি চলল। তরঙ্গিণীকে জানান দিয়ে যাচ্ছে: যাচ্ছি ছোটকা। যায় শশধর দত্তের বাড়ি, রাজির কাছে। রাজি এসেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে। নিমির হাত ধরে টেনে দরজায় খিল এঁটে দেবে—ভুটুর-ভুটুর চলবে সন্ধ্যা অবধি। রাজির গল্প শুনে শুনে নিমি বোধহয় বরের সাধ খানিকটা করে মেটায়।

কমল আজ একা। পুঁটি থাকলে কত খেলুড়ে আসে—চারি পটলি ফুল্টি টুনি পালেদের বেউলো উত্তরবাড়ির ফেক্সি. আরও কত। রাঁধাবাড়ি পুকুল-খেলা নাটাখেলা কড়িখেলা কানামাছি কুমির-কুমির—খেলা কত রকমের। আজকে কারো দেখা নেই। আসে পুঁটির কাছে—ছোট বলে কমলকে তাচ্ছিল্য করে। একবার গিয়ে তরঙ্গিণীর কাছে জিজ্ঞাসা করে এলো—না, এখনো পুঁটিরা পৌঁছে যায় নি, গুয়াতলি কম দূর নয়। যাচ্ছে গরুর-গাড়ি—মনের কল্পনায় কমল গাড়ি দেখতে পাচ্ছে—মাঠ-বিল খেজুরের বাঁশবন জঙ্গল-জাঙাল পার হয়ে কত গাঁ গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সূর্যি পাটে যাবেন, বেলা ডুবে সন্ধ্যা হবে, রাত হবে, পহর রাতে শিয়াল ডাকবে, জোনাকি উড়ে বেড়াবে আকাশে তারা ফুটবে. হাট করে হাটুরে মানুষ সব বাড়ি ফিরে যাবে—গ্রামপথে কাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলে গাড়ি তখনো যাচ্ছে। তখনো যাচ্ছে। গুয়াতলি মজুমদার-বাড়ি যাওয়া সহজ কথা নয়।

একা-একা লাগে বড্ড। এক ছুটে কমল কানাইবাঁশির তলায় চলে এলো। বিলের এইটুকু পার হয়েই বাঁকা তালগাছ, মরগার রাস্তা—পুঁটিরা যে রাস্তায় গরুর-গাড়ির আওয়াজ তুলে সোনাখড়ির এইসব গাছপালা বাগবাগিচা ঘরবাড়ির দিকে তাচ্ছল্যের দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে চলে গেছে। মাটি ফেলার কাজ বন্ধ এখন—সে সব মানুষ বাড়ি চলে গেছে। বিল থেকে ক'জনে গরু-ছাগল তাড়িয়ে তুলে রাস্তাটা পার হয়ে ওদিকে নেমে নজরের বাইরে চলে গেল। একলা কমল। একা হওয়ার সুবিধাও এক দিক দিয়ে যেখানে ইচ্ছা যাওয়া যায়, যা ইচ্ছে করা যায়, মায়ের কাছে জেঠামশায়ের কাছে পুটপুট করে লাগাতে যাবে না কেউ। মরগার রাস্তায় যেতে ইচ্ছে করছে, যার উপর দিয়ে এই খানিক আগে গরুর-গাড়ি চলে গেল। সাঁ করে তীরের বেগে চলে যাবে—গিয়ে আজকের তোলা এক চাংড়া কালো মাটি নিয়ে তক্ষুনি আবার ফিরবে তুমি মাছ নিয়ে যাচ্ছ—চিল আচমকা যেমন ঝাপটা মেরে একটা মাছ নিয়েই আবার আমের ডালের উপর বসে। মাটির চাংড়া বীরত্বের নিদর্শন—যত্ন করে রেখে দেবে

কমল, পুঁটি ফিরে এলে দেখাবে : চেয়ে দেখ, একা-একা মরগার রাস্তা অবধি চলে গিয়েছিলাম। এমনি যেতে যেতে গুয়াতলি অবধি চলে যাব একদিন। গুয়াতলি কি – আরও অনেক অনেক দূরের জায়গা, সাতসমুদ্র তেরোনদীর পার। কলকাতার শহরে যাব – আজব জায়গা, কল ঘোরালে জল পড়ে যেখানে। গরুর-গাড়ি ঘোড়ার-গাড়ি রেলগাড়ি – গাড়ি চড়ার বাকি থাকবে নাকি কিছু?

এদিক-ওদিক তাকিয়ে নেমে পড়ল ধান-কেটে-নেওয়া শুকনো বিলে। বড়রা যাত্রামুখে দুর্গা-দুর্গা করে, কমলও তাই দুর্গা-নাম করল। বেলপাতা কাছেপিঠে নেই, কি করবে – থাকলে হয়ত নিয়ে নিত। রাস্তার উপরে বাঁকা-তালগাছ তাক করে চলেছে।

কোনো দিকে একটা মানুষ নেই। খানিক দূর গিয়ে ভয়-ভয় করছে। তালগাছের অনেক তো বাকি। গ্রামের এ-মুড়ো ও-মুড়ো একা-একা কতই তো চলাচল করে – তখন ভয় করে না। মানুষ যদি না-ও থাকে – চারিদিকে গাছ গাছালি থাকে গরু ছাগল ঘুরে বেড়ায়, তাতে সাহস পাওয়া যায়। এই বিল বর্ষাকালের মতন যদি সবুজ ধানগাছে ভরা হত, তাহলে বোধহয় ফাঁকা লাগত না, পা ছমছম করত না এমন।

আরও গোলমাল হাওয়ায় করছে। নজরে পড়ে না—দূর দুরান্তর থেকে এসে ঝাপটা মারে গায়ে। চুল উড়ছে, গা শিরশির করে। একলা পেয়ে নিঃসীম বিল থেকে অদৃশ্য রূপে এসে ছাট মারছে গায়ের উপর। ছোট পেয়ে শাসন করছে যেন : উঠে পড়, বিলের মধ্যে কি? গাঁয়ের ছেলে গাঁয়ে গিয়ে ওঠ। প্রহ্লাদ মাস্টারমশায় জল্লাদকে যেমন ছাট মেরে শাসন করেন।

অদৃশ্য এই হাওয়া হঠাৎ যদি দৈত্যের মূর্তি ধরে সামনে দাঁড়ায়। আসন্ন সন্ধ্যায় নিরালা এই বিলের মধ্যে – সোনাখড়ি গ্রাম ঐ দূরে পড়ে রইল, মরগার রাস্তাও কাছে এগিয়ে আসে না – এখানে কী হতে পারে, আর কোন বস্তু অসম্ভব, সঠিক কিছু জানা নেই। মরগা অভিযান আজ বরঞ্চ মুলতবি থাক – দিদি ফিরে আসুক। পুঁটি কানাইবাঁশির গাছতলায় দাঁড়িয়ে দেখবে, একদৌড়ে আমি মরগার রাস্তায় চলে যাবো। কালো মাটির চাংড়া এনে দিদির হাতে দিয়ে দেবো, ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে যাবে সে।

কমল ডানহাতি ঘুরল। আ'লের পথ। আ'ল ধরে সোজা উলুক্ষেতে উঠে পড়ল। এই উলুক্ষেত পার হয়েই খেজুরবন। চেনা জায়গা – উলুক্ষেতের পাশ দিয়ে কতবার সদলবলে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেছে। কিন্তু মানুষের

গতিগম্য একটি যে দেখা যায় না কোনো দিকে। রাক্ষসে খেয়ে শেষ করে গেছে নাকি পাতালকন্যার দেশের মতো? উলু কেটে নিয়ে গেছে, উলুর গোড়া লক্ষকোটি সূচ হয়ে আছে। দেখে শুনে ধীরে-সুস্থে পা ফেলতে হয় —বড় কষ্টের পথ চলা।

কষ্ট কাটিয়ে তার পরে এইবার সোয়াস্তি। বিস্তর সঙ্গীসাথী পেয়ে গেল চারিদিকে—এই যত খেজুরগাছ। দেড়ে গাছেরা আছেন—বয়সে বৃদ্ধ, বিষম ঢ্যাঙা, আকাশ ছুঁই-ছুঁই করছেন। গলার কাছে উই সে আকাশ রাজ্যে, রসের ভাঁড়। একটা কাক ভাঁড়ের উপর বসে গাছের ঐখানটা ঠোকর দিচ্ছে মিষ্টি রসের লোভে। এদিকে-সেদিকে গাট্টাগোট্টা মাঝবয়সি অনেক সব গাছ—মাথা জুড়ে সতেজ সবুজ পাতার ঝোপ, মরদজোয়ানের একমাথা বাবরি চুলের মতন। আর বাচ্চা-গাছই বা কত! একেবারে বাচ্চা মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে আছে—গুঁড়ি বলতে কিছু নেই, মাটির ভিতর থেকেই যেন ডালপালা উঠছে। আর কতক আছে—খানিকটা বড় তারা, এবারে চাঁচ দিয়েছে, কেটে রস আদায় করছে। কাঁটায় বাগড়োয় ঝাঁকড়ামাকড়া হয়ে ছিল—চাঁচ দেবার পর গোঁফদাড়ি কামানো মানুষের মতন পরিচ্ছন্ন হয়েছে। গায়েগতরেও, বোঝা যাচ্ছে, তারা এখন আর নিতান্ত ভূমিলগ্ন নয়। ভাঁড় পেতে পেতে গেছে এসব গাছে, দড়ি দিয়ে ভাঁড় ঝোলানোর আবশ্যক হয় নি—মাটির উপর ভাঁড় বসানো। নলি বেয়ে ভাঁড়ে ফোঁটা ফোঁটা রস পড়ছে। কমল দেখছে ঠিক উল্টোটি—গাছের রস ভাঁড়ে পড়ছে না—ভাঁড়ের রসই বাচ্চা-গাছ নির্জন খেজুরবনে বসে চোঁ চো করে খেয়ে নিচ্ছে। যেমন সেদিন কালু গাছির বাইনশালে কমল আর পুঁটি রস খেয়েছিল পাটকাঠির মুখে। পাটকাঠির বদলে বাঁশের নলি এই গাছদের। ন্যাড়াসেজি ও বাবলাকাঁটা দিয়ে ভাঁড় ঘিরে দিয়েছে শিয়াল বেজিতে কিম্বা ছেলেপুলেরা রস খেয়ে না যেতে পারে। ও গাছি, সব রস তোমার চুপিসারে গাছেই যে খেয়ে নিল! কাল সকালে গাছ পাড়তে এসে দেখবে খালি ভাঁড় ঢন-ঢন করছে।

হিরন্ময়ের যেদিন বিয়ের তারিখ, সেই সকালে খবর নেই বাদ নেই কৃষ্ণময় এসে উপস্থিত।

হঠাৎ কি মনে করে? খবর ভাল তোমাদের? দেবনাথ কোথা?

ভবনাথ হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছেন। বাড়ির সবাই ভিড় করেছে। কৃষ্ণময় বলল, কাকামশায় পাখি-শিকারে গেছেন সেজবাবুর সঙ্গে।

বাঁ-হাতে ঝোলানো একগণ্ডা ফুলকপি, ডানহাতে ভারী-সারি বোঁচকা। বোঁচকায় কাপড়চোপড় ও কমলালেবু। লেবু ও কপি এ তল্লাটে দুর্লভ, শীতকালে যারা কলকাতা থেকে আসে এই দুই বস্তু আনবেই। জিনিসপত্র রোয়াকে নামিয়ে রেখে কৃষ্ণময় বলল, আমায় সেজবাবু জোরজার করে পাঠালেন। বললেন, ম্যানেজারকে আটক করলাম। তোমার বুড়োমানুষ বাবা একলা পেরে উঠবেন না, তুমি গিয়ে কাজকর্মে সাহায্য করোগে।

তারপর সবিস্তারে শোনা গেল। ভূদেব মজুমদার দেবনাথকেও চিঠি পাঠিয়েছিলেন, বয়ান একই। যাবার জন্য বিশেষ করে লিখেছেন। চিঠি পেয়ে দেবনাথ ক্ষেপে গেলেন: যাবো আমি—যাবোই তো। ঠেকানো দুঃসাধ্য তাঁকে। স্বাভাবিকও বটে। হবে-না হবে-না করে কমল হয়েছে এইতো সেদিন মাত্র—হিরুই বরাবর ছেলের আদর পেয়ে এসেছে দেবনাথের কাছে। বন্দুক আছে দেবনাথের—সুন্দরবনের লাটে হামেশাই চলাচল, বন্দুক সেই সময় সাথেসঙ্গে রাখতে হয়। বন্দুক আর বাঘা বাঘা ছ'জন বরকন্দাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়েন আর কি দেবনাথ। বাড়ি যাবেন না, ঝিকরগাছা স্টেশনে নেমে ওত পেতে থাকবেন। বরযাত্রীরা রেলগাড়িতে ঝিকরগাছা এসে নামবে, সেখান থেকে ষ্টিমার। হিরুকে ষ্টেশন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, বাড়ি-টাড়ি নয়, সোজা একেবারে কলকাতায় নিয়ে তুলবেন। লাঠি খাবে বরপক্ষ যদি বাধা দেয়। প্রয়োজনে বন্দুক ছোড়া হবে।

আয়োজন চলছে—কথাটা কিভাবে সেজবাবুর কানে উঠল। মনিব হলেও দেবনাথকে তিনি বন্ধুর মতো দেখেন। নিভৃতি নিয়ে খুব খানিকটা ধমক দিলেন: ছিঃ, বুদ্ধিমান-বিবেচক হয়ে এটা আপনি কি করছেন? বর কেড়ে নিয়ে আসবেন—তার পরে কন্যাপক্ষের অবস্থাটা ভেবে দেখেছেন? তাঁদের কি অপরাধ?

দেবনাথ বললেন, ছেলের বাপ বর্তমান, তাঁকে বাদ দিয়ে মামার সঙ্গে কথা বলতে যান কেন ওঁরা।

ভয়ে। সে তো বোঝাই যাচ্ছে। পাহাড় না সমুদ্দুর—আপনারা কোনটা চেয়ে বসেন, কুটুম্ব তাই চোরাপথে কাজ সারলেন।

হেসে সেজবাবু ব্যাপার লঘু করে দিলেন। বললেন, এসব বোঝাপড়া পরে—গণ্ডগোল ঘটানো এখন ঠিক হবে না। তার চেয়ে আমি বলি, গরানডাঙায় বিস্তর পাখি পড়েছে, পাখি মারতে চলুন আমার সঙ্গে।

কলকাতায় রেখে ভরসা হল না। উত্তেজনার বশে কখন কি করে বসবেন—পাখি-শিকারের নামে সেজবাবু তাঁকে আবাদে নিয়ে বের করলেন।

॥ সাতাশ ॥

সকালবেলা পুণ্য গাইয়ের বাছুর হল। বাছুর উঠতে পারে না, পুণ্য জিভ বাড়িয়ে ক্রমাগত বাছুরের গা চাটছে। এতেই বলশালা হচ্ছে বাছুর। ওঠার চেষ্টা করে, পড়ে যায়। চেষ্টা আবার করে, হয় না। করতে করতে শেষটা দাঁড়িয়ে পড়ল। একেবারে চোখের উপর। ভারি মজা তো! কমল হাঁ করে দেখছে। দেখছে আরও কত জনা। কাছে যাবার জো নেই, পুণ্য ঢুঁস মারতে আসে। পুণ্য হেন শিষ্টশান্ত গরু—মা হয়ে গিয়ে আজ মেজাজ তিরিক্ষি। বিকালে দেখা যায়, নুলেবাছুর দিব্যি লম্পঝম্প লাগিয়েছে।

মাসখানেক পরে একদিন গাই দোওয়ার পর নুলেবাছুরকে গাইয়ের কাছে দিয়ে রমণা দাসী চলে গেছে। বাছুর পালাল। হুড়কো খোলা পেয়ে চলল বাছুর সোজা বিলের দিকে। কমল দেখতে পেয়েছে, সে ও ছুটল। প্রাণী তো একফোঁটা, কায়দা কত দৌড়ানোর! ধরে ফেলল কমল, দু-হাত গলায় বেড় দিয়েছে—পাঁকাল মাছের মতন সড়াক করে বেরিয়ে বাছুর লাফাতে লাফাতে দৌড়য়। দেখতে মজা!—পিছনে ছুটবে কি, দৌড়ের রকম দেখে সে হেসেই খুন। তিড়িং তিড়িং লাফ দিয়ে এক-একবার উল্টোমুখো ঘুরে যেন নাচ দেখিয়ে যায়।

বিলে পড়েছে, সামনের দিক দিয়ে অটল আসছে। বলে, ছুটছ কেন খোকন, আ'ল বেধে পড়ে যাবে। বাছুর আমি ধরে দিচ্ছি।

তাতে কমলের ঘোর অপমান। এক-মাসের বাছুরের কাছে পরাভয় মানবে—না, কিছুতেই নয়। জোর গলায় সে নিষেধ করে: ও অটল-দা, ধরতে হবে না তোমায়। আগলে দাঁড়িও না—সরে যাও, ছুটতে দাও ওকে। আমি তেড়ে ধরব।

পথ ছেড়ে দিয়ে অটল হাসিমুখে চেয়ে রইল। মানুষ-খোকা আর গরু-খোকায় পাল্লাপাল্লি—কে হারে কে জেতে, দেখা যাক।

বিল এখানটা কয়েক পা মাত্র। বাছুর ওদিককার উঁচু জায়গাটায় উঠে গেল, যার নাম গোয়ালবাতান। কসাড় বাঁশবন একদিকে—তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। পিছন পিছন কমলও। কত ঝাড় কতদিকে—ঝাড়ে যেন গোলকধাঁধা। নুলেবাছুর ঘুরপাক দিচ্ছে এ ঝাড় বেড় দিয়ে ও-ঝাড়ের পাশ কাটিয়ে। কমল তাড়া করেছে। বাঁশপাতা পড়ে পড়ে এক বিঘত অবধি উঁচু—ছুটছে যেন সে গদির উপর দিয়ে। এত পাতার একটি থাকবে না,

কুমোররা ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাবে তাদের রাক্ষুসে-যোড়া যোঝাই করে। হাঁড়ি-কুড়ি পোড়ানোর পক্ষে বাঁশের পাতা বড় ভাল। আর, রস জ্বাল-দেওয়া যাইবে কাঠের যখন টান পড়ে যাবে, কঞ্চির ঝাড়ু বানিয়ে মণ্ডলদাররাও বাঁশপাতা কুড়োবে। পাতা এখন জমতে দিয়েছে, গাদা হয়ে জমে থাকুক।

ছুটছে কমল বাঁশবনের ভিতরে। বাঁশপাতা পায়ে পায়ে ছড়িয়ে যায়, উপরমুখো ওঠে। ক্যা-ক্যা কট-কট-কট কটর-কটর—বাঁশেরা কথা বলছে। মানুষে যেমন কথা বলে—চারিদিকে অন্য যারা রয়েছে, কুকুর-বিড়াল গরু-বাছুর গাছগাছালি, তারাও সব কথা বলে। কথা বলে, ঝগড়া করে, হাসে, ঠাট্টা-বটকেরা করে, ভয় দেখায়। এক রাজপুত্তুর পাখির কথা বুঝতে পারত, রূপ-কথায় আছে। কমল পারে বোধহয় খুব অনেকক্ষণ যদি কান পেতে থাকে। অগুন্তি বাঁশঝাড়—আকাশের তারা পাতালের বালি গণা যায় না, তেমনি এরা ভালকো-বাঁশ তলতা-বাঁশ বাঁশনি-বাঁশ—সব রকমের আছে, চেহারা দেখে কমল বাঁশের জাত বলতে পারে। ঝাড়ের গোড়ায় এদিক-সেদিক কোঁড়া বেরিয়েছে—মাথায় টুপি কাচ্চাবাচ্চাগুলো লম্বাখিড়িঙ্গে বড়দের পায়ের গোড়ায় গুটিসুটি হয়ে আছে মনে হবে, রোদ পাচ্ছে না বলে শীতে তুরতুর করে কাঁপছে—আহা, কোঁড়াদের দশা দেখে কষ্ট লাগে। বাঁশ কেটে নেওয়ার পরে মুড়ো-গুলো রয়ে গেছে—মাটির উপরে প্রায় হাতখানেক। মরে নি ওদের বেশির ভাগ—ছিটেকঞ্চি ও এক-আধটা নতুন পাতাও গজিয়েছে। জরদগব বুড়ো-মানুষের টেকো মাথার উপর দু-দশ গাছি চুলের মতো।

বাতাস উঠল—এমন কিছু নয়, সামান্য রকম। তাতেই কী কাণ্ড—ওরে বাবা! সকল দিকে সবগুলো ঝাড় একসঙ্গে মাতামাতি লাগাল। দৌড় দিল কমল বেরিয়ে পড়বার জন্য। এদিক থেকে ওদিক থেকে সপাং সপাং করে বাঁশেরা কঞ্চির বাড়ি মারছে, সামনের উপর নুয়ে নুয়ে পড়ছে—কায়দায় পেলে হয়তো-বা টুঁটি ধরে আকাশে তুলে নেবে। কত গভীর এসে পড়েছে না-জানি, বাঁশবনের কোন মুড়োদাঁড়া পায় না। কষ্ট হচ্ছে—এবারে হয়তো গড়িয়ে পড়বে বাঁশতলায় বাঁশপাতার গদির উপরে। আর, কাছের বাঁশ দূরের বাঁশ মাটিতে আবদ্ধ গোড়াগুলো হেঁচকা টানে উপড়ে নিয়ে হুড়মুড় করে ঘাড়ে চেপে পড়বে—

গলা দিয়ে কোন রকমে স্বর বের করে কমল ডেকে উঠল: অটলদা—

এইতো—। হাসির-জবাব সামান্য দূরে, একটামাত্র ঝাড়ের ওদিক থেকে। মুলেবাছুরের কান ধরে আটক করে ফেলেছে অটল, হাসছে খুব কমলের অভিমান দেখে।

ফ্যানসা- ভাত খেয়ে ছেলেরা সব পাঠশালা যায়। বিদ্যোৎসাহী কেউ কেউ ছেলের সঙ্গে নাকে-নোলক পায়ে-মল বাচ্চা মেয়েটাও পাঠিয়ে দেন। বেশি নয়, সারা সোনাখড়ি কুড়িয়ে পাঁচটা সাতটা এমনি। ছাত্রীদের নাম হাজিরাখাতায় কিন্তু ওঠেনি। মেয়েছেলে পাঠশালায়—ইনস্পেক্টর কী বলে না বলে, লেখাজোখার মধ্যে না যাওয়াই ভাল।

পাঠশালা নতুনবাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে। পাকা দেয়াল, খড়ের ছাউনি। দুটো কামরা মণ্ডপের দুই দিকে—একটায় চুন-সুরকি, অন্যটায় তক্তা-কাঠকুটো। বাংলা সাতানব্বুই সালে পাকাবাড়ির ভিত পত্তন, দোতলা চকমিলানো বাড়ির মতলব ছিল তখন। ততদূর হয়ে ওঠে নি, সে মুরুব্বিরাও গত হয়েছেন। উত্তরপুরুষরা কিন্তু আশা ছাড়েন নি। দুই কামরা ভরতি মালপত্র মজুত। এবং বিনামূল্যের বালি তুলে উঠানের শিউলিতলায় গাদা করা আছে।

ঠুং-ঠুং ঠুং-ঠুং ঠুং ঠুং—

চণ্ডীমণ্ডপের উত্তরের দেয়ালে মোটা আংটা বসানো। নতুনবাড়ি যখন দুর্গোৎসব হত, ঐ দেওয়ালের ধারে প্রতিমা বসাত। একবার প্রতিমা উল্টে পড়ার গতিক হয়েছিল, বাঁশ ঠেকনো দিয়ে বিস্তর কষ্টে খাড়া রাখে। মাদার ঘোষের বাপ চণ্ডীচরণ ঘোষ তখন নতুনবাড়ির কর্তা। পরের বছর তিনি দেয়াল খুঁড়ে মোটা আংটা বসিয়ে দিলেন। আংটার সঙ্গে দড়ি দিয়ে প্রতিমার পিছনের বাঁশ বেঁধে দিল, প্রতিমার আর নড়নচড়নের উপায় নেই। পূজো তার পরে তো বন্ধই হয়ে গেল। পাঠশালার ছোঁড়ারা আংটা এখন জোরে জোরে দেয়ালের গায়ে ঠোকে, আংটা বাজিয়ে বড়-ইস্কুলের ঘন্টা বাজানোর সুখ করে নেয়। আংটায় ঘা পড়ে পড়ে ইট ক্ষয়ে বৃত্তাকার গর্ত হয়ে গেছে উত্তরের দেয়ালের উপর।

ঠুং-ঠুং ঠুং-ঠুং—। ছেলেপুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে, মাস্টার পুকুরপাড়ে দেখা দিলেন বুঝি! কুমোরবাড়ির মেটে-দোয়াতে তিন ছিদ্র তিন দিকে, তাতে দড়ি পরিয়ে হাতে ঝুলিয়ে নিয়েছে। খাগের কলম। দাসেদের বিজয় ভাল কলম কাটতে পারে, সবাই তাকে ধরে। বিজয়েরও আপত্তি নেই। মেঘা কামারকে দিয়ে একটা ধারালো ছুরি এই বাবদে দু-আনা মূল্যে বানিয়ে রেখেছে। বইদপ্তর—বড় রুমালের সাইজের কাঁথা, একটা কোণে পাড় ঝুলছে, বইখাতা কলম রেখে কাঁথার চার কোণে মুড়ে পাড় ড়িয়ে জড়িয়ে দপ্তর বাঁধে। বগলে সেই জিনিস। তালপাতার চাটকোল অথবা গোল করে জড়ানো খেজুরপাতার পাটি নিয়ে চলেছে। জায়গা নির্দিষ্ট আছে, পাটি-চাটকোল পেতে নিলেই হল।

তিন-গাঁ রাজীবপুরের লোক গুরুমশায়। এই দেখুন, গুরু বলে ফেলেছি—পাঠশালা হলেও প্রহ্লাদকে গুরু বলা ঠিক হবে না। যেহেতু ইংরেজি ফার্স্ট বুকও পড়িয়ে থাকেন, মাস্টার তিনি। প্রহ্লাদ-মাস্টার বলে সকলে। শনিবার পাঠশালার পরে তিনি বাড়ি চলে যান, সোমবার সকালে আসেন দায়ে-দরকারে হপ্তার মাঝেও যান কখনো-সখনো। আজ সোমবার এখনো এসে পৌঁছন নি। এক একটা দিন এমনি দেরি হয়ে যায়। হট্টগোল। চোর-চোর খেলছে ছেলেরা। উঠোনে কোট কাটা আছে—জন কয়েক সেখানে নুন-দাড়ি খেলছে। কমল আর পালা শিউলিতলার বালির গাদায় বুড়িপোকা ধরতে বসেছে। বালির উপর ছোট গোট গর্ত—সুতোয় পিঁপড়ে বেঁধে সেই গর্তে ফেল। ছিপে মাছ ধরার কায়দা। একটু পরে দেখা যায়, বঁড়শি নড়ছে—নিচে থেকে বুড়িপোকা বেরিয়ে পিঁপড়ে আঁকড়ে ধরে। যে-ক্ষণ ধরা ধরেছে। আস্তে আস্তে সুতো টেনে তোল—বুড়িপোকাও উঠে আসবে। পোকা কোন কাজে আসে না, ধরার পরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়—তবু মাছ ধরার মজা পাওয়া যায় খানিকটা। এই সব চলছে, তার মধ্যে ঘন ঘন সকলে সমুদ্দুর-পুকুরের পানে তাকায়। পুকুরপাড় দিয়ে রাজীবপুরের পথ, প্রহ্লাদমাস্টার ঐ পথে আসবেন। আসার সময় হয়ে গেছে—ঠুং-ঠুং আংটা বাজিয়ে মাঝে মাঝে জল্লাদ জানান দিয়ে দিচ্ছে।

কমল বাড়িতে পড়ত দ্বারিক পালের কাছে। পাঠশালায় অল্পদিন আসছে—প্রহ্লাদমাস্টার নতুন আবার যোগ দিয়েছেন, সেই সময় থেকে। দু-বছর আগে শ্রীপঞ্চমীর দিন কমলের হাতে খড়ি হল। পাথরের থালার উপর পুরুত-ঠাকুর সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ—সরস্বতী-স্তবের একটা লাইন খড়িতে লিখে বললেন, এর উপরে যেমন ইচ্ছে আঁকজোক কেটে যা, দোষত্রুটি দেবী নিজে সেরে নেবেন। এতাবৎ তরঙ্গিণী সদাসতর্ক ছিলেন, হাতে-খড়ির আগে খোকন কাগজের উপর কালি-কলম না ঠেকায়। হাটখোলা থেকে দুই পয়সার দুটো বই কিনে রাখা হয়েছে—বর্ণবোধ ও ধারাপাত। নতুন বইয়ে কমল চুপিসাড়ে হাত বুলিয়ে দেখেছে—মসৃণ কোমল হাত পিছলে বেরিয়ে যায়। নাকের কাছে এনে ধরেছে—সোঁদা-সোঁদা গন্ধ একটা। কিন্তু ঐ অবধি—কালো শব্দসারি খোলা বই ছেড়ে সরে থাকে। হাতে-খড়ি হয়ে যাবার পর বই-শ্লেট-কলম-কালিতে অবাধ অধিকার তার।

দ্বারিক পাল পুববাড়ি ও নতুনবাড়িতে মাস্টারগিরি করেন। তাঁকে বলা ছিল, হাতে-খড়ির পর একটা নতুন কাজ চাপবে—কমলকে পড়ানো। অতিরিক্ত

বেতনও সেই বাবদ। বাইরের-কোঠায় তিনি অপেক্ষা করছিলেন, বই শ্লেট নিয়ে কমল গুটি গুটি সেখানে চলল। দিদি পুঁটি অলকা-বউ পিছু পিছু যাচ্ছে। দরজা অবধি গেল তারা সব, কমল ভিতরে ঢুকল। বসেছিলেন দ্বারিক, হাত বাড়িয়ে কমলকে কোলের মধ্যে টেনে নিলেন। বর্ণবোধ খুলে পড়াচ্ছেন : অ আ ই ঈ। কমল পড়ে যাচ্ছে।

পুরুতের দক্ষিণা, সরস্বতীপূজা ও কমলের হাতে-খড়ি দুই কাজের দরুন, রোক দুই সিকি। আধুলি বের করতে ভবনাথ ক্ষণ পরে বাইরের-কোঠায় ঢুকেছেন—দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়া শুনছেন। এক-ফোঁটা ছেলে কেমন টর-টর করে যাচ্ছে, শোন। দ্বারিকের সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে। কর্তার সামনে দ্বারিক একটু বাহাদুরি দেখিয়ে দিলেন—পড়ানো হতে না হতেই পরীক্ষা : এটা কি বলো দিকি কমলবাবু? কমল বলল, অ—। পারবে না কেন? বই না পড়ুক, অ আ ইত্যাদি কত জনের কাছে কত শতবার শোনা। দক্ষিণার কথা ভুলে ভবনাথ চোখ বড়-বড় করে তাকালেন। দ্বারিক তারিপ করে ওঠেন : ভারি পরিষ্কার মাথা। বড় হয়ে কমলবাবু জজ-ম্যাজিস্টর হবে এই বলে দিলাম। একটা মহাবীরত্বের কাজ করেছে, কমলের ভাবখানাও তেমনি। দুলে দুলে প্রচণ্ড শব্দ করে সে পড়ছে।

প্রহ্লাদ এ সময়টা পাঠশালার কাজে নেই—অম্বিক দত্ত পণ্ডিত হয়ে পাঠশালা চালাচ্ছেন। ঘরজামাই তিনি, মিত্তিরপাড়ার প্রিয়নাথ মিত্তিরের বড়মেয়ে দুর্গিকে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি কায়েমি হয়ে বসবাস করেন। প্রিয়-নাথের ছেলে নেই, পর পর আট মেয়ে। ঝাড়ফুঁক কত রকম হল, মেয়ে হওয়া ঠেকায় না। শেষের দিকে নাম রাখতে লাগলেন আন্না (আর না), ঘেন্না—নামের মধ্য দিয়ে ষষ্ঠীঠাকরুনের কাছে আপত্তি জানানো। আট মেয়ের মধ্যে যমকে দিয়ে-থুয়েও পাঁচ পাঁচটি বর্তমান এখনো। বিয়ের প্রস্তাব তুলে প্রিয়নাথ অম্বিককে বলেছিলেন ছেলে হয়ে তুমি বাড়িতে থাকবে। যা আমার আছে—পায়ের উপর পা দিয়ে নির্ভাবনায় জীবন কেটে যাবে, নড়ে বসতে হবে না। প্রিয়নাথ যতদিন ছিলেন তেমনি কেটেছিল বটে—মারা যাবার পর থেকেই গণ্ডগোল। শাশুড়ি এবং ধর্মপত্নীর সঙ্গে তিলার্ধ বনে না—ঝগড়াঝাটি অকথা-কুকথা অহরহ। শ্যালিকারা স্বামী সহ এক এক সময় হামলা দিয়ে এসে পড়ে। পিতৃসম্পত্তির হকদার তারাও—গাছের আম কাঁঠাল পাড়ে, গোলার চাবি খুলে দেদার ধান বিক্রি করে। ছেলেপুলেও ইতিমধ্যে দেড় গণ্ডা পুরে গেছে। নড়ে বসতে হবে না, প্রিয়নাথ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—তিনি নেই, কার কাছে এখন কৈফিয়ৎ নিতে যাবেন?

দায়ে পড়ে অম্বিককে রোজগারে নামতে হল। গুরুগিরি ছাড়া অন্য পন্থা চোখে পড়ে না। সে গুরুগিরি আবাদঅঞ্চলে। ধান-কাটা অন্তে বাদায় বাদায় পাঠশালা বসানোর ধুম পড়ে যায়। বিদ্যার কমজোরি বলে ঐ সব খানে পণ্ডিতি কর্মে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। পাওনাগণ্ডাও উত্তম। মরশুমে অম্বিক অতএব ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়েন।

আরও আছে। স্ত্রী তুলি ঘোর শুচিবেয়ে হয়ে পড়েছে। নাইয়ে নাইয়ে মারে অম্বিককে এবং ছেলেপুলেগুলোকে—নাওয়ার ঠেলায় ডবল-নিমোনিয়ার কবলে পড়ে পটল-তোলাও বিচিত্র নয়। ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পথ হাঁটে সে—দুনিয়ার সর্ববস্তু ও সমস্ত জায়গা অশুচি, পা কোথায় ফেলে জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না যেন। পবিত্র শুধুমাত্র দুটি জিনিস—জল ও গোবর। আবার জলের সেরা গঙ্গাজল—এই পোড়া দেশে গঙ্গাজল দুর্লভ বলে অনুকল্প নিয়েছে তুলসী-জল।

সাঁজের বেলা ছয় সন্তানকে লাইনবন্দি পুকুরঘাটে বসিয়ে পাইকারি ভাবে তাদের শৌচের কাজ সারে। বাচ্চা ছেলেপুলে সব সময় হুঁশ করে বলতে পারে না। আর যথাসময়ে শৌচ যদি হয়েও থাকে, বাড়তি আর একবার হলে দোষের কিছু নেই। বরঞ্চ ভাল, আরও বেশি পরিমাণে শুচি হয়ে গেল। পুকুরঘাট সেরে তারপর ছেলেপুলেরা ঘরের বাইরে কাপড়-চোপড় ছেড়ে দিগম্বর হয়ে দাঁড়াবে, সর্বাঙ্গে তুলসী-জল ছিটিয়ে তুলি ঘরে ঢুকিয়ে নেবে তাদের। অম্বিকের ব্যাপারেও এমনি। সারাদিন অম্বিক বাইরে বাইরে ঘোরেন, ঘরের ধারে-কাছে আসেন না। রাত্রে না এসে চলে না। তৎপূর্বে পুকুরের জলে ঝুপুস-ঝুপুস করে অবগাহন স্নান। হোক না শ্রাবণের বৃষ্টি-বাদলা, কিম্বা মাঘের কনকনে হিমেল রাত্রি। স্নান করে ভিজে-গামছা পরে ঘরের দরজায় অম্বিক তুর-তুর করে কাঁপছেন। দাঁড়িয়ে থাকতে হবে যতক্ষণ না তুলি ঘুম থেকে উঠে আপাদমস্তকে তুলসী-জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। পুকুরঘাট থেকে বাড়ি আসতে যা অশুচিস্পর্শ ঘটেছে, এইরূপে তার শোধন হয়ে গেল। দুটো গাইগরু আছে অম্বিকের, আর গোটা চারেক ছাগল। সন্ধ্যাবেলা তাদের তুলি তাড়িয়ে-তুড়িয়ে পুকুরে নামায়, কলসি কলসি জল ঢেলে স্নান করিয়ে তবে গোয়ালে তোলে। এখন অভ্যাস হয়ে গেছে—স্নান না করে রেহাই নেই, অবোলা জীব হয়েও বোঝে তারা। তাড়না করে আর জলে নামতে হয় না, মাঠ থেকে সোজা পুকুরে নেমে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। তুলি এসে কলসি কতক জল ঢেলে দিলে উঠে তখন গুটি গুটি গোয়ালে ঢুকে যায়।

হেন অবস্থায় গুরুগিরির নামে আবাদে আশ্রয় নিয়ে অম্বিক দত্ত রক্ষা পেয়ে যান। কিন্তু পাঠশালার আয়ুষ্কাল মোটামুটি ছয় মাস—পৌষ থেকে জ্যৈষ্ঠ।

আষাঢ়ে চাষের মরশুম আসে, গোলার ধানও ততদিনে তলায় এসে ঠেকেছে, পাঠশালা অতএব বন্ধ। অম্বিক অগত্যা শ্বশুরবাড়ি এসে ওঠেন। মাস ছয়েক আবার তুলির খপ্পরে।

সোনাখড়ির পাঠশালা নিয়ে কিছুদিন খুব ঝামেলা যাচ্ছে। প্রহ্লাদ-মাস্টার ছিলেন—মাথায় তাঁর বেশি পয়সার লোভ ঢুকেছে, গুরুগিরি ছেড়ে তিনি আদায়কারী-পঞ্চায়েতের কাজ নিয়েছেন। আমতাপোল গাঁ থেকে বহুদর্শী কাজেম আলি পণ্ডিতকে আনা হল। বয়স সত্তর ছাড়িয়ে গেছে—পড়ান তিনি ভাল, কিন্তু পড়াতে পড়াতে ঘুমিয়ে পড়েন। শীতকালে একদিন নতুনবাড়ির চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় জলচৌকির উপর খুঁটি ঠেশ দিয়ে রোদ পোহাতে পোহাতে পড়াচ্ছেন—ঘুম এসে গিয়ে গড়িয়ে একেবারে উঠানে। মাজায় বিষম চোট লাগল, জীবনে আবার যে কোন দিন বসে পড়াতে পারবেন, মনে হয় না। কাজেম-গুরুর পর আরও তিন-চারজন আনা হয়েছে, জুত হল না। তখন অম্বিক দত্তকে সবাই ধরে পড়ল: গাঁয়ের জামাই আপনি—নোনাজল খেয়ে আবাদে কেন পড়ে থাকবেন, গাঁয়ের পাঠশালার ভার আপনি নিয়ে নিন।

মাদার ঘোষ উকিল-মানুষ, সদরে রীতিমত প্রতিপত্তি। সেই কারণে বাড়ির পাঠশালা, যেখানে গুরুর সাকিন থাকে না বছরের অর্ধেক দিন, সেখানেও সরকারি সাহায্য মাসিক দুই টাকা। ছাত্রের মাইনে আসুক না-আসুক, দুই টাকা বাঁধা আছে—দেয় যদিও একসঙ্গে তিন মাস অন্তর। উপরে ধরা-চারা না হলেও এজিনিস সম্ভবে না।

'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে, দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে' —কবির উক্তি। কমল আছে তো কাঁটাও আছে। দুই টাকা সাহায্যের দরুন ইনস্পেক্টরের ঝক্কি সামলাতে হয় মাঝেমধ্যে। আবাদের মরশুমি পাঠশালায় ইনস্পেক্টরের ঝঞ্ঝাট নেই।

দেশভুঁইয়ের উপর মাদার ঘোষের টান খুব, কাছারি বন্ধ থাকলেই বাড়ি চলে আসেন। বড়দিনের মুখে এসেছেন অমনি। সদর-উঠানে পা দিয়েই চমক খেলেন। হারু মিত্তির মাতব্বরি করে বেড়ায়, তাকে শুধালেন: অম্বিক দত্তকে যেন চণ্ডীমণ্ডপে দেখলাম। ওখানে কি?

হারু বলল, উনিই তো পড়াচ্ছেন আজকাল।

কি সর্বনাশ!

হারু বলে, ভাল গুরু পাচ্ছেন কোথা? তা-বদ্দ চেষ্টা করেছি। প্রহ্লাদ-মাস্টারের বাড়ি গিয়ে পায়ে ধরতে বাকি রেখেছি কেবল। গুরু-ট্রেনিং পাশ করে হালের ছোকরা-গুরু সব বেরুচ্ছে—খাই শুনলে পিলে চমকে যায়।

তাদের দিয়ে পোষায় না।

অম্বিক নিজেই কি ইস্কুলে-পাঠশালে পড়েছে কোন দিন? ও কী পাড়বে?

হারু প্রবোধ দিয়ে বলে, পড়াচ্ছেন তো আজ পাঁচ-সাত বছর। পয়সা-কড়িও রোজগার করে আনেন। ঘষতে ঘষতে পাথর ক্ষয়। ইস্কুলে পড়ে না শিখুন, পড়াতে পড়াতে এখন শিখে গেছেন।

মাদার ঘোষ তবু মুখ বাঁকালেন: অম্বিক পাথরও নয়, নিরেট ইস্পাত। সারা জন্ম ঘষেও হ্রাস বৃদ্ধি হবে না।

বললেন, গুরু বদলাও। সাহায্য বাড়ানোর তদ্বিরে আছি আমি। জানুয়ারির মধ্যে পরিদর্শনে আসবে। রিপোর্ট-টা যাতে ভাল হয় দেখো। তারপরে আমি তো আছিই।

হারু ঘাবড়ায় না। বলে, গুরু হঠাৎ পাচ্ছি কোথা? রিপোর্টের ভালমন্দ কি গুরু বিবেচনায় হয়ে থাকে? তারও তদ্বির আছে। ভাববেন না দাদা। আপনি যেমন ওদিকে, এদিকেও আছি আমরা সব। দেখা যাক।

কোর্ট খুলতে মাদার ঘোষ চলে গেলেন। চণ্ডীমণ্ডপ ও চতুষ্পার্শ্বে ঘোর বেগে ঝাঁটপাট পড়ছে, শিউলি তলার বালির গাদা সরিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে কানাচে অন্তরালে নিয়ে রাখা হল। পথের দু-ধারে জিওলগাছের ডালপালা ছাঁটা হচ্ছে। পাঠশালার ছেলেপুলের সঙ্গে কাটারি হাতে অম্বিক নিজেই লেগে গেছেন।

নতুনবাড়ির ফিটফাট চেহারা পথ-চলতি নিতান্ত অন্যমনস্ক মানুষেরও নজরে পড়ে যায়। ছোটকর্তা বরদাকান্ত বলেন, ইন্সপেক্টর আসছে বুঝি? কবে?

জবাবটা হারু দিয়ে দেয়: তারিখ দিয়েছে বাইশে মঙ্গলবার। ওদের কথা! না আঁচালে বিশ্বাস নেই মামা। গেল বোশেখে অমনি আসবে-আসবে বলেছিল, তারিখও দিয়েছিল। প্রকাণ্ড কাতলামাছ তোলা হল পালের-পুকুর থেকে, রাজীবপুরে লোক পাঠিয়ে সন্দেশ-রসগোল্লা আনা হল। আপনার বউমাকে দিয়ে ক্ষীর বানিয়ে রাখলাম—আগা মাস্তোর আম আর ক্ষীরকাঁঠাল। ফুসফাস। ছোঁড়াগুলোর কপালে ছিল, মাছ আর রসগোল্লা তারাই সব সাপটে দিল। আসবার কথা আবার লিখছে—মাদার-দাদাও বলে গেলেন, আসবে নির্ঘাৎ এবারে। জোগাড়যন্তোর করে যাচ্ছি—কার ভোগে লাগে, দেখা যাক।

না, এলেন এবারে সত্যি সত্যি। আসল ইন্সপেক্টর নন—তাঁরা পাঠশালায় আসেন না, হাইইংলিশ-ইস্কুলে যান। এসেছেন ইন্সপেক্টিং-পণ্ডিত, নাম পরেশ দাস। বয়সে বৃদ্ধ। কোন তদ্বিরে এখনো চাকরি করে যাচ্ছেন,

কেউ জানে না। দেহে দস্তুরমতো জরা নেমেছে, এটা-ওটা লেগেই আছে। পা দুটো হঠাৎ ফুলে উঠেছিল বলে তারিখ দিয়েও বোশেখে আসতে পারেন নি—কথা প্রসঙ্গে পরেশ বললেন। তা বলে ছাড়াছাড়ি নেই। মরতে মরতেও দেখে যাবেন এবারে, সঙ্কল্প নিয়েছিলেন। দেমাক করে বলেন, ইন্সপেক্টরের চেয়ে খাতির-সম্মান ঢের ঢের বেশি পাই আমরা। তাঁদের দশা দেখুন গিয়ে। দশটায় গিয়ে পড়েছেন তো উঠোনে রোদ্দুরের মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। খাতির করে কেউ দশটা মিনিট আগে অফিসের দরজা খুলে বসাবে না। এ বয়সেও আমার এই যে তাগত দেখছেন, এ-গাঁয়ে সে গাঁয়ে ভালমন্দ খেয়ে বেড়ানোর চাকরিটা আছে বলেই।

নতুনবাড়ির ফরাসে সতরঞ্চির উপর তোষক পড়েছে, তদুপরি ধবধবে ফর্সা চাদর ও তাকিয়া। পথের ধকলে বুড়োমানুষ বেশ খানিকটা কাবু হয়েছেন। হাত-পা ধুয়ে কিঞ্চিৎ জিরিয়ে লুচি-মোহনভোগ, চার রকম পিঠা, ক্ষীর-সন্দেশ ও ডাবের জলে পয়লা কিস্তির জলযোগ সেরে পাশবালিশ আঁকড়ে তোষকে গড়িয়ে পড়লেন।

পাঠশালা ছেলেপুলেয় ভরে গেছে। অন্যদিন যা আসে, তার ডবল তে-ডবল এসেছে আজ। তোড়জোড় হপ্তা দুই ধরে চলেছে। ক্ষারে কাচা ফর্সা কাপড় সকলের পরনে। গায়ে জামা উঠেছে। এবং কারো কারো পায়ে জুতো। একেবারে চুপচাপ। সূচীপতন শ্রুতিগম্য হওয়ার একটা যে কথা আছে, সেই জিনিস। অম্বিক মাঝে মাঝে আঙুল তুলে চতুর্দিক ঘুরিয়ে নিঃশব্দে আস্ফালন করেছেন। বেত নেই—ইনস্পেক্টরের নজরে বেত না পড়ে সেজন্য সেরে ফেলা হয়েছে। কিন্তু এই অবস্থা বজায় রাখতে অম্বিক হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন—বেশিক্ষণ আর পারা যাবে না। গুটিগুটি এসে ফরাসের ধারে যুক্তকরে দাঁড়ালেন: পাঠশালা এখন কি পরিদর্শন হবে?

হাই তুলে দুটো তুড়ি দিয়ে পরেশ বললেন, এখন নয়। খাতাটাতাগুলো নিয়ে আসুন বরং এখানে, সরেজমিনে বিকেলে যাব। ছেলেদের ছেড়ে দেন। সকাল সকাল যেন আসে, বলে দেবেন।

অম্বিক ক্ষুণ্ণ হলেন। অনেক করে তালিম দেওয়া—সেই জন্য এতক্ষণ ঠাণ্ডা রাখা গেছে। একবার ছাড়া পেলে রক্ষে রাখবে? ধুলোমাটি কালি-ঝুলি মেখে কাপড়-জামা লাট করে এক-একটা হনুমান হয়ে বিকেলে আসবে। মুখস্থ করিয়ে দিয়েছি যত সব জিনিস—নিজ নিজ নামগুলো পর্যন্ত। দেরি হলে ভুলে যাবে।

হাক বিত্তির খিঁচিয়ে উঠল অম্বিকের উপর: উল্টো দিকটা ভাবছেন?

পরেশ দাসও কম নয়। সবই তো বাচ্চা বাচ্চা ছেলে—জেরায় গড়বড় করে ফেলে যদি?

ইন্সপেক্টরের শুভাগমন নিয়ে দশবারো দিন আজ ভারি ধকল যাচ্ছে। হাজিরা বইয়ে নতুন নতুন নাম ঢোকানো হয়েছে বিস্তর—বাদার বলে গিয়েছিলেন। ছাত্রসংখ্যা বেশি হলে সরকারি সাহায্য বাড়ানো যেতে পারবে—দুই থেকে পাঁচে তোলাও অসম্ভব নয়! তিন মাস অন্তর নগদ টাকা—গুরুর জন্য হড্ড-হড্ড করে বেড়াতে হবে না আর তখন, ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়বে। উকিল বাদার ঘোর কায়দাটা বাতলে দিয়ে গেছেন এবার। এক শিশু শ্রেণীতেই এর মধ্যে আঠারোটা নতুন নাম ঢুকেছে। প্রথম মান এবং দ্বিতীয় মানেও আছে। কোন পুরুষে কেউ পাঠশালা মুখো হয়নি—গায়ে বোঁটকা গন্ধ বুনো খরগোসের মতন। এমন কি ভদ্রসমাজের উপযুক্ত নামও একটা বাপ মা রাখেনি—হাবলা বোঁচা বাঁকা চ্যাঙশ পটোল উচ্চে এমনি সব বলে ডাকে। নতুন নতুন নাম দিয়ে মুখস্থ করানো হয়েছে ক'দিন ধরে। ঝামেলা এক রকম! নামকরণের পর সে নাম বাতিল করে আবার যুক্তাক্ষর বর্জিত নাম দিতে হয়েছে কয়েকটি ক্ষেত্রে। নয়তো জিভে আসে না।

হারু বলে, পরেশ দাস মশায় ঘড়েল লোক—এই কর্মে চুল পাকিয়ে ফেলেছেন। এই সমস্ত মালের মুখোমুখি না হন তো সব চেয়ে ভাল হয়। সেই চেষ্টা দেখুন। চিরটা কাল পরের খেয়ে খেয়ে নোলা প্রচণ্ড। কিন্তু খেয়ে এখন সামাল দিতে পারেন না। জলখাবারের ক'খানা লুচি চিবিয়েই গড়িয়ে পড়েছেন—

সমস্যার সমাধান পেয়ে গিয়ে হারু খল খল করে হেসে উঠল: বৈঠকখানা ওই, আর চণ্ডীমণ্ডপ এই—এক মিনিটের পথও নয়। পা উঠোনে না ছুঁইয়েও রোয়াকে রোয়াকে চলে আসা যায়—তা-ও পেরে উঠলেন না। ভাল হয়েছে—অশুভস্য কালহরণম্। মাধ্যাহ্নিকটা সাংঘাতিক যাতে হয়, দেখুন। সামনে বসে ঠেসে ঠেসে খাওয়াতে হবে—খাওয়ার পর উঠে বসবার তাগত না থাকে। খাওয়ার সময় পরিদর্শন বইয়ের পাতা মেলে ধরব। 'উৎকৃষ্ট'—লিখে দস্তখত মেরে গরুর গাড়িতে উঠে পড়বেন।

খাওয়া নতুনবাড়িতে। গলদাচিংড়ি পোনা আর কই—তিন রকমের মাছ। মাংসের ব্যবস্থা আগে ছিল না—শলাপরামর্শ করে অবেলায় ঐ অম্বিককেই পাঠানো হল, পাড়া খুঁজে পাঁঠা একটা টানতে টানতে তিনি নিয়ে এলেন। একুনে পনের খানি পদ দাঁড়াল—থালা ঘিরে পনের বাটির জায়গা হয় না। আয়োজন ফেলা যাবে শঙ্কা হয়েছিল—কোথায়! চেটে মুছে খেলেন

পরেশ, উপরন্তু পায়স ও সন্দেশ তিন তিনবার চেয়ে নিলেন। বরদাকান্ত একটু এসে দাঁড়িয়েছিলেন, বাইরে গিয়ে হারুকে ধমকান : কী সর্বনাশ, খাইয়ে পুঁতে ফেলবি নাকি? নরহত্যার দায়ে পড়ে যাবি যে!

হারু ফিক্তির খুশিতে ডগমগ, অসুধ ঠিকমতো ধরেছে। দুয়োর-জানলা বন্ধ করে বৈঠকখানা-ঘর অন্ধকার করে দিল। সামাল করে দিল, কেউ ঢুকে না পড়ে—ঘরে কোন রকম শব্দসাড়া না হয়। নিদ্রা নির্বিঘ্নে চলতে থাকুক। কান পেতে শোনা গেল, নাসাও ডাকছে বেশ।

বিকাল হল। ছেলেপুলে জমেছে, তবে সকালবেলার মতো ঠাসাঠাসি নয়। সুপারিবনের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে উঠোনে পড়েছে। চারিদিক চুপচাপ—ইন্সপেক্টরের সুখনিদ্রার ব্যাঘাত না হয়। ফাঁড়া বুঝি কেটে গেল, অম্বিক ভাবছেন। কড়া চোখে তাকিয়ে নিঃশব্দে ছেলেপুলে শাসনে রেখেছেন—হঠাৎ তারা সব দাঁড়িয়ে পড়ল। অম্বিক পিছনে তাকালেন—কী সর্বনাশ, পৈঠা বেয়ে পরেশ উঠে আসছেন। ডাকেন নি কাউকে, শব্দসাড়া করেন নি। ছেলেদের ভাল করে মহলা দেওয়া ছিল—ঠিক ঠিক উঠে দাঁড়িয়েছে।

অম্বিকও দাঁড়িয়ে পড়লেন। হারু কোন দিকে ছিল, বিপদ বুঝি ছুটতে ছুটতে এসে পড়ল। মুরুব্বি দু-পাঁচজন এলেন। দেখতে দেখতে জমে উঠল।

বোস, বোস তোমরা সব—

সকলকে বসিয়ে দিয়ে পরেশ চতুর্দিক একপাক ঘুরে এলেন। ঢ্যাঙা মতন একটা ছেলেকে বললেন, নাম কি তোমার?

কী-যেন নতুন নাম হয়েছে, প্রয়োজনের সময় গুলিয়ে যাচ্ছে। করুণ চোখে ছেলেটা অম্বিকের দিকে তাকায়। কিন্তু ইন্সপেক্টরের চোখের উপরে অম্বিক কি বলবেন এখন। একটুখানি ভেবে সে বলে শ্রীঅনিল কুমার—না না, অনিল নয়, সলিলকুমার ধর।

পরেশ হাসলেন : কোন শ্রেণীতে পড়ো তুমি?

এবারে নির্ভুল জবাব : দ্বিতীয় মান—

দিবারাত্রি কেন হয় বলো।

আরও সহজ ব্যাখ্যা করে পরেশ বলে দিচ্ছেন, রাত্তির গিয়ে সকাল হয়েছিল। তার পরে দুপুর। এখন তো বিকেলবেলা। এক্ষুনি আবার সন্ধ্যে হয়ে যাবে। তারপরে রাত। কেন হয় এসব?

সর্বরক্ষে। জলের মতন প্রশ্ন পড়েছে—যে না সে-ই বলতে পারে। হাঁপ ছেড়ে সলিলকুমার জবাব দিল : সূর্য উঠলে দিনমান। আকাশ ঘুরে সন্ধ্যে-বেলা ডুবে যান, তখন রাত্রি।

অ্যাঁ, কী সর্বনাশ !

চমক খেয়ে পরেশ আজব কথা বললেন, ওঠে না সূর্য। ডুবেও যায় না।

অম্বিকের দিকে চেয়ে কঠিন সুরে বললেন, দ্বিতীয় মাবে ভূগোল পড়ান না পণ্ডিতমশায় ?

তটস্থ হয়ে অম্বিক বললেন, আজ্ঞে হাঁ্য পড়াই বইকি।

কোন ভূগোল পড়ান শুনি ? কোথায় আছে সূর্য আকাশে ঘুরে বেড়ায় ?

অম্বিক নিরীহ কণ্ঠে বললেন, চোখেই তো নিত্যিদিন দেখছি। পুবে উঠল, আকাশে চক্কোর মেরে সাঁজের বেলা পশ্চিমে ডুবে গেল। সূর্যোদয় সূর্যাস্ত পাঁজিতেও রয়েছে।

পরেশ গর্জন করে উঠলেন : সমস্ত ভুল। কী সর্বনাশ, ছেলেদের এই জিনিস পড়িয়ে আসছেন ? সূর্যের নড়াচড়া নেই—এক জায়গায় আছে, পৃথিবীটা ঘুরছে তার চার দিকে।

এক প্রশ্নেই বুঝে গিয়েছেন, অধিক ঘাঁটাঘাঁটির দরকার নেই। খাইয়েছে বড় ভাল, ঢেকুরের সঙ্গে এখনো মাংসের সুবাস বেরিয়ে আসছে। পরেশ নিমকের অমর্যাদা করলেন না। বললেন, যদ্দুর পারি চেপেচুপে লিখে যাচ্ছি। কিন্তু পণ্ডিত বদলান। পৃথিবী দাঁড় করিয়ে রেখে উনি সূর্য ঘোরাচ্ছেন—সাহায্য বাড়ানো দূরস্থান, যে দুটাকা আছে তা-ও রাখা চলে না।

ইন্সপেক্টর বিদায় হতে অম্বিকও ফেটে পড়লেন : আসতে চাইনি আমি ছ্যাঁচড়া কাজকারবারের মধ্যে। দশজনে ধরে পেড়ে আনলেন। দু-টাকা সাহায্য দিয়ে মাথা কিনে বসেছে ওরা ! হাজরে-খাতা বানিয়ে নতুন নতুন নামপত্তন করতে হবে, চড়চড়ে রোদের মধ্যে পোঁঠা খুঁজে বেড়াতে হবে পাড়ায় পাড়ায়, এতবড় পৃথিবীটা লাট্টুর মতন ঘোরাতে হবে। কাজ নেই, আমার আবাদের পাঠশালাই ভাল। কী পড়াব কী না-পড়াব, সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছাধীন। ধান মেপে মাইনে—গোলায় ধান থাকলে তিন পালির জায়গায় চারটে নিলেও কেউ তাকিয়ে দেখবে না। আমার ইস্তফা—কার্তিকমাস পড়লেই আবাদ মুখো রওনা দেবো।

॥ আঠাশ ॥

প্রথম-ভাগ ছাড়িয়ে কমল দ্বিতীয় ভাগ ধরেছে। দ্বারিক পালকে দিয়ে আর সুবিধা হচ্ছে না। গোমস্তা মানুষ জমাখরচের ব্যাপারে অতি উত্তম, কিন্তু বানানে বেপরোয়া। ই কার উ-কার, দুটো ন, তিনটে স নিয়ে ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই—কলমের মাথায় যেটা এসে যায়, অবাধে তাই লিখে যান। দ্বিতীয়-ভাগের কড়া কড়া বানানে পদে পদে এবার ঠেক্কা খাচ্ছেন। কিন্তু এক ভস্ম আর ছার—অধিক দত্তো হলেও তো দেওয়া চলে না। সে অধিকও থাকছেন না সোনাখড়িতে, মরশুম পড়লেই আবাদে মহালে গিয়ে উঠবেন।

প্রহ্লাদ মাস্টার আবার এসে পাঠশালার ভার নিচ্ছেন, কানাঘুষো শোনা যায়। না, কানাঘুষা নেহাত নয়, খবর পাকাই বটে—ভবনাথ সঠিক জেনে এলেন। মাদার ঘোষও প্রহ্লাদের ছাত্র। বাড়ি এসে তিনি দেড় ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে ধূলিধূসরিত অবস্থায় হাঁফ ইত্যাদি সহ রাজীবপুরে সোজা প্রহ্লাদের আটচালায় গিয়ে উঠলেন। প্রহ্লাদের খোড়োঘর, কিন্তু আশে-পাশে সব চকমিলানো পাকাবাড়ি। ভারি ভারি লোক তাঁরা—সম্পর্কে প্রহ্লাদের খুড়ো, খুড়তুতো-জেঠতুতো ভাই। পরগণার একআনা অংশের মালিকানা আছে বলে আইনত জমিদার বলাও চলে। এতবড় বনেদি পরিবারের হয়েও প্রহ্লাদ নিজে নিঃস্ব মানুষ—ভদ্রাসন বাগ-বাগিচা ও সামান্য ভাগজমি ছাড়া আর কিছু নেই। পেটেখুটে বাইরে থেকে দু'পয়সা না আনলে দিন চলে না।

মাদার ঘোষ ভক্তিভরে প্রণাম করে বললেন, আদায়কারী-পঞ্চায়েত হয়ে হাটে হাটে চৌকিদারি-ট্যাক্স আদায় করে বেড়ানো—এ কি আপনাকে মানায়? অঞ্চল জুড়ে এত ছাত্র আমরা। অতি—দারোগা-জমাদার এসে আপনার উপর হুকুম ঝাড়ে, বড্ড খারাপ লাগে তখন আমাদের।

প্রহ্লাদ সায় দিয়ে বললেন, আমার খুড়তুতো ভাইরাও তাই বলছে। তাদেরও লাগে। এ কী ভাললোকের কাজ! কিন্তু পেট মানে না যে বাবা, কী করব?

মাদার বললেন, আমি সেটা দেখব—আমার উপর ভার রইল। যা আপনার নিজস্ব জায়গা, সেইখানে চেপে বসে বিদ্যাদানে কায়েম হয়ে লেগে

যান। ডিস্ট্রিক্ট-ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দহরম-মহরম আছে, সাহায্য পাঁচ টাকার: তুলে দেবো। বাঁধা এই পাঁচ টাকা রইল, তার উপরে ক্লাসের বেতন এবার থেকে ডবল। আরও পাঁচ টাকা সেদিক দিয়ে আসবে।

যশের ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভরসা করা মুশকিল, পূর্ব অভিজ্ঞতা যথেষ্ট রয়েছে। প্রহ্লাদ চুপচাপ আছেন।

বাদার বললেন, খোতামুখ ভোঁতা করে ফিরে যাব—তেমন পাত্র আমি নই মাস্টারমশায়। যতক্ষণ না 'হাঁ' পাচ্ছি, পা ধরে পড়ে থাকব।

গাঁয়ে ফিরে দশজনকে ডাকিয়ে বললেন, প্রহ্লাদ মাস্টারমশায়কে আবার নিয়ে আসছি। মাইনে কিন্তু ডবল হয়ে গেল। দু-আনার জায়গায় চার-আনা, চার আনার জায়গায় আটআনা।

কেউ রাজি কেউ গররাজি, আবার কেউ-বা বলে একেবারে দুনো হয়ে গেলে পারব কেন? মাঝামাঝি কিছু রফা হয়ে যাক।

কলরবের মধ্যে ভবনাথ বলে উঠলেন, আমার একটা কথা আছে বাদার—

বাদার জোড়হাত করে বললেন, যে করে মাস্টারমশায়কে রাজি করিয়ে এসেছি—আপনি আর কথা বলবেন না খুড়োমশায়। কমল শিশুশ্রেণীতে পড়বে—মাইনে দু-আনা লাগত, সেখানে চারআনা।

ভবনাথ বললেন, পুরো এক টাকা দেবো আমি, সকলের মুকাবেলা বলছি। মাগ্‌গিগণ্ডার বাজার পড়েছে। সংসারই যদি না চলে, ঘরবাড়ি ছেড়ে মুখে রক্ত তুলে খাটতে যাবে কেন মাস্টার?

প্রহ্লাদ এলেন। পয়লা দিন আজ খালি দেখাশোনা করে যাচ্ছেন। শিক্ষারম্ভে গুরুবার—সামনে বিষ্যুৎ থেকে পাকাপাকি ভাবে লেগে যাবেন। সোনাখড়ি ছোট গ্রাম—এ-মুড়ো ও-মুড়ো সাড়া পড়ে গেল, সকলে দেখতে আসছে। গোঁফে পাক ধরেছে তেমন মানুষও গড় হয়ে পায়ের ধুলো নিচ্ছে। তারাও সব ছাত্র। কর্তাকে পড়িয়েছেন ছেলেকে পড়িয়েছেন এবারে নাতি পড়বে—এমন পরিবারও আছে অনেক। তিন পুরুষের পণ্ডিত প্রহ্লাদমাস্টার। একমাস এক এক বাড়ি খাবেন, এই বন্দোবস্ত হল। শোওয়া আগে যে নিয়মে ছিল—নতুনবাড়ির বিশাল বৈঠকখানা-ঘরে। চার তক্তাপোশ-জোড়া ফরাস—পাঁচ-ছয়টি নিয়মিত শোয় সেখানে—সময় বিশেষ দশেও ওঠে। একটা প্রান্ত প্রহ্লাদের জন্য আলাদা করা। শোওয়ার সময় আলমারির মাথা থেকে তোষক বালিশ ও মশারি নামানো হবে। এ হেন রাজকীয় ব্যবস্থা শুধুমাত্র মস্টারমশায়ের—অন্য কারো নয়।

পশ্চিমের দেয়াল ঘেঁষে তিনটে আলমারি পাশাপাশি। বাদাররা তখন

তরুণ-যুবা—বয়সের ঝোঁকে কিছু মাত্রায় সাহিত্য চাড়া দিয়ে উঠছিল। তিনটে আলমারি সংগ্রহ করে তাঁরা লাইব্রেরি স্থাপন করলেন। আলমারিতে বইও ছিল। এবং গিয়ে-টিয়ে এখনো কিছু অবশিষ্ট আছে, মাদার বৌম বলে থাকেন। বই থাক না থাক আরশুলা আছে বিস্তর। হালকা শিমুলকাঠের আলমারিতে শতেক ছিদ্র বানিয়ে অহোরাত্রি কিলবিল করে বেড়ায়। বয়স হয়ে গিয়ে মাদারের দলটা কাজকর্ম নিয়ে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। গাঁয়ে যে ক'টি পড়ে আছে, সংসারের ঘানি টানতে টানতে নাজেহাল তারা—বই পড়ার বাতিক সম্পূর্ণ শীতল হয়ে গেছে। এর পরে যে দলটা উঠল—হিরু ঝন্টু অক্ষয় সিধু ভুলো ইত্যাদি সে দলের চাঁই—দশ রকম হুজুগের মধ্যে লাইব্রেরিও ঢুকেছিল তাদের মাথায়। বরের শয্যা-উত্থানের টাকা প্রথা মতো মেয়েদের না দিয়ে লাইব্রেরি-ফাণ্ডে নিয়ে নেওয়া হত। রবারস্ট্যাম্প নতুন করে তৈরি হল। বই কেনা হবে, লিস্টি তৈরি হচ্ছে—তৎপূর্বে বদ্ধ আলমারিতে মজুত বই যা আছে, তার লেনদেন শুরু হয়ে যাক না। কিন্তু আলমারির চাবির হদিস হচ্ছে না। গ্রামের লোকনাথ চক্রবর্তী এখন দুঁদে উকিল হয়ে হাইকোর্টে পশার জমিয়ে বসেছেন, লাইব্রেরির আদি-সেক্রেটারি হিসাবে চাবি তাঁর হেপাজতে আছে। এরা চিঠির পর চিঠি লিখল—চাবি পাঠিয়ে দিন, ভদ্রতা করে এক ছত্র জবাব পর্যন্ত উকিল মশায় দিলেন না। ইটকো ছোঁড়ারা তাঙতে যাচ্ছিল, মুরুব্বিরা নিষেধ করেন। তার মধ্যে মাদার দৌঁবও : খবরদার, খবরদার ! অমন কাজও কোর না। লোকনাথ কিচেন লোক। তালা ভেঙে হয়তো কুড়ি তিনেক আরশুলা বের করলে, হাইকোর্টে লোকনাথ মামলা ঠুকে দিল হীরে-জহরত ঠাসা ছিল আলমারি, লুঠ করে নিয়েছে। পাবলিক-কাজ আরও তো কত আছে—অন্য কিছু বেছে নিয়ে লেগে পড়ো। বই না কিনে তখন এরা কোদাল কিনে রাস্তা বাঁধতে লেগে গেল। বর্ষায় কাজ বন্ধ হল। রাস্তার কাঁচা মাটিও বর্ষার জলে ধুয়ে সাফাই হয়ে গেল। চলছে বেশ—খরায় মাটি তোলে, বর্ষায় ধুয়ে যায়—কোনদিন কাজ ফুরোবার শঙ্কা নেই।

সে যাই হোক, উদরগহ্বরে বই ও আরশুলা নিয়ে আলমারি তালাবদ্ধ—তবে আলমারির উপরটা বেশ কাজে লেগে যাচ্ছে। প্রহ্লাদের বিছানাপত্র গোটানো থাকে একটার মাথায়, ডুগি তবলা থাকে মাঝেরটায়, তৃতীয়টার উপর লম্বা-চেপটা-গোল নানা আকারের বালিশ কতকগুলো। চার তক্তা-পোষ জুড়ে মলিন সতরঞ্চির ফরাস—রাতদুপুরে ধুপধাপ বালিশ নামিয়ে ফেলে ছোঁড়ারা যেমন ইচ্ছা শুয়ে পড়ে।

সতরঞ্চি পাতাই আছে দিবারাত্রি। আসছে বসছে মানুষ, গল্পগাছা করছে, তামাক খাচ্ছে। গোমস্তা দ্বারিক পাল এসে দরজার উপরের সরদাল থেকে হাতবাক্স নামিয়ে নিয়ে ফরাসের একপাশে সেরেস্তা সাজিয়ে বসেন। চাষী প্রজাপাট আসে—খাজনাকড়ি বুঝে নিয়ে দাখিলে কাটেন দ্বারিক, কড়ায় উশুল দেন। আর একদিকে দাবাখেলা চলছে তখন, খেলুড়ে দু'জন ছাড়াও আরও সব ঘিরে বসে জুত দিচ্ছে। 'কিস্তি' 'কিস্তি' করে চেঁচিয়ে ওঠে কখনো-বা। কলহ বেধে যায় চাল দেওয়া নিয়ে, কলহ থেকে মারামারি। লম্ফ দিয়ে এক খেলুড়ে অপরের টুঁটি চেপে ধরে গড়াগড়ি খাচ্ছে। দ্বারিক পাল বললেন, কী হচ্ছে? ছেলেপুলের অধম হলে যে তোমরা। প্রজাখাতক এরাই বা কি ভাবছে! এসব হিতবাক্য এখন কারো কানে যায় না। বেগতিক বুঝে দ্বারিক হাতবাক্স তুলে রোয়াকে মাদুর পেতে সেখানে সেরেস্তা বানিয়ে বসলেন।

দুপুরের দিকে আরও জোরদার। দ্বারিকের সেরেস্তা নেই, ফরাসের এ-মুড়োয় পাশা পড়ছে, ও মুড়োয় তাস। আর সন্ধ্যা থেকে, তো রীতিমতো জমজমাট। ডুগি-তবলা নেমেছে আলমারির মাথা থেকে, দেয়ালের আংটা থেকে ন্যাকড়ায়-ঢাকা খোল নেমেছে, সরদালের উপর থেকে করতাল আর খঞ্জনী নেমেছে। পাথরঘাটা থেকে গাইয়ে মতিলাল হারমোনিয়াম ঘাড়ে করে এলেন। পচা ঝন্টু বিজয় শ্যামাপদ সিধু এবং আরও অনেকে এসে জুটেছে। হারু মিস্ত্রিও এই আসরে। তুমুল গানবাজনা আর এই এত কাণ্ডের ভিতরেও হেরিকেনের গায়ে একটা পুরোনো পোস্টকার্ড গুঁজে আলোর জোর কমিয়ে দিয়ে একটা কোণে হর ও অশ্বিনী দাবায় বসে গেছে।

রাত গভীর হয়। কাচে-ঘেরা গোখুরি-লণ্ঠন একটা দুটো পথের উপর। বিল-পারের ব্যাপারিরা হাট করে ফিরে যাচ্ছে—আরও কিছু এগিয়ে বিলে নেমে পড়বে। নীহার পড়েছে, পথ পিছল। বিলের ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীত-শীত করছে—কাঁধের গামছা খুলে গায়ে জড়িয়ে নিল তাদের কেউ কেউ।

হারু এরই মধ্যে কখন এক ফাঁকে সরে পড়েছে। ঝন্টুর দিকে সিধু চোখ টিপল। ঝন্টু মৃদুস্বরে বলে, না হে, সব কিছু নয়। বাড়িতে একলা বউ, সকাল সকাল না ফিরলে হবে কেন?

হুঁ, বউ! সিধু টিপে টিপে হাসে।

হিরু বলল, রাত হয়েছে—ওঠা যাক।

অশ্বিনী হেরে যাচ্ছিল। উত্তেজিত হয়ে বলে, রাত—কত রাত?

বাইরের দিকে উঁকিঝুঁকি দিয়ে হরু বলল, এগারোটা—

অশ্বিনী বলল, তোমার ঘড়িতে সন্ধ্যা না হতেই এগারো বেজে বসে থাকে। নয়ের এখন এক সেকেণ্ডও বেশি নয়।

ঘড়ি কারো নেই, যে বেশি চেঁচাতে পারবে তার জিত। সে বাবদে অশ্বিনী আপাতত অজেয়। পর পর দুটো বাজি হেরে মেজাজ উগ্র হয়ে আছে। হিরণ্ময়কে নরম হয়ে নতুন এক বাজির বড়ে না ছুঁয়ে নিতে হল।

আরো কিছুক্ষণ চলল। মতিলালের গলা ফ্যাস-ফ্যাস করছে, দুটো গান গেয়ে তিনি চুপ করে গেলেন। ভুলো ধরেছে তারপর। মতিলাল বললেন, ওঠা যাক এবারে। হারমোনিয়াম দাও। উঠব।

ঝন্টু বলে, আপনার গলা ভাঙ বলে আমাদের তো ভাঙেনি। আমরা চালাব আরও খানিক।

হারমোনিয়াম ছেড়ে দিয়ে সারা রাত্তির চালাক না। আমার কি। মানুষের গলা ভাঙে, হারমোনিয়ামেরও রীড ভাঙে। রীড ভাঙলে ফিরিরি— ঘাড়ে করে সেই কসবা অবধি নিয়ে যেতে হবে। একগাদা খরচা। ঝামেলাও বড়ো। হারমোনিয়াম আমি রেখে যাব না বাপু।

নিয়ে গেলেন হারমোনিয়াম তো বয়ে গেল। এরাও ছাড়নপাত্র নয়— বিনি হারমোনিয়ামে চালাচ্ছে। প্রহ্লাদ ইতিমধ্যে খেয়ে এসেছেন—রোয়াকের বেঞ্চিতে বসে চুপচাপ তামাক টানছেন, আর চটাশ চটাশ করে মশা মারছেন। উঁকি দিয়ে কে-একজন ডাকল: একা একা বাইরে কেন মাস্টারমশায়, ভিতরে এসে বসুন। প্রহ্লাদ কানে নিলেন না, যেমন ছিলেন রইলেন। গুহ্য কারণ আছে। ভিতরে আসার জো নেই। যারা এখন ঘরের ভিতর, অনেকেই তাঁর ছাত্র। গানবাজনা করা, দাবা-পাশা খেলা—যেদিন পাঠশালায় পড়ত, সম্ভব ছিল কি এদের পক্ষে? বয়স হয়ে এখন পড়াশুনো চুকিয়ে দিয়েছে বলেই করে যাচ্ছে। কিন্তু পিতামাতা ও মাস্টারপণ্ডিতের কাছে মানুষের বয়স হয় না। প্রহ্লাদ-মাস্টার ফরাসে ঘট হয়ে গিয়ে বসলে তাঁর চোখের উপরে আমোদ-ফুর্তিতে জুত হবে না। তা ছাড়া হুঁকো ঘুরছে ওদের হাতে হাতে—প্রহ্লাদ ঢুকলে পলকে বন্ধ হয়ে যাবে। এমন জমাটি আড্ডার রসভঙ্গ তিনি কেমন করে হতে দেবেন? মাস্টারমশায় একটেরে তাই পৃথক হয়ে রয়েছেন।

ওদিকে তাই তাড়া পড়ে গেল: শেষ করো হে এইবার। খেয়েদেয়ে এসে মাস্টারমশায় ঠায় বসে রয়েছেন। তোমরা উঠে গেলে তবে তাঁর বিছানা পড়বে।

আড্ডায় ইতি দিয়ে অতএব সব উঠে পড়ল। ছিলিমটা শেষ করে

প্রহ্লা ধীরেসুস্থে আলমারির মাথা থেকে তোষক-বালিশ নামালেন। এতক্ষনে শোয়া—মশারি শুধুমাত্র প্রহ্লাদের। অতি-অবশ্য চাই ওটা। মশা দু-চারটে আছে বটে, মশারি কিন্তু সে কারণে নয়। পাড়াগাঁয়ের মানুষ সাপের কামড় অগ্রাহ্য করে, সামান্য মশায় কামড়ে কি করবে! প্রহ্লাদ-মাস্টারের তবু কিন্তু মশারি একটা চাই-ই। অঘোরে ঘুমুচ্ছেন তিনি—একঘুম প্রায় কাবার। আড্ডা ভেঙে যে যার বাড়িতে খেতে গিয়েছিল—খাওয়া-দাওয়া সেরে ছোকরাগুলো জঙ্গুলে পথে হাই-হুই শব্দসাড়া করে একে-দুয়ে আবার ফিরে আসছে। শোওয়া এই নতুনবাড়িতেই ফরাসের সতরঞ্চর উপর। নিতান্ত যাদের বিয়ে হয়ে গেছে, সেই ক'টি বাদ। তা ও শোনে নাকি? বউকে ঘুমন্ত ফেলে রেখে পালিয়ে এলো হয়তো কোনদিন। ধরা পড়ে পরের দিন বকুনি খায়।

হবে, হবে। ও-বাড়ির গিন্নি এসে ছেলের মাকে প্রবোধ দেন: শিঙে দড়ি নিতে চাচ্ছে না গরু। হয় এমনি—গোড়ায় গোড়ায় পাকছাট মারে, শেষ অবধি ঠিক পোষ মেনে যায়। সবাই পোষ মানে, তোমার ছেলে কেন মানবে না?

প্রহ্লাদ অঘোরে ঘুমোচ্ছেন, দরজা ভেজানো। আলো নেই, ঘর অন্ধকার। আলোর গরজও নেই—আলমারির উপরের বালিশগুলো ফরাসে ফেলে যার যেটা নাগালের মধ্যে এলো মাথা চাপিয়ে শুয়ে পড়ে। বালিশের একদিন না ও যদি নাগাল মেলেও, শোওয়া ও ঘুমের কিছুমাত্র হানি হবে না।

পহরে পহরে প্রহ্লাদ ঘুম ভেঙে ওঠেন। চিরকালের অভ্যাস। হুঁকো-কলকে তামাক কাঠকয়লা টেমি দেশলাই সমস্ত জানলার উপর মজুত। নেমে এসে তামাক সাজতে বসে যান তিনি। টেমি জেলে কাঠকয়লা ধরান। হুঁকো-কলকে সহ তারপর মশারির মধ্যে ঢুকে পড়েন। ভুড়ুক ভুড়ুক করে টানছেন। মশারির বাইরের সব ক'টি তাঁর ভূতপূর্ব ছাত্র, বাজে কেউ নয়। হুঁকো টানার আওয়াজ পেয়ে তারা এপাশ ওপাশ করে, মশা মারতে চাপড় মারে গায়ে। ছাত্রগণ জেগে পড়েছে—মশারির অন্তবর্তী প্রহ্লাদ-মাস্টারের অবিদিত থাকে না। টেনেই যাচ্ছেন তিনি হুঁকো, মুখে মোলায়েম হাসি।

হঠাৎ বাৎসল্য জাগে মাস্টারমশায়ের অন্তরে। টেমিটা জলছিল—মশারির বাইরে বাঁ-হাত বাড়িয়ে ঝাপটা মেরে টেমি নিভিয়ে দিলেন। এবং উল্টো দিকে ডান-হাতে হুঁকো বাড়িয়ে ধরলেন। ডবল আবরু—আলো নিভে গিয়ে অন্ধকার ঘর, এবং মশারির ব্যবধান। মশারি টাঙানোর উদ্দেশ্যও এই ব্যবধান-রচনা। মাস্টারমশায় প্রসাদ দিচ্ছেন, ভক্তিমান ছাত্রেরা সে

বন্ধ হেলা করে না। হাত বাড়িয়ে কেউ একজন হুঁকো নিয়ে নেয়। ভুড়ুক ভুড়ুক বাইরে এবার হুঁকো টানার আওয়াজ— যা এতক্ষণ মশারির ভিতরে ছিল। হুঁকো এ হাত থেকে ও হাতে ঘুরছে, টানের চোটে কল্কের মাথায় আগুন জ্বলে আঁধার আলোকিত করে তুলছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে হুকো ঘুরে মশারির কাছে এসে থেমে যায়। ইঙ্গিত বুঝে প্রহ্লাদ হাত বাড়িয়ে হুঁকো ভিতরে নিয়ে নেন। শেষ কয়েকটা মোক্ষম সুখটান দেবেন, গুরুভক্ত-ছাত্রেরা সে জন্য কলকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। ছিলিম শেষ করে প্রহ্লাদ হুঁকো-কলকে রেখে শুয়ে পড়লেন। আবার উঠবেন তিনি। স্বহস্তে তামাক সেজে নিজে খাবেন, প্রত্যাশীদের খাওয়াবেন। এই সদ্বিবেচনার জন্য ছাত্রেরা যৎ-পরোনাস্তি গুরুভক্ত, ঘরবাড়ি ছেড়ে গুরুর পাশাপাশি এসে শোয়। কষ্ট করে উঠতে হয় না, তৈরি তামাক ঘুমের মধ্যে আপনাআপনি মুখের কাছে এসে পড়ে। এত সুখ অন্য কোথা ? ঘরবাড়ি, এমন কি, বউ ফেলে এখানে তাই শুতে আসে।

রাত্রিবেলা অন্ধকারের মধ্যে এই সব। এবং প্রাক্তন ছাত্রদের ক্ষেত্রে। দিনমানে আর এক রকম। সোনাখড়ির পুরানো ঠাঁইয়ে প্রহ্লাদ আবার এসে বসেছেন, সাড়া পড়ে গেছে। আশপাশে নতুন নতুন পাঠশালা গজিয়ে উঠেছিল, সমস্ত কানা। ছেলেপুলের ঠাসাঠাসি এখন, চতুর্দিক থেকে আসে। জঙ্গলে-ভরা আঁকাবাঁকা সুঁড়িপথ ধরে আসে, জলজাঙাল ভেঙে আসে, ধানবনের আল ধরে বিল-পারের ছেলেরা এসে ওঠে। আশশ্যাওড়ার ডাল ভেঙে সমুদ্দুর-পুকুরের চাতালের উপর পা ঝুলিয়ে বসে প্রহ্লাদ দাঁতন করেন, আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন। আসছে তো আসছেই—বগলে বইদপ্তর, আর জড়ানো পাটি-চাটকোল। হাতে-ঝুলানো দোয়াত। শিশুশ্রেণীতে তালপাতা লেখে, পাততাড়ি সেই বাবদ। কার কোন জায়গা মোটামুটি ঠিক আছে, এনেই পাটি বা চাটকোল বিছিয়ে জায়গা নিয়ে নেবে।

মাস্টারমশায়, আমার জায়গায় পেঁচো বসে আছে।

এইও—

ফ্যানসা-ভাত খেয়ে প্রহ্লাদ চৌকিতে এসে বসেছেন। তামাক সেজে দিয়েছে. হুঁকো টানছেন। পাঠশালা বসেছে, নালিশ শুরু হয়ে গেছে।

মাস্টারমশায়, শ্যামের পাটি আমার চাটকোলের উপর দিয়ে পেতেছে, দেখুন।

এট শ্যাম. পিটিয়ে তক্তা করব। শিগগির সরিয়ে নে।

বই কাড়াকাড়ি ওদিকে। মাণিক আর শ্রীপতিতে লেগে গেছে। পাটিগণিত দেখে মাণিক সেলেটে অঙ্ক তুলে নিচ্ছে, পাটিগণিত বই তার নিজেরও বটে।

শ্রীপতি জোর করে সেটা কেড়ে নেবে। নেবেই। মাণিকও তেমনি—ডাইনে বাঁয়ে, শেষটা হাত বড় করে পিছন দিকে ধরল। জায়গায় বসে হাতের নাগালে পাওয়ার আশা নেই দেখে হামাগুড়ি দিয়ে শ্রীপতি বাঘের মতন থাবা মারল বইয়ে। এতখানির পর নজরে না পড়ে পারে না, প্রহ্লাদ গর্জন ছাড়লেন : এই ছিপে, কি হচ্ছে রে ?

মাণিক করকর করে নালিশ করে : দেখুন না মাস্টারমশায়, অঙ্ক কষছি—ছিপেটা পাটিগণিত নিয়ে নেবে।

মাটিতে শোয়ানো ফুলোকঞ্চির ছাট। তুলে নিয়ে প্রহ্লাদ সপাং করে একবার মাটির গায়ে মারলেন : কাছে আয় ছিপে, হাত পেতে এসে দাঁড়া।

আদেশ-পালনে শ্রীপতির কিছুমাত্র গরজ দেখা গেল না। বলে, নিচ্ছি না তো মাস্টারমশায়। মিছে কথা। সাবা দেবো। তা মাণকে কিছুতে হাত ছোঁয়াতে দেবে না, পাপী করে রাখবে।

বিচার ঘুরে গিয়ে এবার শ্রীপতির স্বপক্ষে : বড় বাড় বেড়েছে মাণকে, অন্যের অনিষ্ট-চিন্তা। বই তোর খেয়ে ফেলবে নাকি ? দিয়ে দে।

অপরাধ মাণিকেরই বটে। সাংঘাতিক অপরাধ। পাটিগণিত বইয়ে দৈবাৎ শ্রীপতির পা লেগে গেছে। বই হলেন মা-সরস্বতী—সরস্বতীর গায়ে পা লাগিয়ে পাপ করে বসেছে সে, প্রমাণ করে পাপমুক্ত হবে। সেটা এমন কিছু ব্যাপার নয়—বইয়ে একবার হাত ঠেকিয়ে সেই হাত নিজের কপালে ঠেকানো। কায়দায় পেয়ে গেছে বলে মাণিক তা হতে দেবে না, জব্দ করছে শ্রীপতিকে। অঙ্ক কষায় বড্ড মন পড়ে গেল, পাটিগণিত যক্ষের ধনের মতন আগলে আছে।

বই দে মাণকে—

মামলায় বিজয়ী শ্রীপতি একঘর পড়ুয়ার দিকে গর্বিত দৃষ্টি ঘুরিয়ে পাটিগণিত হাতে তুলে নিয়ে কপালে ঠেকাল।

লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে ছোটকর্তা উঠানে দেখা দিলেন। ছোটকর্তা অর্থাৎ বরদাকান্ত। নব্বুই ধরো ধরো করছে বয়স—এতকাল তালগাছের মতন খাড়া ছিলেন, ইদানীং সামান্য একটু নুয়েছেন। এক-মাথা সাদা চুল, পুষ্ট পাকা গোঁফ, ফর্সা রং। প্রহ্লাদের কাছে প্রায়ই আসেন, বসেন, তামাক খান, গল্পগাছা করেন। পৈঠায় পা ছোঁয়াবার আগেই উঠান থেকে বলতে থাকেন, তামাক খাওয়াও দিকি মাস্টার। তোমার তামাকটা বেশ ভলোক, তোমার ছেলেগুলো পাজেও বেশ ভাল। সেই জন্যে আসি।

আসবেন বই কি! শতকণ্ঠে তাই তো বলে বেড়াই, এই বয়সে

ছোটকর্তামশায় কী রকম গ্রাম দেখাশুনো করে বেড়ান—সোনাখড়ি গিয়ে দেখে এসো সকলে।

আপ্যায়ন করে প্রহ্লাদ নিজের চৌকি ছেড়ে ছেলেদের একটা চাটকোল টেনে নিয়ে বসলেন। চৌকি জুড়ে বরদাকান্ত আয়েস করে বসছেন। তামাক-সাজা কর্মে সবচেয়ে বড় রাখাল, আর জল্লাদ। পড়ুয়াদের মধ্যে বয়সের দিক দিয়ে রাখাল সকলের বড়, চেহারা তাগড়াই। তামাক সাজার প্রশংসা পাইকারি সব ছেলের নামে হলেও কৃতিত্ব রাখাল ও জল্লাদের।

রাখাল হাতের লেখা লিখছিল। ছলা করে দিয়েছেন প্রহ্লাদ, মুক্তোর মতন লেখা: 'কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ —'। বালির-কাগজ বাদামি রংয়ের, পাতাটায় ষোল ভাঁজ করেছে, ছলা সকলের উপরে। ছলা দেখে নিচের বাকি পনেরো ঘরে পরিচ্ছন্ন স্পষ্ট হস্তাক্ষরে ঠিক ঐ রকম লিখতে হবে। এই কর্মটি রাখাল চমৎকার পারে। শুধুমাত্র লেখার ব্যাপারেই তার যত কিছু মনোযোগ। একমনে রত ছিল, হেনকালে বরদাকান্তর গলা: তামাক খাওয়াও দিকি মাস্টার—

লেখা পড়ে রইল, রাখাল তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। হলে হবে কি, কলকে তার আগেই সম্পূর্ণ জল্লাদের দখলে। কলকেয় তামাক ঠেসে হুড়দাড় করে জল্লাদ বাড়ির ভিতর আগুন আনতে ছুটল। ধরতে যাচ্ছিল রাখাল, ছাড়ত না—তামাক সাজায় তারই হকের দাবি। কিন্তু ছোটকর্তা ও প্রহ্লাদ মাস্টার দু-জন প্রবীণ মুরুব্বির একেবারে চোখের উপর কলকে নিয়ে টানাহেঁচড়া ভাল দেখায় না। অপসৃয়মান জল্লাদের দিকে কটমট চোখে সে তাকিয়ে রইল।

প্রহ্লাদ বুঝেছেন। উচিত দাবি রাখালেরই বটে। মনোহরপুরে রাখাল-দের বাড়ি, বিল-পারে অনেক দূরের গ্রাম। নতুনবাড়ি এক দুর্বল শরিক মেজবউ বিরাজবালা—তাঁর ছোট ভাই। গায়ে-গতরে কিছু ভারী, সেই লজ্জায় লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে বাড়িতে ছিল সে। খেত, বেড়াত। প্রহ্লাদ-মাস্টারের ক্ষমতার বিষয়ে বলে পাঠালেন মেজবউ—গাধা পিটিয়ে এযাবৎ যিনি বিস্তর ঘোড়া বানিয়েছেন। নিজের গাঁ-গ্রাম নয়, এখানে কিসের লজ্জা? তোর চেয়েও ধেড়ে ধেড়ে ছাত্তোর পাঠশালায় আছে। পড়া যেমন হোক না হোক, হাতের লেখাটা দুরস্ত করে নিবি, নড়ালবাবুদের কোন একটা মহালের তহশিলদার করে নেবেন ওঁরা। নিদেনপক্ষে তহশিলদারের মুহুরি। রাখালের তিন দাদাও প্রস্তাবে সায় দিয়ে কনিষ্ঠকে জোরজার করে বোনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এসে কিন্তু লাগছে ভালই, দিদির বাড়ি পছন্দ হয়েছে তার। বিধবা দিদি ও তাঁর সাত বছুরে ছেলে ফণীকে নিয়ে সংসার। খুঁজে খুঁজে সরু লম্বাটে

খোলের পছন্দসই হুঁকো কিনে ফেলেছে একটা, রাখালের নিজস্ব জিনিষ। প্রকাশ্যভাবে দিদির সামনে হুঁকো টানার বাধা নেই। দা দিয়ে তামাক কাটে, নিজ হাতে তরিবত করে তামাক মাখে। কালও মেখেছে, জিনিসটা বড় ভাল উতরেছে। গুরুপ্রণামী স্বরূপ সেই তামাক একদলা আজ প্রহ্লাদের জন্য নিয়ে এসেছে। আর সাজার ভার পড়ল কিনা জল্লাদের উপর। রাখালকে দেখিয়ে দেখিয়ে কলকে নিয়ে সে আগুন তুলতে গেল।

অবিচার হয়েছে, প্রহ্লাদ বুঝতে পারলেন। বললেন, হুঁকোর জল ফিরিয়ে নিয়ে আয় রাখাল। ক-দিন ফেরানো হয়নি, জল কটু হয়ে গেছে। পরের তামাক তুই সাজবি, বলা রইল।

মন্দের ভালো। বাইরে এক পাক ঘুরে আসা যাচ্ছে, আর পরের বারের জন্যে তো পাকা হুকুম হয়ে রইল। হুঁকো উপুড় করে জল ফেলতে ফেলতে রাখাল ঘাট-মুখো ছুটেছে। ঘাট ছাড়িয়েই বকুলগাছ—পাকা বকুলফল তলায় পড়ে আছে, পাখিতে ঠোক্কর মেরে ফেলে দিয়েছে। বকুলে ঠোঁটের দাগ। একটা বড় ডালে পাকা বকুল গাঢ় হলুদ রং ধরে আছে। বরদাকান্তর সঙ্গে প্রহ্লাদ কথাবার্তায় মগ্ন—গাছে উঠে বকুল দু-চারটে পেড়ে নেওয়া যেতে পারে, প্রহ্লাদ ঠাহর পাবেন না। জল্লাদকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাবে, বিচিও কাজে লাগানো যাবে—টুক-টুক করে ছুঁড়ে মেরে প্রতিহিংসা নেবে।

সেকালের কথা বলছেন বরদাকান্ত। একেবারে কালকের ব্যাপার মনে হয়। এই নতুনবাড়িতে তখন আড়াইখানা খোড়োঘর মাত্র—যত রবরবা পশ্চিমবাড়ি, বরদাকান্তের বাড়ি। মাদার ঘোষের বাপ চণ্ডী ঘোষ মশায় নলভাঙা এস্টেটে বাঁকাবড়শি কাছারির নায়েব হয়ে বসলেন, নতুনবাড়ির বাড়বাড়ন্ত তখন থেকে। মাসমাইনে তিন টাকা। বছর তিনেক চাকরির পর বাড়িতে পাকাদালান দিলেন, পাকা চণ্ডীমণ্ডপ বানিয়ে দুর্গা তুললেন—যেখানে এখন এই পাঠশালা রয়েছে। মাইনে মোটমাট ঐ তিন টাকাই কিন্তু। সে মাইনেও মাসে মাসে নিতেন না—সারা বছর পড়ে থাকত, পুজোর আগে একসঙ্গে তিন-বারোং ছত্রিশ—বছরের মাইনের টাকা হিসেব করে নিতেন। সম্পূর্ণ টাকাটা দুর্গোৎসবে ব্যয় করতেন। এক পয়সাও মাইনে নেন না, অথচ রাজার হালে সংসার চলছে, নতুন নতুন ভূসম্পত্তি খরিদ করছেন—বোঝ তবে উপরির ঠ্যালাটা। জমিদারবাবুরাও না বুঝতেন এমন নয়। মাইনেপত্তোর এস্টেটে জমা থেকে যায়—সম্বৎসরের গ্রাসাচ্ছাদন তবে চলে কিসে? বুঝেসুজেও তাঁরা উচ্চবাচ্য করেন না। মালেকের মাল-খাজনা ও যাবতীয় পাওনাগণ্ডায় কিছুমাত্র তঞ্চকতা নেই—তার উপরে বুদ্ধিবলে নিজ ব্যবস্থা করে নিলে নায়েবের

পক্ষে সেটা বাহাদুরিই বটে। পশ্চিমবাড়ির শরিকি আটচালা থেকে পাঠশালা তারপরে এই পাকা চণ্ডীমণ্ডপে এলো।

পাঠশালার পণ্ডিত তখন সর্বেশ্বর পাল—দ্বারিক পালের পিতামহ তিনি। মাজা-ভাঙা কোল কুঁজো বুড়োমানুষ—হস্তাক্ষরে ছাপার অক্ষর হার মেনে যায়। নানা জায়গা থেকে ফরমাস আসত—পুরানো পুঁথি তালপাতার নকল করে দিতেন। তাঁর প্রধান উপজীবিকা এই। আবার ওদিকে ফারসিনবিশ—কথায় কথায় বয়েৎ আওড়াতেন, মামলার রায় ফারসি থেকে তরজমা করে বুঝিয়ে দিতেন। মহাভারত-রামায়ণ পাঠ করতেন—তাতেও দু-চার পয়সা দক্ষিণা মিলত। আর পাঠশালার পণ্ডিতি তো আছেই।

বাচ্চা ছেলে সর্বপ্রথমে পাঠশালায় এসেছে। গুরুপ্রণামী এক টাকা এবং আস্ত একখানা সিধে পায়ের কাছে রাখল। বাচ্চাকে সর্বেশ্বর কোলে তুলে নিলেন, খড়ি দিয়ে তালপাতায় হাঁড়ি-কলসি এঁকে দিলেন। আঁকুক বাচ্চা যেমন তার খুশি। লেখাপড়া আরম্ভ হয়ে গেল। গুরুমশায় জলচৌকিতে বসেছেন। চাল থেকে সিকা ঝুলছে মাথার উপর—সিকার হাঁড়িতে চিনির-পুতুল চিনির রথ বীরখণ্ডি কদমা। হাত উঁচু হয়ে হাঁড়িতে ঢুকে যায়। একটা কদমা এনে বাচ্চাকে দেন। বনের পাখি বেশ বশ মানাচ্ছেন সর্বেশ্বর গুরুমশায়।

হাঁড়ি-কলসি চলল কয়েকটা দিন। তালপাতায় ন্যাড়াসেজির আঠা দিয়ে পণ্ডিতমশায় অ-আ ক-খ যাবতীয় স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ লিখে দিলেন। শুকিয়ে তার উপর কাঠকয়লার গুঁড়ো ছড়ানো হল। অক্ষরগুলো জলজল করছে। কলম বুলাবে ছেলে এর উপর দিয়ে অক্ষরের ছাঁদ রপ্ত করবে। সে কলম নলখাগড়া কেটে বানানো। কলমে বেশ খানিকটা হাত এসে যাবার পর সামনে পৃথক তালপাতা রেখে মিলিয়ে মিলিয়ে সেই পাতায় অ আ ক-খ লিখবে।

তালপাতা হয়ে গিয়ে কলাপাতা। কোমল মাঝপাতা কেটে এনেছে লেখার জন্য। সেই শুভদিনটিতে গুরুমশায়ের কাপড়-প্রণামী। কাগজে লেখা আর শেলেটে লেখ এই তো সেদিন মাত্র এসেছে। বরদাকান্তর শৈশবে এ-সবের চলন ছিল না।

সর্বেশ্বর মারা গেলের. এলেন কাজেমগুরু। মাথায় তাজ, একগাল বড় দাড়ি। চৌকির উপর বসে বসে মেরজাই সেলাই করেন আর হাঁক পাড়েন মাঝে মাঝে: পড়ে পড়ে লেখ—

এক একদিন ছোটকর্তা বাজার দরের কথা তোলেন। কী সস্তাগণ্ডার দিন ছিল তখন। খাওয়া-দাওয়ার সুখ ছিল, শখও ছিল লোকের। সমস্ত উড়েপুড়ে গেল একেবারে। ফুরফুরে চাল হাওয়ায় উড়ে যায়—দেড় টাকা মণ। তার চেয়ে

অনেক নিরেশ এখন চার সাড়ে-চার টাকায় বিকোচ্ছে। খাবে কি মানুষ—ভাত নয়, টাকা চিবিয়ে খাওয়া এখনকার দিনে।

শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি—গল্পটা শোন মাস্টার, যেন কালকের কথা। যেতে যেতে খেয়াল হল, কিছু তো হাতে করে যাওয়া উচিত। বিষ্যুৎবার কাটাখালির হাট—মাঝিকে বললাম, হাট হয়ে যাই চলো। ঘুর হবে খানিকটা, কী করা যাবে—শুধু হাতে যাওয়া যায় না।

ইলিশের মরশুম, ভৈরবে পড়ছে খুব। মুঠো-হাত চওড়া চকচকে চাঁদি-রূপোয় গড়া যেন। দাও এক টাকার—বলে টাকা ছুঁড়ে দিলাম ডালির উপর। জেলে হাসছে। দু'পয়সা করে ইলিশ—বত্রিশটা এক টাকায়। ইলিশের ঝাঁকা নিয়ে শ্বশুরবাড়ি উঠি কেমন করে? কমিয়ে তখন আটআনার নিলাম। তা-ও ষোলটা, আর একটা ফাউ।

কলকের আগুন নিতে জল্লাদ ভিতর-বাড়ি ঢুকেছে। চার শরিকের এজমালি রান্নাঘর—ঘরের মধ্যে দুই তরফ, আর দুই হাতনেয় দুই তরফ বেড়া ঘিরে নিয়েছেন। কোন তরফের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সকাল আছে এখনো—চানে-টানে গিয়েছে বউরা সব। কেবল রাখালের বোন বিরাজবালা বঁটি পেতে কচি-লাউ ফিরে ফিরে করে কুটছেন, ঘণ্ট হবে। কাছে এসে জল্লাদ বলল, মেজখুড়িমা, উনুন ধরানো হয় নি বুঝি তোমাদের? আমি যে আগুন নিতে এলাম। টেমি জেলে কয়লা ধরানো—বড্ড ঝামেলা তাতে।

মেজবউ বললেন, দুলিদের ঢেঁকিশালে যা। চিঁড়ে কুটছে, পাড় পড়ছে, শুনতে পাস না? ঐখানে আগুন পাবি।

দুটো বাড়ির পর দুলি অর্থাৎ অম্বিক দত্তর বাড়ি। আগুনের তল্লাসে সেইখানে যেতে হল। আঁটোসাঁটো জওয়ানী দুলি পাড় দিচ্ছে, দুলির বোন ঘেন্নাও সাথেসঙ্গে আছে। চিঁড়ের পাড় খুচ-খুচ করে হয় না, জোর লাগে দস্তুরমতো। তবেই ধান চেপ্টা হয়ে চিঁড়ে হয়ে দাঁড়ায়। দু-বোনে পাড় দিচ্ছে, আর বুড়োমানুষ হয়ে দুলির মা অপরূপ খেল দেখাচ্ছেন লোটের ধারে এলে দিতে বসে। কোলে দুলির ছ-মেসে বাচ্চা চুক চুক বুকের শুকনো চামড়া চুষছে অভ্যাস বশে। হামাগুড়ি দিয়ে লোটের উপর গড়িয়ে এসে পড়বে সেই ভয়ে বুকের মধ্যে রাখতে হয়েছে। লোটের ভিতরের চিঁড়ে এলে দিচ্ছেন তিনি। বিপজ্জনক কাজ—তিলেক অসাবধানে আঙুল ছেঁচে যাবে। এমন আছে পাড়ার মধ্যেই পূববাড়ির বড়গিন্নি। ঢেঁকিতে আঙুল-থেঁতো—অসাড় বাঁকা আঙুলে কোন কিছু করতে পারেন না। এলে দিচ্ছেন ডানহাতে দুলির মা, আর বাঁ হাতে নারকেলের শলায় নেড়ে নেড়ে খোলাহাঁড়িতে ধান সেঁকছেন

—সেই ধানে পাড় দিয়ে চিঁড়ে হচ্ছে। এর উপরেও আছে। লোভী ছেলেপুলে এসে ভিড় জমায় 'ঠাম্মা, দাও—' 'ঠাম্মা, দাও—' করে। এলে দেবার ফাঁকে লোটের ভিতর থেকে চিঁড়ের দলা তুলে দিতে হয়—কাড়াকাড়ি করে খায় তারা। সদ্য-কোটা চিঁড়ের দলা—গায়ের গরম কাটেনি, ও-জিনিসের তুলনা নেই।

কলকে হাতে জল্লাদ এসে পড়ল : ঠাম্মা, আগুন দ'ও—

ভুলির মা বিপন্নভাবে বললেন, বাঁশের চেলার আগুন থাকবে না দাদা। ক'খানা আমের ডালাও ছিল—সে আগুন নিচে পড়ে গেছে।

রোসো, চিমটে নিয়ে আসি।

কলকে রেখে জল্লাদ ছুটল। বৈঠকখানা-ঘরে তামাকের সরঞ্জামের ভিতর চিমটেও থাকে। চিমটের আগুন তুলে কলকের মাথায় বসিয়ে প্রাণপণে ফুঁ দিচ্ছে। ধরে গেছে তামাক, গলগল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে কলকের তলার ছিদ্র দিয়ে। খাসা তামাক—মনোরম একটা গন্ধ বেরিয়েছে। রাখাল জিনিস চেনে। কেনে তো সকলেই হাট থেকে। রাখালের তামাকের স্বাদ আলাদা।

প্রহ্লাদ-মাস্টারের হাতে মুখে চলে। ছোটকর্তার গল্পে হুঁ হাঁ দিচ্ছেন, মাঝেমধ্যে ফোড়নও কাটেন এক-আধটা। ডানহাত ওদিকে ব্যস্ত খুব তালপাতা, শেলেট, খাতা নিয়ে ছেলেরা ঘিরে ধরেছে—দ্রুতহাতে একটার পর একটা ছলা করে দিচ্ছেন—মিলিয়ে লিখবে। শেলেটে বর্ণমালা লেখাচ্ছেন—মুখে বলে বলে দেখিয়ে দিচ্ছেন হাতে ধরে—অ-আ ক-খ নিরলঙ্কার শুকনো নাম বলে হয় না—জবর জবর বিশেষণ : আঁকুড়ে-ক, মাথায় পাগড়ি-ঙ, ছেলে কাঁকালে-ঝ, বোঁচকা-পিঠে ঞ, পেট কাটা ষ—এমনি সব।

বরদাকান্ত হি-হি করে হাসেন : বেশ মজা! ভাল বলেছে মাস্টার—খাসা, খাসা! ঙ র মাথায় পাগড়ি, ঞ র পিঠে বোঁচকা—ঠিক বটে।

প্রহ্লাদ হাসছেন : বলেন কেন। তেতো ওষুধ এমনি কি গিলতে চায়? মধু দিয়ে মেড়ে খাইয়ে দিই।

রাখাল ফিরল। জল-ফেরানো হুঁকো এগিয়ে এনে ধরেছে। প্রহ্লাদ বললেন, কোথায়! ফেরেনি জল্লাদটা এখনো। হুঁকো রেখে দে।

বরদাকান্ত বিরক্ত কণ্ঠে বলেন, আজও গেছে কালও গেছে! কলকে ফুঁকে একেবারে শেষ করে আনবে। ছেলেপুলেগুলো যা আজকাল হয়েছে—গুরুজন বলে মান্য নেই। বাল পেল্লাদের তামাকটা বড় ভাল—যাই, একটান টেনে আসি। হা-পিত্যেশ বসে আছি তখন থেকে।

প্রহ্লাদের মনোভাবও ঠিক এই। কিন্তু একেবারে প্রত্যক্ষ ছাত্র জল্লাদ—সে তামাক খায়, চোখে দেখেও ছোটকর্তার মতো স্পষ্ট করে বলার জো

নেই। কিল খেয়ে কিল চুরি করা। বরদাকান্তর এত সব কথা শুনেও শুনছেন না তিনি। কাজে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তালপাতা আর শেলেটে লিখে লিখে এনেছে—মনোযোগে দেখছেন। ভুল সংশোধন করে দিচ্ছেন, ক্ষেত্র বিশেষে থাবড়াও একটা-দুটো।

মাস্টারমশায়, ধুয়ে নিয়ে আসি—

বলেই বুধো এক লাফে পৈঠা পার হয়ে দৌড়। 'আসি' বলে কথাটুকু পরিপূর্ণ করবার সবুর সয় না। শেলেটে বা তালপাতার লেখা উঁচু করে প্রহ্লাদকে একটুকু দেখিয়ে পুকুরঘাটে ছুটল। ভিজে ন্যাকড়া থাকে হাতের কাছে, লিখে লিখে অনেকবার ন্যাকড়া ঘষে মুছেছে। শেষটা আবছা দাগ-দাগ হয়ে যায়—পুকুর-ঘাটে না গেলে আর হয় না।

সমুদ্দুর-পুকুরের পাকাঘাটে জলে নেমে রগড়ে রগড়ে তালপাতা ধুচ্ছে। আঘাটার দিকে ঝুঁকে-পড়া কামিনী ফুলগাছ-তলায় তেঁতুল-খেটের উপর বউঝিরা সকালবেলা বাসন মেজে গেছে—মাজুনি পড়ে রয়েছে। শেলেট-ওয়ালারা সেই মাজুনি নিয়ে শেলেট মাজতে বসল। অস্পষ্ট আঁকচোক যত পড়েছে, তুলে ফেলে ঝকমকে করবে।

জল্লাদ অবশেষে দেখা দিল। কলকের ফুঁ দিতে দিতে সন্তর্পণে পৈঠা বেয়ে উঠল।

এত দেরি কেন রে ?

ছোটকর্তা হেসে বললেন, বললে হবে কেন। গুরুজনদের মুখে নিয়ে ধরবে—তিতে না মিঠে, বিষ না অমৃত—পরখ না করে দেয় কি করে ?

জল্লাদ কলরব করে বৃদ্ধের কথা ডুবিয়ে আগুনের বাবদ কত ঝঞ্ঝাট তাকে পোহাতে হয়েছে—সবিস্তারে বলতে লাগল। হাত বাড়িয়ে ইতিমধ্যে কলকে নিয়ে বরদা হুঁকোয় বসিয়ে টানতে লেগেছে। আরামে চোখ বুজে টেনেই যাচ্ছেন। প্রহ্লাদ যে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে, বন্ধ চোখে দেখতে পাচ্ছেন না।

একটা ছেলে অঙ্ক দেখাতে এলো। সুযোগ পেয়ে প্রহ্লাদ হাঁক পেড়ে উঠলেন : একটুখানি দাঁড়া। সামনের উপর সাজা-তামাক—একটান টেনে নিয়ে তার পরে দেখব।

বরদা চোখ মেলে তাকালেন। মুখ থেকে হুঁকো তুলে ছিদ্রমুখ হাত বুলিয়ে মুছে দিয়ে বললেন, খাও হে মাস্টার। রেখেছে ঘোড়ার-ডিম, খাও তাই।

প্রহ্লাদ মাস্টার একটান টেনেই ঠক করে মাটিতে কলকে উপুড় করলেন। মেজাজ হারিয়ে ফেলে শিক্ষক-ছাত্র আবরু আর রইল না। চোখ পাকিয়ে

জল্লাদকে কাছে ডাকছেন: আয় ইদিকে লক্ষীছাড়া পাজির পা-ঝাড়া। সব খানি তামাক ছাই করে ঠিকরি অবধি পুড়িয়ে কলকের মাথায় তোর প্রসাদ এনে দিল উল্লুক। ছোটকর্তার কি—হুঁকা পেলেন তো টানতে লেগে গেলেন।

চুলের মুঠো ধরে মাথা নুইয়ে ধরেছেন। দু-চার ঘা পড়বে পিঠে। হেনকালে রাখালের দিকে নজর পড়ল। এক টান টেনেই কলকে চালতে হল—গুরুর মনোকষ্টে ভারও লেগেছে। উসখুস করছিল, স্পষ্ট করে তারপর বলেই ফেলল, আমি এক ছিলিম সেজে এনে দিই মাস্টারমশায়।

যা। যাবি আর আসবি। থুতু ফেলে যা দুব্বোঘাসের উপর, থুতু না শুকোতে সেজে এনে দিবি। কলকে যদি সাবাড় হয়, তোকেও সাবাড় করব—এই বলে রাখলাম।

জিভ কেটে খুশির আনন্দে এক-গাল হেসে একছুটে রাখাল বেরিয়ে গেল।

প্রহ্লাদ-মাস্টারের মুষ্টি তোলা আছে। এবং ঘাড়ে হাত চেপে পিঠখানা বাগালের মধ্যে আনা হয়েছে। ঢিব-ঢাব পড়লেই হয়। কিন্তু মারের চেয়ে কঠিন শাস্তি মনে এসে গেল। ঘাড় ছেড়ে দিয়ে বললেন, তিন দিন তোর তামাক সাজা বন্ধ। বলতে গিয়েছিলেন 'কোন দিন'—নিজ স্বার্থেই সামলে নিয়ে 'তিন দিন' করলেন। তামাক সাজে ছোঁড়া বড্ড ভাল—অতি-সাধারণ ক্যাকসা তামাকও সাজার গুণে অমৃত হয়ে দাঁড়ায়।

লঘুপাপে গুরুদণ্ড হল হে মাস্টার—

বরদাকান্ত খুব হাসতে লাগলেন: তিন তিনটে দিন কলকে ছোঁবে না, এর চেয়ে অন্নজল বন্ধ করে দিলেই তো ভাল ছিল। এ তিন দিন তোমার জল্লাদ পাঠশালেই আসবে না দেখো।

নালিশ এলো: বুধো লিখতে দিচ্ছে না মাস্টারমশায়—

প্রহ্লাদ তাকিয়ে পড়লেন। কোথায় বুধো—চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যেই তো নেই। বদ্যিনাথ নিচু হয়ে বসে হাতের লেখা করছে। বুধো শেলেট ধুতে সেই ঘাটে গিয়েছিল—ফেরে নি।

বদ্যিনাথ বলে, মুখে রোদ ফেলছে মাস্টারমশায়, লিখতে দিচ্ছে না।

তাই বটে। বুধো অনেক দূরে বেড়ার ধারে—উঠোনে সবে পা ঠেকিয়েছে। বজ্জাতি ওখানে থেকেই। মেজে ঘষে শেলেট চকচকে হয়েছে, রোদ ঠিকরে পড়ছে শেলেটের উপর। ডাইনে-বাঁয়ে সরিয়ে ঘুরিয়ে এক কুচি রোদ চণ্ডীমণ্ডপের দেয়ালে এনে ফেলে। আরও ঘুরিয়ে অনেক চেষ্টায় তার-

পর বন্তিনাথের মুখে। চমক খেয়ে উঠানের দিকে তাকিয়ে বন্তিনাথ বুধোর কাণ্ড দেখল।

প্রহ্লাদকে দেখিয়ে দেয় : ঐ দেখুন মাস্টারমশায়—

ফুলো কাঞ্চ তুলে মাটির উপর সপাং করে এক বাড়ি : এই বুধো, বড্ড চেটো হয়েছে তোর, মার খাবার জন্য কুটকুট করছে, উঁ ?

বুধো পৈঠার ধারে এসে পড়েছে তখন। বলল. না মাস্টারমশায়, ইচ্ছে করে নয়। শেলেট ঝুলিয়ে আনছিলাম, কখন ঝিলিক এসে পড়ল—

ঠিক একেবারে মুখের উপর পড়ল, এত থুয়ে বন্তিনাথের মুখে ? উঠে আয়—

কমল এতদিন দ্বারিকের কাছে একা একা পড়েছে, এইবার সে পাঠশালে চলল। প্রথম-ভাগ সারা হয়ে দ্বিতীয়-ভাগ চলছে। কড়া কড়া অত সমস্ত বানান দ্বারিককে দিয়ে হয় না। পুরো একটাকা মাইনে দ্বিতীয় ভাগ-পড়া একফোঁটা ঐ বালকের জন্য—বলাব'ল হচ্ছে : দেবে না কেন ? চাকরি করে অঢেল টাকা আনছে। হবে-না হবে-না করে তিনি মেয়ের পিঠে ষেটের বাছা ছেলে। পেহ্লাদ মাস্টারের লোভ বাড়িয়ে দিল। পড়াবে ঐ ছেলে, আর আমাদের ছেলেপুলেগুলো পেটাবে।

উমাসুন্দরীর ইচ্ছা নয়, ছোটছেলে রোজ দু'বেলা টন টন করে পাঠশালায় যাওয়া-আসা করবে। কিন্তু বাড়িসুদ্ধ সকলের বিপক্ষে কাঁহাতক লড়ে বেড়ান ? প্রহ্লাদকে আনার মূলে যাঁরা, এ-বাড়ির কর্তাটিও তাঁদের একজন। তাঁকে বলে কিছু হবে না।

তরঙ্গিণীকে শুধান : অদ্দুর যেতে পারবে ছেলে ?

গর্ভধারিণী মা হয়েও কিছুমাত্র উদ্বেগ নেই। হেসে তরঙ্গিণী বলেন, কদ্দুর—নতুনবাড়ি ন-মাস ছ-মাসের পথ নাকি ?

তা হলেও বর্ষায় জলকাদা হবে পথে—

হাসতে হাসতে তরঙ্গিণী আরও জুড়ে দেন : বর্ষায় জলকাদা শীতকালে হিম চোত-বোশেখে খরা—ছেলে তবে তুলোর বাক্সে রেখে দাও, কোন-কিছু গায়ে লাগবে না।

উমাসুন্দরী রাগ করে বললেন, খাইয়ো তোমরা হিম, কাদার মধ্যে ফেলে রেখে দিও. যত ইচ্ছে হেনস্তা কোরো—কিছু বলতে যাব না। মুখ টিপলে এখনো দুধ বেরোয়—বড় হোক একটু, তিনটে চারটে বছর সবুর করো, লেখাপড়া তো পালিয়ে যাচ্ছে না।

ডুবন্ত লোকের তৃণখণ্ড ধরার মতন মেজছেলে কালীময়কেও বললেন।

সে ব্যবস্থা দিল : এ-বাড়ি আর ও-বাড়ি—ভাবনার কি আছে মা ? পুঁটি কি নিমি একজন-কেউ সঙ্গে গিয়ে রেখে আসবে।

ভাবনা তো নয়ই, উল্টে আরও যেন স্ফূর্তি লেগে গেছে সকলের। নিমি চমৎকার ফুল-লতাপাতা-পাখি তুলে রুমালের সাইজের কাঁথা সেলাই করে দিল —দ্বিতীয়ভাগ শিশুশিক্ষা ধারাপাত তিনখানা পাঠ্যবই, খাকের কলম, চিলের পাখনার কলম এই সমস্ত দপ্তরে বেঁধে নিয়ে যাবে। বালির-কাগজের খাতা বেঁধে দেওয়া হল—পাঠশালে গিয়ে কাগজেও লিখবে। এমনি তো ভবনাথ খরচের নামে তেরিয়া—কমল আবদার ধরেছিল, হাটখোলা থেকে জলছবি কিনে এনে দিয়েছেন তিনি—বীণাপাণি সরস্বতী, গজলক্ষ্মী, সাহেব-ঘোড়সওয়ার। জলছবি মেরে বই ও খাতার বাহার করেছে। কাগজে লিখবে তো এবার —সেজন্য ভাল কালি, সাঁ'র কালি, তরঙ্গিণী বানিয়ে দিলেন। চাল ভেজে ভেজে প্রায় পুড়িয়ে জল মেশায়, যার নাম সাঁ'র জল। খোলাহাঁড়ির তলা থেকে ভুষোকালি চেঁচে সাঁ'র জলে গুলে দিলেই কালি হয়ে গেল। শিল্পীমানুষ নিমি—কালির সঙ্গে আবার বাবলার আঠা মিশিয়ে দিল, লেখা ঝিকমিক করবে। কুমোরবাড়ির মেটে দোয়াতের গায়ে তিনটে ছিদ্র—ছিদ্রে সুতো পরানো—সুতো ধরে দোয়াত হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যাবে। কালির মধ্যে এতটুকু ন্যাকড়া—দোয়াত দৈবাৎ উল্টে গেলেও কালি সমস্ত পড়ে যাবে না, ন্যাকড়ায় আটকে থাকবে।

বগলে বইদপ্তর, ডানহাতে ঝুলানো দোয়াত—। কমল শেলেট খাতা আর গুটানো পাটি দেখিয়ে বলে, দাও ওসব, বাঁহাতে নিয়ে নিচ্ছ।

তরঙ্গিণী বলেন, পুঁটি নেবে। পাটি পেতে একেবারে তোকে জায়গায় বসিয়ে আসবে।

না, দিদি যাবে না। কেউ না।

একলা যে-মানুষ বিল ভেঙে মরগার রাস্তার কাছাকাছি চলে গিয়েছিল, নতুনবাড়ির তো তার কাছে ডাল ভাত। গুপ্ত অভিযানের কথা অবশ্য এঁদের কাছে খুলে বলা যায় না। নড়েচড়ে মাটিতে দুম করে এক লাথি মেরে বলল, কেউ যাবে না, আমি একলা।

হাত তো দু'খানা মাত্তোর, একলা তুই অত সমস্ত নিবি কেমন করে ?

নেবো—

গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে রইল, এক পা এগোবে না। বিরক্ত হয়ে তরঙ্গিণী বলেন, দিয়ে দে পুঁটি। এই বয়সে এমন জেদ—অনেক দুঃখ আছে ওর কপালে।

উমাসুন্দরী কোথায় ছিলেন, কর-কর করে পড়লেন : আজকের একটা দিন—এমন কথাটা বললে তুমি বউ। কোন কথা কেমন ক্ষণে পড়ে, কেউ

জানে না। বলি, একটু আধটু জেদ হবে না তো বেটাছেলে হয়েছে কেন। মিনমিনে যে নমুখো হলেই বুঝি ভাল হত।

তরঙ্গিণী এতটুকু হয়ে গেছেন। বকুনি খেয়ে আর তিনি রা কাড়লেন না। একদিকে জিওল-ভেরেণ্ডা-খাড়ু গাছের বেড়া, রামোত্তম মোক্তারের জঙ্গল-ভরা পোড়োবাড়ি অন্যদিকে। মাঝে পথ, দু'দিক থেকে ঘাসবনে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। পথ ধরে কমলবাবু একা পাঠশালা যায়। পিছনে তাকানো হচ্ছে মাঝে মাঝে—বিশ্বাসঘাতকতা করে কেউ পিছু নিল কিনা। তাই বটে—দূরে দূরে আসছে তো একজন। খাড়ুবনের আড়াল করে দাঁড়াল কমল—আর খানিকটা এগিয়ে আসতে, এক ছুটে সামনে গিয়ে পড়ল। পুঁটি নয়, বিনো—পুঁটি হলে রক্ষে ছিল না। মেরে, খিমচি কেটে—দেখে নিত একবার।

বিনোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে: তুমি আসছ কেন বড়দি?

বা রে, আমি কেন যেতে যাব। আমার কাজে আমি যাচ্ছি—কচুশাক তুলতে।

তাই যাও। এদিকে আসতে পারবে না কিছুতে।

পাঠশালার পৈঠার ধারে এসে যত বীরত্ব উপে গেল, থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। প্রহ্লাদকে জানে, বাড়িতে এসে ক'দিন আদর-টাদর করে গেছেন। পাঠশালাও দেখা আছে—পুতুল খেলতে পুঁটি নতুনবাড়ি আসে, দিদির সঙ্গে কমলও দু-এক দিন এসেছে—দূর থেকে তখন পাঠশালা দেখে গেছে। নিজে আজ পড়ুয়া হয়ে ঢুকতে ভয়-ভয় করছে। এবং লজ্জাও।

প্রহ্লাদ মিষ্টি করে ডাকলেন: এসো খোকন। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, উঠে এসো। আমার এই পাশটিতে বসবে। ভাল মাথা তোমার শুনেছি—অনেক বিদ্যে শিখবে, বিদ্যের সাগর হবে তুমি।

প্রথম-ভাগ ও দ্বিতীয়-ভাগ দুটো বইয়ের সঙ্গে যাঁর নাম, তিনিও বিদ্যের সাগর—কমলের মনে পড়ে গেল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কমলও সেই রকম হবে—কমলোচন বিদ্যাসাগর।

খেজুরপাতার পাটি বিছিয়ে নিয়ে কমল প্রহ্লাদের পাশটিতে বসেছে। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন প্রহ্লাদ একবার। পয়লা দিন আর কিছু নয়, অন্যদের নিয়ে পড়লেন। কমল তো বসে ছাড়ে না—সকলের দেখাদেখি বইদপ্তর খুলে আপন মনে দ্বিতীয়-ভাগ পড়ে যাচ্ছে।

শ্লেটে অঙ্ক কষে এনেছে জল্লাদ। এক নজর দেখেই প্রহ্লাদ জ্বলে উঠলেন: মুণ্ডু হয়েছে! দামড়া ছেলে সামান্য বিয়োগটাও পারিস নে? এদ্দিনে

শিখাল কেবল তামাক সাজাতে—সেটা ভাল মতোই শিখেছিস। বলি, আর্যা, মুখস্থ আছে?

হ্যাঁ, আছে। প্রহ্লাদের তুড়ুক-জবাব: বলব?

মুখস্থ না ঘোড়ার ডিম! আঁ-আঁ করে—আর ক্রমাগত বলে, বলব? প্রহ্লাদ ধমক দিয়ে উঠলেন: বল্ না রে হতভাগা। একটা আর্যা বলবি, তার জন্য পাঁজি খুলে দিনক্ষণ দেখতে হবে নাকি?

বিনো এসে উপস্থিত। কমল গোছগাছ করে দিব্যি বসে গেছে, দেখে বেশ ভাল লাগল। হাসতে হাসতে প্রহ্লাদকে বলে, কমল কিন্তু একা একা এসেছে মাস্টারমশায়, আমি ওর সঙ্গে আসি নি। আমি কচুশাক তুলে বেড়াচ্ছি।

প্রহ্লাদ হেসে চোখ টিপে বলেন, বেশ করছ। মেলা কচুগাছ আমাদের মণ্ডপের কানাচে। কমললোচন একা এসেছে জানি। পুরুষছেলে একা একা কত দেশদেশান্তর বেড়াবে, পাঠশালায় আসা তো সামান্য জিনিস।

ছাত তুলে সপাং করে মাটিতে একটা বাড়ি দিয়ে প্রহ্লাদ কানখাড়া করে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে নড়েচড়ে ভাল হয়ে বসলেন। সুর করে মাখন আগে পড়ছে, প্রহ্লাদ ও কয়েকটি ছেলে শুনে শুনে একসুরে পড়ে যাচ্ছে। বড় বড় চোখ মেলে কমল অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। বেশ তো চমৎকার!

কুড়োবা কুড়োবা কুড়োবা লিজ্জে
কাঠায় কুড়োবা কাঠায় লিজ্জে।
কাঠায় কাঠায় ধুল পরিমাণ
বিশ গণ্ডায় হয় কাঠার প্রমাণ—

আহা, কি সুন্দর! কেমন বাজনা বেজে কানের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। একবার মাত্র শুনেই তো কমলের আধা মুখস্থ হয়ে গেল।

॥ ঊনত্রিংশ ॥

শুভকর্ম সারা করে সকলে শুয়াতলি থেকে ফিরছেন। গরুর-গাড়ির ছইয়ের মধ্যে উমাসুন্দরী ও পুঁটি। ধান কেটে-নেওয়া খেতে চাকার দাগে পথ পড়েছে—পথ ধরে গাড়ি রাস্তার উপর উঠল। চলেছে, চলেছে। আগে আগে কালীময়—গলাবন্ধ কোট গায়ে, মাথায় আলোয়ান বাঁধা, বগলে ছাতি, হাতে জুতো। শীতকালে এখন জল-কাদা নেই, চারিদিক শুকনো-শাকনা—

জুতো পায়ে পথ চলা অসাধ্য নয়। কিন্তু কাদা না হলেও জুতোয় ধুলো-ময়লা লাগে, জুতোর তলা কমবেশি কিছু ক্ষয়েও যায়। তা ছাড়া পা টনটন করে অনভ্যাসের দরুন। ভদ্রসমাজের মধ্যে জুতোর আবশ্যক, কায়ক্লেশে পায়ে রাখতেই হয়—কিন্তু পথ চলতি অবস্থায় এখন কেন অকারণ কষ্ট স্বীকার করা। জুতাজোড়া যথারীতি বাঁ-হাতে ঝুলিয়ে কালীময় হনহন করে গাড়ির আগে আগে চলেছে।

উমাসুন্দরীর ইচ্ছা ছিল, ভাইয়ের বাড়ি আরও কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসবেন। ভূদেবও বারম্বার বলেছিলেন, কাজ চুকলেই চলে যেতে হবে তার কোন মানে আছে? জলে পড়েনি তো। কতকাল পরে বাপের ভিটেয় এলে—ভাইবোনে এক জায়গায় হলাম আমরা। বুড়ো হয়েছি, কবে চোখ বুজব, আর হয়তো দেখা হবে না।

কিন্তু কালীময় নাছোড়বান্দা—যাবেই। এখন ধান কাটার পুরো মরশুম। ফুলবেড়ে শ্বশুরবাড়ি জমাজমি সে ছাড়া দেখবার আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। বর্গাজমির ধান—আহার-নিদ্রা ছেড়ে এই সময়টা জমিতে ঘোরাঘুরি করা দরকার। বর্গাদারে নয়তো পুকুর-চুরি করবে।

মামামশায়কে বলল এই। এ ছাড়া আরও আছে। সেটা মনের ভিতরের কথা, মুখে বলার নয়। পাকস্পর্শ অন্তে নতুনবউ গুয়াতলি থেকে বাপের-বাড়ি ফিরে গেছে। হিরুও নতুন শ্বশুরবাড়ি গেছে। ভূদেবের বাড়ি এখন আর কী আছে খালের চেলা-পুঁটি-মৌরলা ক্ষেতের নতুন ঠিকরি-কলাই আর খানাখন্দের কচুশাক ছাড়া? সে জিনিস বাড়িতেও আছে। ফুলবেড়েতেও আছে। তার জন্য মাতুলালয়ে কেন পড়ে থাকতে হবে? বলল, মা-ই বরঞ্চ থেকে যান, লোক-সুযোগে পাঠিয়ে দেবেন। নয়তো একটা চিঠি দেবেন মামা, আমাদের ফটিক মোড়ল এসে ব্যবস্থা করে নিয়ে যাবে।

শুনেটুনে উমাসুন্দরীর মতি-পরিবর্তন হল। ধান উঠেছে তাঁর উঠোনের উপরেও—উঠোন ভরে গেছে। তার উপরে কলাই-মুসুরি আছে। বউ মেয়েরা কি সামাল দিয়ে পারে? একলাটি ছোটবউ চোখে অন্ধকার দেখছে। এখন যাই দাদা, ষষ্ঠীতে এসে বাপের-বাড়ির আম-কাঁঠাল খেয়ে যাব।

গ্রামে ঢুকে হরিতলা। গরু-গাড়ি থামিয়ে উমাসুন্দরী নেমে বৃক্ষদেবতার পায়ে গড় করলেন, তলায় মাটি মাথায় মুখে দিলেন। কালীময় জোর হেঁটে অদৃশ্য। পুববাড়ি ধরো ধরো করল সে এতক্ষণ। পুঁটিও নেমে পড়েছে। চেনা এলাকার ভিতর এসে বয়ে গেছে আর গাড়ির চালার উপর ঘটের

[illegible] থাকছে। [illegible] নিয়ে [illegible]
থেকে গাড়িতে বসে বসে পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরে গেছে। [illegible]
বাড়ি, দাসেদের বাড়ি ছাড়িয়ে বকুলতলা চাঁপাতলা হয়ে পুকুর-পাড় ধরে তীরবেগে দৌড়চ্ছে সে, ঝুঁটিবাঁধা চুল খুলে গিয়ে বাতাসে উড়ছে।

নতুনবাড়ির পাঠশালায় ছুটির আগের নামতা পড়ানো হচ্ছে। সর্দার-পোড়োর গৌরব আজ কমলের উপর বর্তেছে—পড়াচ্ছে সে-ই। পুঁটিকে দেখল একনজর। দৈবাৎ লক্ষ্মী র উঠানে পড়ে একছুটে দিদিকে জড়িয়ে ধরবে—কিন্তু কর্তব্য বিষম—মনে যাই থাক, যথানিয়মে সুর করে পড়িয়ে যাচ্ছে: আট উনিশং একশ-বাহান্ন ন-উনিশং একশ-একাত্তর--। এবং বারম্বার দৃষ্টি যাচ্ছে আশশ্যাওড়া-ভাঁটবনের শুঁড়িপথটার দিকে পুঁটি যার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নামতা শেষ। ছুটি। সামনের রাস্তায় গরুর গাড়ি দেখা দিয়েছে। ছইয়ের নিচে উমাসুন্দরী পিছন দিকে মুখ করে আছেন। কমলকে ডাকলেন: এসো। ছুটি হয়ে গেল? কাছে এসো খোকন।

কমল ঘাড় নেড়ে দিল— আসবে না সে। পায়ে পায়ে তবু এসে পড়ল। উমাসুন্দরী বলেন, গাড়ি থামাচ্ছি—উঠে আয় পাশটিতে।

জোরে জোরে কমল অনেক বার ঘাড় নেড়ে দিল উঠবে না সে কিছুতে। চোখ ভরে যায়: গাড়িতে তখন তো নিয়ে গেলে না! পুঁটি গেল, আমি বাদ। এইটুকুর জন্যে এখন ওঠার কথা বলছেন!

তরঙ্গিণী আর বিনোকে দেখা গেল। পুঁটির কাছে শুনে পথ অবধি এগিয়ে পড়েছেন। জিজ্ঞাসাবাদ করছেন, খবরাখবর বলছেন। বাইরে বাড়ির উঠোনে গাড়ি থামিয়ে গরু দুটো খুলে গাড়োয়ান সুপারিগাছে বাঁধল। অটলের হাত থেকে কলকেটা নিয়ে ফক-ফক করে টানছে। দেখতে দেখতে বেশ একটু ভিড় জমে উঠল, এবাড়ি ওবাড়ি থেকে দু-পাঁচজন এসে পড়লেন। বউ কেমন হল, ও কেষ্টর মা? দিয়েছে-থুয়েছে কি? নতুন বউ বাপের বাড়ি রওনা করে দিয়ে এলে, আমাদের একটু দেখালে না?

উঠানে এত লোক—ভবনাথকে কেবল দেখা যায় না। বাড়িতেই আছেন তিনি—দক্ষিণের-কোঠার মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে জমাখরচের হিসাব দেখছেন। হিসাব বোধকরি সাতিশয় জরুরি—নয়তো উঠোনে এত লোকের কথাবার্তা, একটিও তাঁর কানে ঢোকে না?

উমাসুন্দরী একটা নিশ্বাস চেপে নিলেন। দুর্গোৎসবের ব্যাপারে সেবারে সারাটা গ্রাম নিয়ে কী মাতামাতি—আর বাড়ির ছেলে দিক, ছোটবাবু যাকে চোখে হারাতেন—ছেলেটার বিয়ে হল, কুটুম্বর পাতে একমুঠো ভাত পড়ল

[illegible]

[illegible] কমলকে বলছেন, [illegible]—থাক না, ভাই। [illegible] কদিন থাকবে, সেইজন্য পাঠিয়ে দিয়ে এলাম। ঠাকুরপো [illegible] বাড়ি আসবে। নতুন বউ তখন নিয়ে আসব। নেমতন্ন-আমন্ত্রণ আমোদ-আহ্লাদ সমস্ত তখন।

কমলের সবুর সয় না, বীরত্বের খবরটা পুঁটিকে সকলের আগে দিচ্ছে: তুই টিপি-নে দিদি—একা একা আমি কোথায় চলে গিয়েছিলাম।

চোখ বড় বড় করে পুঁটি বলে, কোথায় রে? বল্ না কোথায়।

অনেক দূর। বলবি নে কাউকে?

না, কক্ষনো না। দিব্যিদিলেশা করছে পুঁটি: ঘরের মধ্যে এই বকুল-তলায় বসে বলছি, বলব না।

তখন কমল সন্তর্পণে গুপ্তকথা ব্যক্ত করে। বাঁকা-তালগাছ ছাড়িয়ে বরগার উপর দিয়ে পুঁটিদের গরুর-গাড়ি গিয়েছিল—একলা কমল খাড়াআড়ি বিল ভেঙে একদিন সেই অবধি গিয়ে পড়েছিল আর কি, প্রায় রাস্তা অবধি।

পুঁটি হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে: ঐ বুঝি অনেক দূর হল। রাস্তা অবধিও যাসনি, তাই আবার জাঁক করে বলছিস? খোকন যেন কী—আমি ভাবলাম, না-জানি কোন দূর-দূরন্তর জায়গা।

হাসির তোড়ে কমল দিশা করতে পারে না। বলে, উঠতাম ঠিক রাস্তায় গিয়ে। তা ভাবলাম, তোকে না নিয়ে একা-একা গেলে ফিরে এসে তুই দুঃখ করবি।

পুঁটি তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, দুঃখ করব? আমি বলে কত কত গাঁ-গ্রামের কত শত রাস্তা ঘুরে এলাম—

কমল বলে, গরুর-গাড়িতে বসে সবাই অমন ঘুরতে পারে। হেঁটে তো যাসনি।

পুঁটি হাত-মুখ নেড়ে চোখ ঘুরিয়ে বলে যাচ্ছে, বরগার ঐ রাস্তা তো ঘরের দুয়োরে। সে কত-দূর! যাচ্ছি, যাচ্ছি যাচ্ছি—তেরোতলি আর আসে না। সূর্যি ডুবে গেল, চাঁদ উঠল—তেরোতলি আসে না। কত ঘরবাড়ি গরু-বাছুর বিল-মাঠ—তেরোতলি আসেই না মোটে।

কমলও বুঝি মনে মনে গরুর-গাড়ি চেপে দিদির সঙ্গে জড়াজড়ি হয়ে বসে [illegible] যাচ্ছে। [illegible] যাচ্ছে—[illegible] যাচ্ছে, যাওয়ার শেষ হয় না। [illegible] সে যাত্রা।

[illegible]

বিল হয়ে গেছে—[illegible] [illegible] [illegible] শেষ নেই। [illegible]

গাঙ থেকে খাল বেরিয়ে গাঁয়ের [illegible] বরাবর চিরে [illegible] [illegible]। [illegible]

যেমন, খালও তেমনি—[illegible] কচুরিপানা [illegible] [illegible] [illegible]

জল দেখবার উপায় নেই। কচুরিপানা বলে, আবার কেউটেফণাও [illegible]—

কেউটেসাপে যেন ফণা তুলে উঠেছে, দেখতে সেইরকম। ফণার মতন [illegible]

সবুজ পাতা, ফুল ফুটে তার মধ্যে শোভা করে থাকে।

কমল গাঙ দেখেনি। বিলের মধ্যে খাল আছে কয়েকটা—[illegible]

হন্তের খাল, আসাননগরের-খাল—হামেশাই নাম শোনা যায়। বাড়ির নিচে বিল হলেও এত খালের একটাও তার চোখে দেখা নেই। গুরাতলি গিয়ে পুঁটি তো বহুদর্শিনী হয়ে গিয়েছে—অবোধ শিশু-ভাইটিকে সে গাঙ-খালের বিষয়ে জ্ঞানদান করে। গাঙ-খালের মুড়োদাঁড়া নেই—খানিকটা গিয়ে যে একেবারে শেষ হয়ে গেল, শেষ অবধি পায়ে হেঁটে তুমি উল্টো পাড়ে চলে গেলে, যে জিনিষ হবার জো নেই।

তবে?

সাঁতার কেটে পার হয় লোকে। গুরোতলি:তে তা-ও মুশকিল—:শেওলা ও জঙ্গলের ভিতরে সাঁতরানো চাট্টিখানি কথা নয়। মাঝমধ্যে সাঁকো আছে—মানে এপারে-ওপারে বাঁশ ফেলা। বাঁশের উপরে পা টিপেটিপে মানুষে চলাচল করে—পা সরে গেছে কি ঝুপ করে নিচে গিয়ে পড়বে।

কমল সভয়ে বলল, ওরে বাবা!

খালের এপারে আর ও-পারে খানিক খানিক জায়গায় দাম কেটে সাফ-সাফাই করে ঘাট বানিয়ে নিয়েছে। চান করে লোকে, বাসন মাজে, কলসি ভরে জল নিয়ে যায়। এপারের ঘাটে ওপারের ঘাটে কথাবার্তা গল্পগুজব কথা-কাটাকাটি এমন কি ঝগড়াঝাটিও হয় কখনো-সখনো। কিন্তু যা হবার দূরে দূরেই হল—কাছাকাছি হতে পারছে না বলে কাজের খুব একটা জোর বাধে না।

কমল হেসেই খুন। একজন এখানে এই পারে, আর একজন ওই সেখানে—কাছে যেতে পারে না, হাঁক পেড়ে তাই গল্প করছে। ভারি মজা তো!

গড় বলে এক জলা জায়গা—দীর্ঘ, দূরব্যাপ্ত। কোন এক রাজার রাজ-বাড়ি ছিল, রাজবাড়ি ঘিরে গড়। গড়ের পাশে উঁচু ঢিবি ও জঙ্গল—লোকে রাজবাড়ি বলে দেখায়। বেলা মাছ পড়ে ঐ গড়ে, খাল-বিল থেকে এসে [illegible]। [illegible] [illegible] জায়গা ওটা, জেলেরা জমা নিয়েছে। [illegible]—

[illegible] মাছ দেখার চুক্তি। থাবুই নিয়ে [illegible] যায়, সেই সঙ্গে পুঁটিও যেত। হাপরে মাছ জিয়ানো—হাপর ডাঙায় তুলে ধরলে মাছ খলবল করত, সে বড় দেখতে মজা। জেলে বলত, কি মাছ খাবা খুকি-ঠাকরুন? পুঁটি আঙুল দেখিয়ে বলত, ঐটা, ঐটা—উঁহু, চ্যাংমাছ কে খাবে, ওদিককার উই বড় কইটা—

মেলা টিয়াপাখি, বিশেষ করে রাজবাড়ির জঙ্গলে গাছপালায়। এখানে যেমন কোয়েল-শালিক, গুয়াতলিতে টিয়াপাখি তেমনি। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়ায়; গাছে বসে, মাটির উপরেও বসে। গড়ের ধারে বেদেরা এসে টোল ফেলেছিল। বেলা ডুবুডুবু—মেয়েমদ্দ ছেলেপুলে ঘোড়া-খচ্চর ছাগল-মুরগি এক-পাল এসে পড়ল। মানুষরা এলো কতক পায়ে হেঁটে, কতক-বা ঘোড়ার পিঠে। গৃহস্থালীর জিনিসপত্র সঙ্গে এনেছে—যার ঘর-ছাওয়া হোগলা অবধি। সকালবেলা দেখা গেল, হোগলার এক এক কুঁজি তুলে পুরোদস্তুর পাড়া জমিয়ে নিয়েছে। গাছতলায় উনুন ধরাচ্ছে, নাওয়া-খোওয়া করছে গড়ের জলে। আরও বেলায় মেয়েরা পাড়ায় ঢুকে 'বাত ভালো-ও-ও—' বলে হাঁক পাড়ছে: বাত ভাল করতে পারি, দাঁতের পোকা বের করতে পারি। হরেক ব্যাধির চিকিৎসা পুরোনো কাপড় কিম্বা দুটো-চারটে পয়সার বিনিময়ে। পুরুষরাও বেরিয়ে 'ভানুমতীর খেলা' অর্থাৎ ম্যাজিক দেখাচ্ছে। আর পাখি ধরছে নলের মুখে আঠা লাগিয়ে। টিয়াপাখি ধরে ধরে তারের খাঁচায় পুরছে। কত যে ধরল, লেখাজোখা নেই। টিয়া ধরার মতলব নিয়েই বেছে বেছে এইখানেই আস্তানা নিয়েছে—গুয়াতলির মানুষ বলাবলি করে।

না গিয়েও কমল গুয়াতলি গ্রামটা চোখের উপর দেখতে পাচ্ছে—এমনি-ধারা পুঁটির গল্পের গুণ। গাঙের কিনারে প্রাচীন বটগাছ—ঝুরিগুলো হুবহু মুনি-ঋষির জটাজালের মতো। কালীমন্দির সেখানে। মন্দিরের পাকা চাতালে ভস্মমাখা ত্রিশূলধারী লম্বাচওড়া দশাসই এক সাধুপুরুষ থাকেন। লাল-টকটকে বড় বড় চোখ। নিশিরাত্রে মা-কালীর বিগ্রহ নাকি কথাবার্তা বলেন তাঁর সঙ্গে। বাড়িসুদ্ধ একদিন সবাই সাধুর কাছে গিয়েছিলেন—নতুন বউ ছিল, পুঁটিও ছিল। পুঁটির দিকে সাধু তাকিয়ে পড়লেন, ভয় পেয়ে পুঁটি ছিটকে সকলের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

কমল তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, ধুস, কী তুই, আমি হলে সাধুর একেবারে কাছে চলে গিয়ে বর চাইতাম।

পুঁটি প্রশ্ন করে: কী বর চাইতিস?

মুহূর্তমাত্র না ভেবে কমল বলল, একটা টিয়াপাখি চাইতাম—বিনি খাঁচায়

ই গাড়ির উপর [illegible]।"

পুঁটি এক তাজ্জব বস্তু দেখেছে, যার নাম রেলগাড়ি। [illegible] দেখলেও নতুন বউয়ের কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এত শুনেছে যে সে-ও একরকম দেখা-ই। ওয়াতলি থেকে ক্রোশ দুই দূরে রূপদিয়া নামে স্টেশন। সেখানে লোহার পাটির উপর দিয়ে রেলগাড়ি আসে আর যায় দিনে-রাত্রে অনেক বার। আওয়াজ ওয়াতলির বাড়ি থেকেই স্পষ্ট কানে পাওয়া যায়। তাই-বা কেন, হৃদয় নামাদের ছাতে উঠে ধোঁয়ার কুণ্ডলীও দেখে এসেছে—এই এখানটা ধোঁয়া, কতদূর গিয়ে আবার ধোঁয়া, আরও খানিকটা গিয়ে আবার। রাত-দুপুরে একটা গাড়ি আসে। জেঠিমার কোলের মধ্যে শুয়ে পুঁটির ঘুম ভেঙে যেত এক-এক রাত্রে। যেন এক দঙ্গল দৈত্য রেগে বেরিয়ে পড়ে চতুর্দিক লণ্ড ভণ্ড করে বেড়াচ্ছে। সে কী ভয়ানক আওয়াজ রে খোকন! কাঁপুনি লাগত, জেঠিমাকে এঁটেসেঁটে ধরতাম। কলের ব্যাপার তো কিছু বলবার জো নেই। হয়তো বা ইস্ক্রুপ-টুরুপ খুলে লাইন ভেঙে মজুমদার-বাড়ি এসে পড়ে সবসুদ্ধ চুরমার করে দিয়ে গেল। রক্ষা এই, আওয়াজটা বেশিক্ষণ থাকত না। গাড়ি চলে গিয়ে আবার সব ঝিমিয়ে পড়ে। ঝিঁঝিঁ ডাকে, তক্ষক ডাকে।

রেলগাড়ি বস্তুটা কমলও জানে। 'পদ্যপাঠে' পড়েছে। 'ছয় দণ্ডে চলে যায় ছ'মাসের পথ—'। কিন্তু বইয়ে পড়াই শুধু, তার অধিক কিছু নয়। নতুন বউ, সেজবৌদি হয়েছেন যিনি, তাঁর কী কপাল-জোর! রেলগাড়ি চক্ষের পলকে তাঁকে রূপদিয়া স্টেশনে এনে নামিয়ে দিয়েছিল। আর দিদিটাও খুব যে কম যায়, তা নয়—আস্ত রেলগাড়ি চোখে না দেখুক, ধোঁয়া দেখেছে, দিনমানে ও রাত্রে গাড়ির গর্জন শুনেছে।

পুঁটি বলল, সেজবৌদির নাম সরসীবালা। খাসা নাম—না রে? মানুষটাও খুব ভাল। খুব আস্তে আস্তে বলে ফিসফিস করে। গায়ের উপর বসেও সব কথা শুনতে পাইনে, জিজ্ঞাসা করে নিতে হয়। তোর কথা জিজ্ঞাসা করত, এ-বাড়ির সকলের কথা জিজ্ঞাসা করত। তোকে বলত ঠাকুরপো—হি-হি-হি, তুই খোকন ঠাকুরপো হয়ে গেছিস।

এতগুলো দিন শ্বশুরবাড়ি ছাড়া। এসে পড়েছে তো আর দেরি করে! ফুলবেড়ে আজই যাবে, কালীময় ধরল। ফসল ওঠার সময় জামাই বিনে একলা শাশুড়িঠাকরুন চোখে সর্ষেফুল দেখছেন। বর্গাদার পুকুরচুরি করছে।

উমাসুন্দরী বলেন, পথঘাট ভাল না। যাবি তো পড়ে পড়ে ঘুমোলি কেন সন্ধ্যে অবধি?

ভোর থাকতেঁ বেরিয়েছি, ঘুমের কি বোধ না ?

কথা কানে না নিয়ে ঘ্যাচ-ঘ্যাচ করে সে বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গীও জুটে গেল—অম্বিক দত্ত। অম্বিকের আদিবাড়ি ফুলবেড়ের—জ্ঞাতিভাইরা আছে এবং সামান্য জমাজমি। বাদাবনে এইবার পাঠশালা খোলার মরশুম—ছ-সাত মাসের মতো অম্বিক চাকরিতে বেরুবেন, তৎপূর্বে জমাজমি সম্পর্কে ভাইদের কিছু বলে যেতে চান।

ঘুটঘুটে-আঁধার রাত্রি, ঘাসবনে আচ্ছন্ন সুঁড়িপথ। হেন অবস্থায় হাতে লাঠি চাই, এবং অপর হাতে লণ্ঠন যদি থাকে তো খুবই ভাল—এই বিলাসিতা অবশ্য সকলের ট্যাঁকে কুলোয় না। আর চাই মুখের সশব্দ কথাবার্তা। আজকে মূর্তিমান একটি দোসর রয়েছে। কিছু সঙ্গী না থাকলেও একা একা মুখ চালাতে হবে—সাপটাপ সরে যাবে পথ থেকে, ঘাড়ে পা পড়ার সম্ভাবনা কমবে।

কথাবার্তা চলছে। হিরুর বিয়েই আজকের বড় কথা। অম্বিকের অনুযোগ : ভাইয়ের বিয়ের নিজে গিয়ে তো সেঁটে এলে, গ্রামের কেউ জানতে পারল না। একমুঠো ভাত পড়ল না কারো পাতে।

ঘোড়ার ডিম। সেঁটেছি না আরো-কিছু ?

কালীময়ের ব্যথাটা ঠিক এখানে। বিয়ের সব অনুষ্ঠান নিখুঁত হল, খাওয়ার ব্যাপারে গণ্ডগোল। শুরু থেকেই। বর যাচ্ছে বরযাত্রীর দল সঙ্গে নিয়ে—সেই পথের উপর থেকেই। সবিস্তারে কালীময় বলতে বলতে যাচ্ছে।

গুয়াতলি থেকে দু'ক্রোশ গিয়ে রেলস্টেশন। ঝঞ্ঝাটের পথ। বরের কিছু নয়—সে তো পালকির মধ্যে গ্যাঁট হয়ে পড়ে আছে। মরতে মরণ বরযাত্রীগুলোর—খানাখন্দ বনজঙ্গল আর মাঠ ভেঙে চলেছে। বুড়োমানুষ ছেলেমানুষ জনা দশেক দলের মধ্যে—টিগটিগ করে যাচ্ছে তারা, যাচ্ছে কি যাচ্ছে-না—তাদের ফেলে এগোনো যায় না। স্টেশনে এসে দেখা গেল, পয়লা ঘণ্টা পড়ে গেছে—পান-টানের উপরে সেখানে কিছু হয়ে উঠল না। এতগুলো নিয়ে গাড়িতে ওঠা, আবার ঝিকরগাছা-ঘাট স্টেশনে দেখেশুনে গোণাগুণতি করে নামিয়ে নেওয়া—গায়ে কালঘাম ছুটে গিয়েছিল। ঝিকরগাছা থেকে নৌকো—নৌকোর ব্যবস্থা মেয়েওয়ালাদের। মাঝি তাড়াচ্ছে তাড়াতাড়ি উঠে পড়বার জন্য। সন্ধ্যার মুখে বর-বরযাত্রী গ্রামের ঘাটে হাজির করে দেবার কথা—গড়িমসি করলে সেটা সম্ভব হবে না। এমন কি লগ্ন ফসকে যাওয়াও বিচিত্র নয়। তারা গিয়েছিল, রেঁধেবেড়ে মজা করে খাওয়া যাবে ঝিকরগাছায়। এখানকার দোকানে দোকানে ব্যবস্থা আছে, উনুন রান্নার-কাঠ কোন-কিছুর

অসুবিধা নেই, বাসনকোসন ভাড়া পাওয়া যায়, বাটনা-বাটা জল তোলার বাবদে ঝি-ও প্রচুর মেলে। কিন্তু সময়ে কুলোচ্ছে কই? অগত্যা কালীময় অন্নপূর্ণা হোটেলের সঙ্গে ব্যবস্থা করে ফেলল। বত্রিশ জনে খাবে, কাটো-বেলাসের খাওয়া দিতে হবে—রেট বাড়িয়ে জন-প্রতি সিকি সিকি, বত্রিশজনে আট টাকা।

বলতে বলতে কালীময় যেন ক্ষেপে যায়। হোটেলের সেই দুর্ভোগ মনে উঠে অন্তরাত্মা জ্বালা করে। নররূপী রাক্ষস পুরো একগণ্ডা জুটেছিল তাদের বরযাত্রিদলে। সেকেলের ডাকসাঁইটে খাইয়ে রঘুবর—মুণকে-রঘুবর যাঁকে বলত—ভাতব্যঞ্জনে দৈনিক যিনি মণের কাছাকাছি টানতেন—তাঁরই সাক্ষাৎ-নাতি ঋষিবর যাচ্ছে। এবং ঋষিবরের সাঙাত আরও তিনটে। কেউ কম যায় না—এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। হোটেল-ওয়ালার সঙ্গে কথাবার্তা চলছে—ক্ষিধের ওদিকে ঋষিবরের নাকি মাথা ঘুরতে লেগেছে। চারটে পিঁড়ি পাশাপাশি নিজেরাই ফেলে—অমন কবুতরের চোখের মতন কপোতাক্ষের জল, তাতে একটা ডুব দিয়ে আসারও সবুর সইল না—পিঁড়িতে বসে হাঁক পাড়তে লেগেছে: ভাত নিয়ে এসো ও ঠাকুর—

ঋষিবরের ঠাকুরদা রঘুবর। রঘুবরের নামে লোকে আজও ধন্য-ধন্য করে। খাওয়া দেখিয়ে রাজগঞ্জের জমিদারমশায়ের কাছ থেকে মোটা পারিতোষিক আদায় করেছিলেন তিনি। বাড়ি এসে সেই টাকায় জাঁকিয়ে দুর্গোৎসব করলেন। দেনার দায়ে একবার রঘুবরের দেওয়ানি-জেল হল। দেওয়ানি-জেলের নিয়ম—থাকে বটে সরকারি জেলখানায়, কিন্তু খোরাকি-খরচা বাদীকে দিতে হয়। একআনা করে সাধারণ একবেলার বরাদ্দ। রঘুবর আপত্তি করে জানালেন, এক আনায় কি হবে—নিদেনপক্ষে এক টাকা। সাহেব-কালেক্টর অবাক হয়ে বললেন, মাত্র দু'বেলায় পারবে একা টাকা খেতে? রঘুবর বললেন, দিয়ে দেখুন। দারোগা নিজে সঙ্গে গেলেন রঘুবরের বাজার করার সময়। চাল কেনা হল পাঁচ সের, দু সের ডাল, দুটো রুইমাছ—ওজন সের পাঁচেক করে দাঁড়াবে—

সাহেব খাওয়া দেখতে এসেছেন—কড়মড় করে রুইয়ের মুড়ো চিবানোর ভঙ্গি দেখে তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে পালালেন। ডিক্রিদার গতিক বুঝে মামলা তুলে নিল—এই পরিমাণ খোরাকি দিয়ে নিজেই সে ফতুর হয়ে যাবে। রঘুবর মুক্ত।

এ হেন ঠাকুরদাদার উপযুক্ত নাতি ঝিকরগাছার অন্নপূর্ণা হোটেলে আহারে বসে গেছে। রসুইঠাকুর ভাত ঢালতেই পাতা খালি। হোটেলের লোকজন

কারুকর্ম মেলে হাঁ করে দেখছে। মালিক যথারীতি চৌকি-তক্তাপোশে হ্যাণ্ড-বাকসের সামনে বসে খদ্দেরদের পানের খিলি দেওয়া ও পয়সা-কড়ি গুণে নেওয়ার কাজে ছিলেন। ঝি ছুটে এসে বলল, খাবার-ঘরে আসুন একবার কর্তা, দেখে যান।

মালিক বলে, দেখব আবার কি? কেউ কম খায়, কেউ চাট্টি বেশি খায়। পেট ছাড়া তো চাকাই-জালা নয়—কত আর খাবে? পেট চুকে যখন, দিয়ে যেতে হবে। ওসব নিয়ে বলবিনে কিছু তোরা. হোটেলের নিন্দে হবে।

ঝি বলল, চাকাই-জালাই ঠিক—একটুও কম নয়। চারজনে পাশাপাশি বসে গেছে। দেখবারই জিনিস—চোখ মেলে একবার দেখে যান. তারপর বলবেন। হাঁড়িতে ষোলজনের ভাত—পুরো হাঁড়ি কাবার করে এখনো দাও' 'দাও' করছে।

সর্বনেশে কথা। মালিক ছুটল। ফিরে এসে কালীময়ের কাছে হাতজোড় করে: রক্ষে করুন মশায়। যা হবার হয়েছে—আর কেউ খাবেন না আমার অন্নপূর্ণা হোটেলে. আরও আঠাশজন বসলে বাবসা গনেশ উলটাবে—ছা-পোষা মানুষ মারা পড়ব একেবারে। ঐ চারজনের পয়সা দিতে হবে না। ভালয় ভালয় বিদেয় হয়ে যান। তবু জানব, অন্নের উপর দিয়ে গেল।

কালীময় বিস্তর বোঝানোর চেষ্টা করে: ঘাবড়াচ্ছেন কেন, সবাই কি আর ঋষিবর? রেট চার আনার জায়গায় না-হয় ছ-আনা হিসাবে দেওয়া যাবে

কোন প্রস্তাব হোটেলওয়ালা কানে নেবে না। হাত জড়িয়ে ধরেছে, হাত ছেড়ে দিয়ে পা ধরতে যায়। কালীময় অগত্যা অন্য হোটেলের খোঁজে ছুটল। কিন্তু ছোট গঞ্জ ঝিকরগাছা—ভোজনের বৃত্তান্ত ইতিমধ্যে সর্বত্র চাউর হয়ে গেছে। কোনো হোটেল রাজি নয়। বিস্তর সময় ক্ষেপ হয়ে গেছে—রাঁধাবাড়া আগে যদিই বা সম্ভব ছিল, এখন আর উপায় নেই; কিছু চিঁড়ে-বাতাসা কিনে নৌকোয় উঠে পড়ল, সারা দিনমান ঐ 'চিঁড়ে চিবিয়ে ও নদীর জল খেয়ে কাটল। সবাই ঋষিবরকে দোষে, এদেরই জন্যে এতগুলো লোক উপোসি যাচ্ছে। মুখপাতে কেন ওরা বসতে যায়, উচিত ছিল সকলের খাওয়াদাওয়া চুকে যাবার পর সর্বশেষে বসা। হোটেলওয়ালার তখন আর প্রতিহিংসা নেবার উপায় থাকত না।

সন্ধ্যাবেলা নৌকো গিয়ে পৌঁছল। মেয়েওয়ালারা পালকি-বেহারা বাজি-বাজনা মজুত রেখেছে। ঘাটে নামতে না নামতেই তোলপাড় পড়ে যায়। বিয়েবাড়ি সামান্য দূর,, দালানকোঠা নজরে আসছে। কিন্তু টুক করে যে উঠে পড়বে, সেটি হচ্ছে না। সারাটা দিন বলতে গেলে কাঠ-কাঠ

উপোস গেছে। ক্লিথের নাড়ি পট-পট করছে—তাহলেও [illegible] [illegible] দেখানোর জন্য আয়োজন, বাড়ি উঠলেন তো ইস্তি পড়ে গেল। তিন তিনটে গ্রাম পুরোদস্তুর চক্কোর দেওয়াল ঘণ্টা তিনেক ধরে—ঢোল-কাশি-সানাই বাজিয়ে, গেঁটেবন্দুক ফুটিয়ে, হাউইবাজি আকাশে তুলে। নারকেল-তেলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে মশাল বানানো—বরযাত্রী, কন্যাযাত্রীদের হাতে হাতে সেই মশাল। চতুর্দিক একেবারে দিনমান করে ফেলল।

কমল এতদিন একলা ছিল, সন্ধ্যার দিকে বড় কাউকে পাওয়া যেত না। মেয়েগুলো বলত, এককোঁটা ছেলে—তোর সঙ্গে আবার খেলা। সমবয়সি ছেলেদের মধ্যেও ভালছেলে বলে কমলের বদনাম। উপর থেকেও নিষেধ—পটলার বাপ একদিন তো ছেলের কান টেনে ঠাঁই-ঠাঁই করে চড়: গাছবাঁদর তোর কিছু হবে না—কিন্তু যার হবে, তার ঘাড়ে কি জন্য গিয়ে লাগিস?

পুঁটি আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই আগেকার মতো চারি সুরি বেউলো ফুন্টি, টুনি সবাই আসতে লেগেছে। সন্ধ্যার আগে খাওয়া-দাওয়া সেরে আসে। মেয়েই প্রায় সব—নিরীহ ছোটছেলে দু-একটা নেওয়া যেতে পারে। পদা-জল্লাদ-রাখাল ইত্যাদির মতো দুরন্ত ও ধেড়ে ছেলে কদাপি নয়। ধান উঠেছে বলে উঠান লেপেপুঁছে দেবমন্দিরের মতো করেছে, ঘাসের একটুকু অঙ্কুর দেখলে খুঁটে তুলে ফেলে দেয়।

খেলার তাই বড্ড জুত। পুববাড়ির দুই শরিক—উত্তরের অংশ বংশীধরের, দক্ষিণের অংশ ভবনাথের। খেলার ব্যাপারে কিন্তু শরিকি ভাগাভাগি নেই। কুমীর-কুমীর খেলা। দুই উঠোন জুড়েই জল। চারিদিককার ঘর-দুয়োর দাওয়া-পৈঠা সমস্ত ডাঙা। কুমীর হয়ে একজন সারা উঠোনে চক্কোর দিচ্ছে। অন্য সবাই মানুষ। এ-ঘরের দাওয়া থেকে ও-ঘরের দাওয়ায় যাবে উঠোন-রূপ গাঙ পার হয়ে। সেই উঠোন-গাঙে শিকার ধরবার জন্য কুমীর হন্তদন্ত হয়ে ঘুরছে। যাচ্ছে মানুষ মাঝ-উঠোন দিয়ে দু-হাত নেড়ে সাঁতারের ভঙ্গিতে—গাঙের এপারের ঘাট থেকে ওপারের ঘাটে যাচ্ছে যেন। মাঝেমধ্যে মুখে মুখে বলছে ঝাপুস-ঝুপুস, অর্থাৎ গাঙের গভীর স্রোতে মনের সুখে ডুব দিচ্ছে। কুমীরও আছে তক্কে তক্কে—ওকে খানিক তাড়া করল, কিন্তু আসল তাক একটার উপরে—আড়চোখে লক্ষ্য রাখছে। একদৌড়ে হঠাৎ তার কাছে গিয়ে চড়াৎ করে পিঠে এক থাপ্পড়। কুমীর যে ছিল সঙ্গে সঙ্গে সে মানুষ, আর যাকে মারল সে কুমীর হয়ে গেল।

কোনদিন বা কানামাছি-খেলা। কাপড়ের মুড়োয় আচ্ছা করে চোখ

[illegible]

[illegible] নিয়ম তাই। আন্দাজে একমুঠো লোককে কোন একজনকে ধরেই কানামাছি নাম বলে দেবে। বলা ঠিক হল তো তারই এবার চোখ বাঁধবে। আগের জন চোখের বাঁধন খুলে ফেলল।

বাপের-বাড়ি যাবার সময়ে উমাসুন্দরী সুমুখ-উঠানে কিছু ধানের পালা দেখে গিয়েছিলেন। আগাম ফসল সে-সব ধানের। এবার সুমুখ পিছন সব উঠোনেই ধান এসে পড়ছে। ফি বছরই আসে এই রকম—গুরাতলিতে ভাইয়ের কাছে এই জন্য তাঁর সোয়াস্তি ছিল না। মাঠ ছেড়ে আঙিনার উপর মা লক্ষ্মীর শুভ আগমন—হেন সময় বাড়ির গিন্নি গরহাজির কেমন করে থাকবেন?

ধান কাটার পুরো মরশুম। জনমজুরের দুনো তেদুনো দাম—কোন কোন অঞ্চলে এমন কি পুরো টাকা অবধি উঠে গেছে ঝাঁটপাট দেওয়া নিত্যি সকালে গোবরমাটি-নিকানো ঝকঝকে তকতকে উঠান। উঠানে তিলার্ধ জায়গা আর খালি থাকছে না। সারা দিনমান বিলে মাঠে ধান কাটে, সন্ধ্যাবেলা বাঁকে বয়ে আঁটি এনে ফেলে। আদুরে ছেলেপুলে কাঁধে তুলে নাচায় না—তেমনি ঢঙে বাঁকের এ-মাথায় আর ও-মাথায় আঁটিগুলো নাচাতে নাচাতে নিয়ে আসে। কাঁচাধানের সোঁদা-সোঁদা গন্ধ—গ্রামের সুঁড়িপথ ধরে আসে, চারিদিক গন্ধে আমোদ করে দেয়, নাক টেনে টেনে সেই গন্ধ বেশি করে নিতে ইচ্ছে করে।

ধান কাটার আরও জোর এবারে। পাকাধান ক্ষেতের কাদামাটিতে ঝরে লোকসান না ঘটে। লোক লাগানো হল বেশি—অনেক বেশি। আঁটি বওয়া এখন আর বাঁকে কুলোয় না, গরুর-গাড়ি বোঝাই হয়ে বিল থেকে আসছে। মাঝবিলে এখনও জল। কাদায় জলে চাকা বসে যায়, গরুতে টেনে পারে না তো মানুষ টেনে আনে ধানের গাড়ি। গ্রামপথে বোঝাই গাড়ির ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ—পারিনে আর বোঝা বয়ে, আর পারিনে, আর পারিনে—এমনিতরো যেন আর্তনাদ। উঠোনের উপরে এসে বোঝা খালাস। আঁটির পর আঁটি পড়ে একদিকে গাদা হয়ে যায়। এর পরে পালা সাজানো। গোল করে সাজিয়ে যাচ্ছে, মাটি থেকে উঁচু হয়ে উঠছে ক্রমশ। একজন পালার উপর, আর, একজন ধানের আঁটি সেখানে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে।

বেশ রাত হয়েছে। টেমি জ্বলছে দাওয়ায়। গল-গল করে ধোঁয়াই উঠছে, আলো আছে কি নেই। জোনাকি উড়ছে, আকাশে তারা। বিলের হাওয়া আসছে, হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। ভাই-বোনে এক পিঁড়িতে—কম্বলের দোলাইখানা

[illegible] গায়ে [illegible]
বাজার হাটবেশাতি এনে রাখছ। কাজকর্মের বড় [illegible]
তরিতরকারি কোটা। আর ভাই-বোনে এদিকে জেলাই গায়ে [illegible]
হয়ে ধানের পালা দেওয়া দেখছে। সন্ধ্যার নিজেরা খেলাধূলো করছে—এ
যেন চাষীদের আলাদা খেলা। খেলা দেখতেও মজা। শিভবর কি অটল,
তামাক খেতে খেতে এসে কলকে বাড়িয়ে,ধরছে : দু-টান টেনে নাও গো,
জাড়ের ভাবটা কেটে যাবে। কলকে টানতে টানতে গগন সর্দার বলে, গায়ের
ঘাম মরে গেছে, তা বলে জাড় তো পাচ্ছিনে। অটল বলে, কাজে আছ বলে
টের পাচ্ছ না। বাড়ি যাবার সময় ঠেলা বুঝবে।

হাই উঠছে ভাই-বোনের। তারপরে এক সময় গিয়ে বিছানায় পড়ে।
তরঙ্গিণীর বিছানায় ঘুমিয়ে জড়াজড়ি হয়ে আছে। রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে
সবাই শুতে এলেন—ঘুমন্ত পুঁটিকে খানিকটা জাগিয়ে তুলে দুই ডানা ধরে
উমাসুন্দরী নিজের ঘরে নিয়ে যাবেন। কোন দিন হয়তো পুঁটির বড় বেশী
ঘুম ধরেছে—তুলে ধরছেন, গড়িয়ে পড়ছে আবার সঙ্গে সঙ্গে। উমাসুন্দরীর
করুণা হল : মেয়ে আজ তোমার এখানে থাক ছোটবউ। ছোটবউ
তরঙ্গিণীর কিছু আপত্তি : আমার এখানে কেন আবার দিদি? খোকার
শোওয়া খারাপ। ঘাড়ের উপর ঠ্যাং চাপিয়ে দেবে, রাত দুপুরে শুম্ভ-
নিশুম্ভর যুদ্ধ বেধে যাবে।

ঘুমন্ত মেয়ের এলিয়ে-পড়া অসহায় করুণ মুখের দিকে চেয়ে উমাসুন্দরী
চটেমটে উঠলেন : কেটে দিচ্ছ কেন? এই অবস্থায় টেনে নিয়ে যাই কেমন
করে? পেটে জায়গা দিয়েছ, একটা রাত পাশে একটু জায়গা দিতে
পারবে না?

কিন্তু আরও যে আছে। উমাসুন্দরী নিজেই সারারাত এপাশ-ওপাশ
করবেন, কোল খালি-খালি ঠেকবে। তরঙ্গিণীর সেটা ভাল-মতন জানা।
হাসলেন তিনি, জায়ের কথার উপরে সেদিন কিছু বললেন না। সরে-টরে
রইলেনও উমাসুন্দরী—কিন্তু মেয়ে ঘুমের মধ্যে টাহর পেয়েছে, জেঠিমা নেই।
বায়না ধরল : দিয়ে এসো জেঠিমার কাছে। হবেই দিতে, নয়তো কেঁদেকেটে
অনর্থ করবে। তরঙ্গিণী তখনকার বকুনির শোধ নিলেন : বলেছিলাম
না দিদি?

মেয়ের রকম-সকম দেখে উমাসুন্দরী হাসেন। তরঙ্গিণী বললেন, ঘুমিয়ে
পড়ুক আর যাই হোক, তোমার সোহাগী মেয়ে তুমি নিজের কাছে নিয়ে
রেখো। রাত দুপুরে আমি ঝঞ্ঝাট পোয়াতে পারব না।

॥ ত্রিশ ॥

অম্বিক দত্ত চাকরিতে চললেন। ধান-চাল উঠেছে—সারা অঞ্চলের লোকের হাতে-গাঁটে পয়সা, মনে স্ফূর্তি। ভদ্রসমাজে যা চলে, সে সমস্ত তাদেরও অল্পবিস্তর চাই বই কি। তার মধ্যে এক জিনিস হল পাঠশালা। যত্রতত্র এখন পাঠশালা বসাচ্ছে। মরশুমি পাঠশালা—জ্যৈষ্ঠ অবধি খাসা চলবে। বর্ষার সঙ্গে চাষবাসের তাড়াহুড়ো পড়ে যাবে। গোলাআউড়ির ধানও ওদিকে তলায় এসে ঠেকেছে—পাঠশালা এবং ভদ্রজনোচিত অন্যান্য ব্যাপারগুলো মুলতুবি আপাতত। মা-লক্ষ্মী মেনে নেন তো সামনের শীতে আবার দেখা যাবে। সেই শীত এসে গেছে, ছাতা ও পুঁটলি বগলদাবায় নিয়ে অম্বিক রওনা দিলেন।

বয়স হয়েছে, বাদা অঞ্চলে গড়ে পড়ে নোনাজল খাবার মোটেই আর ইচ্ছে ছিল না। গ্রামে থেকে বউ-ছেলেপুলে নিয়ে সংসার-ধর্ম করবেন ভেবে-ছিলেন। সোনাখড়ি পাঠশালার কাজটাও জুটে গিয়েছিল। দিব্যি চলছিল—বজ্জাত ইন্সপেক্টর এসে সমস্ত গড়বড় করে দিল। যেতে হবে অতএব, না গেলে পেট চলবে কিসে? ছাতা ও চটিজোড়া ইতিমধ্যে তালিতুলি দিয়ে ঠিক করে নিয়েছেন। পাঁজিতে যাত্রাশুভ দেখে নিয়ে দুর্গা-দুর্গা বলে প্রহর রাতে অম্বিক ঘর থেকে যাত্রা করে বেরুলেন। মন ভারী, পা দু'টা আর চলতে চাইছে না। পা'কে এখন চলতে বলছেও না কেউ পুবপোতার পাঁচচালা ঘর থেকে বেরিয়ে উত্তরপোতার দোচালা ঘরে ওঠা—বুড়ি শাশুড়ির যে ঘরে স্থিতি। শাশুড়ি আজকের রাতের মতন পাঁচচালা ঘরে মেয়ে ও নাতি-নাতনিদের সঙ্গে শোবেন। ভোরে অম্বিক চলে যাবার পর নিজস্থানে ফিরবেন আবার।

ভোরবেলা বড় কুয়াসা। এক-হাত দূরের মানুষটাও নজরে আসে না। বুড়োথুথ্থুড়ে শাশুড়ি কাঁপতে কাঁপতে তারই মধ্যে কোলের মেয়েটা এনে তুলে ধরলেন। এই একফোঁটা বাচ্চা বাপের বড় ন্যাওটা। সবে কথা ফুটেছে, বা-বা-বা-বা করে, অম্বিককে দেখলেই হাত বাড়িয়ে দেয় অর্থাৎ কোলে তুলে নাও। শাশুড়ি বাচ্চার একটি হাত অম্বিকের দিকে বাড়িয়ে দিলেন, অম্বিক একটা আঙুল মুখের ভিতর নিয়ে আলগোছে দাঁতে ঠেকালেন। দাঁতের কামড়ে মায়ার বন্ধন কেটে দিলেন যেন। এই প্রক্রিয়ার

পর বাপের আদর্শয়ে বেয়ের শক্ত রোগপীড়া হবার ভয়টা গেল। শীত করছে বলে অম্বিক-বোটা সুতি-চাদরটা পিরহানের উপর জড়ালেন, পুঁটলি আর ছাতা বগলদাবায় নিয়ে নিলেন। পুঁটলির মধ্যে গামছা, হাতচিরুনি, অতিরিক্ত কাপড় একখানা এবং চটিজোড়া। পরনে আছে কাপড়, ফতুয়া ও পিরহান। পিরহানের পকেটে খুচরো আটআনা পয়সা। সর্ব-সাকুল্যে এই নিয়ে যাচ্ছেন। অধিক আর কিসে লাগবে, দিচ্ছেই বা কে? এই সম্বলেই, কপালে থাকলে, আষাঢ়ের গোড়ায় ফিরে আসবেন ডিঙির খোল ধানে বোঝাই করে, পিরহান ও ফতুয়ার পকেট টাকায় বোঝাই করে। নতুন নয়, এর আগেও ফিরেছেন রণজয় করে আসার মতন। তবে বয়স খানিকটা বেড়ে গেছে, এই যা। শাশুড়ির পায়ের ধুলো নিয়ে দুর্গা-দুর্গা করে অম্বিক উঠোন পার হলেন। রাস্তায় পড়ে হনহন করে চললেন। ছেলেপুলেগুলো ঘুম থেকে ওঠেনি। বউ বেড়ার উপর চোখ দিয়ে রয়েছে, না দেখেও বুঝতে পারছেন। চারক্রোশ দূরে কানাইডাঙার ঘাটে হাজির হবেন জোয়ারের জল থমথমা হবার আগেই।

এসে গেছেন ঠিকঠাক, দেরি হয় নি। বাদা অঞ্চলে সকলের বড় হাট কুমিরমারি। হাটবার কাল—সকাল থেকে সমস্ত দিন হাট চলবে। খান পনেরো হাটুরে ডিঙি ছাড়ি-ছাড়ি করছে। একহাঁটু কাদা-মাটি মেখে অম্বিক ঘাটে এসে পড়লেন: আমি যাব—

এই কানাইডাঙার ঘাট থেকে হাটুরে-নৌকোয় আরও কতবার উঠেছেন। গুরুমশায় বলে অনেকেই চেনে অম্বিককে ডিঙিতে উঠবেন, জিজ্ঞাসাবাদের কিছু নেই—যেটায় খুশি উঠে পড়লেই হল।

হাটুরে-নৌকোয় ভাড়া বলে কিছু নেই। মালপত্র বিক্রি হয়ে যাক, একটা কিছু তখন ধরে দিও। নানান সওদা নিয়ে ব্যাপারিরা হাটে যায়—যখনকার যে জিনিস। এই এখন যেমন নিয়ে যাচ্ছে খেজুরগুড় ডালকলাই তরিতরকারি আখ তামাক ইত্যাদি কিনে আনবে ধান। অম্বিকের মালই নেই, অতএব কিছুই লাগবে না, একেবারে মুফতে যাওয়া। তবে একটা নিয়ম, চন্দারকে বোঠে বেয়ে দিতে হয়। অম্বিক পিছপাও নন—চাদর পিরহান ফতুয়া খুলে বোঠে হাত দিলেন। দিয়েছেনও দুটো-চারটে টান—মাঝি হয়ে পাড়ানে বসেছে, সেই লোক হাঁ-হাঁ করে উঠল: আপনি কেন? বসুন ভাল হয়ে। বিদ্বান গুরুমশায় মানুষ—বোটে মারা কি আপনার কাজ?

গলুই থেকে এক ব্যাপারি রসান দিয়ে উঠল: জানো না ভাই। বোটে মারারও গুরুমশায় উনি। এ-বিদ্যেও হাতে ধরে শিখিয়ে দিতে পারেন।

মাঝি জেদ ধরে বলল, বোটে কেন ধরবেন আপনি গুরুমশায় তামাক

ঝাড়া। ফিরে যায়, আঙুলের ডগাকে একটু একটু এলোয়ে দেন।

অবশেষে তামাক-সাজার ভারটা অম্বিকের উপর। গাঙের কনকনে হাওয়ায় শীত ধরেছে রীতিমতো, চাদরে কুলোচ্ছে না। অতঃপর যতবার ইচ্ছে, খুশিমতন তামাক সেজে নেওয়া যাবে। এদের তামাক দা-কাটা—অতিশয় ভলোক, পাঁচার-দোসর। এ-তামাকের ধোঁয়ায়, শীত তো শীত, বাদাবনের বাঘ অবধি পালাতে দিশা পায় না। ছোট্ট ডিঙির দু-পাশ দিয়ে দশ-বারোখানা বোঠে পড়ছে সমতালে। জলে আলোড়ন। গাঙ ক্রমশ ভয়াল হয়ে উঠল। এপার-ওপার দেখা যায় না। হাটুরে-ডিঙিগুলো এক ঝাঁক পানকৌড়ির মতন জলের উপর দিয়ে ঝাঁক বেঁধে উড়ছে।

ডিঙি অনেক রাতে কুমিরমারি পৌঁছল। পূবে আর দক্ষিণে অকূল গাঙ, আর দুই দিকে আদিগন্ত আবাদ। উত্তর নদীর পাড় ঘেঁষে উঁচু ফালি জমির উপর অগণ্য চালাঘর। হপ্তার মধ্যে একটা দিন শুধু হাট। হাটের আগের রাত্রি থেকে লোক জমে। লোক চলাচলের একমাত্র উপায় নৌকো-ডিঙি—পায়ে হাঁটার পথ যৎসামান্য। গাঙের ঘাটে অতএব নৌকোয় নৌকোয় ছয়লাপ—সে এমন, একহাত জায়গা কোথাও ফাঁকা পড়ে নেই। এক নৌকোর গা ঘেঁষে অন্য নৌকো। তারপরে নৌকো আর মাটিতেই কাছি করতে পারে না, অন্য নৌকোর গুড়োর সঙ্গে বেঁধে রাখে। সেই নৌকোর সঙ্গেও আবার অন্য নৌকো। এমনি করে করে প্রায় মাঝগাঙ অবধি নৌকোয় নৌকোয় এঁটে যায়। নামবার সময় এ-নৌকো থেকে সে-নৌকো, সেখান থেকে ও-নৌকো—নৌকো পালটে পালটে এগোয়। হাটের দিনটা এইরকম। হাট অন্তে সন্ধ্যা থেকে নৌকোরা সব ঘরমুখো করে, ভিড় পাতলা হতে থাকে। পরের সকাল থেকে ঘাট শূন্য, বিশাল প্রান্তরের মধ্যে চালাগুলো খাঁ-খাঁ করে। পরের হাট না আসা অবধি একনাগাড় এইরকম রইল।

হাটুরে-ডিঙিতে ছই থাকে না—যেহেতু ছইয়ে বাতাস বেধে গতি বাধা পায়। চতুর্দিক ফাঁকা, ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। অম্বিকের হাড়ে হাড়ে ঠকঠকি লাগে। এক-চাদরে শীত মানায় না। অমাবস্যার কাছাকাছি সময়, কিন্তু অন্ধকার হলেও ঝাপসা ঝাপসা সবই নজরে আসে। তোলা-উনুন নৌকো থেকে উপরে তুলে নিয়ে এসেছে অনেকে, অথবা শুধুমাত্র তিনটে গোঁজা পুঁতে উনুন বানিয়েছে। উনুন ঘিরে আহারার্থীরা গোল হয়ে বসে আছে, চালটা খানিক ফুটে গেলেই পাতে পাতে ঢেলে দেবে। অম্বিকও ঘোরাঘুরি করছেন উনুনের ধারে ধারে। ভাতের জন্য নয়—গামছার খুঁটোয় বেঁধে কিছু চিঁড়ে এনেছেন, নৌকোয় বসে তারই চাট্টি জলে ভিজিয়ে খেয়ে নিয়েছেন। উনুনের ধারে-

কাছে একটু গরম জায়গা খুঁজছেন তিনি। কিন্তু সুচারু জায়গা [illegible] না। উনুনে ভাত রাঁধবে এবং উনুন ঘিরে শুয়ে পড়বে—হাটখোলায় [illegible] উনুন ধরিয়েছে এইজন্য। হাঁটছেন এ-উনুনের কাছ থেকে সে-উনুনে—জোর হাঁটনায় শীত কম লাগে। সম্ভব হলে শীতের রাত্রি এমনি হাঁটাহাঁটি করে পুইয়ে দেবেন। কিন্তু বয়স হয়ে গেছে—ক্লান্ত হয়ে একসময় কেওড়াগাছের গোড়ায় চাদর মুড়ি দিয়ে পড়লেন। সকালবেলা হাটের হৈ-চৈ-এর মধ্যে ধড়-মড় করে উঠে দেখেন, একটা কুকুর তাঁরই মতন কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে পায়ের দিকে।

বেলা বাড়ল। লোকারণ্য। পিঁপড়েখালির মাতব্বরটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—কী নাম যেন—গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। পর পর মরশুম অম্বিক ঐ গ্রামে পাঠশালা করে এসেছেন। মাতব্বর কলরব করে উঠল: এই যে গুরুমশায়। ধান-চাল উঠে গেল—কত গরু কত ডাকাত-বদ্যি হাটের এ-মুড়ো ও মুড়ো চক্কোর মারতে লেগেছেন, আমাদের অম্বিক গুরুমশায়ের দেখা নেই। ভাবলাম, ভুলেই গেছেন-বা।

সে কী কথা। অম্বিক গদগদ হয়ে বলেন, গাঁয়ে-ঘরে ছিলাম—প্রাণটা মাতব্বরমশায় সর্বক্ষণ কিন্তু আপনাদের কাছে পড়ে ছিল।

মাতব্বর বলে, এমনি ডুব মারলেন—খোঁজখবর কত করেছি, এ-দিগরেই আর পদধূলি পড়েনি।

আসতে দিল না যে। চেষ্টার কসুর করিনি। গ্রামবাসী সব আটকে ফেলল। বলে, গাঁয়ের ছেলেপিলে মুখ্য হয়ে থাকবে, আর তুমি কাঁহা কাঁহা মুল্লুক বিদ্যে দান করে বেড়াবে—কিছুতে সেটা হবে না। এক রকম নজরবন্দি করে রাখা—কী করব বলো। মণ্ডপে বসে বসে পাঠশালা করি, আর তোমাদের কথা ভাবি।

ইতিমধ্যে এ-গ্রাম সেগ্রামের আরও চার-পাঁচটি চতুর্দিকে জড় হয়েছে। অম্বিক পসার-বাড়ানো কথা বলছেন, আর তাকিয়ে তাকিয়ে আন্দাজ নিচ্ছেন শ্রোতাদের মনোভাব কি প্রকার?

বলছেন, এবারে আটঘাট বেঁধে কাজ করছি। মনের মতলব ঘুণাক্ষরে প্রকাশ হতে দিই নি। রাত দুপুরে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়েছি।

পিঁপড়েখালির মাতব্বর বলে, খাসা করেছেন। চলেন আমাদের নৌকায়। গোলপাতার ঐ খানটা নৌকো।

টানাটানি ধরাধরি করছে: সেই একবার গিয়েছিলেন গুরুমশাই, আমার ক্ষেতের কালজিরে-ধান দিয়েছিলাম, ঘরেধান দিয়েছিলাম, মনে পড়ে না? আয়েন্দা সন আসবানে, জনে জনেরে করে আইলেন—তা ও-মুখো মোটে আর হলেন

না। ধরিছি আমি, ছাড়াছাড়ি নেই।

গোকুলগাঁয়ের লোকটিও নাছোড়বান্দা। বলে, উঠতি গঞ্জ আমাদের। নতুন পাঠশালার পাকা মেঝে, টিনের ছাউনি—আরামে কাজ করবেন। ভারি ভারি মহাজনরা আছে, পয়সাকড়ি ভালই দেবে তারা। মাইনে ধানে পাবেন, নগদ পয়সাতেও পাবেন। চলুন—

বলে লোকটা অম্বিকের হাত চেপে ধরল। পিঁপড়েমারির মাতব্বর ওদিক থেকে রে-রে করে ওঠে: হাটের মধ্যে জুলুমবাজি—আমি আগে ধরি নি! কথাবার্তা আমার সঙ্গে আগে হয়ে গেছে। এ গুরুর আশা ছাড়ো, অন্য গুরু খোঁজো গে।

অম্বিকেরও ঐ পিঁপড়েমারি পছন্দ। পুরানো চেনা জায়গা। গুরুর প্রতি গ্রামের মানুষগুলো সাতিশয় ভক্তিমান। নিত্যিদিন সিধা পাঠাত। সিধা নিয়ে আবার এ-গৃহস্থে ও-গৃহস্থে পাল্লাপাল্লি—আয়োজনে কে কাকে ছাড়াতে পারে। হাটের মধ্যে সোনাখড়ির কেউ যদি হাজির থাকত—অম্বিক ভাবছেন। হেনস্থা করে অম্বিককে সরিয়েছে—থাকলে সেই অম্বিকের আজ খাতিরটা দেখতে পেত।

পিঁপড়েমারির মাতব্বর অদূরে এক ছোকরাকে দেখে ডাকাডাকি করছে: ও কিরণ, ইদিকে এসো। আমাদের পুরানো গুরুমশায়ের ধরা পেয়েছি। নিয়ে যাচ্ছি। সাবা দাও।

কিরণ ছোকরা সসম্ভ্রমে গড় হয়ে প্রণাম করল।

মাতব্বর অম্বিকের কাছে কিরণের পরিচয় দিচ্ছে: গাঁড়াপোতার অবিনাশ মণ্ডলের পোতা। মেজো মেয়ে সরলার সঙ্গে গেল-বোশেখে কিরণের বিয়ে দিয়েছি, ছেলের মতন হয়ে আমার সংসারে আছে—

সগর্বে বলে, খুব এলেমদার ছেলে। একটা পাশ দিয়েছে।

অম্বিক স্তম্ভিত। কথা বেরুতে চায় না, জড়িত কণ্ঠে কোন রকমে বললেন, কি পাশ?

কিরণ বলল, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছি এবার পাইকগাছা হাই-ইস্কুল থেকে।

কী সর্বনাশ, পাশের উপসর্গ এই নোনা বাদা অবধি এসে হাজির হয়েছে! তবে আর সোয়াস্তি কোথা? পাশ-করা জামাতা বাবাজীও তবে তো পৃথিবীকে নাকে-দড়ি দিয়ে ঘুরপাক খাওয়াবে সূর্যকে বেড় দিয়ে। আরও কত রকম হয়কে নয় করবে, ঠিক কি! অম্বিক মুহূর্তে মতি পরিবর্তন করে ফেললেন। উঠতি জায়গার নতুন পাঠশালাই ভাল। পাশের ঢেউ পৌঁছতে পৌঁছতেও পাঁচ-সাত বছর কেটে যাবে। ততদিন তো নিরাপদ।

গোকুলগঞ্জের লোকটাকে এগোতে বলে তিনি তার পিছন পিছন চললেন।

দ্বারিক সংবাদ নিয়ে এলেন: চাল কেটে বসত ওঠাব—রাগের মাথায় সেই যে বলেছিলেন, নিজে থেকেই সত্যি সত্যি বসত উঠিয়ে যাচ্ছে।

বিষয়ী মানুষের কতজনের সঙ্গে কত রকমের বিরোধ—ভবনাথের তত মনে পড়ছে না! বললেন, কার কথা বলছ?

দ্বারিক ছড়া কাটলেন: কচুর বেটা ঘেচু, বড় বাড়েন তো মান। ফটিক আমাদের গুড়িকচু, তার বেটা নবনে হয়েছে মহামানী মানকচু। মানে ঘা পড়েছে—আপনাদের উত্তর-ঘরের বংশীধর কোণাখোলায় কিনু সর্দারের দরুন জমিটা দিয়ে দিলেন, সেইখানে সে ঘর তুলবে।

ভবনাথ অবাক হয়ে বলেন, বলো কি হে। মামলায় মামলায় অঢেল খরচা করে অনেক কষ্টে জমি খাস করে নিয়েছে, খাসা ফলসা জমি, আম-কাঁঠাল নারকেল-সুপারি—দিয়ে দিল সেই জমি?

বিনি সেলামিতে, আধেলা পয়সাটি না নিয়ে।

ভবনাথ বললেন, আমি তো কিছু জানিনে—

কেউ জানত না, চুপিসারে কাজ হয়েছে। বাঁশ কিনে এনে জমির উপর ফেলল, তখনই জানাজানি হয়ে গেল।

ভবনাথ গম্ভীর হয়ে গেলেন। দ্বারিক আবার বলেন, বাঁশও বোধহয় বংশীধর কিনে দিয়েছেন। শরিক জব্দ করতে ও-মানুষ সব পারেন।

ভবনাথ শুধান: ওর বাপ ফটিক কি বলে? কথাবার্তা হয়েছে তার সঙ্গে?

দ্বারিক বলেন, তার তো কেঁদে ফেলার গতিক। হুটকো-গোঁয়ার বলে ছেলেকে গালিগালাজ করতে লাগল। বলে, বংশীবাবু এসে রাতদিন ফিসির-ফিসির করেন—

ভবনাথ বিরস কণ্ঠে বলেন, দিনকাল বদলাচ্ছে বলছিলে না দ্বারিক, সত্যি সত্যি তাই। নইলে তিনপুরুষে চাকরান-প্রজা ভিটে ছেড়ে বংশীর জমিতে ঘর তুলছে—

দ্বারিক বলেন, খুঁটির জোরে মেড়া লড়ে। বংশীধর ওদের খুঁটো হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

সে তো হবেই। ওরা আমাদের জব্দ করার ফিকির খুঁজে বেড়ায়, আমিও খুঁজি। নতুন-কিছু নয়। কিন্তু নবনে টক্কর দিয়ে বাস ওঠাবে—

তল্লাটে তা হলে মুখ দেখাতে পারব না। আমাকেও গোঁয়ারমতির রাগ ওঠাতে হবে।

নিভু-নিভু লণ্ঠনের আলোয় দু'জনের মাথায় মাথায় বসে উপায়-চিন্তা হল। পাঁচ-সাত কলকে তামাক পুড়ল। তারপর রাত দুপুরে একলা দ্বারিক চুপি-সারে বেরুলেন। চলে গেলেন কোণাখোলায় কিনু সর্দারের দরুন সেই জমিতে। জমির উপর বাঁশ ফেলে রেখেছে। বাঁশ গণলেন দ্বারিক—এক-কুড়ি তিনটা। দু-তিনবার গণে নিঃসংশয় হয়ে এলেন।

পুববাড়ির অনেক বাঁশঝাড়। গাঁয়ের বাইরে গোয়ালবাথান নামে দ্বীপের মতন একটা জায়গা—কতক জমিতে পাট ও আউশধান আর্জায়। তা ছাড়া আছে খেজুরবাগান, পাঁচ-সাতটা ডোবা এবং ঠাসা বাঁশবন। দিনমানে দ্বারিক সেই বাঁশবনে গিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখলেন। রাত্রে শিশুবর অটল আর একজোড়া কুড়াল নিয়ে ঝাড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। ঝাড় থেকে বাঁশ কাটার সময় গোড়ার দিকে খানিক খানিক পড়ে থাকে। কবে বাঁশ কেটে নিয়ে গেছে—দ্বারিক তার ভিতর থেকে গোড়া পছন্দ করে দিচ্ছেন, শিশুবর আর অটল ছ-আঙুল আট-আঙুল এক-বিঘত কখনো বা এক হাত নিচে কেটে ফেলেছে। ফাঁকা বিলে জ্যোৎস্না ফুটফুট করে—ঝাড়ের মধ্যেও জ্যোৎস্নার ফালি এসে পড়ায় কাজের পক্ষে জুত হল খুব। কিন্তু এত ছোট ছোট বাঁশের টুকরো কোন কাজে লাগবে, মাহিন্দারদের বোধে আসে না। বাড়িতেই নেওয়া হল না ঐসব টুকরো, যে উনুনে পোড়ানোর কাজ হবে। ডোবার জলে সমস্ত ছুঁড়ে দিয়ে খালি-হাতে সকলে ফিরে গেল।

বুঝল পরের দিন, ভবনাথের কর্মচারী হিসাবে দ্বারিক যখন গঞ্জের থানায় গিয়ে এজাহার দিলেন: নবীন মোড়ল কোণাখোলায় ঘর তুলবে, তার যাবতীয় বাঁশ রাত্রিবেলা ভবনাথের গোয়ালবাথানের ঝাড় থেকে চুরি করে কেটেছে। দারোগা এসে পড়ল, কোণাখোলায় গিয়ে জমির উপর বাঁশ দেখল। গোয়ালবাথানের ঝাড়েও গেল—সদ্য বাঁশ কেটেছে, গোড়া দেখে যে-না সে-ই বলবে। গণতিতে ভজে গেল—ঠিক ঠিক তেইশ। এর চেয়ে অকাট্য প্রমাণ আর কি হবে? যদিই বা কিছু হতে হয়, ভবনাথ চোরাগোপ্তা সেটুকু সেরে দিয়েছেন। চুরির দায়ে নবীনের কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে থানায় নিয়ে তুলল। নবীন কাকুতি-মিনতি করে, দু-চোখে জলের ধারা বয়—ভবনাথ দেখতে পান না, কানেও শোনেন না।

পরের দিন নবীনের কটি বউ এসে বড়গিন্নির পায়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। [illegible] আছুবলিরা। ভবনাথ বুঝিয়ে শুনিয়ে বললেন, তোমাদের দোষ নেই

মা-জননী—তোমরা কোন রকম কষ্ট না পাও, আমি [illegible] কতক জেলের ঘানি ঘুরিয়ে আসুক। গায়ে বড্ড তেল হয়েছে, [illegible] শুকানোর দরকার।

তার পরের দিন খোদ ফটিক এলো। নবীনকে সদরে চালান করেনি, এখন অবধি সে থানায়। বাপে-ছেলের সামান্য সাক্ষাৎও হল। ছোঁড়াটা খুব ঘাবড়ে গেছে। ইহজন্মে আর গোঁয়ার্তুমি করবে না, মানীর মান রেখে চলবে—

ভবনাথ পরিতৃপ্তির সঙ্গে শুনছেন। বললেন, ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা দেখি তবে—কি বলো? সর্বদা শাসনে রাখবে, কথা দাও ফটিক।

ফটিক বলে, কাউকে আর লাগবে না কর্তা। দুটো দিনেই শিক্ষা হয়েছে খুব। চেহারা সিকিখানা। কান মলছে, নাক মলছে—কক্ষনো আর বংশীবাবুর কথায় নাচবে না।

কিসে কি হল—থানা থেকে ছাড়া পেয়ে রাত্রিবেলা নবীন বাড়ি এসে উঠল। কয়েকটা দিন তারপরে বেরুলই না ঘর থেকে।

কৃষ্ণময়ের নামে চিঠি এসে গেছে। একজোড়া—একটা এস্টেটের তরফ থেকে, একটা দেবনাথ নিজে লিখেছেন। কলকাতায় ফেরবার জোর তাগাদা।

ভবনাথ বললেন, পড়লে তো চিঠি?

কৃষ্ণময় বলল, পড়তে হয় না—কি আছে, না পড়লেও বলা যায়। বাড়ি আসার কথা যখন উঠল, সেরেস্তার ভিতরে তখন থেকেই এ চিঠির বয়ান তৈরি হচ্ছে। দুর্গা-দুর্গা—বলে আমি বেরুলাম, চিঠিও সঙ্গে সঙ্গে ডাকবাক্সে পড়ল। বাড়ির উঠোনে পা ঠেকাতে-না-ঠেকাতেই চিঠি এসে হাজির।

বেজার মুখে সে বলে, আসা মাত্তোর খোঁচাখুঁচি জুড়ে দেবেন তো ঠেলেঠুলে পাঠোনো কেন বুঝিনে। দিব্যি তো ছিলাম সেখানে।

ছিল বটে তাই—মিছা নয়। কৃষ্ণময়ের স্বভাব এই। গেল কলকাতায় তো 'দারাপুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার—' এই গোছের ভাব তখন। একখানা এনভেলপ কিনে কাউকে চিঠি লিখবার পিত্তেশ নেই। বলে, কাকামশায়ের হরদম চিঠি যাচ্ছে, তাতেই তো টের পাচ্ছে বেঁচেবর্তে রয়েছি আমরা। ঘটা করে আলাদা আবার কি লিখতে যাব? বয়সকেলে ছেলের কথা শুনুন একবার! বলে, এক পয়সায় তিনখানা কচুরি আর এক পয়সায় হালুয়ায় একটা বিকেল ভরপেট হয়ে যায়, সে পয়সা খামোকা কেন গবর্ণমেন্টের ঘরে দিতে যাই?—বুঝুন।

আবার সেই মানুষ বাড়ি যদি এসে গেল, নড়ানো আর সহজ কর্ম হবে

না। পাড়ায় এবাড়ি-ওবাড়িতেও নড়তে চায় না। দিনরাত ঘরের মধ্যে—লোকে বলে, বউয়ের আঁচল ধরে থাকে। চিঠি সবে তো দু-খানা এসেছে—হয়েছে কি এখনো, গাদা গাদা আসবে। এক নজর চোখ বুলিয়ে কৃষ্ণময় কুটি কুটি করে ছিঁড়ে বাতাস উড়িয়ে দেয়, ভিড় জমতে দেয় না। চিঠির মেজাজ চড়া হতে থাকবে ক্রমশ, শেষটা খোদ বড়-মনিবের সইযুক্ত নোটিশ আসবে: অমুক তারিখের মধ্যে হাজির না হলে নতুন লোক নিয়ে নেওয়া হবে, আদায়-তহশিলের এত ক্ষতি বরদাস্ত করা যাচ্ছে না।

অলকা-বউ ঘাবড়ে গেছে। বলে, দেরি নয়—চলে যাও তুমি।

তাড়িয়ে দিচ্ছ?

চাকরি গেলে আমাকেই লোকে দুষবে।

কৃষ্ণময় অভয় দিয়ে বলে, চাকরি কেন যাবে রে পাগলি? যেতে পারে না।

কিন্তু একে স্ত্রীলোক, তায় কমবয়সি—সহজে সে প্রবোধ মানে না। বলে, জমিদারবাবু নিজে লিখেছেন—

লিখুন গে যে বাবু হোন। আমারও কাকামশায় রয়েছেন।

যাই হোক, পাঁজি দেখানো উচিত এবারে। ভটচায্যিবাড়ি বৃদ্ধ গোপাল ভটচাযের কাছে গিয়ে বলল, একটা ভাল দিন দেখে দিন জেঠামশায়। কলকাতা হল পশ্চিম দিক এখান থেকে—

উঁহু, পশ্চিম ঠিক নয়—দক্ষিণ ঘেঁসে গেছে। নৈর্ঋতকোণ মোটামুটি।

ডাঁটি-ভাঙা চশমা নাকের উপর তুলে গোপাল পাঁজির পাতা উলটাতে লাগলেন। ক্ষণ পরে চোখ তুলে বললেন, মঙ্গলবার ঘণ্টা এগারোটা তেইশ মিনিট পঁচিশ সেকেণ্ড গতে। উত্তরে নাস্তি—তা কলকাতা বরং দক্ষিণই ঘেঁসে যাচ্ছে।

তিথি নক্ষত্র কেমন?

অষ্টমী তিথি, পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র। মন্দ হবে না।

যোগিনী?

ঈশানে। খারাপ নয়।

মাহেন্দ্রযোগ?

নেই। অমৃতযোগও নেই। সিদ্ধিযোগ আছে—চলে যাবে মোটামুটি।

পাঁজি কৃষ্ণময় নিজ হাতে টেনে নিল। বলে, যাত্রামধ্যম দেখছি জেঠামশায়।

যাত্রানাস্তি তো নয়—ঘাবড়াচ্ছ কেন?

না জেঠামশায়। বিদেশ-বিভুঁয়ে যাওয়া—দিনটা সর্বাংশে যাতে উৎকৃষ্ট হয়, আপনি তাই দেখুন।

গোপাল বিরক্ত হয়ে বলে ফেললেন, অত খুঁতখুঁতুনির এখন কি গরজ—এই গোড়ার দিকে? কতবার যাত্রা ভাঙবে, তার লেখাজোখা নেই। পেট কামড়াবে, অরভাব হবে, মেয়েটা হাঁচবে হয়তো একবার-দু'বার—কত রকমের কত ভণ্ডুল ঘটে যাবে। যাত্রা করে আলাদা ঘরে কাটিয়ে যাত্রা ভেঙে আবার আপন-ঘরে ফিরে আসবে। জানি তো তোমার বাবা—

স্পষ্টভাষী গোপাল মিথ্যে বলেননি। এমনি ব্যাপার বরাবর হয়ে আসছে, এবারও হবে, সন্দেহ কি। কৃষ্ণময়ের বিদেশযাত্রা চাট্টিখানি কথা নয়।

রাগ করে কৃষ্ণময় বলে, মিথ্যে খবর কেমন করে যে রটে যায় বুঝিনে। আপনি একটা ভাল-দিন দেখে দিন, যাই না-যাই তখন দেখতে পাবেন।

কলকাতার চাকুরে বলে কৃষ্ণময়ের জন্য উঠানের পশ্চিম দিকে পৃথক একটা ঘর—তাই শেষটা কেলেঙ্কারির কারণ হয়ে উঠল। দুপরবেলা খাওয়ার পাট সেরে তরঙ্গিণী তাকের উপর থেকে মহাভারত নামাতে যাচ্ছেন, বিনো এসে খুসখাস করে বৃত্তান্ত বলল: কাণ্ড দেখগে ছোটখুড়িমা—দুয়োরে খিল এঁটে দিয়েছে।

গোড়ায় তরঙ্গিণী ধরতে পারেন নি। জিজ্ঞাসা করলেন: কে খিল আঁটল?

আবার কে! তোমাদের চাকরে ছেলে আর তার বউ।

তরঙ্গিণী এক মুহূর্ত অবাক হয়ে রইলেন। বিনো হাত ধরে টানে: সত্যি না মিথ্যে, ছাখসে এসে।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তরঙ্গিণী বলেন, ছাড়ান দে বিনো। ওদিকে না গেলাম আমরা, চোখে না-ই বা দেখলাম।

বিনো বলছে, তোমার শাশুড়ি—আমাদের বুড়োঠানদিদি গো—বলতেন, তিন পোলার মা হয়ে গিয়েও ভাতারকে কোনদিন মুখ দেখতে দিইনি। রাত দুপুরে আলো নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে তবে ঘোমটা খুলতেন। সেই পুববাড়িতে ভরদুপুরে এই বেলেল্লাপনা—সর্বচক্ষুর সামনে দড়াম করে হুড়কো এঁটে দিল।

তরঙ্গিণী আমল দেন না: ওদের কথা ধরতে নেই। কেষ্ট বিদেশবিভুঁই-এ পড়ে থাকে। ক'দিনই বা একসঙ্গে থাকতে পায়। গাঁয়ের বারোমেসে মানুষের বেলা যে নিয়ম ওদের পর সে .নিয়ম খাটাতে গেলে হবে না।

বিনো করকর করে উঠল: বিদেশবিভুঁয়ে কাকামশায়ও তো থাকেন ওদের মা, তোমাদেরও ঠিক তাই। কই, তোমাদের তো কেউ কখনো বেহায়াপনা দেখেনি।

আপনারা রয়েই বুড়ো হয়ে পড়তে লেগেছি—আমরা আর ওরা।

বিনো ছাড়বে না : আজ না-হয় বুড়ো, চিরদিন তো বুড়ো ছিলে না। তোমাদের নিয়ে কোনদিন তো কথা ওঠেনি।

তরঙ্গিণী বললেন, দিনকাল বদলেছে যে বিনো, এদের কাল আলাদা। অসহ্য ঠেকে তো তোরাই চোখ বুঁজে থাকবি।

খানিকটা কড়কেও দিলেন : বাড়ির কথা বাইরে না যায়। নিনিকেও ভাল করে সমঝে দিবি তুই।

।। একত্রিশ ।।

একটা রাস্তা বিল থেকে সোজা গাঁয়ে এসে উঠেছে। রাস্তা মানে বর্ষাকালে হাঁটুজল, কোথাও বা কোমরজল, বর্ষা অন্তে কাদা। সেই কাদা কার্তিক অবধি। তারপরে শুকনো। কাদার জলে বরঞ্চ চলতে ভাল, শুকনো পথ সমান-পথ নয়। কাদার মধ্য দিয়ে মানুষ হেঁটেছে, গরু হেঁটেছে, ধান-বওয়া গরুর-গাড়ি আসা-যাওয়া করছে—কাদা শুকিয়ে সারা পথ গর্ত-গর্ত হয়ে আছে এখন। পা ফেলে সুখ নেই, পায়ের তলায় খোঁচা লাগে, গর্তের মধ্যে পড়ে পা মচকায়। কাদা-জলের পথ দাও—লোকে হেলতে-দুলতে দশ ক্রোশ পথ চলে যাবে, কিন্তু শুকনোর দিনে বিল থেকে গ্রাম অবধি এইটুকু আসতে-যেতে প্রাণ বেরিয়ে যায়।

তা প্রাণ থাকল কি গেল, এখন দেখতে গেলে হবে না। বছর-খোরাকি ধান গোলায় উঠে যাক, গ্যাঁট হয়ে বসে প্রাণ ও মানসম্মানের কদ্দুর কি বজায় আছে, বিবেচনা করা যাবে। পুববাড়ির বড়কর্তা ভবনাথকে সকাল-বিকাল ঐ বিলের পথ ভাঙতে হচ্ছে। ধান কাটতে বাকি আছে কিনা, কাটা ধান ক্ষেতে পড়ে আছে কিনা, আ'ল ঠেলে আধ-হাত জমি কেউ নিজের দখলে নিয়ে নিয়েছে কিনা—বিলের এদিক-সেদিক তদারক করে বেড়ান। বসতে পিঁড়ি দিল কিনা, দৃকপাত নেই—উঠোনে দাঁড়িয়ে কাকুতিমিনতি : আর্জানো ফসল ইঁদুরে-বাঁদরে খাওয়াবে নাকি ও কুঞ্জ? নড়াচড়া দাও এট্টু তাড়াতাড়ি—

বিলের রাস্তা গ্রামে পৌঁছেই দু-দিকে দুই মুখ হয়ে গেছে। তেমাথার উপর বিশাল কাঠবাদাম-গাছ। মস্ত মস্ত পাতা। সবুজ পাতা থেকে লাল হয়ে যায়, লাল টুকটুক করে, যেন আলতায় চুবিয়ে দিয়েছে। দিবারাত্রি পাতা ঝরে। এ-পাড়া ভাদ্রে পোড়ে না বলে কুমোর অথবা খ'লারে

ঢুকোতে পারে না। [illegible]
পায়ের তলায় বাধা হয়ে গেছে—পথিকজন সেই [illegible]
যায়—আচমকা যেন গদির উপর উঠে পড়েছে। পাতার গাদায় [illegible]
যাচ্ছে—ইচ্ছাসুখে দু-পায়ে ছড়িয়ে দেয়, টুকটুকে পাতা তুবড়ি বাজির মতো চতুর্দিকে উঁচু হয়ে ওঠে।

ছেলেপুলেরা এক একসময় গিয়ে বাদামতলা হাতড়ায়, পাতার গাদার ভিতরে দুটো-চারটে বাদামও মিলে যায়। আম জাম জামরুলের মতন গাছে চড়ে কষ্ট করে পাড়বার বস্তু নয়। কঠিন পুরু খোলা, শাঁস যৎসামান্য—খোলা ভেঙে সে অবধি পৌঁছানোর সাধ্য পাখি-পশুর নেই। মানুষের পক্ষেও সহজ নয়, কাটারি কুপিয়ে কুপিয়ে তবে খোলা ভাঙে। কাকে বাদুড়ে উপরের ছাল ঠুকরে ঠুকরে খায়, বোঁটা ভেঙে তখন টুপ করে ফল পড়ে পাতার মধ্যে ঢোকে।

হন্তদন্ত হয়ে ভবনাথ বাড়ি ফিরছেন—বাদামতলায় দেখতে পেলেন, কমল আর পুঁটি গাদা গাদা বাদামতলায় দু-হাতে তুলে ছড়িয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ ঠিক দুপুরে কেউ কোথাও নেই দেখে বাদাম খুঁজে বেড়াচ্ছে। পুঁটিরই মাথায় আসে এসব—তাড়া দিতে দুটিতে দুড়-দুড় করে পালাল।

কয়েকটা দিন পরে ভীষণ ব্যাপার। বাদামগাছের লাগোয়া গো-ভাগাড়—মরা-গরু ফেলে যায়, শিয়াল শকুনে খুবলে খুবলে খায়। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে, বাদামতলায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। সেদিনও ভবনাথ বিলের দিক থেকে ফিরছেন—দেখলেন, একটা লোক পাশের পগারের মধ্যে কি যেন করছে। চোর-টোর ভেবেছেন উনি—বিলঅঞ্চল থেকে গ্রামে উঠে আত্মগোপন করে আছে, খানিকটা রাত্রি হলে পাড়ার মধ্যে ঢুকবে।

কে ওখানে? উঠে আয় বলছি।

আসে না, শব্দসাড়াও দেয় না। ভবনাথ কাছে চলে গেলেন। তড়াক করে সেই লোক উঠে দাঁড়াল। ওরে ব বা—লম্বায় হাত দশেক, গাট্টাগোট্টা চেহারা, রস-জ্বালানো জালার মতন বিশাল মাথা। বাতাবিলেবুর সাইজের চোখের মণি অবিরত পাক খাচ্ছে অক্ষি-গোলকের ভিতর। পগারের মধ্যে গো-ভাগাড়ের হাড়গোড়—নরাকার ঐ জীব মগ্ন করে হাড় চিবোচ্ছিল লজেঞ্চুসের মতো।

বুঝে ফেলেছেন ভবনাথ, উচ্চৈঃস্বরে রাম-রাম করছেন। চর্বণ ছেড়ে তক্ষুনি সে চোঁচা-দৌড়। পলকে অদৃশ্য।

বাড়ি ফিরে ভবনাথ হৈ-হৈ লাগালেন: ছুটে যা শিবুর, বাঁকাবড়শি

হেমন্ত ঠাকুরের কাছে।' আমার নাম করে বলবি। তোমার আর খোল-কত্তাল নিয়ে যে অবস্থায় থাকেন চলে আসুন। একপালা গাইতে হবে আমার উঠানে।

কি, হল কি হঠাৎ?

ভবনাথ বললেন, ভাগাড়ে আজ গরু পড়েছে। মুচিতে চামড়া খুলে নিয়ে গেছে, শিয়াল-শকুনে খেয়েছে সারাদিন ধরে। গোভূত সন্ধান পেয়ে হাড় চিবোতে বসেছিল। আমি একেবারে মুখোমুখি পড়েছিলাম। কষে রাম-নাম চালাও এখন, তবে ভূত অঞ্চল ছেড়ে পালাবে।

নিমি ও রাজি দুই চক্ষুশূল এরা। মেয়েরা সই পাতায়, এরা নতুন-কিছু করেছে—সইয়ের বদলে চক্ষুশূল পাতিয়েছে। ও ভাই চক্ষুশূল—বলে এ-ওকে ডাকে। দু'জনে ওরা মাঝের-কোঠায় ভুটুর-ভুটুর করছে। শ্বশুরবাড়ি থেকে রাজি সদ্য এসেছে—শ্বশুর-শাশুড়ি ভাসুর-দেওর জা-ননদের কথা এবং বরের কথা। কথা অফুরান—ফুরোলে ছাড়ছে কে? রাজি ছাড়লেও শ্রোতা নিমি তো ছাড়বে না।

ধানের পালার অধিকাংশ মলা-ডলা হয়ে গেছে, উঠোন প্রায় ফাঁকা। এক-দিকে তাড়াতাড়ি গোটাকয়েক মাদুর-সতরঞ্চি পেতে ফেলল, মেইকাঠের সঙ্গে একফালি বাঁশ বেঁধে তার গায়ে লণ্ঠন ঝুলাল। ঘরের চালে আর আড়ের খুঁটিতে চারকোণা বেঁধে একটা কাপড় টাঙিয়ে দিল—মাথার উপরের চন্দ্রাতপ। আর কি চাই—পুরোদস্তুর আসর। হেমন্ত ঠাকুরও এসে পৌঁছলেন। খুব একচোট খোল পেটাচ্ছেন, লোক যাতে জমে যায়।

রাজি বলে, উঠি ভাই চক্ষুশূল—

নিমি টেনে বসাল। বলে তাড়া কিসের? সবে তো সন্ধ্যে। দু-দিনের তরে বাপের-বাড়ি এসেছিস, তোকে কেউ কুটোগাছটিও ভাঙাতে বলবে না।

রাজি বলে সে জন্যে নয়। রাত্রিবেলা জঙ্গলে পথ ভেঙে যাওয়া, তার উপর কী সব দেখে এলেন জেঠামশায়—

তুইও যেমন! কী দেখতে কি দেখেছেন, হয়তো বা ভয় দেখানো কথা।

উঠানে গান! আরম্ভে আসর-বন্দনা। চামর দুলিয়ে হেমন্ত ঠাকুর উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম চতুর্দিকে চক্কোর মারছেন। নিমি বলল, একটুকু শুনে তো যাবি। আমি তোকে পৌঁছে দিয়ে আসব।

রান্নাঘরের দাওয়ায় অন্ধকারে দু-জনে গিয়ে বসল। 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' পালা। নিমি অমহিষ্ণু হয়ে ওঠে। কান্না আসে কেবলই। রাজিকেই বলে, যাবি তো এক্ষুনি ওঠ। লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পড়ে গেলে হাঙ্গাবো—বেঁচে না ওঠা পর্যন্ত আসর ছেড়ে ওঠা যাবে না।

উঠোন-ভরা লোক। দু'জনে টিপিটিপি বেরিয়ে পড়ল। রামলক্ষ্মণ ঠাকুর থাকুন—তাঁদের পুণ্যকথা হেলা করে এরা নিজেদের সামান্য কথায় মশগুল। কথা যত-কিছু রাজিরই—নিমি কান বাড়িয়ে শুনে যায়। বড়দিনের সময় বাড়ি এসে বর এক কাণ্ড করেছিল—সে কারণে কথা বন্ধ সারা বিকাল এবং রাত্রের শেষযাম পর্যন্ত। শেষকালে—কাউকে বলিস নে ভাই চক্ষুশূল, আমার পা জড়িয়ে ধরতে যায়—তখন মাপ করে দিই। রাতে তো ঘুমানোর জো নেই—কিছু উশুল করে নিচ্ছিলাম দুপুরে ঘুমিয়ে। শাশুড়ি উঠোনে মাদুর পেতে রোদ পোহাচ্ছেন। ঐ তো বাঘের মতন শাশুড়ি—তাঁরই পাশ দিয়ে পা টিপে টিপে এসে ঘরে ঢুকেছে। জাগানোর চেষ্টা করেছে যথাসাধ্য—অথচ তিল পরিমাণ শব্দসাড়া করার জো নেই। এতে রাজি জাগতে যাবে কেন? দোয়াতে আঙুল ডুবিয়ে ডুবিয়ে বর তখন সারা মুখে চিত্রকর্ম করল। সুপুষ্ট একজোড়া গোঁফ দিয়েছে ঠোঁটের উপর, থুতনিতে চাপদাড়ি। দু-পাশের গাল দু-খানাও বাদ রেখে যায় নি। এত সমস্ত করে চোরের মতন বেরিয়ে গেছে। বড-জা'র সকলের আগে নজরে পড়ল, তাই খানিকটা রক্ষা: ওরে ছোট, গোঁফ-দাড়ি উঠে গেছে যে তোর! আয়না ধরে হাসি কি কাঁদি, ভেবে পাইনে।

দত্তবাড়ির সামনে এসে পড়েছে। গল্প থামিয়ে রাজি বলে, আসি তবে ভাই—

নিমি বলল, বাঃ রে, আমি বুঝি একলা যাব?

তবে?

তোকে এগিয়ে দিলাম, তুই দে আমায়। পুরো না দিস, খানিকটা দে।

চলল আবার। রাজির মুখে খই ফুটছে। বর হয়ে গিয়ে তারপরে শাশুড়ি নিয়ে পড়ল। এবং বড জা। শাশুড়ি দজ্জাল। বড়বউ কিন্তু সোনার বউ—জগদ্ধাত্রীর মতন রূপ। বাপ-মা তুলে শাশুড়ির এত গালিগালাজ, বড় বউ রা কাড়ে না, চুপচাপ কাজ করে যায়। এক কাঠি নাকি বাজে না—কথাটা কত বড় মিথ্যা, শুনে-এসো একবার রাজির শ্বশুরবাড়ি গিয়ে। কাঠির মতন রোগা শাশুড়িঠাকরুণ একখানি মাত্র মুখে একসাটি অবিশ্রান্ত জবর রকম বাজিয়ে যাচ্ছেন—সে এমন, ঘরের চালে কাক বসতে ভরসা পায় না বড়বউয়ের সুখ্যাতি সকলের মুখে, কেবল শাশুড়ি ছাড়া। শাশুড়ির দলে সম্প্রতি আর একটি জুটেছে—বলতে পার কে? বলো দিকি। আমি, রাজবালা, বাড়ি নতুনবউ কেমনা কাণ্ডবাণ্ড আমি এক সকালবেলা দেখে ফেলেছিলাম। বড়দিদি গো, খুরে তোমার শতেক নমস্কার!

মুখে আর কথা বেরোয় না, হাসিতে ফেটে পড়েছে। হাসে আর বারবার

[illegible]

[illegible] ঘুরে আসছে।

এসে গেছে তারা পুববাড়ি। হেমন্ত ঠাকুর জোর বেগে চালিয়েছেন। নিমি বলে, বাড়ি এলাম।

তা তো এসেছিস। আমি এখন একলা ফিরব নাকি?

নিমি বলে, চল্, দিয়ে আসি তোকে।

অতএব নিমি চলল আবার রাজিকে পৌঁছতে। গল্পের সেই মোক্ষম জায়গা এবারে, যার জন্য রাজি পরম শান্ত বড়বউকে ধন্য-ধন্য করে টিটকারি দিচ্ছে। জানলায় হঠাৎ চোখ পড়ে গিয়ে উঠোনের কায়দাটা দেখে ফেলেছিল রাজি। শাশুড়ি রান্নাঘরের দাওয়ায় গোবরমাটি লেপছেন। বড়বউয়ের ঘর থেকে বেরুতে আজ কিছু বেলা হয়ে গেছে—তা নিয়ে শাশুড়ি কলিযুগ ধরে গালিগালাজ করছেন, শোলোক পড়ছেন: কলিকালের বউগুলো কলি-অবতার—রাত নেই দিন নেই, ভাতার ভাতার!

অপরাধী বড়বউ জবাব দেয় না, ঝাঁটা হাতে নিঃশব্দে উঠান ঝাট দিচ্ছে। নতুনবউ দেখতে পাচ্ছে জানালা দিয়ে। বকতে বকতে বুড়ো শাশুড়ি ক্রমশ ঝিমিয়ে এলেন, থেমে যাবার গতিক। হঠাৎ সব ক্লান্তি ঝেড়েফেলে তুমুল কণ্ঠে বড়বউয়ের মৃত চৌদ্দপুরুষদের নামে এই দিনের প্রারম্ভে বিবিধ খাদ্যের ব্যবস্থা করতে লাগলেন, বিশ দিন নিরন্ন থেকেও মানুষে যা মুখে তুলতে নারাজ। বড়বউয়ের দৃকপাত নেই—না-রাম না-গঙ্গা রা কাড়ে না। বাক্য বিনা কাজ হচ্ছে তো কোন দুঃখে গলাবাজি করতে যাবে? নতুনবউ জানালার পথে সমস্ত দেখে নিয়েছে। ঝাঁট দিতে দিতে একবার-বা ঝাঁটা তুলে শাশুড়ির পানে ঈষৎ নাচিয়ে দিল। অথবা দু-পাটি দাঁত মেলে মুখভঙ্গিমা করল রান্নাঘরের দিকে চেয়ে। ব্যস, আর রক্ষা নেই। নিপাট ভালমানুষ বড়বউ দীর্ঘ ঘোমটা টেনে দিয়ে পরম মনোযোগে আবার নিজ কর্ম করে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে দত্তবাড়ি পৌঁছে গেছে তারা। নিমি বলল, ঘরে উঠলে হবে না চক্ষুশূল, আমার সঙ্গে চল্।

নিমি রাজিকে দত্তবাড়ি পৌঁছে দেয়, দত্তবাড়ি থেকে রাজি আবার নিমিকে পুববাড়ি নিয়ে আসে। কতবার যাতায়াত—গণতে গেছে কে? অবশেষে পালা শেষ—শক্তিশেলে নিহত লক্ষ্মণ বিশল্যকরণীর গুণে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলেন। হরিবোল দিয়ে আসরের মানুষও উঠে পড়ল। যে যার বাড়ি যাচ্ছে। রাজি তাদের মধ্যে ভিড়ে পড়ল।

জনাদের উঠোনটা এবার দেখবার মতো। লোভী গোতুহ, বস্তা-গরুর

[illegible]

দেখেছেন। [illegible]

ভেঙে ধুপধাপ করে ভূত পালিয়ে যাচ্ছে। [illegible]

আছে—তারা বলে, বড়কর্তার ভয়-দেখানো কথা। ছেলেপুলে [illegible]

গিয়ে পড়ত—এমনি কায়দা—করলেন, ইতরজন্ত্র কেউ বাদামতলা [illegible]

হবে না।

সে যাই হোক, পুঁটি-কমল ও তাদের সঙ্গিসাথীদের সত্যিই বাদাম-সংগ্রহ বন্ধ। নিতান্ত যদি লোভ ঠেকাতে না পারে, যাবে দিনমানে দস্তুরমতো দলবল জুটিয়ে। জল্লাদ ছেলেটাই শুধু ভ্রূভঙ্গি করে উড়িয়ে দেয়: বাজি রাখো, আমি যাব। ভাগাড়ে যেদিন গরু পড়বে, একলা রাতদুপুরে গিয়ে আমি বাদাম কুড়িয়ে আনব। যদি বলো সে বাদাম দিনের বেলা কুড়ানো, রাত্রিবেলা গাছের গায়ে গোটাকয়েক দায়ের কোপ দিয়ে আসব, সকালে গিয়ে দেখতে পাবে।

তা পারে হয়তো জল্লাদ—দুনিয়ার মধ্যে ও-ছেলের অসাধ্য কিছু নেই শুধুমাত্র পড়া ও লেখা ছাড়া।

॥ বত্রিশ ॥

ধান-কাটা সারা। বিল শুকিয়েছে। বাড়িতে বাড়িতে মলনের কাজও শেষ। উঠানের মাঝখানে মেইকাঠখানা রয়ে গেছে এখনো। যদ্দিন থাকে থাকুক না। সন্ধ্যাবেলা ফ্যান খাওয়াতে গরু ভিতর-উঠানে নিয়ে আসে—মেই কাঠে বাঁধা যায় তখন। কমল-পুঁটিদেরও কাজে লাগে—মলনের গরুর মতন মেইকাঠ ধরে ওরা গোল হয়ে ঘোরে। খাসা মজা।

উঠোন জুড়ে ইঁদুরে কি করেছে, দেখ। গর্ত, গর্ত, গর্ত—মাটি তুলে তুলে ডাঁই করেছে। ধানের পালায় ঢাকা ছিল বলে তেমন নজরে পড়ত না। পালা উঠে গিয়ে ফাঁকা-উঠোন—তো গুণমণি এসে পড়ল পাতকোদাল হাতে নিয়ে। ইঁদুরের গোষ্ঠিকে বাপান্ত করে, আর জোরে জোরে কোপ ঝাড়ে গর্তের উপর। কোপ কি ইঁদুরের ঘাড়ে? যমের ঘাড়েই বা নয় কেন, গুণোর ছেলেগুলো কেড়ে নিয়েছেন যিনি? ইঁদুরে ধান নিয়ে তুলেছে গর্তের ভিতরে—খেয়ে কতক তুষ করেছে, কতক-বা ভাণ্ডারে সঞ্চয় করেছে। গর্তের জায়গা কুপিয়ে গুণমণি ধান-মাটিতে ঝুড়ি বোঝাই করে পুকুরঘাটে নিয়ে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ধোয়। মাটি ধুয়ে গিয়ে ধান ঝিকমিক করে ওঠে। পুরো এক ঝুড়ি মাটি ধুয়ে মুঠো দুই ধান। সবস্তটা দিন ধরে গুণমণি

এই করছে—ধান এনে এনে রোদে দিচ্ছে উঠোনের উপর। শেষ পর্যন্ত পরিমাণে নেহাৎ মন্দ হল না—দু-তিন খুঁচি তো বটেই। গুণমণি হুঙ্কার দিয়ে ওঠে: ধান পড়ে রইল, তোমাপাড়ার নাম নেই। খুব যে ঠ্যাকার হয়েছে ঠাকরুন।

উমাসুন্দরী বলেন, ইঁদুরের মুখ থেকে কেড়েকুড়ে বের করেছিস, ও ধান তোর। তুই নিয়ে যা শুনো।

তা গুণমণি এমনি এমনি নেবার লোক নাকি? উঠান পিটিয়ে চুরমুশ করে গোবর-মাটি লেপল ক-দিন ধরে। ধান দিয়েছে, তার মূল্যশোধ।

বিল আর এখন জলা-জায়গা নয়, শুকনো ডাঙা। ডোঙার পথ গিয়ে পায়ে হাঁটার পথ। বিল-পারের মানুষ, বলতে গেলে, জলচর জীব—হাঁটাহাঁটি তেমন পেরে ওঠে না। হাটঘাট করতে বারোমাসেই তারা ডাঙাঅঞ্চলে আসে। ইদানীং হাঁটতে হচ্ছে। বিল ভেঙে আড়াআড়ি উঠে পুববাড়ির ঢেঁকিশালের সামনে দিয়ে মন্তার-মা'র ঘরের কানাচ ঘুরে সোজাসুজি হাটে চলে যায়। কৃষ্ণময় শহরে থাকে, এ জিনিস তার ঘোর অপছন্দ। ঢেঁকিশালে মেয়ে-বউরা ভানা-কোটা করে, কানাপুকুরে তালের ঘেটের উপর বাসনের কাঁড়ি মাজতে বসে যায়—হাটুরে পথ মাঝান দিয়ে গেলে আবরু রক্ষে হয় কেমন করে?

বংশী ঘোষের ছেলে সিধু বলে উল্টো কথা: ক'টা মাসের তো ব্যাপার। বর্ষায় ডোঙা চলতে লাগলে এ পথ আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে। পাড়ার তখন ওরা ইয়ে করতেও আসবে না। বলি, মন্দটা কি হয়েছে? ঘরের দাওয়ায় বসে দিব্যি ধানচাল হাঁসের-ডিম কেনা যাচ্ছে। নিকারির মাছের ডালি নামিয়ে মাছও কেনা যায়। হাটখোলা অবধি না গিয়েও হাটবেসাতি করি।

কৃষ্ণময়কে ঠেস দিয়ে বলে, ক্ষেতের ছাগল তাড়ানোর মতন মানুষজন তাড়াহুড়ো না করে ফরসা বউ ঘরের সিন্দুকে তালাচাবি বন্ধ করে রাখলেই তো হয়।

খানিকটা তেমনি ব্যাপারই বটে। অবিরত ঝগড়াঝাঁটি হাটুরে মানুষের সঙ্গে: তোমাদের আক্কেলটা কি শুনি? পাছদুয়ারের উঠোন কি সরকারি রাস্তা পেয়ে গেছ?

যার সঙ্গে হচ্ছে, সে হয়তো ঘুরপথে গেল তখনকার মতো। কিন্তু কে কখন আসছে, লেখাজোখা নেই। লাঠি হাতে তবে তো হুড়কোর ধারে খাড়া পাহারায় থাকতে হয়। এ যেন বালির বাঁধ দিয়ে স্রোতের জল ঠেকানো। হয় না, গাঁ-গ্রামের চাষাভুষো মানুষ অতশত আবরুর মহিমা বোঝে না—খিটমিটি কৃষ্ণময়ের লেগেই আছে।

ভবনাথ মতলব ঠাউরে ফেললেন। উমাসুন্দরীকে বললেন, বড়বাবুকে মানা করে দাও, লোকের সঙ্গে অকারণ বিবাদবিসম্বাদ না করে। ব্যবস্থা আমিই করছি।

ঘর বাঁধতে ভবনাথের জুড়ি নেই। এ বাবদে খরচও যৎসামান্য। মস্তবড় খড়ের ভুঁই—বিনি চাষে উলুখড় আপনাআপনি জন্মে, কেটে আঁটি বেঁধে চালায় গাদা দেবার অপেক্ষা? বাঁশঝাড়ও বিস্তর। বাঁশের খুঁটি, বাঁশের সাজপত্তোর, বাঁশের চাল—উপরে খড়ের ছাউনি। কানাপুকুর থেকে কোদাল কতক মাটি তুলে ভিটে বানিয়ে নেওয়া। ব্যস, হয়ে গেল ঘর। পুববাড়ির বড়কর্তার ঘর তুলতে দু'চার দিনের বেশি লাগে না। ঢেঁকিশাল দক্ষিণের পোঁতায়—পুব ও পশ্চিম উভয় পোঁতায় ঘর উঠে যাওয়ায় বাইরের এদিকটাও এখন ঘেরা বাড়ি, আঁটো উঠোন। এত ঘর কোন কর্মে লাগবে, সেটা এর পর ধীরে-সুস্থে ভেবে দেখা যাবে। তবে হাঁটুরে পথ পাকাপাকি রকম বন্ধ, বিলপারের মানুষের গোটা কানাপুকুর বেড় দিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

হঠাৎ বড্ড বেশি শীত পড়ে গেল।

শীত করে রে বুড়োদাদা, গায়ে দেবো রে কি?
কাহত খানেক কড়ি আছে, দোলাই কিনে দি।

দোলাইয়ে যাবার শীত নয়, দাঁতে দাঁতে ঠকঠকি। গা-হাত-পা কন কন করে। লেপ আর ক'টাই বা লোকের বাড়িতে—বুড়োহাবড়া মানুষ সন্ধ্যে না হতেই কাঁথা-মুড়ি দিয়ে কুকুরকুণ্ডলী হয়ে পড়ে। তবে লেপ না থাক, আগুনের মন্বন্তর নেই। বাড়ি বাড়ি অনেক রাত্রি অবধি মানুষে আগুন পোহায়।

পুববাড়িতে নতুন দুই চালাঘর উঠে দক্ষিণের উঠোনে ঘের পড়ে গেছে. চকমিলানো বাড়ির মতন হয়েছে। উটকো লোকের চলাচল বন্ধ, তা বলে পড়শিদের ওঠা-বসার বাধা নেই। ঢেঁকিশালের সামনে জামরুল গাছটার নিচে আগুন পোহানোর খাসা এক আড্ডা জমে উঠল। উদ্যোক্তা রমণী দাসী। গাছতলায় কুড়িয়ে কুড়িয়ে শুকনো ডালপালা আনে। খানা-ডোবায় যত্রতত্র এমন পাটকাঠি—এনে রাখে তার কয়েক বোঝা। বাঁশতলায় শুকনো বাঁশপাতাও ডাঁই হয়ে আছে—কয়েকটা কঞ্চি একত্র বেঁধে ঝেঁটিয়ে আনলেই হল। দিনমানে এই সব জুটিয়ে-পুটিয়ে আনে, সন্ধ্যার পর আগুন দেয়। আঁটো জায়গা বলে হাওয়ার উৎপাত নেই—আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে, মানুষ এসে জমতে থাকে।

রমণী দাসী মাঝবয়সী বিধবা। আঁটোসাঁটো গড়ন, অদ্ভুত রকমের সাহসী। সোনাখড়ি ও চতুষ্পার্শ্বের পাঁচ-সাতখানা গ্রাম এবং বিলগুলো তার পায়ের

তলায়। সাপ যথেষ্ট, সন্ধ্যা সময় এই শীতকালে কৈবোবাবের আবির্ভাব ঘাট। পরোয়াকের মুখে তবু রাতবিরেতে বেরুতে রমণীর আটকায় না। নষ্ট মেয়েমানুষ—বলে নাকি ভৈরব পালোয়ান। গরুর-গাড়িতে সোয়ারি বয় নিতাই মোড়ল—তারই বাপ ভৈরব। এখন বুড়োমানুষ, কিন্তু বয়সকালে বলশক্তি দৈত্যদানবের মতো ছিল। তখনকার অনেক গল্প লোকের মুখে মুখে ফেরে। নামের সঙ্গে 'পালোয়ান' বিশেষণও সেই আমলের। ভৈরব নাকি রমণী দাসীর-চালচলন পছন্দ করে না, যা-তা বলে বেড়ায়। প্রহর বেলায় একদিন ভৈরব কুটুম্ববাড়ি থেকে ফিরছে—মাঝবিলে ভুতুড়ে-বটতলার কাছে রমণীর একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেল। আর যাবে কোথা পালোয়ান-টালোয়ান রমণী দাসী গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না—ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘিনীর মতন ভৈরবের উপর। বাবরি চুল, দুধের মতন সাদা, থরে থরে মাথার চৌদিকে ঝুলছে। সেই চুল মুঠোয় ধরে ধাক্কা মেরে বৃদ্ধকে চষা-ভুঁয়ের উপর ফেলল। চেঁচাচ্ছে: ভেবেছিস কি ওরে বুড়ো, নষ্টামি আজ তোর সঙ্গেই করব—কত বড় বাপের বেটা দেখি। এক হাতে চুল মুঠো করে ধরেছে, কিল-চড়-ঘুষি ঝাড়ছে অন্য হাতে। লাঙল ফেলে চাষারা হৈ-হৈ করে এসে পড়ল।

এত দাপটের মানুষ ছিল ভৈরব—বুড়ো হয়ে রাগ-টাগ ঠাণ্ডা মেরে গেছে। মিছে কথা রমণী, তাহা মিথ্যে, মিছামিছি তুই ক্ষেপে গেলি—এই সব বলে মুষ্টিবদ্ধ চুল ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। ছাড়া পেয়ে তারপড়েও কিন্তু নড়ে না, চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে—স্ত্রীলোকের পরাক্রমে মুগ্ধ হয়ে গেছে সে। ভৈরব হেন পালোয়ানেরও দুর্গতি দেখে রমণী দাসীর চরিত্র নিয়ে বলাবলি সেই থেকে একেবারে চুপ হয়ে গেছে।

গল্প বলতে রমণীর জুড়ি নেই। সন্ধ্যার পর আগুন ধরিয়ে দিয়ে যেদিকটা কাঠ-পাতা গাদা করে রেখেছে, সেইখানে সে বসে যায়। আগুন না নেভে—সমানে কাঠ পাতা দিয়ে যাচ্ছে। আর মুখে মুখে গল্প। গোড়ার দিকে ছেলেপুলেরা সব শ্রোতা। বাড়ির কমল-পুঁটি তো আছেই, পাড়া থেকে সব এসেছে। বুড়ো ভৈরবের কাজ-কর্ম নেই, এক-একদিন সে-ও চলে আসে। গল্প শোনে বাচ্চাদের ভিতর একজন হয়ে। ঠেঙানি খেয়ে রমণীর উপর আক্রোশ দূরস্থান, ভাবসাব যেন বেশি করে জমেছে। আগুন ঘিরে গোল হয়ে সব বসে যায়। এই সাঁঝের বেলা ওককথাই (রূপকথা) বেশির ভাগ এখন—রাজপুত্তুর কোটালপুত্তুর পাতালবাসিনী-রাজকন্যা ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী গোবর-চাপা দেওয়া সাপের মাথায় মানিক—এই সব গল্প। বেলা ওককথা শুরুর রমণী।

মাঝে-মধ্যে ভৈরব পালোয়ানের জোয়ান বয়সের কথাই উঠে পড়ে। সে খুব গল্পও রমণীর অনেক শোনা আছে—ওরুকথারই সমান বজায়দার। উল্টোপাল্টা হয়ে গেলে শ্রোতা ভৈরই কোড়ন কেটে ওঠে, কোন অংশ বাদ চলে গেলে ভৈরবই জুড়েগেঁথে ঠিক করে দেয়।

ছেলে নিতাইয়ের মতন ভৈরবও গরুর-গাড়ি চালাত। ঝড় হয়ে গেছে আগের দিন। কামার-দোকানের সামনের রাস্তায় ভৈরব গাড়ি দাবড়ে বিলের দিকে যাচ্ছে। ডালপালা সমেত বিশাল এক আমগাছ পড়ে রাস্তা বন্ধ। কৈলেস কামার চেঁচাচ্ছে: গাড়ি ঘোরাও পালোয়ান। সেই হল্তের-খাল ঘুরে যেতে হবে।

ভৈরব নেমে পড়ল। গতিক সেই রকমই—গাড়ি পিছিয়ে নিয়ে খালের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বিলে গিয়ে পড়া। বিস্তর ঘুরপথ, সময় অনেক লাগবে। তারও বড়—গাছ দেখে পরাজয় মেনে পিছানো পালোয়ানের পক্ষে ঘোরতর অপমানের ব্যাপার।

কৈলেস বলছে, ভেবে কি করবে? ডালপালা ছেঁটে গুঁড়ি উপড়ে ফেলে তবে পথ বেরুবে। পাঁচ-সাত দিনের ধাক্কা।

সহাস্যে ভৈরব বলে, আর বুঝি উপায় নেই কর্মকারমশায়?

আর, ঐ হল্যের-খালের পাশে পাশে ঘোরা।

ভৈরব সর্দার ছুটে গিয়ে আমগাছে পড়ল। গুঁড়ি বেড়ের মধ্যে আসে না তো মাথার দিক ধরে টানাটানি। একলা—শুধুমাত্র এই একটি মানুষ। অত বড় গাছ এক-মানুষের টানেই গড়িয়ে পাশে গিয়ে পড়ল। রাস্তা পরিষ্কার। ভৈরব বলে, যাদের গাছ তারা এসে ধীরে-সুস্থে ডালপালা ছাঁটুক, গুঁড়ি কেঁড়ে তক্তা বানাক—পথ বন্ধ হয়ে লোকের কাজকর্মের ব্যাঘাত ঘটাবে না।

একবার কোন কাজে ভৈরব সর্দার ডুমুরের হাটে যাচ্ছে। হাটুরে-ডিঙির যা নিয়ম, চড়নদারে পালা করে বোঠে বাইবে। ভৈরব বোঠে ধরেছে এবার। কী পালোয়ানি বাওয়া রে বাবা—মাঝি সামাল করছে: আস্তে রে ভাই, আস্তে। বলতে বলতে চড়াং করে বোঠে ভেঙে দুই খণ্ড। ডিঙি ঘুরে যায়। মাঝি গালি পাড়ছে। অন্য বোঠে নিতে গেলে সবাই হাঁ-হাঁ করে ওঠে: কখনো না। বোঠে ধরা হটকো লোকের কর্ম নয়, বুদ্ধিশুদ্ধি লাগে। ভৈরবের অতএব হাত-পা কোলে করে চুপচাপ বসে থাকা এবং দু-কানে অবিশ্রাম গালি শোনা। সারা পথ এমনি চলল। ঘাটে পৌঁছে গিয়ে মাঝি বলল, খুব কৃতার্থ করেছ আমাদের, গা তুলে এইবারে নেমে পড়। অপমানে ভৈরব গুম হয়ে বসে ছিল,

লম্ফ দিয়ে নাবল। নেবে ডিঙির গলুই ধরে হড়-হড় করে টান। টানের চোটে ডাঙায় উঠে গেল ডিঙি, তবু ছাড়ে না—ডাঙার উপরে টেনে নিয়ে চলেছে মানুষজন ও মালপত্র সমেত। হাটের সীমানা ছাড়িয়ে তারপরেও চলল। হাট ভেঙে এসে লোকে আজব কাণ্ড দেখছে। কাড়ালের উপর মাঝি উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে—পারে না, পড়ে যায়। জোড়হাত করছে সে: ঘাট হয়েছে, ক্ষেমা দে ভৈরব-ভাই। যেলা দূর এনে ফেলেছিল, জলে ফিরিয়ে দে আমার ডিঙি। বয়ে গেছে, ডিঙি ছেড়ে দিয়ে ভৈরব লহমার মধ্যে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল। মাঝি কপাল চাপড়ায়: ডিঙি এখন গাঙে নিয়ে ফেলবার কি উপায়?

হাটঘাট সেরে ফিরতি বেলা ভৈরব আর নৌকোর ঝামেলায় গেল না। পথ কতটুকুই বা—ক্রোশ পনেরোর মতো হতে পারে। অর্থাৎ তিরিশ মাইল—যা বললে সবাই বুঝে যাবেন। সামান্য পথ সে হেঁটেই মারল, রাত না পোহাতেই বাড়ি পৌঁছে গেল।

আর এক দিনের ব্যাপার। ভৈরব পালোয়ানের নাম যে-না-সে'ই জানে। দক্ষিণ অঞ্চলে তেমনি আর এক জন আছে, তার নাম পালান কয়াল। পালানের পাটের কারবার—মরশুমে পাট কিনবার জন্য লোক-নৌকো নিয়ে এই দিগরে এসে পড়েছে। এসেছেই যখন, খোঁজে খোঁজে সোনাখড়ি গিয়ে হাজির। বড় বাঞ্ছা, ভৈরব পালোয়ানের সঙ্গে একহাত লড়ে যাবে।

ভৈরবের গাইগরুটা মাঠে বাঁধা—ছেলে সকালবেলা বেঁধে গেছে। জল খাওয়াতে গিয়ে ভৈরব দেখে, চিটেপানা পেট—ঘাস নেই, কি খাবে? সারা বেলাই নির্জলা উপোস করে আছে, বলা যায়। কি খাইয়ে গরুর পেট ভরানো যায় এখন? সামনে ভালকো-বাঁশের ঝাড, তাছাড়া আর-কিছু নজরে আসে না। বাঁশ তো বাঁশই সই—ভৈরব প্রকাণ্ড একটা বাঁশ নুইয়ে গরুর মুখে ধরল। মহানন্দে গরু বাঁশের পাতা খাচ্ছে—

হেনকালে রাস্তার উপর থেকে পালানের প্রশ্ন: পালোয়ান ভৈরব সর্দার মশায়ের বাড়ি তো ঐ। বাড়ি আছেন তিনি?

ভৈরব ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল: কি দরকার তাঁর কাছে?

কাছে এসে পালান বিনয় করে বলে, পালোয়ান মশায়ের ভুবন-জোড়া নামডাক—ছটো জেলা পার হয়ে আমাদের তল্লাট অবধি গেছে। আমারও অল্পসল্প সুখ্যাতি আছে। লোভ হয়েছে, একহাত লেগে দেখব পালোয়ান মশায়ের সঙ্গে। সেই জন্যে এসেছি।

ভৈরব ভ্রূকুটিদৃষ্টিতে পালানের আপাদমস্তক তাকিয়ে দেখে। লোকটা বলে

যাচ্ছে, আমার কি। ও-মানুষের সঙ্গে হারলে অপযশ নেই, কপাল ভগ্নেরি। জিতে যাই তবে তো পাথরে-পাঁচকিল। আছেন তিনি বাড়িতে?

ভৈরব বলে, আছেন। আপনি গরুটাকে বাঁশের পাতা খাওয়াচ্ছিলেন, ডেকে এনে দিচ্ছি। বাঁশ ছাড়বেন না কিন্তু, টেনে ধরে থাকবেন। ছেড়ে দিলে খাড়া উঠে যাবে। গরুর এখনো পেট ভরে নি, আরও কিছু পাতা খাবে।

রাজি হয়ে পালান বাঁশের মাথা টেনে ধরল। যেই-না ভৈরব ছেড়ে দিয়েছে, বাঁশ সঙ্গে সঙ্গে অমনি টনটনে খাড়া। পালান ছাড়ে নি, এঁটে সেঁটে ধরে রয়েছে, বাঁশের সঙ্গে শূন্যে উঠে গেছে সে, ঝুলছে। নিচে দাঁড়িয়ে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে ভৈরব। বলে, আমি—আমিই ভৈরব সর্দার। মল্ল লাগার সাধ আছে এখনো? নেমে পড তা হলে।

লাফ দিয়ে পালান বাঁশতলায় পড়ল। মুখে আর কথাটি নেই। ভৈরবের পায়ের কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম। তারপরে দৌড়। দৌড়—দৌড়—চক্ষের পলকে অদৃশ্য।

সেই ভৈরব বুড়ো হয়ে গিয়ে রমণী দাসের হাতে নাস্তানাবুদ। সন্ধ্যেবেলা আগুন ঘিরে গোল হয়ে বসে বাচ্চাদেরই একজন হয়ে সে এখন রূপকথা শোনে। তার নিজের গল্প হয়—সে-ও অলীক রূপকথা, রমণী যেন অচিন-দেশের কোন দৈত্যদানবের কথা বলে যাচ্ছে।

রাত বাড়ে। শেয়ালের কান্না আসে আমবাগানের ওদিক থেকে। কুয়োপাখি ডাকে। কচুবনে সজারু ঝুম-ঝুম ঝুম-ঝুম করে জলতরঙ্গ মল বাজিয়ে ছুটে যায়। রমণী দাসের মুখ সমানে চলেছে—সেই সাঁঝের বেলা থেকে তিলার্ধ জিরান নেই। শ্রোতার বদল হয়ে গেছে ইতিমধ্যে একজন দু'জন করে। কমল ছিল, পুঁটি ছিল, এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে ছেলেমেয়েরা এসেছিল। হয়তো-বা বুড়ো ভৈরব ছিল। এমনি বয়স্ক আর যে কেউ ছিলনা, এমনও নয়। ছোটরা সব এখন ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে, গভীর ঘুম ঘুমাচ্ছে। গল্প এখন বড়রা শুনছে। গল্পও আলাদা। রমণী কবে কেউটে-সাপের মুখে পড়েছিল, চৈত্রের দুপুরে চালকহীন ঘোড়া ভারী খুরের আওয়াজ তুলে আগান-নগরের বিলের মধ্য দিয়ে ছুটে চলে গিয়েছিল—এই সমস্ত গল্প। মামলা-মোকদ্দমার গল্পও হয়। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রমণী নাকি কোমরে আঁচল বেঁধে উকিলের সঙ্গে কোন্দল করেছিল, হাকিম একেবারে থ বনে গিয়েছিলেন।

গল্পের মধ্যে এক সময় উমাসুন্দরীর গলা পাওয়া যায়। উঁচুগলায় তিনি

সামাল করে দিচ্ছেন : ওরে রমণী, যাবার-সময় জল ঢেলে ভাল করে আগুন নিভিয়ে যাস মা।

টকটকে চেহারা, দীর্ঘদেহ, গায়ে জবড়জং জোব্বা, দু-পায় সের দশেক ওজনের জুতো, হাতে লাঠি, কাঁধে বিপুল বোঁচকা—মূর্তিগুলো গ্রামপথে ঘোরা-ঘুরি করছে। কাবুলিয়ালা—বরকত খাঁ, বাদশা খাঁ, আকবর খাঁ এমনি সব নাম। অত কে নামের হিসাব রাখতে যায়—লোকে খাঁ-সাহেব ডেকে খালাস। শীতকালে আসে শাল-আলোয়ান-কম্বল বিক্রি করতে, পেস্তা-বাদাম-কিসমিসও আনে কোন কোন বার। চৈত্রমাস পড়তে না পড়তে চলে যায়।

এক খাঁ-সাহেব পুববাড়ি ঢুকে পড়ল। শিশুবর কাবুলিওয়ালার মক্কেল, একেবারে সে সামনাসামনি পড়ে গেল। শশব্যস্তে খাতির করে বলে, এসো এসো খাঁ-সাহেব। কবে আসা হল?

খাঁ-সাহেবটির প্রতীক্ষায় পথ তাকাচ্ছিল সে এতদিন—এমনি তরো ভাব।: বলে, খবর ভাল তোমার?

হ্যাঁ ভাল। রুপেয়া নিকলাও।

নিকলাব বই কি। দশ কাঠা ভুঁয়ের কোষ্টা ঐ জন্যে আলাদা করে রাখা আছে। আর একটু দর উঠলে ছেড়ে দেব। আছ তো তিন-চার মাস এখন—তাড়া কিসের? আমিই ফকিরবাড়ি গিয়ে মিটিয়ে দিয়ে আসব, তাগাদা করতে হবে না।

গেল-বছর শিশুবর শখ করে বউয়ের জন্য পশমের আলোয়ান কিনেছিল। নগদ দাম লাগে না বলে অনেকেই কেনে এমন। ধারে পেলে হাতি কিনতেও রাজি পাড়াগাঁয়ের লোক, দরকারে লাগবে কিনা সে বিবেচনা অবান্তর। কাবুলিওয়ালার ব্যবসা এই জন্যেই চালু। এসে এখন আগের পাওনা আদায় করছে, নতুন আবার ধার দিচ্ছে। জনমজুর খেটে দিন আনে দিন খায়, নড়বড়ে কুঁড়েঘরে থাকে, আপনি আমি ভরসা করে আটগণ্ডা পয়সা হাওলাত দিইনে, সেই মানুষকে কাবুলিওয়ালা স্বচ্ছন্দে পাঁচ-সাত-দশ টাকার জিনিস দিয়ে কত সব পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে স্বদেশে চলে গেল। আগামী শীতে: শোধ হবে—এ শীতে যেমন আগের পাওনা শোধ হচ্ছে। হতেই হবে, অন্যথা নেই—বংশ সুদ্ধ মরে লোপাট হয়ে যায় তো আলাদা কথা, নয়তো কাবুলি-ওয়ালার টাকা কেউ মারতে পারবে না। দৈত্য-সম মানুষটা যখন 'দাও রুপেয়া' বলে উঠোনে লাঠি ঠুকবে, টাকা তখন দিতেই হবে যেমন করে পারো।

কৃষ্ণময় পশ্চিমের-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলে, তোমার বোঁচকা একবার খোল দিকি খাঁ-সাহেব, নতুন কি সব মাল আনলে দেখি। চোখের দেখাই শুধু—কেনাকাটা পেরে উঠব না। যা দাম হাঁকো তোমরা। কলকাতার দরের সঙ্গে আকাশ-পাতাল তফাত।

কাবুলিওয়ালা বাংলা কথা বলে—তাতে আড়ষ্ট ভাব। কিন্তু অন্যের কথা দিব্যি বুঝে নেয়। এমন কি হাসি-মস্করাটুকুও। বলল, রুপেয়া নগদা ফেলো না—সস্তা করে দিবো।

তামাক সেজে শিশুবর টানতে টানতে এল। হুঁকোর মাথা থেকে কলকে নামিয়ে কাবুলিওয়ালার দিকে এগিয়ে ধরে: খাও—

বাংলা মুলুকে কত কাল ধরে আসা-যাওয়া. কিন্তু দু-হাতের চেটোয় কলকে টানা অদ্যাপি রপ্ত হয়নি। কলাপাতায় ঠোঙা বানিয়ে ভিতরে কলকে বসিয়ে শিশুবর হাতে দিল। কাবুলিওয়ালা টানছেও বটে, কিন্তু মুখে ধোঁয়া যায় না। হাসে সবাই হি-হি করে: ও খাঁ-সাহেব, হচ্ছে কই? দেখে নাও আমরা কি করি, কোন কায়দায় টানি।

কৃষ্ণময় বলল, তুলে পেড়ে রাখ খাঁ-সাহেব। ফকিরবাড়ি যাব কাল-পরশুর মধ্যে, তোমাদের কার কি মাল আছে দেখব। বাবার বালাপোষ ছিঁড়ে গেছে, তুষ একটা কিনতে পারি যদি অবিশ্যি গলা-কাটা দাম না হাঁকো।

ফকিরবাড়ি তল্লাটের মধ্যে সুবিদিত—পাশের কোণাখোলা গ্রামে হাতেম আলি ফকিরের বাড়ি। আল্লার বান্দা, সত্যনিষ্ঠ মানুষ তিনি। মুখ ফসকে দৈবাৎ কোন কথা যদি বেরিয়ে যায়, তা-ও তিনি সত্য করে ছাড়বেন। একটা গল্প খুব চালু—পোষা গরু দড়ি ছিঁড়ে পড়শির ক্ষেতে পড়েছিল, পড়শি এসে নালিশ করে গেছে। ফকির তাই নিয়ে চাকরকে ধমকাচ্ছেন: ঘরে কোষ্টা থাকতে নতুন দ'ড়ি পাকিয়ে কেন গরু বাঁধা হয় না? চাকর বলল, কোষ্টা রয়েছে উড়োদড়ির জন্য। ফকির চটেমটে বললেন, হবে না উড়োদড়ি। ফকিরের অন্তত দশকুড়ি খেজুরগাছ, গাছ-ম'লের দরুন মোটা রোজগার। খেজুরগাছ কেটে ভাঁড় ঝুলিয়ে দেয়, টপ টপ করে রস পড়ে ভাঁড় ভর্তি হয়। যে দড়িতে ভাঁড় টাঙায় তাকে বলে উড়োদড়ি। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, উড়োদড়ি হবে না—তো কোনক্রমেই হবে না। অতএব গাছম'ল বন্ধ। উড়োদড়ি দিয়ে ভাঁড় বাঁধা চলবে না, খেজুরগাছ কাটতে যাবে তবে কিসের জন্য? একগাদা টাকা লোকসান একটা বেমক্কা কথার জন্য। এতদূর সত্যবাক্ বলেই বোধহয় লোকের রোগপীড়া নিয়ে যা বলেন, তা-ও ফেটে

যায়। শুক্রবারে ফকির থানে বসেন না—ঐ দিনটা বাদ দিয়ে দেখতে পাবেন, ঘটি হাতে কাতারে কাতারে মানুষ ফকিরবাড়ি চলেছে ফুল-পানি নিয়ে-দেবার জন্য।

পশ্চিম-দুয়ারি ঘরে থান। সামনে বিশাল পুকুর—পুকুর না বলে দীঘি বলাই ঠিক। চার পাড়েই ঘাট-বাঁধানো। উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিম পাড়ের উপর লম্বা চালাঘর। যারা পাগলবাবার (পাগলবাবারই সেবাইত ফকির) মানত শোধ করতে আসে, উত্তর-দক্ষিণের চালা দুটো তাদের জন্য। উত্তরেরটা মুসলমানদের—মানতের মুরগি জবাইয়ের পর রাঁধাবাড়া-খাওয়া ও বিশ্রাম ওখানে। দক্ষিণপাড় হিন্দুদের—মানতের পাঁঠা বলি দিয়ে ঐ চালাঘরে প্রসাদ পায় তারা। পশ্চিমপাড়ের চালা খোপে খোপে ভাগ করা—বাইরের লোক এসে ঐসব আস্তানা নেয়। যে-কেউ এসে থাকতে পারে। দায় জানলে খোরাকি পাবে ফকিরবাড়ি থেকে—ফকিরের বড়বিবি মানুষ হিসাব করে চাল মেপে দিবেন। যেমন এসে উঠেছে কাবুলিওয়ালা—প্রতিবারই এসে এখানে আস্তানা নেয়। এমন জুত আর কোথা?

অমনি আসে তবলদারের দল। চার-পাঁচ দল এবারও এসেছে। উড়িষ্যা অঞ্চলের বাসিন্দা—দু'জনে এক-এক-দল। ভারী ওজনের কুড়াল ঘাড়ে নিয়ে আসে তারা—মুখের দিকটা সরু, ঐ ধরনের কুড়াল আমাদের কামারে গড়ে না। গাছম'লের এই মরশুমে খেজুররস জাল দেবার জন্য নিত্যিদিন বিস্তর কাঠের প্রয়োজন। আগাম টাকা দিয়ে ম'লদারে আম জাম তেঁতুল বাবলা ইত্যাদি কিনে রাখে। কেনা গাছ সঙ্গে সঙ্গে কাটে না, যেমন আছে রেখে দেয়। কাটা ও চেলা করা এইবারে—পোড়ানোর এই প্রয়োজনের সময়। সে কাজ তবলদারে করে, জনমজুর দিয়ে এত তাড়াতাড়ি এমন পরিপাটি ভাবে হয় না।

আরও কত রকমের সব এসে আস্তানা গাড়ে! বর্ষা-অন্তে লক্ষ্মীমন্ত গৃহস্থরা এইবার ইট কাটবে, দালান-কোঠার ভিত কাটবে—সুদূর পশ্চিমঅঞ্চল থেকে ইট-কাটা কুলিরা এসে ফকিরবাড়ির দাওয়ায় গাছতলায় ঘাটের পাকা-চাতালে যে যেখানে পারে ঠাঁই নিয়ে নেয়। রাজঘাটের রাজমিস্ত্রিরা পাটা-কর্নিক নিয়ে এসে পড়ে। কপোতাক্ষ-পারের করাতিয়ার দল আসে মস্তবড় করাত দু-তিন জনে কাঁধের উপর নিয়ে। ভরা মরশুমে চাষী এখন তো পয়সার স্রোতে ভাসছে, নানা রকমের মতলব মাথার মধ্যে চাড়া দিয়ে ওঠে। কোন-একটা মতলব ফেঁদেছে—ফকিরবাড়ি গিয়ে দেখবে, সেই কাজের কারিগর এসেছে কিনা। না এলেও এসে যাবে দু-পাঁচ দিনের মধ্যে—বরাবরই আসে, ভাবনা নেই।

গঞ্জে সাহামশায়দের গুদামে দু-গাড়ি পাট তুলে দেওয়া ইস্তক চৈতন্য জোড়লের

মনে অস্বস্তি হয়েছে—মেঝের মাটির উপর শোওয়া ঠিক হচ্ছে না। ঠাণ্ডা লাগে, তা ছাড়া সাপখোপের ভয় তো আছেই। বুড়ো কাঁঠালগাছটায় কাঁঠাল ধরা অনেক কাল বন্ধ—গাছটা চেরাই-ফাড়াই করে তক্তপোষ বানানো যাক। গেল সে ফকিরবাড়ি—করাতি এনে লাগিয়ে দিল। গাঁ-গ্রামে গাছ কেটে তক্তা বানানোও মচ্ছব বিশেষ, দেখার জন্য লোক আসে। খবর শুনে কমল বিকেলের পাঠশালা সেরে বইদপ্তর ছুঁড়ে দিয়ে মোড়লপাড়া ছুটল।

উপরের মানুষটা, দেখ দেখ, করাত টেনে উপরে নিয়ে তুলছে, নিচের মানুষ দুটো টেনে আবার নিচে নামাচ্ছে। আবার উপরে তোলে, আবার নিচে নামায়। পেটের ভিতর সেঁধিয়ে গেছে করাত, বিতিকিচ্ছি টানা-হেঁচড়া চলছে—আহা, বুড়ো গাছের কী দুর্গতি! টানে টানে কাঠের গুঁড়োর বৃষ্টি হচ্ছে, গুঁড়ির গায়ে তক্তারা সব হাঁ হয়ে পড়ছে। করাতিদের দিব্যি নাচের তাল। করাত উপরে ওঠার সঙ্গে নিচের মানুষজোড়া এগোচ্ছে, উপরের মানুষের হাতজোড়া মাথার দু-দিক দিয়ে উঠে যাচ্ছে। তারপর নামে করাত নিচে, মাটির লোক দুটো পায়ে পায়ে পিছিয়ে যায়।

উপরের করাতি কাতর হয়ে পড়েছে, জিরিয়ে নেবে বলে নেমে পড়ল। করাত টেনে টেনে হাতের ডানা খালি লেগেছে, শীতকালে ঘাম দেখা দিয়েছে, ঘামের সঙ্গে কাঠের গুঁড়ো সর্বাঙ্গে লেপটে গেছে—এই সমস্ত বলছে। অনতিদূরে পুকুর, পুকুরে নেমে অঞ্জলি ভরে খুব খানিকটা জল খেয়ে নিল। গামছার বাড়ি দিয়ে গা ঝাড়ছে। কমলের মজা—কাজ বন্ধ তো কোমরের কাপড়ে কোঁচড় বানিয়ে দেদার কাঠের গুঁড়ো তুলে নিচ্ছে। গুঁড়োর কতক হলদে, কতক বা রাঙা। দুলর্ভ ঐশ্বর্য—পুঁটি ও অন্যদের তাক লাগিয়ে দেবে।

বিনো এসে পড়ল এতদূর অবধি। বিষম ডাকাডাকি: চলে এসো খোকন। ইস্কুল থেকে গিয়ে খাওয়া নেই দাওয়া নেই—এত কি দেখবার এখানে?

কী দেখবার আছে, উনি ভেবে পান না। কমল তো চোখ ফেরাতে পারে না। ঘসর-ঘসর ঘ্যাস-ঘ্যাস করে করাত পুরোদমে লেগে গেল আবার। প্যাঁচে প্যাঁচে গুঁড়ো ছিটকে পড়ছে। কাঁঠালগাছ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ছে। আশপাশের গাছপালা সব স্তম্ভিত হয়ে আছে। না-জানি কখন ওদের পালা আসে—ভয় হচ্ছে নিশ্চয় খুব। একটা ডালে কাঠবিড়ালি ছুটতে ছুটতে দাঁড়িয়ে পড়ল—বুড়ো কাঁটালগাছের দুর্গতি দেখছে?

॥ তেত্রিশ ॥

বিষ্যুৎবার আজ, হাটবার—খেয়াল আছে? রবি মঙ্গল বিষ্যুৎ—হপ্তায় তিনদিন হাট। খেয়াল না থাকলে অন্যেরাই খেয়াল করিয়ে দেবে। হাট শুধু কেনা-বেচার জন্য নয়—পাওনাআদায়, ধার-দেনা শোধ, দশগ্রামের লোকের দেখা-সাক্ষাতের জায়গা। বিষ্যুতের হাটকে বলে চারের হাট, এর পরের হাট যেহেতু চারদিনের মাথায়—রবিবারে। চারের হাট বলেই কদরটা বেশি। পয়সার খাঁকতি যতই থাক, একবারে ঢুঁ মেরে আসতেই হবে—আজকের হাট কামাই দেওয়া চলবে না।

সন্ধ্যার সামান্য বাকি। দাওয়া থেকে শশধর দত্ত হাটের পথে তাকিয়ে লোক-চলাচল দেখছেন, আর ভুড়ুক ভুড়ুক হুঁকো টানছেন। নিশি ঘরামি ঘরের মটকা সেরে দিয়েছিল—

এরাই কেবল আসে, দুপুর থেকে চার-পাঁচজন হয়ে গেল। যাদের কাছে শশধর পাবেন, নজর এড়িয়ে তারা জঙ্গল ভেঙে হাটে চলে যায়।

নিশিকে শশধর বলে দিলেন, হাটে যাও ঘরামি। সেখানে পাবে।

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে নিশি বলল, আপনি আবার সকল হাটে যাও না দত্তমশায়—

শশধর খিঁচিয়ে উঠলেন: আমি না যাই, নারাণ তো যাবে। তোর পাওনা আটকাচ্ছে কিসে?

এস্টেম মোড়ল বেগুনক্ষেতের বেড়া ঘিরেছিল, একবেলার জোনের দাম পাবে। তাকেও হাটের কথা বলে দিলেন। যতীন নাথের ক্ষেতের ফু-সের হলুদ এসেছে—তাকে বললেন, আজ হবে না বাপু, সামনের হাটে। কালু গাছি এক কলসি খেজুরগুড় দিয়েছিল—শশধর বললেন, ঢেঁকি গড়তে তুমিও আমার বাবলাগাছ নিয়েছ কালু। দাম সাব্যস্ত হয়ে কাটাকাটি হবে, তবে তো। আর একদিন এসো নিরিবিলি সময়ে।

কালু বলে, কবে?

এসো দিন পাঁচ-সাত পরে। ভিটে ছেড়ে পালাব না রে বাপু, ভয় কিসের?

উত্তরবাড়ির যজ্ঞেশ্বরকে দেখতে পেয়ে: কে যায়—যজ্ঞি না? কবে বাড়ি এয়েছ, দেখতে পাইনি তো।

এতক্ষণে এই একজন—শশধর যাঁর কাছে টাকা পাবেন। সমাদরে আহ্বান করেছেন : উঠে এসো যজ্ঞি, তামাক খাওসে এসে।

হুঁকো হাতে নিয়ে আসল কথাটা যজ্ঞেশ্বর নিজেই তুলে দিলেন : ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপের ইট নিয়েছিলাম, দাম কিছু বাকি রয়ে গেছে। এবারে শোধবোধ করে দিয়ে যাব। আর যা বলতে এসেছি দত্তজা মশাই, থাউকো একটা দর ঠিক করে ভাঙা মণ্ডপ সম্পূর্ণ দিয়ে দাও আমায়। ইটগুলো নিয়ে গিয়ে পাকা দেয়ালের একটা ঘর তুলব। তোমারও অতখানি জায়গা জঙ্গল হয়ে সাপ-পোকের বাতাস হয়ে পড়ে আছে, সাফসাফাই হয়ে যাবে। কিছু না হোক, কলা-কচু রুয়ে দিলেও সংসারের কত আসান।

কথার মধ্যে মেঘা কর্মকার এসে পড়ল। নাছোড়বান্দা তাগিদদার। আবার দত্তমশায়ও যেমনি—যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল—মেঘার ব্যাপারে তিনি যেন বেশি রকম কঞ্জুষ। সেই কবে আষাঢ় মাসে পোয়াল-কাটা বঁটি গড়ে দিয়েছিল—তিন কিস্তিতে খানিক খানিক শোধ হয়ে অদ্যাপি ছয় আনার পয়সা বাকি; এসে দাঁড়াতেই শশধর মাথা নেড়ে দিলেন : আজ কিছু হবে না মেঘনাথ, মেল্য জনকে দিতে হল। রবিবারের হাটেও না। মঙ্গলবারে আসিস—দেখব।

মেঘা প্রায় হাহাকার করে উঠল : হাতে-গাঁটে সিকিপয়সা নেই দত্তমশায়। চারে হাট কামাই গেলে সগোষ্ঠি খাব কি ?

শশধর অবিশ্বাসের সুরে বললেন, হ্যাঁ তোর আবার পয়সার অভাব। মরশুমে এত যে লোহা পেটালি—পয়সা যায় কোথা ?

মেঘা বলে, খরচাও যে তেমনি। চারগণ্ডা মুখ সংসারে—মানুষ বলি নে দত্তমশায়, মুখ ধরে ধরে আমার হিসেব। তিন বেলায় ধরুন তিন-চারে বারো-গণ্ডা মুখ আমায় ভরে যেতে হয়। আর সে কি আপনাদের ঘরের মুখ ? এক একজনে যা ভাত টানে—চোখ দিতে নেই দত্তমশায়, কিন্তু আপনার চারকুড়ি বয়স হতে চলল—আমার চার বছুরে মেয়েটার সঙ্গেও আপনি ভাত খেয়ে পারবেন না।

অনেক টানাহেঁচড়ার পর চারআনা আদায় নিয়ে মেঘা কর্মকার বিদায় হল। শশধরের ছোটছেলে নারায়ণদাস এসে পড়েছিল, দাঁড়িয়ে গেছে। হাটে যেতে হবে তাকেই। এদের সামনে শশধর কদাপি হাটের পয়সা বের করে তার হাতে দেবেন না। বিরক্ত হয়ে সে ঘড়ি দেখে এল। একলা মেঘার সঙ্গেই সময় লেগেছে ঠিক বাইশ মিনিট। শেষ পর্যন্ত দুই আনার জন্য যেন মরণ-বাঁচন। শশধর দেবেন না, মেঘা কর্মকারও না নিয়ে যাবে না। কে

কতদূর কাতরোক্তি করতে পারে, তারই প্রতিযোগিতা। বৃদ্ধ শশধরেরই জিত, ছ-আনা বাকি রেখে মেথরকে চলে যেতে হল।

নারায়ণদাস কিছুটা রগচটা। গজর গজর করছে: পাওনাগণ্ডা সেই সেই দিতে হবে—ফেলে দিলেই চুকে যায়। মানুষকে অকারণ ঘোরানো আমি পছন্দ করি নে।

শশধর বলেন, তুমি হলে কি করতে?

ছ-আনার পয়সা ফেলে দিতাম সঙ্গে সঙ্গে। আধ মিনিটে কাজ হয়ে যেত।

তবেই হয়েছে। শশধর বক্রহাসি হাসলেন: মানুষ হল লক্ষ্মী। গৃহস্থবাড়ি মানুষজন আসবে, যাবে, বসবে গল্পগাছা করবে, তামাক খাবে—আসা যাওয়ার উনি কাজ চুকিয়ে বিদেয় করে দিলেন! বলি, টাকাপয়সা শোধ হলে লেনদেন চুকেবুকে গেলে মানুষ আর আসবে তোমার বাড়ি?

আসবে না-ই তো। হাতে টাকা না থাকত, আলাদা কথা। কলকাতা থেকে পরশুদিন দাদার টাকা এসেছে—ন্যায্য পাওনা আটকে রেখে মানুষকে হয়রান করার আমি মানে বুঝতে পারি নে।

শশধর রেগে যান। যজ্ঞেশ্বরকে বললেন, মানে বোঝো না—বুঝিয়ে দাও হে যজ্ঞি। এমনি করে বাবুরা সংসারধর্ম করবেন। মানুষজন ওদের উঠোনে ইয়ে করতেও আসবে না, জঙ্গল ঢেকে উঠবে। থাকিস সেই জঙ্গলের পশু-পক্ষী হয়ে। আমি যে ক'টা দিন আছি, সে জিনিস হতে দিচ্ছি নে।

বাপের বকুনি খেয়ে নারায়ণদাস যজ্ঞেশ্বরকে মধ্যস্থ মানে: দেখুন না কাকা, পয়সা রয়েছে—লোকটাকে তবু মিছামিছি ঘোরানো। ওর হয়তো বড্ড দরকার আজকে। আমি তো জানি, গরজের মুখে পেলে যাতায়াত ভালবাসা-বাসি বেশি করে বাড়ে। বাবা তা বোঝেন না।

না রে বাবা, না—

যজ্ঞেশ্বরও বোঝেন না, দেখা যাচ্ছে। তিনি শশধরের দলে। উদাস-পারা নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, সংসারে কেউ কারো নয়, সবাই পাকসাট মারার তালে আছে—আপন বউ-ছেলে পর্যন্ত, অন্যে পরে কা কথা। কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরোলে পাজি। খাতির-ভালবাসা আদায় করবে তো বাঁধন-কষন ঢিলা হাতে দিও না। ফাঁক পেয়েছে কি, দড়ি-ছেঁড়া গরুর মতো মানুষেরও পাত্তা মিলবে না।

অটলকে নিয়ে ভবনাথ বিকেলই হাটে চলে গেছেন। কৃষ্ণময় আছে, তাকে

পাঠাতে ভবনাথ নারাজ, তার কেনাকাটা পছন্দ নয়। শহুরে থাকে, ছেলের মেজাজ আলাদা। কইমাছের কুড়ি চার আনা চাইল তো দরদাম নেই—টুক করে আস্ত সিকিটা ছুঁড়ে দিল ডালির ওপর—যে মাছের কুড়ি দু-আনা দশ পয়সার বেশি কিছুতেই হয় না। কুড়ি যে চব্বিশটায় এবং তদুপরি দুটো ফাউ—এই সামান্য ব্যাপারটাও জানা নেই ওদের। কুড়ির বেশি একুশ দিতে গেলেই হাঁ-হাঁ করে ওঠে: কুড়ি পুরে গেছে পাড়ুইমশায়। জেলে পর্যন্ত অবাক হয়ে যায়। কৃষ্ণময় তাই যেতে চাইলেও ভবনাথ না-না—করে নিজে বেরিয়ে পড়লেন।

ভটচায্যি-বাড়ির গোবরা এলো কৃষ্ণময়ের কাছে। প্রায়ই সে আসে, এসে ভুটুর-ভুটুর করে। গোপাল ভটচায ছেলের একটা চাকরির জন্য কেষ্টকে বড্ড ধরেছেন। দুর্মূল্যের বাজার—যজন-যাজন এবং পিতৃপুরুষের রেখে-যাওয়া সামান্য সম্পত্তিতে আর চলবার উপায় নেই। গোবরার হস্তাক্ষরটি খাসা। কিছু না হোক, একটা মুহুরির কাজ জুটিয়ে দাও বাবাজি। জমিদারি এস্টেটের মুহুরি কিংবা আদালতে উকিল বা মোক্তারের মুহুরি। টেবিলের সামনে হোক কিংবা হাতবাক্সের সামনে হোক, কোন এক জায়গায় বসতে পারলে হল। দেবনাথ বাড়ি আসবে শুনছি—এলে তাকেও বলব।

কৃষ্ণময়ই বা গ্রামবাসীর কাছে কেন খাটো হতে যাবে? অবহেলার ভঙ্গিতে বলল, মুহুরিগিরির জন্য কাকামশায় অবধি যেতে হবে কেন? আপনাদের আশীর্বাদে ওটুকু আমার দ্বারাই হবে।, যাচ্ছিই তো, গিয়ে খবরাখবর নিয়ে পত্তর লিখব, গোবরাকে পাঠিয়ে দেবেন।

যাওয়ার কথাটা গোপালের তত প্রত্যয়ে আসছে না—সন্দেহ বুঝে কৃষ্ণময় জোর দিয়ে আবার বলল, খুব তাড়াতাড়ি যাব। এদ্দিন কবে চলে যেতাম, তা যেন নানান বাগড়া পড়ে যাচ্ছে।

গোপাল টিপে দিয়ে থাকবেন, গোবরা ইদানীং যখন তখন আসে। জমিয়ে ফেলেছে কৃষ্ণময়ের সঙ্গে। জমিদারি সেরেস্তার কথা, এবং কলকাতা শহরের কথা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে শোনে।

শীতকালে এখন লোকের হাতে গাঁটে পয়সা—বিশেষ করে গোলায় আউড়িতে কলসিতে যত্রতত্র ধান। গামালে বেরুনোর এই হল প্রশস্ত সময়। দীর্ঘদিন গামালের কাজ করে করে যদুনাথ ঘাগি হয়ে গেছে। যদুনাথ মণ্ডল, বলাইয়ের বাপ—থিয়েটারে নিয়তির পার্টে নাম করেছিল যে বলাই। যদুনাথ খাটছে খুব, এই ক'টা মাসে যদ্দূর গুছিয়ে নিতে পারে। কাঁধে শিকে-বাঁক

ঝুলিয়ে ঝুড়ি ও বস্তা নিয়ে বেরোয়। বাঁকায় গিন্নিপছন্দ বউপছন্দ বাচ্চাপছন্দ রকমারি জিনিসপত্র, যথা—তরলআলতা, গন্ধতেল, আয়না, চিরুনি, চুলের কাঁটা-ফিতে, ঠাকুর-দেবতার পট, সিঁদুর, কাচের চুড়ি, পুঁতির মালা, কড়ে-পুতুল, বাঁশী, রূপছবি ইত্যাদি। মতিহারি-তামাক এবং পান-সুপারি অতিঅবশ্য চাষী-বাড়ি গিয়ে ওঠে, মরদরা যে সময়টা বাড়ি থাকে না—মাঠে অথবা গঞ্জে চলে গেছে। মেয়েলোক খদ্দের। তাদের নিয়ে ঝামেলা বেশি, মজাও বেশি। অনেক বাছাবাছির পর জিনিস পছন্দ হল তো তখন দরদাম নিয়ে কথাকথি। ধৈর্য হারালে হবে না—খুব খানিকটা দরাদরির পর 'মরে গেলাম' 'বিষম ক্ষতি হয়ে গেল' ইত্যাদি কাতরোক্তি শোনাতে শোনাতে রাজি হয়ে যায় যদুনাথ। সত্যিই যে দামে মাল যাচ্ছে, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ত্রিভুবনের কোথাও ঐ দামে কেউ দেবে না। কিন্তু যদুনাথ দিচ্ছে—যেহেতু দাম-শোধ নগদ পয়সায় নয়। চাষী-পাড়ায় ক'টাই বা রানী-রাজকন্যা আছে, ঝড়াক করে যারা নগদ বের করবার ক্ষমতা রাখে। ধান দিয়ে শোধ করবে। আর, ধানের যে কোন দাম আছে, মেয়েলোকের হুঁশ থাকে না এই ধান-কাটার মরশুমে। ছ-আনা দাম সাব্যস্ত হয়েছে—যদু মণ্ডল পালি ভরা ধান বস্তার মধ্যে ঢেলে দিল। বাড়ির গিন্নি সতর্ক করে দেয়: দেয্য যা, তার বেশি নিও না কিন্তু মোড়ল। পাছ-দুয়োর দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ো বাড়ির মানুষ এসে পড়বার আগে।

স্ফূর্তিতে যদুনাথ বাড়ির পর বাড়ি ঘুরছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। আজ এই পর্যন্ত থাক—এবারে বাড়ি ফেরা। বিক্রি ঢের হয়েছে—জিনিস যা ফেরত যাচ্ছে, নিতান্ত নগণ্য। বাঁকের দু'দিকেই বস্তা এখন ধানে বোঝাই। ধানের ভারে বাঁকের দুই মাথা ধনুকের মতো নুয়ে পড়েছে। এই বিপুল বোঝা আসাননগরেরও আগে থেকে শুকনো বিল ভেঙে বয়ে আনছে। বুড়ো হয়ে পড়েছে, সেটা বেশ মালুম হচ্ছে যদুনাথের। পা চলতে চায় না—মনের স্ফূর্তিই যেন চাবুক মারতে মারতে ক্রোশের পর ক্রোশ নিয়ে আসছে।

বাড়িতে বলাই রান্নাবান্না করে। রেঁধে ঢাকা দিয়ে রাখে, বাপ এলে দু'জনে পাশাপাশি বসে খায়। বেলা পড়ে আসে, এখনও দেখা নেই আজ। ক্ষিধের পেট চোঁ-চোঁ করছে। সামান্য দূরে বিল—বিলের ধারে চলে গেল বলাই। শুকনোর সময় এখন পায়ে পায়ে পথ পড়েছে ঊ ই বটগাছ অবধি। সেখান থেকে ডাইনে মোড় নিয়ে আরও খানিকটা গিয়ে আসাননগর।

যদুনাথকে দেখা যায় না। বলাই বিলে নেমে পড়ল। তিন-চারটে মানুষ—হাটুরে মানুষ তারা—গঞ্জে হাটে যাচ্ছে। হন্তদন্ত হয়ে এসে তারা খবর দিল, যদুনাথ অজ্ঞান হয়ে বিলের মাঝে পড়ে আছে, বাঁকের বোঝা পাশে গড়াচ্ছে।

রোদ্দুরে ঝিমঝিমি লেগেছে—অত বোঝা বয়ে আনা যদুনাথের মতো মানুষের পক্ষে কঠিন বটে।

বলাই পাগল হয়ে ছুটল। পাড়াপড়শি আরও সব যাচ্ছে। আশাননগরের দিক থেকেও লোক এসে পড়েছে। নাড়ি ধুক-ধুক করছে, সম্বিৎ নেই, ডাকলে সাড়া দেয় না। কী করে এখন বাড়ি অবধি নেওয়া যায়? গরুর-গাড়ি একটা ঠেলতে ঠেলতে এনে যদুনাথকে তার উপরে শোয়াল। গাড়ি নিজেরাই টানে। টানছে সতর্ক ভাবে, তা হলেও বিলের পথে ধাকাধুক্তি ঠেকানো যায় না। ধনঞ্জয় কবিরাজ যদুনাথের উঠানে দাঁড়িয়ে আছেন, নাড়িতে আঙুল ঠেকিয়ে তিনি মুখ বাঁকালেন। কিছুই করবার নেই, প্রাণপাখী খাঁচা-ছাড়া।

বাপের উপর-বলাইয়ের অতিমাত্রায় ভালবাসা—সংসারে বাপ ছাড়া কে-ই বা ছিল? চলে গেলেন তিনি—রোগ না পীড়া না, একরকম অপঘাতেই যাওয়া। কান্নাকাটি করছে বলাই খুব।

সেই সঙ্গে আবার বাপের শ্রাদ্ধশান্তি নিয়ে উদ্বেগ। ভটচাযি্য-বাড়ির গোপাল ভটচাযিমশায়কে ধরল: ইহলোকে যা হবার হল—পরলোকে বাবা যাতে ভাল থাকেন, তার উচিত ব্যবস্থা দেন ঠাকুরমশায়। তা-ই আমি করব, বাবার কাজে খুঁত থাকতে দেব না। বৃষোৎসর্গ বিধেয়, গোপাল বললেন। চিরকুটের উপর লাল কালিতে লিখেও দিলেন ব্যবস্থা: মৃত ব্যক্তির প্রেতত্ব-বিমুক্তি পূর্বক স্বর্গলোক গমন-কামনায় সমর্থ পক্ষে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ আবশ্যক। বৃষোৎসর্গ চারিটি বৎসতরীর সহিত কর্তব্য। অপ্রাপ্তিতে দুইটি, অন্ততপক্ষে একটিতেও হইতে পারে। পুরুষের উদ্দেশ্যে বৃষোৎসর্গ হইলে দক্ষিণা স্বরূপ বৃষ দেয়…

লাও ঠেলা। কিন্তু বলাই দমে নি, চিরকুট জনে-জনের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। সবাই বলাইকে ভালবাসে—বিশেষ করে সেই সেবারে নিয়তি সাজার পর থেকে। গুরুদশার বেশে সুদর্শন কিশোর ছেলে, হাতে কঞ্চির নড়ি—গ্রামবাসীর কাছে গিয়ে বলছে, গলার ধড়া যাতে নামতে পারি সেই ব্যবস্থা আপনারা দশজনে করে দিন। লোকে দিচ্ছেও দু আনা, চার আনা করে, তার বেশি সামার্থ্য কোথায়? হারু মিত্তির কাঁধে বয়ে রিহার্সালে নিয়ে যেত, তার সঙ্গে বেশি খাতির। হারুর কাছে মনোদুঃখে বলল, পাড়া ধরে চষে ফেললাম হারুদা, টাকা চারেকের বেশি উঠল কই? অথচ করতে হবে বৃষোৎসর্গ, ভটচাযি্য মশায়ের ব্যবস্থা—

হারু তো অবাক: আস্থা দেখে বাঁচিনে তোর বলাই। বৃষোৎসর্গে যা খরচ, তাতে একজোড়া মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। ক'জনে পারে—তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধই পেরে ওঠে না এ বাজারে—

বলাই মাথোড়বান্দা : বাবা আমার নিত্যিদিন মরতে যাবেন না, শ্রাদ্ধ একবারই করছি। প্রেতলোক পাশ কাটিয়ে সোজা স্বর্গধামে চলে যাবেন তিনি। গোপাল ভটচায্যি যে ব্যবস্থা দিয়েছেন, অক্ষরে অক্ষরে আমি তাই করব। নিজের গাঁয়ে না হলে খড়া-গলায় বাইরের দশটা গাঁয়ে ভিক্ষে করে বেড়াব—

তার পরে মোক্ষম ঘা দেবার অভিপ্রায়ে বলল, দশ গাঁ লাগবে না, রাজীবপুর যাব। ঐ এক জায়গা থেকেই সব যোগাড় হয়ে যাবে।

হারু মিত্তির স্তম্ভিত হয়ে বলে, সোনাখড়ির মানুষ হয়ে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে রাজীবপুর যাবি—পারবি যেতে?

বলাই বলে, বাবার কাজে দরকার হলে নরকেও যেতে পারি। থিয়েটারে পাঠ নেবার জন্য রাজীবপুরের ওরা কতবার ঝুলোঝুলি করেছিল—বাবা হাঁকিয়ে দিত।

মাদার ঘোষ কোন দরকারে বাড়ি এসেছেন একদিন-দু'দিনের জন্য। বলাইকে নিয়ে হারু তাঁর কাছে গেল। মাদার বললেন, খবর পেয়েছি সব, বাপ-বেটার ছিলি তো বেশ ভাল—আচমকা যদু এই রকম ভাবে চলে গেল। তারপর, শ্রাদ্ধশান্তির কি হচ্ছে?

হারু বলল, সেই জন্যেই তো আপনার কাছে আসা।

মাদার ঘোষ বিনাবাক্যে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে দিলেন। বলাইকে বললেন, পিতৃদায় সকলকে বল গিয়ে, সবাই তোকে ভালবাসে।

হারু বলল, গিয়েছিল ক'জায়গায়। দু'আনা চারআনা করে দেয়, তাতে আর কত এগোবে। অন্নজল কি তিলকাঞ্চন নয়—গোপালঠাকুর মশায়ের কাছ থেকে ব্যবস্থা এনেছে, বৃষোৎসর্গ।

করবে তাই। মাদার ঘোষ এককথায় রায় দিয়ে দিলেন: মনে যখন ইচ্ছে জেগেছে, আলবৎ করবে। কত যোগাড় হল রে?

বলাই বলল, বারো-তেরো টাকার মতো হয়েছে আপনার এই পাঁচ টাকা ধরে।

মাদার পুনশ্চ পাঁচ টাকা বের করে দিলেন। হারু বলে, মবলগ টাকার দরকার—বিশ-পঁচিশ-ত্রিশে কি হবে?

হবে, হবে—। মাদার বললেন। যাদের টাকা-পয়সা নেই, তাদের বাপ-মায়ের কাজ হবে না বুঝি? ব্যবস্থা সব রকমের আছে—আমিরি ব্যবস্থা আছে, ফকিরি ব্যবস্থাও আছে। ঘাবড়াবার কিছু নেই। কলকাতায় চলে যা বলাই; কালীঘাটে গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধ করবি। মহাতীর্থ কালীঘাট—একান্ন পীঠস্থানের

একটা। আদি গঙ্গা মানে আসল যে গঙ্গা, তার উপরে। বুঝোবোঝাই হল—সোনাখড়ির চেয়ে অনেক ভাল হবে। দত্তবাড়ির কালিদাস আছে, স-ই সব বন্দোবস্ত করে দেবে। থিয়েটারপাগলা মানুষ, তোর কথা মনে আছে তার। আমিও না-হয় একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটা হারুরও খুব মনে ধরল: সেই ভাল, চলে যা কলকাতায়। কালিঘাটে খরচা কম, কাজের দিক দিয়ে একেবারে ফাস্টোকেলাস।

বলাই রাজি, খুব রাজি। কিন্তু যাবে কার সঙ্গে? গাঁয়ের বার হয়নি কোনদিন—বড় শহরে একা একা যাওয়া ভরসায় কুলোয় না। পুববাড়ির কৃষ্ণময় যাবে শোনা যাচ্ছে, গোপাল ঠাকুরমশায় দিনক্ষণও নাকি দেখে নিয়েছেন।

বলাই বলল, যাই, তারিখটা তবে সঠিক জেনে আসি।

মাদার বললেন, তারিখ জানলেই হবে না রে। এব আগে কতবার যাত্রা ভেঙেছে, তা-ও জেনে আসবি।

বোকা-বোকা মুখে বলাই তাকিয়ে পড়ল। হারু বুঝিয়ে দেয়: বার চারেক অন্তত যাত্রা না ভেঙে কেষ্টদা'র যাওয়া হয় না। ওটা এখন নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে, সবাই জানে।

মাদার বললেন, কেষ্ট কলকাতায় যেতে যেতে তোর বাপের শ্রাদ্ধের মেয়াদ পার হয়ে যাবে। বছর পুরলে সপিণ্ডিকরণ—কেষ্টর সঙ্গে যদি যাস, সেই কাজটাই হতে পারবে।

সমাধান মাদারই করে দিলেন: কাল না হলেও পরশুদিন সদরে নিশ্চয় ফিরব। আমার সঙ্গে চল্। ওখান থেকে লোকে হরবখত কলকাতা যাচ্ছে—হাইকোর্টে মামলা করতে যায়, বাজার সওদা করতে যায়। তাদেরই এক-জনের সঙ্গে জুটিয়ে দেব। শিয়ালদহে নেমে হ্যারিসন রোডের মুখেই কালিদাসের মেস—মেসে তোকে তুলে দিয়ে আসে, তেমনি ব্যবস্থা করে দেব

।। চৌত্রিশ ।।

ঝাঁকড়া-মাকড়া চুল, খালি পা, হাতে কঞ্চির নড়ি, পরনে খাটো থান; গায়ে কম্বল জড়ানো—বলাই কালিদাসের মেসের ঘরে ঢুকল। যে লোকটা বাসা চিনিয়ে এসেছে, পৌঁছে দিয়ে সে চলে গেল। কালিদাস তেল মাখছে—স্নান করে খেয়ে অফিসে যাবে।

কিছু বিস্মিত হয়ে সে বলল, কি খবর বলাই, কোত্থেকে ?

মুখে কিছু না বলে বলাই কম্বল মোচন করল। কাঁধের ধড়া বেরিয়ে পড়ল। গুরুদশার মধ্যে নাকি অপদেবতার উৎপাতের আশঙ্কা। উৎপাত এড়াতে লোহা অঙ্গে রাখতে হয়। ধড়ায় সে জন্য একটা লোহার চাবি বাঁধা।

কালিদাস বলে, খবর পাইনি তো। কবে গেলেন তোর বাবা, কি হয়েছিল ?

বলাই মাদার ঘোষের চিঠি বের করে দিল। আদ্যোপান্ত পড়া শেষ করে কালিদাস বলল, হুঁ। তা দাঁড়িয়ে কেন, বোস। গুরুদশায় বুঝি কাঠের উপর বসা চলবে না, কুশাসন চাই। মেসে কি আর কুশাসন আছে দেখি—

'রঘু' 'রঘু' করে ভৃত্যকে ডাকতে লাগল। বলাই বলে, আসন কি হবে ? ঝকঝকে পাকা মেঝে—এখানেই বসে পড়ি। নতুনবাড়ির বাবু আপনার কাছে পাঠালেন, ধড়া নামিয়ে দিতে হবে।

নিশ্চয়, নিশ্চয়। ধড়া কিছু চিরকাল কাঁধে রাখবার জিনিস নয়—সকলে নামায়, তুইও নামাবি ঠিক।

চিঠিখানায় আর একবার চোখ বুলিয়ে কালিদাস বলল, বৃষোৎসর্গ করতে চাস,নইলে তৃপ্তি হবে না। তা যোগাড় করলি কত ?

সলজ্জে বলাই বলে, টাকা কুড়ির মত জুটিয়েছিলাম অনেক কষ্টে, তার থেকেও তো রাহা-খরচ আড়াই টাকা গেল।

কালিদাস বলে, ফেরত যাবার খরচা আছে। তাছাড়া কলকাতা থেকে একেবারে শুধু-হাতে ফিরতে পারবিনে, এটা-ওটা কিনতে হবে। তার জন্যেও ধরে রাখ চার-পাঁচ টাকা।

মুহূর্তে বলাইয়ের মনে এল, ফেরত যাবার কথা কেন ? বাবা গেছেন— সোনাখড়িতে কোন্ বন্ধন আছে যে ফেরত আমাকে যেতেই হবে ? সেবারে তো মেলা লম্বা লম্বা কথা—আপিসের বেয়ারা করে নেবেন, আপিসের থিয়েটারে পাঠ দেবেন—

কথাগুলো চকিতে বলাইয়ের মনে খেলে গেল। থাক সেসব। কালিদাস চুপচাপ, কী যেন ভাবছে। টাকার অঙ্ক শুনে মুখ না ফেরায়। সকাতরে বলাই বলে, ওর বেশি আর যোগাড় হল না বাবু। বড্ড আশা নিয়ে এসেছি আপনার কাছে।

কালিদাস বলে, এসে ভালই তো করেছিস। গ্রামবাসী হিসেবে আমিও কিছু দেব। হরে দরে টাকা পনেরো নিট থাকছে। পনের টাকায় বৃষোৎসর্গ কি বলিস, দানসাগর পর্যন্ত করিয়ে দিতে পারি। মহারাজ নবকৃষ্ণর মায়ের

বেলা-ব্যবসাগর হয়েছিল, আবার সোনাখড়ির যদুনাথের বেলাও জলস্থল-এর নাম কলকাতা শহর, বন্দোবস্তে এখানে কি না হয়? আপিসের কিরকম আসে কালীঘাট থেকে—মুরুব্বি কাকে ধবি, আমি ভাবছিলাম।

মেসের খাওয়া বলাই খাবে না, হুঁশ হল সেটা। বলে, হবিষ্যি করবি তো তুই—মালশা পোড়াবি?

গুরুদশার সময় নতুন মালসায় স্বপাকে শুদ্ধাচারে ক্যানসা-ভাত রেঁধে একবেলা খাওয়ার বিধি। খাওয়ার পরে মালসা ফেলে দেয়। একে মালসা-পোড়ানো বলে। বলাই বলল, মালসা না পোড়ালেও হবে। বিদেশে অতশত লাগে না—ভটচাযি্য ঠাকুরমশায় বলে দিয়েছেন। আতপচালের চাট্টি ক্যানসা-ভাত হলেই চলে যাবে।

কী জন্যে? আমাদের কলকাতায় কোনটা মেলে না শুনি? নিয়মমতর মালসাই পোড়াবি তুই। রঘুকে বলে যাচ্ছি, মালসা সৈন্ধবনুন আতপচাল কাঁচকলা—যা যা লাগে সমস্ত এনে গুছিয়ে দেবে। বারান্দায় ঐখানে তিনখানা ইট পেতে উনুন করে চাট্টি ঘুঁটে নিবি, ব্যস। হবিষ্যির পর, কম্বল বের করে দিয়ে যাচ্ছি—টান টান শুয়ে পড়বি। আপিস থেকে সকাল সকাল ফিরব, ফিরে এসে তোকে কালীঘাট নিয়ে যাব।

অফিসের ইন্দু হালদারকে কালিদাস বলে রেখেছিল—সন্ধ্যার পর বলাইকে নিয়ে হালদারপাড়া রোডে তার বাড়িতে গেল। ইন্দু তৈরি হয়ে আছে, চটিজোড়া পায়ে ঢুকিয়ে ঘাটে নিয়ে চলল।

যেতে যেতে একবার জিজ্ঞাসা করে: খরচ-খরচা কি পরিমাণ?

বলাইয়ের আগেই কালিদাস জবাব দিয়ে দেয়। সম্বল সম্পূর্ণ প্রকাশ না করে কিছু হাতে রেখেই বলে, দশ টাকা—বড্ড বেশি তো বারো। তার উপরে কেটে ফেললেও উপায় নেই।

ইন্দু হালদার চুক-চুক করে: তাই তো হে, বাজারখানা যা পড়েছে—জিনিসপত্তোর সব মাগ্‌গি। এত কমে রাজি হবে, মনে তো হয় না।

কালিদাস বলে, হবে না তো তোমায় নিয়ে যাচ্ছি কেন? যাতে হয় তাই করবে। না হবার কি আছে, বুঝিনে। জিনিস মাগ্‌গি হোক যা-হোক, তাতে ঠাকুরমশায়দের কি? সবই তো ওঁদের কায়েমি ব্যবস্থা—গাঁটের একটি পয়সাও বের করতে হচ্ছে না। যা পাচ্ছেন ষোল আনা মুনাফা। দশ টাকার চুক্তি হলে মুনাফা পুরোপুরি ঐ দশ টাকাই।

ঘিঞ্জি গলি দিয়ে চলেছে—এমন সঙ্কীর্ণ, ছুটো মানুষ পাশাপাশি যাওয়া মুশকিল। ইন্দু এক খোলার-বাড়িতে নিয়ে তুলল। টানা লম্বা চালা সামনের

দিকে, ভিতরে উঠোন। এমনি বাড়ির ভিতরে এতখানি ফাঁকা জায়গা ধারণায় আসে না। জায়গা ফাঁকা রেখেছে শোভা-সৌন্দর্য বাড়াবার কারণে নয়—কাজের গরজে। শ্রাদ্ধ-কার্যালয়। আদিগঙ্গার ধারে ধারে আরও কয়েকটা কার্যালয় আছে এইরকম। উঠোনের ওদিকে পাশাপাশি চার বেদি—শ্রাদ্ধকর্মে বেদি লাগে, মাটি তুলে পাকাপাকি বেদি বানিয়ে রেখেছে। ব্যবস্থা পাইকারি—একই দিনের জন্য চার মক্কেল এলেও ফেরত যাবে না—পাশাপাশি চার শ্রাদ্ধকর্ম স্বচ্ছন্দে চলবে। উঠানের যজ্ঞডুমুর গাছে অনেকগুলো বাছুর বাঁধা—বৎসতরী, বৃষোৎসর্গের জন্য আবশ্যক। মোটের উপর উপকরণের কোন অঙ্গে খুঁত নেই। নির্ভাবনায় অতএব দেহত্যাগ করতে পারেন—এই বাড়ির ঠিকানাটা শ্রাদ্ধকারীদের দিয়ে যাবেন অতিঅবশ্য, আজেবাজে ঠগ-জোচ্চোরের খপ্পরে যাতে না পড়তে হয়। কথাবার্তা পাকা হবার পর, জরুরি ক্ষেত্রে দশ মিনিটে এখানে কর্মারম্ভ হতে পারবে—সর্বাংশে নিখুঁত, ষোলআনা শাস্ত্রসম্মত শ্রাদ্ধ। অবিশ্বাস করেন তো মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত এনে আসরে বসিয়ে দিন। মন্ত্রপাঠ স্বকর্ণে শুনবেন তিনি, কাজকর্ম দেখবেন, নির্ঘাৎ তার পরে শতকণ্ঠে সাধুবাদ করবেন।

ইন্দু হালদার উঠানে দাঁড়িয়ে ডাক দিল: জনার্দন ঠাকুরমশায় আছেন?

মাথায় টাক গলায় মোটা যজ্ঞোপবীত নগ্নগাত্র জনার্দন শশব্যস্তে এসে বসবার আসন দিলেন। বলাইকে এক নজর দেখে নিয়ে সরাসরি তিনি কাজের কথায় এলেন: কবে? অন্নজল তিলকাঞ্চন বৃষোৎসর্গ দানসাগর সব রকম ব্যবস্থা আছে—চাই কোনটা?

ইন্দুকে দেখিয়ে জনার্দন একেবারে গদগদ হলেন: এই হালদার মশায়দের আশ্রয়ে আছি। ওঁরা জানেন আমার কাজকর্ম। এত জায়গা ফেলে আমার ঘরেই তাই পদধূলি পড়ে।

বলাইয়ের দিকে চোখ ঠেরে হেসে ইন্দু বলল, ঠাকুরমশায় দানসাগরের কথা শুধালেন। সাজপোশাকে চেহারায় ছোকরাকে রাজরাজড়ার মতো মালুম হচ্ছে—তাই না?

জনার্দন ঠাকুর বলেন, পোশাকে আর চেহারায় মানুষ ধরা যায় না হালদা মশায়। বিশেষ, এই কালীঘাটের মতো জায়গায়। চুনোট-করা ধুতি পরে আতরের গন্ধে মাতিয়ে ঘুরছে ফিরছে—পকেটমার পকেট হাতড়ে পেল সাকুল্যে গুণ্ডা পয়সা, রাগ সামলাতে না পেরে থাপ্পড় কষিয়ে দিল বাবু-লোকটার মুখে। আবার ভিক্ষে-করা কাঙালি একটা মরল, তার ছেঁড়া কাঁথায় ভাঁজে সাড়ে তিন হাজার টাকার নোট।

ইন্দু হালদার কল্লিষের ঢঙে বলল, হাজার-টাকা নয়—ব্যাপার হবেন না

ঠাকুরমশায়, কুল্যে দশটি টাকা। বৃষোৎসর্গ করে দিতে হবে। অনেক দূর মফস্বল জায়গা থেকে বড্ড আশা করে এসেছে।

জনার্দন ঠাকুর তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলেন: বলেন কি মশায়, দশ টাকায় বৃষোৎসর্গ? আর সব বাদ দিয়ে বৃষ আর বৎসতরীতেই কত পড়ে যায়, খবর নিয়ে আসুন।

ইন্দু বলে, বাজারের খবরে গরজ কি শুনি? বেওয়ারিশ ধর্মের ষাঁড় রাস্তায় ঘুরছে—সময় কালে তারই একটা তো তাড়িয়ে এনে তুলবেন।

উঠানের বাছুরগুলো দেখিয়ে বলল, আর বৎসতরী দেদার তো মজুত করে রেখেছেন। দাম ধরে কিনে নেব, কাজ অন্তে আপনার জিনিস আপনারই হবে আবার। নতুন যজমানের কাছে আবার বেচবেন, ফের তখনই ফেরত আসবে। এক এক ফোঁটা বাছুর এরই মধ্যে দু-তিন'শ বার বেচা হয়ে গেছে। বলুন, তাই কি না?

সুমুখের চালার দিকে উঁকি দিয়ে কালিদাস বলল, সব উপকরণই ঘরের মধ্যে থরে থরে সাজানো। ঐ একই ব্যাপার—ঘর থেকে একবার বেরিয়ে আসবে, কর্ম অন্তে ঘরের জিনিস আবার ঘরে ঢুকে পড়বে। বাজার-দর দিয়ে কি হবে—কত নিয়ে মালামাল আপনি উঠোনে নামাবেন, তারই কথাবার্তা।

জনার্দন ঠাকুর এবারে অন্য দিক দিয়ে যান: মালামাল ছাড়াও তো আছে। ক্রিয়াকর্ম, মন্ত্রপাঠ—একখানা বৃষোৎসর্গ নামানো সহজ কথা নয়। তিন প্রহর জুড়ে চলবে। কড়া কড়া সংস্কৃত মন্ত্র—পড়তে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়।

ইন্দু হালদার বলল, বেশ তো, এক আধুলি ধরে নেবেন দক্ষিণা বাবদে।

জনার্দন ঠাকুর বললেন, আধুলিতে সংস্কৃত হয় না। ষষ্ঠীপুজোয় অং-বং হতে পারে বড় জোর।

ইন্দু রেগে গেল, হেসে হেসে হচ্ছিল—কণ্ঠস্বর এবার কঠিন। বলে, এরা না-হয় মফস্বলের লোক, পাঁচপুরুষ ধরে আমরা মোকামের উপর আছি। মায়ের সেবাইত—একদিনের পূজো আমাদের অংশে। মন্তর আপনাদের কেমন সংস্কৃত, ভাল মতন জানা আছে। জোঁকের গায়ে জোঁক লাগাতে আসবেন না ঠাকুরমশায়।

থতমত খেয়ে জনার্দন চুপ করে যান। তারপর ঘরের মধ্যে গিয়ে লম্বা এক ফালি কাগজ নিয়ে এলেন। বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে যা যা লাগবে, তার পরিপূর্ণ ফর্দ। ইন্দুর হাতে নিয়ে বললেন, জিনিসের পাশে পাশে দাম ফেলুন। যেমন ইচ্ছে ফেলে যান, আমি কিছু বলব না।

শক্ত কাজ—পাঁচটা সাতটা দাম ফেলতেই ইন্দু হালদারের বালুক হয়ে

গেল। বৃষের দাম ধরল আট আনা, শাড়ি কাপড় চার আনা হিসেবে। গণ-তিতে প্রায় ষোড়শ দফা হবে। জনার্দন ঠাকুর প্যাঁচ খেলেছেন, ইন্দু বুঝতে পারল— প্যাঁচে পড়ে যাচ্ছে সে। দাম যত কমিয়ে ধরুক দশ টাকার মধ্যে রাখা অসম্ভব। ফর্দ ফেরত দিয়ে বলে, দাম-টাম যা ফেলতে হয় আপনি ফেলে নিন ঠাকুরমশায়। আমাদের থাউকো চুক্তি—দশ টাকা। না পোষায় বলে দিন। শতেক দুয়োর জানা আছে আমার।

বলে সে উঠে দাঁড়াল। জনার্দন বলেন, বসুন, বসুন—চটলে কাজ হবে কেমন করে? বেশ, দশ টাকাতেই বৃষোৎসর্গ সেরে দিচ্ছি। ছোটখাটো একটু দরবার আছে। দ্বাদশটি ব্রাহ্মণভোজন করাতে হয়—সেটা এই দশের মধ্যে ঢোকাবেন না।

বারো টাকা মজুতই আছে। এই সব বুঝেই দু-টাকা হাতে রেখে দরদস্তুর করেছে। ইন্দু হালদার দরাজ ভাবে বলে দিল, আরো দু-টাকা ব্রাহ্মণ-ভোজন বাবদ।

জনার্দন বললে, বারো জনে দু-টাকার মধ্যে কি খাবে বলুন তো। তার উপর, ব্রাহ্মণের খাওয়া—

ইন্দু তর্ক করে: চিঁড়ে-গুড় খাওয়ানো যায়, ছানা-চিনি খাওয়ানো যায়, বড়লোকেরা ইদানীং আবার ঘি-ভাত খাওয়ানো ধরেছেন। ফলের তাতে ইতর বিশেষ নেই।

তা দু-টাকায় বারো জনের চিঁড়ে-গুড়ও কি হয়? বলুন।

কালিদাস মাঝে পড়ে মীমাংসা করে দিল: যাকগে যাক। ভাল করে খাওয়াবেন ব্রাহ্মণদের, পাঁচ টাকা দেব। টাকাটা আমি-ই দিয়ে দেব। খুশি এবারে?

জনার্দনের মুখে হাসি ধরে না। বলেন, ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময়টা থাকতে হবে আপনাদের। এই দাওয়ার উপরে বসাব। এক এক ব্রাহ্মণে কী পরিমাণ টানবেন, আর কত আমোদ করে খাবেন, দেখতে পাবেন।

বাপের কাজকর্ম মনের মতন সমাধা হয়ে যাবার পরেও বলাই কয়েকটা দিন কলকাতায় রয়ে গেল। মেসে থাকে, আর আজ জ্যান্ত-চিড়িয়াখানা কাল মরা চিড়িয়াখানা (মিউজিয়াম) পরশু হাওড়ার-পুল তরশু পরেশনাথের-মন্দির তার পরের দিন হাইকোর্ট ইত্যাদি দেখে বেড়ায়। গান শুনিয়ে রঘুর সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলেছে, দুপুরে মেসের কাজকর্ম চুকে গেলে রঘুকে নিয়ে সে বেরোয়। খাসা কাটল দশ-বারোটা দিন। তারপর মন উতলা হয়ে ওঠে, নিজেই বলছে বাড়ি যাবার কথা। বাড়িতে কেউ নেই, কিন্তু গ্রামের জন্য বড্ড প্রাণ পোড়ে।

কালিদাস বলে, মেসে আমার ফ্রেণ্ড হয়ে আছেন—তাদেরই তো আনিয়ে রে। আমাদের আপিসে বেয়ারা করে ঢোকানো যায় কিনা, সেই চেষ্টায় আছি। বাড়ি গিয়ে কোন লাটসাহেব হবি, শুনি?

কিন্তু কলকাতা জল বিছুটি মারছে বলাইকে। যে দিকে তাকায় ইট আর ইট—কাঁচা মাটি পায়ে ঠেকাতে পায় না কখনো। মাটি এখানে ঝুড়িতে ঢুকে ফেরিওয়ালার মাথায় চড়েছে—'মাটি চাই' 'মাটি চাই' হেঁকে রাস্তায় রাস্তায় মাটি বিক্রি করে বেড়ায়। কলকাতায় থাকা আর পাখিদের খাঁচায় থাকা এক রকমের।

কালিদাসের কাছে বলল, গামালের বিস্তর মালপত্র বাড়িতে পড়ে পড়ে পচছে। মরশুম এখনো চলছে, সেইগুলো বেচে আসিগে। বর্ষা পড়লে গামালের কাজ বন্ধ। তখন এসে যাব। কাজ জুটিয়ে দেন তো তাই করব কলকাতায় থেকে।

ধানাই-পানাই বলে তো বাড়ি এসে উঠল। বাপের কাজ ধরেছে। কলকাতা ভাল না। শান-বাঁধানো শহর—গাছগাছালি নেই, মাটি পর্যন্ত নেই। মানুষে কি করে থাকে, কে জানে। বলাই আর যাচ্ছে না সেখানে। কালিদাস ধমকেছিল: লাটসাহেব হবি সোনাখড়ি গিয়ে? তা খানিকটা লাটসাহেব বই কি—বলাই এখন কলকাতা-বিশেষজ্ঞ—ভদ্রপাড়ায় যেমন দত্তবাড়ির বৃদ্ধ শশধর আছেন। এবং পুববাড়িতে দেবনাথ ও কৃষ্ণময়। কতজনে এসে বলাইয়ের দাওয়ায় বসে কলকাতার আজব আজব গল্প শোনার জন্য। কল ঘোরালে জল পড়ে সেখানে, কল টিপলে আলো জ্বলে। রথের মেলা এ-দিগরে বছরের মধ্যে দুটো দিন, আর মেলা সেখানে নিত্যিদিন লেগেই আছে। খুব আকাশে তোলে কলকাতাকে—তা বলে নিজে সে যাচ্ছে না।

ঠকঠক ঠকাঠক—সকালবেলা সজোরে কুড়াল পড়ছে পশ্চিমপাড়ার দিকে। কমল দৌড়ল। অটলকে পেয়ে শুধায়: কি হচ্ছে অটলদা?

পালমশায়ের তেঁতুলগাছ মারবে। ভবলদার এসে পড়েছে।

গাছ মারা—পাড়াগাঁয়ে তা-ও একটা ঘটনা। গাছ ঘিরে লোক জমেছে মন্দ নয়। কমল-পুঁটি তো আছেই, মাঝবয়সি ও বুড়োথাড়াও কতক এসে জুটেছেন। গাঁয়ের এক প্রাচীন বাসিন্দা চিরবিদায় নিচ্ছে, শেষদেখাটা দেখে যাই—ভাবখানা এই প্রকার। দ্বারিক পালের সময়টা খারাপ যাচ্ছে, পুরানো তেঁতুলগাছটা বেচে দিয়েছেন, ম'লদার কুঞ্জ ঢালি কিনেছে তেইশ টাকায়! খেজুরগাছ কাটার ধুম চারিদিকে। গাছ কেটে রস আদায় করে, রস জ্বালিয়ে গুড় বানায়, গুড়ের উপর পাটাশেওলা চাপা দিয়ে চিনি। রস জ্বাল দেবার জন্য কাঠের গরজ—কাঠকুটোর বাজার এখন বড্ড চড়া। তাই বলে তেইশ

টাকা-খানের। কথা শুনে লোকের চক্ষু কপালে ওঠে।

হিমচাঁদ বলেন, কিসের গাছ হে—তেঁতুল না হয়ে সপোরগাছে হোক, ফল হলেও তো তার দাম তেইশে ওঠে না।

ওদিকে বরদাকান্তের দ্বারিক পার্দি দেখিয়ে দিচ্ছেন: দক্ষিণের এই মুড়ো দিকে কেটে নাও, গাছ ঐ বেঠো জায়গায় পড়বে। উত্তর পূবে পড়ে তো সর্বনাশ—আমার হাজারি-কাঁঠালগাছ কালোসোনা-আমগাছ জখম করে দেবে।

বরদাকান্ত বললেন, তোমার টাকার গরজ, বুঝি সেটা দ্বারিক। বেচলে তো বেচলে এই গাছ। এমন তেঁতুল এ-দিগের আছে কোথাও? শুনতেই তেঁতুল—তেঁতুল খাচ্ছি না আখ খাচ্ছি, তফাত করা যায় না।

দ্বারিক কৈফিয়তের ভাবে বলেন, হলে হবে কি—বাঁদরে খেয়েই শেষ করে, মানুষের ভোগে তো লাগে না।

ঘোর বেগে জল্লাদ প্রতিবাদ করে উঠল: অমন কথাও বলবেন না জেঠামশায়, বাঁদরের বদনাম দেবেন না। কষ্ট করে কেউ তো গাছেও উঠলেন না—তারাই পেড়েঝেড়ে দিল, ঝুড়ি ভরে আপনি বাড়ি নিয়ে নিয়ে গেলেন।

কথা সত্যি। যারা দেখেছে, খুব হাসছে তারা। গেল ফাল্গুনের ঘটনা। তেঁতুল এমনি ফলন ফলেছে যে ডাল-পাতা দেখা যায় না। ছোট ছোট ফল, উজ্জ্বল-বাদামি রঙের। আর ছোটকর্তা বরদাকান্ত যে কথা বললেন—দ্বারিকের গাছের তেঁতুল খেয়ে কে বলবে, তেঁতুলফল টক? সেই পাকাফলের লোভে একদঙ্গল বাঁদর গাছের উপর আস্তানা গেড়েছে, তেঁতুল খেয়ে দফা সারছে। অতিশয় মোটা গাছ, ডালও অনেক উপরে। গাছে ওঠা সহজ নয়—ডালের উপর গেরো বাঁশ ফেলে অনেক কায়দা করতে হয়। কিন্তু বাঁদরে এমন দাঁত খিঁচোয়, ধারে-কাছে যেতে কেউ ভরসা পায় না—নিরাপদ দূরে দাঁড়িয়ে ঈর্ষার দৃষ্টিতে বাঁদরের তেঁতুল-ভোজন দেখে।

একমাত্র জল্লাদই বাঁদরকে গ্রাহ্য করে না। বলে, বাবাকেই করিনে, তার বাঁদর! ধুপধাপ পা ফেলে চলে যায় সে তেঁতুলগাছের তলায়। পিছনে সব চেঁচাচ্ছে: যাসনে ও জল্লাদ, খিমচে চোখ তুলে নেবে। নাক থ্যাবড়া করে দেবে। জল্লাদ কানেও নেয় না—হাতে লাঠি, একটা পা শিকড়ের উপর দিয়ে বীরমূর্তিতে দাঁড়ায়।

ভাবভঙ্গি দেখে বাঁদরেও খানিকটা বুঝি ঘাবড়ে গেছে। লম্ফঝম্ফ করে না। তারা—এক একটা ডালের উপর বসে উৎকট রকম মুখ খিঁচোচ্ছে। নিচে থেকে জল্লাদও যথাসাধ্য মুখ খিঁচিয়ে প্রত্যুত্তর দিচ্ছে। নর-বানরের মুখ খিঁচুনির যুদ্ধ। যুদ্ধ প্রচণ্ড হয়ে ওঠে ক্রমশ। উত্তেজনায় জল্লাদ হাতের লাঠি

দিয়ে ঘা মেরে বসল গাছের গুঁড়িতে। আর খাবে কোথা—বাঁদরেরাও [illegible] শোধ নিচ্ছে ডালে ঝাঁকিয়ে, ডালের উপর লাথি মেরে। পাকা-তেঁতুলের বোঁটা রোদে মড়মড়ে হয়ে আছে, ঝাঁকি লেগে ঝুর ঝুর করে তলায় পড়ছে। বেশ খানিকক্ষণ চলল। সন্ধ্যার পর বাঁদর নিশ্চুপ। ঘাত্রিক অন্ধকারের মধ্যে খুঁড়ি বোঝাই করেন, আর বাড়ি নিয়ে নিয়ে চালেন। তেঁতুল পাড়ার কাজ বাঁদরেই করে দিল।

এখন ডালে ডালে কচি তেঁতুল—আহা রে, এবারও তেমনি হত—বাঁদরে পাকা-তেঁতুল পেড়ে দিত। তবলদারে গুঁড়িতে কোপ ঝাড়ছে, গাছে উঠে বড় ডাল কয়েকটা কেটে দিল—

সকাতরে কমল বলে, গাছের বড় কষ্ট হচ্ছে—না রে দিদি? ডাল কাটে কেন ওরা?

বলাই দর্শকদের মধ্যে। সে বুঝিয়ে দেয়: কেটে-ছেঁটে পরিষ্কার করে নিচ্ছে। পাড়ার সময় অন্য গাছে না লাগে। আগে কাটলে কাটবে, পরে কাটলেও কাটবে—একই কথা।

কমল বলে, মাংস-টাংস কাটে তো পাঁঠাবলির পরে। জ্যান্ত পাঁঠার মাংস কাটা কি ভাল?

জোরে জোরে কুড়াল মারছে। মারের পর মার। বেশ শীত, তলবদারদের গায়ে তবু ঘাম। অতিকায় কুড়ালগুলো গাছের গায়ে পড়ছে উঠছে, ধারালো ফলার উপরে রোদ পড়ে যেন বিদ্যুৎ খেলছে। ভাই-বোনে বাড়ি চলল—কমলের পাঠশালা আছে। পাঠশালা না হলেও থাকত না—থাকা যায় না, কষ্ট হয়। কোপের ঘায়ে প্রাচীন বৃক্ষরাজ যন্ত্রণায় ওঃ-ওঃ—করে উঠছে, কমলের স্পষ্ট রকম কানে আসে, ডালে ডালে কত পাখি—ভয়ে সব কিচির-মিচির করছে, উড়ে গিয়ে এ-গাছে ও-গাছে বসছে।

দুপুরে পাঠশালা থেকে ফেরার সময় ঘুরে একটুকু তেঁতুলগাছের কাছে এসে দাঁড়ায়। জল্লাদও এসেছে। তলবদাররা খানিকটা কেটে অন্যত্র চলে গেছে। সব ম'লদার আলানির জন্য এখন হন্যে হয়ে উঠেছে—তলবদারে এ-কাজের ও-কাজের খানিক খানিক করে বহুজনের মন রাখে।

গুঁড়িতে মস্তবড় হাঁ হয়ে গেছে, কাঠের কুচি চারিদিকে স্তূপাকার। আঠার মতো বেরিয়েছে ক্ষাটা জায়গা থেকে—কান্নাকাটির পর চোখের জল শুকিয়ে থাকলে যেমনটা দেখায়। জল্লাদকে কমল আঙুল দিয়ে দেখায়, গাছ কেঁদেছে জল্লাদ-দা, ঐ দেখ।

কাঁদে নাকি আবার গাছ? হি-হি-হি, তোর যেমন কথা।

জল্লাদ হেসে কুল পায় না। বলে, কান্না হয়েছে কি। শুধু গোড়া কেটেই

:ছেড়ে দেবেনা। কুড়ুল মেরে টুকরো টুকরো করবে, চেলা-চেলা করে ফেলবে।

কাঠ চেলা করা কমল তো কতই দেখে। এই বিরাট বিপুল সুপ্রাচীন তেঁতুলগাছের ভাগ্যেও তাই? গাছ কি মনে মনে ভাবছে তার আসন্ন দশা? ভয় পেয়েছে?

জল্লাদের কথা শেষ হয় নি: সেই চেলা-কাঠ নিয়ে কুণ্ড চালি বাইনের আগুনে ঢুকিয়ে দেবে—পোড়াবে। তারপরে দেখবি, অত কাঠের একখানাও নেই, পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সব। পালের-বাড়ির মিঠেতেঁতুলের গাছ কোনদিন কেউ আর দেখতে পাবে না।

গাছ কাটা আর কমল দেখতে যায় নি। পরের দিন হুড়মুড় করে পাড়া কাঁপিয়ে তেঁতুলগাছ পড়ল—তখন সে পাঠশালায়। বাড়ি ফেরার সময় জন্মের শোধ একটি বার দেখতে গেল। দশমুণ্ড কুড়িহস্ত মহাবলী রাবণরাজা ভূতলশায়ী হয়ে আছেন। দু-চোখ ভরে জল আসে, এদিক-ওদিক চেয়ে তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে দেয়। মানুষের বেলা কান্নাকাটি—মেজদিদি চঞ্চলা কবে চলে গেছে, তার নামে এখনো মা বুক ছেড়ে কাঁদে। আর এই বুড়ো তেঁতুলগাছ কত কাল ধরে গ্রামেরই একজন হয়ে ছিল, কুড়ালের ঘায়ে ঘায়ে কষ্ট দিয়ে তাকে মারল, তার জন্য দু-ফোঁটা চোখের জল পড়েছে তো—কী লজ্জা, কী লজ্জা! পুঁটি দেখতে পায় তো হেসে লুটোপুটি খাবে, মুছে ফেল্ শিগ্‌গির!

পিঠে-পরব—গ্রামের সব বাড়িতের সর্বজনীর পিঠে খাবার নেমন্তন্ন। বড় এককাঁদি বাতি-কলা কাটা হয়েছে—পৌষসংক্রান্তি নাগাত পেকে যাবে, সেই আন্দাজে কেটেছে। পৌষমাসে এখন নতুনগুড়ের অভাব নেই। গোয়ালে দুধাল গাই। ঝুনোনারকেলও মজুত। আর যা সব লাগবে—যথা, কাচিপাতা পিঠে সেঁকবার মুচি, মিঠেআলু, সর্ষের তেল ইত্যাদি বিমুদের হাটে কিনবে।

উমাসুন্দরী হুঁশ করিয়ে দেন: চাল ভেজা রে বিনো, গুড়ো কুটে ফেল্। এর পরে ভিড় লাগবে। এ-বাড়ি, সে-বাড়ি থেকে ঢেঁকশেলে এসে পড়বে সব। গরজ সকলের—আমি তখন কাকে মানা করতে যাব। করলেও শুনবে না, মিছে ঝগড়াঝাঁটির বাড়ান।

চ্যা-কুচকুচ, চ্যা-কুচকুচ—ঢেঁকিশালে চাল কোটার ধুম। অলকা-বউ আর মিনি পাড় দিচ্ছে, তরঙ্গিণী এলে দিতে বসে গেছেন। এলে দিতে হয় খুব সামাল হয়ে, নাকান্ত এদিক-ওদিক হলে সর্বনাশ। উমাসুন্দরী হেন গিন্নিবান্নি মানুষেরও আঙুলের উপর একবার ঢেকির ছেয়া পড়েছিল—ডানহাতের দুটো আঙুল চিরজন্মের মতো বেঁকে রয়েছে। তরঙ্গিণী সেই থেকে বাড়ি অন্য কাউকে গোটের দিকে হাত বাড়াতে দেন না। এই নিয়ে কত মান-অভিমান, কত

কোন্দল। অলকা-বউ বলে, মা'র আঙুল খেতো হয়েছে বলে কি সকলেরই হবে? করতে করতেই তো শিখব—বলি আপনি যখন আর পারবেন না, সংসারের ভানা-কোটা কে করে দেবে?

তরঙ্গিণী কিছুতে আমল দেন না। বলেন, কাঁটার মুখ ঘষে ঘষে সূচাল করতে হয় না রে। যে দিন দায়ে পড়বে, সব কাজ আপনা-আপনি শেখা হয়ে যাবে। আমার বেলাই বা কি হল? ন-বছুরে মেয়ে শ্বশুরবাড়ি এসেছিলাম—কাজকর্মে শাশুড়ি হাত ছোঁয়াতে দিতেন না।-শেষ-মেশ কিছুই তো আটকে রইল না। যদ্দিন পারি করে যাচ্ছি, তারপরে তোমরাই তো সব।

ঢ্যা-কুচকুচ, ঢ্যা-কুচকুচ—। ঢেঁকির ছেয়া তালে তালে উঠছে পড়ছে লোটের গর্তের ভিতর। ঐ উঠা-নামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তরঙ্গিণী চাল নেড়ে দিচ্ছেন। যেন কলের কাজ—ছেয়া উঠছে-নামছে, হাত ঢুকছে-বেরুচ্ছে, হাতের চুড়ি বাজছে। দেখতে মজা, কানে শুনতেও মজা। হাতের বের হতে তিলেক পরিমাণ দেরি হলে লোহার গুলো-আঁটা ছেয়া হাত ঠুঁটো করে দেবে বড়গিন্নির মতন।

তরঙ্গিণী লোট থেকে চালের গুঁড়ো তুলে দেন। বিনো কুলোয় নিয়ে নেয়, কুলো দুলিয়ে দুলিয়ে গুঁড়ো টেঁকে। আভাঙা-ক্ষুদ কিছু রয়ে গেছে, সেটা আবার লোটের গর্তে ফেলে দেয়। ঢ্যা-কুচকুচ, ঢ্যা-কুচকুচ—পিঠের চাল কোটা হচ্ছে।

পুলিপিঠে, ভাজাপিঠে ভাপাপিঠে। মুখসামালি গোকুল পাটিসাপটা রসবড়া—এই সমস্ত ভাজাপিঠে, তেলে বা ঘিয়ে ভেজে নিতে হয়। কাচিপোড়া-পিঠে চিতল পিঠে ভাপাপিঠেরই রকমফের। পৌষপার্বণের মুখে কুমোরে কাচিপোড়ার মুচি বানায়। এমন কিছু নয়, মেটে কড়াইয়ের তলদেশে পিঠের সাইজে গোলাকার গর্ত। চালের গোলা ঢেলে দিলে সেখানে গিয়ে পড়ে, সেই ভাবে সেঁকা হয়ে যায়। মৌঝোলা গুড় মাখিয়ে কাচিপোড়া-পিঠে খেয়ে দেখবেন পাঠক, আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে।

তরঙ্গিণী পিঠে ভাজছেন। প্রথম পিঠে ব্রহ্মার নামে উনুনের আগুনে দিলেন। পরের পিঠেখানা আলাদা করে রাখা হল, বাঁশবাগানে রেখে আসবেন, শিয়ালের ভোগে যাবে। তারপরে ছেলেপুলে ও অন্যান্য সকলের। শুধু কমল-পুঁটি নয়, অনেকে পাড়া থেকে এসেছে। উনুনের ধারে ভিড় করেছে। আগুন পোহানো আর সেই সঙ্গে পিঠে খাওয়া—এক এক খোলা নামে, অমনি সবাই হাত বাড়িয়ে দেয়। হাতে না দিয়ে তরঙ্গিণী ডালায় ফেলেন। বলেন, ব্যস্ত কেন? জুড়োতে দে একটুখানি। নয়তো হাত পুড়বে, জিভ পুড়বে।

বেড়ার কাছে কাঠের খেলকোয় টেমি জ্বলছে। গল গল করে ধোঁয়া

বেরেছে। আলো আর কতটুকু, ধোঁয়াই সব। ছেলেপুলে না থাকলে পিঠে বানিয়ে সুখ?—তরঙ্গিনী ভাবছেন। ভিড় জমিয়ে ঐ যে সব হাত পেতে আছে। সব কষ্ট আমার সার্থক হয়ে গেল। চকিতে ভিড়ের পানে একবার নজর ফেললেন। মুখ দেখা যায় না স্পষ্টভাবে—ঝাপসা রকম দেখা যাচ্ছে। শুধালেন: সত্যি বল, ছেলে-পুলে সবাই তোরা তো বটে—বাড়তি কেউ ভিড়ে বসে হাত বাড়াসনি?

গল্প ফাঁদলেন। তখন আর পিঠের জন্য তাড়াহুড়ো নেই। গল্পে সবাই মজে গিয়েছে। পিঠের লোভে পড়ে কোন বাড়িতে এক ভূত এসেছিল বাচ্চা ছেলের রূপ ধরে, ভিড়ের ভিতর এসে হাত বাড়িয়েছিল। পিঠে-ভাজুনি চালাক খুব, টের পেয়ে গেছে। নে, ধর—বলে ভূতের হাতে পিঠে না দিয়ে কড়াই থেকে পুরো হাতা গরম তেল ঢেলে দিল। পুঁড়ে গেল, জ্বলে গেল (ভূতের কথা নাকি সুরে কিনা) বলতে বলতে বাচ্চা-ভূত এক লাফে পাঁচিল টপকে বিল ভেঙে দৌড়।

তরঙ্গিণী হাসছেন। ছেলেপুলেরাও হেসে খুন। হাসে, আবার আধ-অন্ধকারের মধ্যে এ ওর মুখে তাকায়। পিঠের জন্য যারা এসেছে, সবাই ঠিক ঠিক মানুষ তো বটে? ভূত কেউ মূর্তি ধরে আসেনি?

কমলের খুব ভাব জমে গেছে—মানুষ নয়, পশুপাখি নয়—একটা গাছের সঙ্গে। বেঁটেখাটো যজ্ঞডুমুর গাছ—খসখসে পাতা, এবড়ো-খেবড়ো গায়ে বুঝি কুষ্ঠরোগে ধরেছে। হাটখোলার আমবাগানে সেবার কোথাকার এক কুষ্ঠরোগী ফেলে গিয়েছিল, নড়তে চড়তে পারে না। রাত্রিবেলা শিয়ালের দল জ্যান্ত-মানুষ খুবলে খেত, আর গলা ফাটিয়ে আর্তনাদ করত সে। জল্লাদ চোরাগোপ্তা তাকে দত্তদের ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপে এনে তুলেছিল, তারপরে অবশ্য জানাজানি হয়ে গেল। কমল সেই কুষ্ঠরোগী দেখেছিল। বক্সির-ভুঁইয়ের যজ্ঞডুমুর গাছের সর্বাঙ্গেও ডুমো-ডুমো ঠিক সেই রকম।

একেবারে বিলের লাগোয়া বক্সির-ভুঁই। কোন বক্সিদের নাম জুড়ে আছে, বরদাকান্তও হদিস দিতে পারেন না। ভুঁইখানা বিল থেকে সামান্য উঁচু—পাট ও আউশধান ফলে। একদিকে খানিকটা নাবাল জায়গা, বিলের চেয়েও নিচু, ইটখোলা ঐটুকুরও নাম। পুববাড়ির কোঠাঘরের ইট কেটেছিল এখানে। তার পাশে উঁচু ঢিবি—ইটের জন্য বোধহয় মাটি কেটে কেটে ডাঁই করেছিল—বাড়তি মাটি কাজে লাগে নি, পাহাড় হয়ে পড়ে আছে। যজ্ঞডুমুর গাছ পাহাড়ের মাঝখানটায় পাহাড়ের বয়স যা, মনে হয় গাছেরও বয়স তাই।

যজ্ঞডুমুর গাছের সঙ্গে কমলের বন্ধুত্ব। বক্সির-ভুঁই এবং ইটখোলার সঙ্গেও। [illegible] যেতে পারে না কমলের কাছে, কমলই আসে যখন তখন। একদিকে গ্রাম [illegible] একদিকে বিল। ধরবুপুরে নিশিরাত্রে বর্ষায় মধ্যে শীতের মধ্যে বাসন্তী

জ্যোৎস্নায় বেঁটে যযডুমুর গাছ একলাটি দাঁড়িয়ে থাকে। বর্ষার জলে সবুজ [illegible] বিল এঁটে যায়, বক্সির-ভুঁয়েও তখন ধান অথবা পাট। চারিদিকের অপার সবুজ সমুদ্রের মধ্যে ইটখোলাটুকুতেই কেবল ধান নেই। ধানবন না থাক, জল দেখবারও উপায় নেই তা বলে। শাপলা বড় বড পাতা বিছিয়ে জল ঢেকে দিয়েছে—পাতার মাঝ দিয়ে অগণ্য শাপলাফুল মাথা তুলেছে। সকাল-বেলা এসে দেখতে অপরূপ—সব ফুল দল মেলে আছে তখন, ফুলে ফুলে জল আলো। সারা রাত জেগে মনের মতো সাজ করেছে যেন। রোদ উঠলে এ রূপ আর দেখাবে না, আস্তে আস্তে দল গুটিয়ে ফেলবে। উৎসবের শেষে গায়ের গয়না তুলে পেড়ে যেমন বাক্স-পেটরায় রাখে। এই শাপলা মাত্র নয়—লকলকে কলমিডগা পেঁচিয়ে জড়িয়ে জাল বুনে আছে, গাঁটে গাঁটে তার কলকের আকারের ভায়োলেট রঙের ফুল। একেবারে পাড়ের দিকে নীলাভ চেঁচোঘাস ও মা'লেঘাস।

জল বেশি বলে ইটখোলার ঐখানটা বিলের মাছ কিছু কিছু এসে জমে। কমলের অনেক ক্ষমতা—মাছ-মারাটাও শিখে ফেলেছে। জেঠামশাইকে ধরে গঞ্জ থেকে আধ পয়সায় বঁড়শি ও দু-পয়সার সুতো আনিয়ে নিয়েছে, তলতা-বাঁশের সরু আগায় সুতো-বঁড়শি বেঁধে এখন তার নিজস্ব ছিপ। বঁড়শি কেমন করে পুঁটে করতে হয়, জল্লাদ দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে—নইলে এমন সুন্দর হত না। পটলা আর বৈদ্যনাথ লগির মাথায় খুঁচি বেঁধে তলায় তলায় নালশোর (লালপিঁপড়ে) বাসা খুঁজে বেড়ায়। সরু চালের ফুরফুরে ভাতের চেয়েও নালশোর ডিম—কই-জিওল-পুঁটিমাছদের বড পছন্দ, পেলে কপ করে গিলে ফেলে—তিলার্ধ দেরি করে না। কমলও ওদের সঙ্গে জুটেছে—নালশোর কামড খায়, ডিমেরও ভাগ পায়। সরু সরু ডিম কোন কায়দায় বঁড়শিতে গাঁথে, তা-ও শিখে নিয়েছে। ছিপ হাতে সন্তর্পণে বক্সির-ভুঁয়ের আ'ল ধরে বাড়ির কেউ না দেখে এমনি ভাবে চলে গেল সে ইটখোলায়।

জানে সব কায়দাকৌশল, কিন্তু ছিপ ধরে কাঠের-পুতুল হয়ে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো অসম্ভব। আরও মুশকিল—তেপান্তর অবধি ধানবন, তার মাঝে প্রাচীন বটগাছটাও দেখা যায়—ডালে ডালে যার ভূত-পেত্নী ব্রহ্মদৈত্যদের বাসা। আবার ডাঙার ওদিকে ফাঁকার মধ্যে কয়েকটা খেজুরগাছ, মাথায় বাউরি-চুল দন্তহীন ভুসড়ো মেলে- কমলের দিকে হাসছে যেন নিঃশব্দে ফ্যা-ফ্যা করে। এ হেন-জায়গায় একা একা দাঁড়িয়ে মাছ মারা চাট্টিখানি কথা নয়। ফিরে গিয়ে অতএব দুর্ধর্ষ দি:দিকে সঙ্গে নিয়ে নিল। বলে, ছিপ ফেল্-দিদি।

দূর, মেয়েমানুষ যে আমি—

মুখে আপত্তি পুঁটির, লোভ কিন্তু ষোলআনা। কমল বলে, এখানে কে

দেখছে? কাদাজল ভেঙে এতদূর কেউ আসতে যাবে না।

বালশোর কামড় খেয়ে ডিম ভেঙে আনলি তুই। ছিপ-সুতো-বঁড়শি গোছগাছ করলি—

কমল বলে, ছিপ আমার যাচ্ছে কোথা? তুই দিদি মাছুড়ে খুব। কাপড়-ছেঁকনা দিলে তোর কাপড়ে খেঁয়া-পুঁটি ওঠে, আমার কাপড়ে শামুক-গুগলি। গোড়ার দিনটায় কিছু না পেলে মন খারাপ হয়ে যাবে।

পুঁটি কাছে থাকলে কমলের ভয় লাগে না। বিল তো সামান্য স্থান, সাত সমুদ্র পাড়ি দিতে পারে কলম্বাসের মতন। সামনের অকূল ধানক্ষেতের দিকে চেয়ে মনে হল, এখানেও সমুদ্র—সবুজরঙের সমুদ্র-কিনারে দাঁড়িয়ে আছে সে। এ হেন সমুদ্র না দেখে একনজরে তাকে তাক করে থাকবে হবে ছিপের ফাতনার পানে—মাছের ঠোকে ঐ বুঝি ফাতনা একটু নড়ে উঠল—ছিঃ।

যজ্ঞডুমুরের গাছে হেলান দিয়ে কমল বিল দেখছে। বর্ষার বিলে কতরকমের মজা। কত ডোঙা-ডিঙি, কতরকম মাছের চলাচল ধানবনের ভিতরে। অলক্ষ্য কোথায় আ'ল ছাপিয়ে ঝিরঝির করে জল পড়ছে। এক-পা দু'পা করে কমল এগোয়, উঁকিঝুঁকি দেয় আওয়াজের উৎপত্তিস্থান আবিষ্কারের আশায়। মাঝবিলে হঠাৎ মানুষ দেখা গেল—পুরোপুরি নয়, মাথা বুক অবধি, বাকিটা ধান-বনের মধ্যে তলিয়ে আছে। সেই অবস্থায় সাঁ-সাঁ করে ছুটছে। ঐ একমাত্র মানুষেই শেষ নয়—পর পর আরও কয়েকটি। কী ছোটা ছুটছে ধানবন ভেঙে। ছুটছে তো বটেই—কিন্তু মানুষগুলোর পা ছোটে না, কমল তা জানে। ডোঙা ছোটে, যে ডোঙার উপরে চড়ে ধবজি মারছে। ডোঙা চক্ষুর গোচরে নেই।

পুঁটি ভেবেছিল, তারাই প্রথম—ইটখোলার মাছের খবর অন্য কেউ জানে না। কিন্তু ঠাহর হল, এদিক সেদিক ফুট কাটা রয়েছে। ফুট হল দাম-সরানো যৎসামান্য ফাঁকা জায়গা, বঁড়শি যে ফাঁকে জলতলে যেতে পারে। ফুট কেটেছে অতএব ছিপ নিয়ে আসে নিশ্চয়ই মানুষ। কইমাছ মারার উৎকৃষ্ট সময় ভোরবেলা রোদ ওঠার আগ পর্যন্ত। ভোরে অতএব সেই মানুষ এসে রোদ না উঠতে ফিরে যায়।

যজ্ঞডুমুর গাছের গুঁড়ি বেশ মোটা, সামান্য উঁচু থেকেই ডাল বেরিয়েছে। এ গাছের ছাল কবিরাজি ওষুধে লাগে। ছাল কেটে কেটে নিয়ে যায়—নতুন ছাল বেরিয়ে ডুমো-ডুমো হয়ে আছে। এমনি করে করে গুঁড়ি কুঠে-রুগীর চেহারা নিয়েছে। ডালের উপর আরও খানিক উঁচুতে উঠে কমল ভাল করে বিল দেখছে। পায়ের চাপে শুকনো ডাল একটু ভেঙে গেল। পুঁটি কুটেক

দিকে এক নজরে ছিল—চকিতে চোখ তুলে বলল, গাছের উপর কি করিস?

কমল বলে, আছি বসে। বেশ তো আছি।

পুঁটি আর কিছু বলে না। কাতনার দিকে পলকহীন নজর। ভাই-বোনে তারা বাড়ি ফিরে যাবে, যবডুমুর গাছ আবার তখন একা—কমল ভাবছে এই-সব। গাছের জন্য কষ্ট হচ্ছে খুব। ভরদুপুরে কিংবা নিশিরাত্রে তেপান্তরের বিলের পাশে একলা একটা প্রাণী দাঁড়িয়ে থাকে—কথা বলতে পারে না বেচারী, নড়তে চড়তে পারে না।—আহা, কী কষ্ট গাছের!

চমক লাগল হঠাৎ। বলছে যেন কথা—যবডুমুর গাছ বোবামুখে কী যেন বলতে চাইছে। গাছের গায়ের উপর কান রাখল কমল। শুনতে পায়, কিন্তু একবর্ণ বুঝতে পারে না। বিলের হাওয়ায় পাতা নড়ছে, তারই সঙ্গে হড়বড় করে গাছ একসঙ্গে কত কি বলে যাচ্ছে।

আস্তে রে, বুঝতে পারিনে।

গাছের গায়ে কমল আদরের চাপড় মারল। পাতা আস্তে নড়লে কথা-বার্তা সে যেন বুঝতে পারবে। প্রবোধ দিচ্ছে গাছকে—। পুঁটি অদূরে, শব্দ করে কিছু বলতে গেলে হেসে গড়িয়ে পড়বে সে ঠাট্টা করবে, পাগল বলবে কমলকে। অতএব নিঃশব্দ ভাষায় মনে মনে সে গাছকে বোঝাচ্ছে: যাই বলো গাছ, এখন এই ভরভরন্ত বর্ষায় মোটেই তুমি একা নও। অগুন্তি ধান-গাছেরা রয়েছে, ওদিকে পাটগাছ—ছোট হোক, যাই হোক—গাছই তো এরা সব। তবে আর একলা কিসের? সে বটে বলতে পারো চোত-বোশেখে—

চোত-বোশেখে ফাঁকা মাঠ ধূ-ধূ করে। শুকনো-খটখটে ইটখোলা। মাছ যা এসেছিল, জল সেঁচে মানুষে ধরে নিয়ে গেছে—চিল-কুল্যো-মাছরাঙায় ঠোঁট মেরে মেরে নিয়েছে। শাপলা শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন। লকলকে কলমির ডগাও নেই, নিস্তেজ দু-চার গাছা কোনরকমে প্রাণ নিয়ে ধুঁকছে। ফুল ফুটিয়ে স্ফূর্তি করার দিন তখন নয়। যবডুমুর গাছ সেই সময়টা একেবারে একলা। মন টানে—গাছকে কমল তখনও মাঝে মাঝে দেখতে আসে। কড়া রোদ, জনপ্রাণী নেই কোনদিকে। বাড়ির লোক নিদ্রামগ্ন। সেই হল সুলগ্ন—পুঁটিকেও বলে না, একলা বেরিয়ে আসে।

বস্তির ভুঁয়ে তখন চাষ দিয়েছে—ডেলাবন। পার হয়ে আসতে পায়ের তলায় ব্যথা করে। ইটখোলার মাটি ফেটে চৌচির—দৈত্যের হাঁ বুঝি গ্রাস করে ফেলবে। সত্যি সত্যি তাই একদিন হল। দোরঘুঁড়ি আকাশে—ভারি মিষ্টি সুর বেরোয় দোরঘুঁড়ি ওড়ার সময়। কমল আকাশের ঘুঁড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে হাঁটছে, ফাটলের মধ্যে পা ঢুকে গেল। এত টানাটানি পা কিছুতে

উঠছে না। মাটি যেন শিকল পরিয়ে আটকায়। ভয় হয়ে গেল রীতিমতো। দূরের আশপাশে ফটিক মোড়লকে দেখা যায়; কোন কাজে হন হন করে চলেছে। কমল ব্যাকুল হয়ে ফটিকদা ফটিকদা—করে ডাকছে। এমনি সময় পা উঠে গেল হঠাৎ। পা টেনে ধরে মাটি মস্করা করছিল—নিশ্চয় ঠাট্টামস্করার ব্যাপার, ইচ্ছে করেই করেছিল—ফটিকের এসে পড়ার সম্ভাবনায় ছেড়ে দিল। ভাগ্যিস ফটিক ডাক শুনতে পায়নি, মান রক্ষে হয়ে গেল তাই।

যবডুমুর ফলনের সময় এখন। গাছে চড়ে কমল কচি কচি দেখে কিছু পাড়ল। কচু-পাতায় মুড়ে বাড়ি নিয়ে তরঙ্গিণীকে বলল, কী ফলন ফলেছে মা। এই ক'টা নিয়ে এসেছি। চাও তো আরো আনতে পারি।

তরঙ্গিণী ছেলেকে বললেন, এই ডুমুর খায় নাকি?

মানুষে খায় না, ওষুধ-পত্তরে কিছু লাগে। তাই বা ক'টা! বিল-কিনারে নিঃসঙ্গ যবডুমুর গাছ। গুঁড়ির গোড়া থেকে মগডাল অবধি ডুমুর ফলতে কোনখানে বাকি থাকে না। বড় হয় ফল, পাকে, কাক-কুলিতে খেয়ে যায়। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, যবডুমুর গাছ একলা প্রাণী বিলের কিনারে কাল কাটায়।

গাছটার জন্য কমলের কষ্ট হচ্ছে। সন্ধ্যা হল, সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে গেল। এই রাত্তিরে যবডুমুর গাছের নিশ্চয় ভয় করছে। হাঁটতে পারে না, অচল অথর্ব হাটখোলার সেই কুষ্ঠেরুগীর মতো—পারলে পালিয়ে আসত ঠিক। বোবা বলে ডাকতেও তো পারছে না—আহা, গাছের বড় কষ্ট! কমলকে কেউ গাছের মতন যদি বিলের ধারে দাঁড় করিয়ে দেয়—পা-দুটো শিকড়ের মত পোঁতা? আর খুব খানিকটা বেলেসিঁদুর খাইয়ে কথা বন্ধ করে দিয়েছে—কষ্টে-সৃষ্টে মুখ দিয়ে একটুকু ফ্যাসফেসে আওয়াজ বেরোয় শুধু। জোর হাওয়া এলে যবডুমুরের পাতায় পাতায় যে ধরণের আওয়াজ ওঠে। ওমা, মাগো, ছেলে তোমার গাছ হয়ে গেছে—দেখে যাও এসে।

হত যদি তাই সত্যি সত্যি! সাতভাই-চম্পার মতো—ভাইরা সব চাঁপাফুল, বোনটি পারুল। যেই না মাকে পেয়েছে, ফুলেরা ছেলে হয়ে গিয়ে ঝুপঝাপ কোলে-কাঁখে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কমলেরও তাই—বিলের ধারে সে এক যবডুমুর গাছ। কেমনটা হয় তাহলে—ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। মা তো আলুথালু হয়ে 'ওরে খোকন, কোথায় গেলি'—বলতে বলতে বিলের পাশে ছুটল গিয়ে জড়িয়ে ধরতেই গাছ সঙ্গে সঙ্গে আবার খোকন। খোকন [illegible] মিটিমিটি হাসছে মায়ের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে, কতক্ষণের মধ্যে মা [illegible] পেলো না।

'সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ'

সম্পর্কে

কয়েকটি আলোচনা

গ্রামীণ জীবনযাত্রার

'সাগা'-গ্রন্থ

ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত মনোজ বসু মহাশয়ের 'সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ' উপন্যাসখানি একাসনে বসে পড়ে ফেলার বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। মন যখন রসানন্দে সম্বিৎ হারিয়ে ফেলে, তখন সেই মানসিক অবস্থার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কেমন তার হদিশ দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ তখন ভালোমন্দ বিচারের বোধ ও প্রবৃত্তি ক্ষণকালের জন্য আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। প্রখর ঘুমে আচ্ছন্ন ব্যক্তির ঘুমন্ত অবস্থার

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ, পি-এইচ. ডি.: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগের প্রধান, সঙ্গীত ও ললিত-কলা বিষয়ের ডীন; বাংলা ভাষা-সাহিত্যের বহুখ্যাত গবেষক ও ইতিহাস-লেখক।

মানসিক মানচিত্র অঙ্কন সম্ভব নয়। তবে সুপ্তিভঙ্গের পর লোকে বুঝতে পারে সুনিদ্রা হয়েছিল। রসসাহিত্যে মন মাতোয়ারা হয়ে গেলে চিত্তবৃত্তি ক্ষণেকের জন্য নিজ রাজ্যপাট ত্যাগ করে। এই উপন্যাসখানি পড়তে বসে আমার মনের অবস্থা কতকটা সেই রকমই হয়েছে। এটি শ্রীযুক্ত বসুর সর্বাধুনিক উপন্যাস, এবং আমার মতে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। শুধু তাঁরই বা কেন, সাম্প্রতিক উপন্যাসের পয়লা সারির দিকে তাকিয়ে মনে হয়, মনোজ

বসু মহাশয় প্রবীণ ও নবীন—সকলকে ম্লান করে দিয়েছেন। এই কথাগ্রন্থখানি বিলীয়মান গ্রামীণ জীবনযাত্রার একখানি 'সাগা'-গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। যশোহর-খুলনা-চব্বিশ পরগণার পটভূমি ও জনজীবনের এতটা ব্যাপ্তি ও বিশালতা একালের উপন্যাসে বড়ো একটা পাওয়া যায় না। বিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছর এর কালের সীমা। এই দেশ-কালের মধ্যে কতকগুলি গ্রামীণ মানুষের সুখদুঃখের জীবন আবর্তিত হয়েছে। সোনাখড়ি গ্রামের ভবনাথ ঘোষ এর কেন্দ্রীয় চরিত্র, কিন্তু তাঁকে ঘিরেই সমস্ত ঘটনা এগিয়ে চলেনি। বস্তুতঃ বাঁধাদস্তুর উপন্যাসের মতো এর বিশেষ কোন কেন্দ্রীয় কাহিনী নেই, কোনও একজন চরিত্রের ওপরও এর ভারকেন্দ্র নির্ভর করছে না। সমগ্র গ্রামটিই যেন একটা চরিত্র রূপে দেখা দিয়েছে এবং তাকে কেন্দ্র করেই নর-নারীর চরিত্রগুলি আবর্তিত হয়েছে।

এই উপন্যাসের আঙ্গিকও কিছু অভিনব। কাহিনী বা চরিত্র, বিশেষ কোন একটির একক প্রাধান্য এর মধ্যে নেই। ছোট-বড়ো চরিত্র, ঘটনা, গ্রাম্য পরিবেশ—সব কিছু শোভাযাত্রায় এগিয়ে চলেছে। যূথবদ্ধ জীবনচিত্রই এ কাহিনীর মূল বৈশিষ্ট্য। বহু চরিত্র ও কাহিনীগুলিকে এমনভাবে পরিচালিত করা, কোনও একটিকে প্রাধান্য না দিয়ে সবগুলিকে সমান গুরুত্ব সহ চিত্রিত করা একটা বিশেষ ধরণের সৃষ্টিক্ষমতা বলেই পাঠকেরা স্বীকার করবেন। প্রবীণ বয়সে পৌঁছেও লেখক যে কতটা দক্ষতা দেখাতে পারেন, এই উপন্যাসেই তার প্রমাণ মিলবে। সম্প্রতি বাংলা কথাসাহিত্যে নানা ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। গল্প-উপন্যাসে আদৌ আখ্যান থাকবে কিনা, চরিত্র বিকাশই উপন্যাসের একমাত্র লক্ষণ কিনা, অথবা ব্যক্তিজীবনের বিচ্ছিন্নতাই উপন্যাসের গতি নিয়ন্ত্রণ করবে কিনা—ইত্যাদি নানা প্রশ্ন ও সমস্যা একালের শিল্পী ও পাঠকের মনে নানা তরঙ্গ তুলেছে। শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় সেসব জটিল ও অ্যাকাডেমিক জল্পনার মধ্যে না-গিয়ে যে সমস্ত মানুষ স্মৃতির পটে হারিয়ে গেছে, অথবা স্বার্থপর রাজনীতির কবলে পড়ে যারা সাতপুরুষের বাস্তুভিটে ছেড়ে নগরীর পথে অদৃশ্য হয়ে গেছে, এই উপন্যাসে তাদের স্মৃতি তর্পণ করেছেন। তারা আর কোনও দিন দেশ-কালে বিচরণ করবে না, কিন্তু তারা অমর হয়ে রইল লেখকের মনে এবং মন থেকে গ্রন্থের মধ্যে অবতরণ করে। আমরা এই গ্রামজীবনের একদা শরিক ছিলাম, তারপর জীবিকার তাড়নায় সে সমস্ত গ্রাম ছেড়ে চলে এলাম পাষাণপুরীতে। স্মৃতির পটে ক্রমে ক্রমে সে সমস্ত ছায়াছবি ম্লান হয়ে গেল। হঠাৎ এই উপন্যাসখানি পড়তে পড়তে আবার যেন অর্ধ-শতাব্দীর পূর্বেকার নদীনালা, বাওড়,

হাডের হাতছানির ইঙ্গিত পেলাম, দেখলাম, কখন যেন নিজেই জাতিস্মর হয়ে উঠেছি, বালক কমলকে আমারই মধ্যে আবিষ্কার করলাম। হয়তো অনেকেই আমার অভিজ্ঞতার স্বাদ পেয়েছেন। অনেক দিন কোন গল্প উপন্যাস পড়ে এত তৃপ্তি পাইনি, এত আনন্দ বোধ করিনি, এত ব্যথাও পাইনি। কোন্ মুহূর্তে লেখক যে আমার একান্ত আপনজন হয়ে পড়েছেন, তাও বুঝতে পারিনি।

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস নানা সমস্যার ভারে কুব্জ হয়ে পড়েছে রাজনীতি সমাজতত্ত্ব, মনোবিকার—সমাজের কানাগলি ও চোরাপথের বিষাক্ত অন্ধকারে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষগুলোও হারিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, দেহমনের বিকৃত দুঃস্বপ্নই বুঝি জাগরণের চেয়েও সত্য ও যথার্থ। লেখকের নিজস্ব মনোবিকার অথবা সাগরপারের কেতাবি বিদ্যা থেকে 'কুম্ভিলক'-বৃত্তিজাত অপচ্ছায়াগুলি যখন আমাদের চারিদিকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, তখনই 'সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ' হাতে এল। এতদিন যেন অন্ধকূপের মধ্যে ছিলাম, এবার বহতা ধারার মধ্যে এলাম। মানসিক রুচির স্বাদ ফেরাবার জন্য শ্রীযুক্ত বসুকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই উপন্যাস, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একালের বাংলা কথাসাহিত্যে একক মহিমায় বিরাজ করবে এবং অল্পকালের মধ্যেই এটি চিরায়ত সাহিত্যের মর্যাদা পাবে।

আশ্চর্য বই

ডক্টর অমলেন্দু বসু

"এমনি হাজার ছবি, হাজার মুখ, মন ধরে' রেখে দেয়…মন ধরে' রেখে দেয়, দরকার মতো বের করে দেয়,"—একথা বলেছিলেন অবন ঠাকুর। ধরে' রাখে তো মনই, কিন্তু সবারই মন ধরতে পারে না, কিম্বা সব জিনিসই ধরে' রাখার মতো নয়। মনোজ বসুর মনে ধরে' রাখার শক্তি আছে, যে-স্মৃতি বিধৃত হয়েছে তা' অবশ্যই ধরে রাখার মতো। হাজার মুখ, হাজার ছবি ধরে' রাখার মতো অসামান্য সংবেদনা ও নিপুণতার মালিক মনোজ বসু। "সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ"—এই শিরোনামাতেই ব্যঞ্জিত হয়েছে একটা বিমথিত বেদনাবোধ এমন এক সমাজের জন্য যাকে আজ আর আমরা খুঁজে পাচ্ছি না (খুঁজে পাওয়া সম্ভবই নয়), যাকে আর পাওয়া যাবে না, কিন্তু হায়, যার জন্য মনোজ বসুর ও আমাদের যে কোনো বাঙালীর স্মৃতিদীর্ণ চিত্তের অন্তস্থলে ছড়িয়ে আছে অহর্নিশি একটা হতাশক্লিষ্ট অথচ সংগুপ্ত বেদনাবোধ।

মনোজ বসুর এই আশ্চর্য বইয়ে চিত্রিত হয়েছে একটি প্রায়-বিস্মৃত জীবন-পরিবেশ, বিস্মৃত হয় তো সব কিছুই। "কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন

অমলেন্দু বসু, এম. এ., ডি. লিট (অক্সফোর্ড): আলিগড় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ইংরেজি বিভাগীয় প্রধান। দেশে ও বিদেশে খ্যাতিমান সাহিত্যরসবেত্তা ও সমালোচক।

যৌবন ধনমান।" সেই ভেসে-যাওয়া জীবনকে শিল্পকলার শক্তিতে ফিরিয়ে আনতে পারেন শিল্পী। মনোজ বসু সেই শক্তিমান শিল্পী "সেই গ্রাম সেই সব মানুষ"—কোন্ গ্রাম, কোন্ সব মানুষ? লেখক গ্রামের নাম দিয়েছেন 'সোনাখড়ি'। এ নামের গ্রাম কি কোনোকালে ছিল, যেমন ছিল বিক্রমপুরের সোনারং গ্রাম, এবং (কে জানে) কত অখ্যাত বিস্মৃত তুল্যনামী গ্রাম? কিন্তু সোনাখড়ির ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক সত্তা আদৌ মস্ত কথা নয়। নাই বা ছিল সোনাখড়ি গ্রাম, নাই বা ছিল ভবনাথ-দেবনাথ-মুক্তকেশী-অলকা বউ-উমাসুন্দরী-কমল, এরা আর ওরা এবং আরো অনেক। বাস্তব সত্তাই একমাত্র সত্তা নয় মহত্তমসত্তর সত্তাও নয়। ইংরেজ চিত্রশিল্পী টার্নার সম্বন্ধে

কাহিনী আছে যে তিনি যে কালে একের পরে এক ছবি এঁকে যেতেন সূর্যাস্তের তখন জনৈক মহিলা-দর্শক বলেছিলেন, "মিঃ টার্নার, ছবিগুলির রং, সুন্দর, কিন্তু এরকম সূর্যাস্ত তো আমি কোনোদিন বাস্তবে দেখিনি।" টার্নার জবাব দিয়েছিলেন, "দেখেননি হয়তো, কিন্তু দেখতে পারলে কি সুখী হতেন না?" মনোজ বসুর সোনাখড়ি তেমনিই এক গ্রাম, ভবনাথ-দেবনাথ-উমাসুন্দরী-অলকাবউ তেমনই নরনারী যাঁদেরকে পাঠকেরা দেখেননি, লেখকও সম্ভবত হুবহু তাঁদের দেখেননি। দেখবেন কি করে? বস্তুত এই সব নরনারী রক্ত মাংসের নরনারী ছিলেন না। তাঁরা, তাঁদের নিবাস, তাঁদের রীতিনীতি আচারব্যবহার, ধ্যানধারণা তাঁদের স্বপ্ন, তাঁদের কর্ম কোনো লৌকিক জগতের ঠিক নায় মিলবে না, মিলবে আমাদের কল্পনার জগতে। কিন্তু তবুও এ সবই আমাদের অসংখ্য লৌকিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়া এবং সে জন্যই এদের একটা অনবদ্য প্রাকৃত সত্তাও ধরা পড়েছে এই কল্পনাসমৃদ্ধ রচনাকুশলী লেখকের কাহিনীতে। সোনাখড়ি নামের কোন গ্রাম থাক না থাক, পৃথিবীর যে-অঞ্চল সেদিন অবধি পূর্ববঙ্গ নামে পরিচিত ছিল, প্রাচীন ইতিহাসে সমতট, বঙ্গ বঙ্গাল নামে অভিহিত হত, যে-অঞ্চল ভারতীয় ইতিহাসের তিক্ততম বেদনাবিধুর অধ্যায়ে ভারত বা ইণ্ডিয়া থেকে বিযুক্ত হয়ে গেল, সেই পূর্ববঙ্গের একটি গ্রামীণ জীবন নিয়ে কাহিনী রচনা করেছেন মনোজ বসু এমন অপরিসীম সমানুভূতি নিয়ে, এমন নিপুণ চিত্রশিল্পের অবিস্মরণীয় বর্ণালীতে, এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথ্যসম্ভার দিয়ে যাঁরা সেই পূর্বঙ্গের গ্রামে বাস করেছেন অথবা যাঁরা পূর্ববঙ্গে না গিয়ে থাকলেও সেখানকার কথা জানেন, যাঁরা রাজনৈতিক রূঢ়তা সত্ত্বেও দুই বাংলার অচ্ছেদ্য সম্পর্কে বিশ্বাস রাখেন, তাঁদের সকলের কাছে সোনাখড়ি হবে একটি প্রতীক, ভবনাথ-দেবনাথ-উমাসুন্দরী-অলকা কমলের জীবন হবে সেই চিরন্তন বাংলার অবিনশ্বর সংস্কৃতির নিদর্শন, যে বাংলা সম্বন্ধে জীবনানন্দ লিখেছিলেন, "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে চাহি না আর।" নিষ্কম্প প্রত্যয়-গভীর বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, "পৃথিবীর এই সব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল;— এশিরিয়া ধুলো আজ—বেবিলন ছাই হয়ে আছে।" এই গ্রাম, এই সব মানুষদের উদ্দেশ্য করে মনোজ বসু উৎসর্গপত্রে লিখেছেন:

> তোমরা ছিলে। ত্রিভঙ্গ-স্বাধীনতার তাড়নায় বড় তাড়াতাড়ি
> শেষ হয়ে গেলে। আমার এই দীর্ঘশ্বাসে তোমাদের অন্তিম তর্পণ।

তোমরা ছিলে…শেষ হয়ে গেলে…অন্তিম তর্পণ—প্রতিটি কথায়

নিঃশেষিত-আয়ু আপনজনকে স্মরণ করা হয়েছে এবং এই প্রতীকী স্মরণের বেদনার্ত সংক্ষিপ্ত বাণীতে উদ্দিষ্ট হয়েছে সমগ্র পূর্ববঙ্গের হারিয়ে-যাওয়া জীবন।

মনোজ বসুর এই নিবিড় প্রেমসিক্ত চিত্রণে কিন্তু কোনো হাল্‌কা ভাবালুতা নেই। তাঁর চিত্রকর্মে তথ্যবস্তুর অসাধারণ ঐশ্বর্য। কত যে গ্রামীণ প্রথা ও বিশ্বাস তিনি ধরে রেখেছেন এই বইয়ে! তিনি উল্লেখ করেছেন কত সব গ্রাম্য প্রত্যয় ও সংস্কারের বিষয় যেগুলি আজকের নাগরিক জীবনে আর প্রবহমান নেই, গ্রাম অঞ্চলেও স্তিমিত হয়ে এসেছে, আজকের বিপর্যস্ত জীবন-সংগ্রামে যার বিলোপ ঘটেছে। তিনি বলেছেন নষ্টচন্দ্রের কথা ("আকাশের চাঁদ ঐ দিনে নষ্ট হয়ে যায়, দর্শন নিষেধ" পৃঃ ১২৪), ভাদ্রসংক্রান্তির কথা ("আজ যারা সকালবেলা শুয়ে গড়াবে, ভাদ্রমাস যাবার মুখে বেদম কিলিয়ে সর্বাঙ্গ তাদের ব্যথা-ব্যথা করে দিয়ে যাবে": পৃঃ ১২৬), কেন আকাশে প্রদীপ দিতে হয় মহালয়ার তর্পণের পর থেকে (পৃঃ ১৩৯—১৪০) ষষ্ঠীর দিন থেকে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা অবধি ঢেঁকির পাড় পড়তে নেই (পৃঃ ১৩৪) কোজাগরীতে "নিশিজাগরণ অক্ষক্রীড়া চিপিটক-নারিকেলোদকভক্ষণ": (পৃঃ ১৪৮), তিবিশে আশ্বিন সংক্রান্তির দিনে ধানবনকে সাধ খাওয়ানো—অর্থাৎ ধানের ক্ষেতকে মা ভেবে, মাকে গর্ভবতী কল্পনা করে মায়ের সুসন্তান জন্মাবে এই কল্পনায় মা'কে সাধ খাওয়ানো (১৪৯ পৃঃ), গারসির রীতিকর্ম (পৃঃ ১৪৯—১৫০)। নিরবচ্ছিন্ন নিপুণতায় মণ্ডিত করে, কাব-জনোচিত সহানুভূতির সঞ্চারে, নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক চেতনার প্রাচুর্য মিশিয়েছেন এই সংস্কারগুলির ব্যাখ্যায়, মূল কাহিনীর সঙ্গে এদের অন্তর্গ্রন্থনে। গ্রামে তো বাস করেছেন কত লেখক, কিন্তু মনোজ বসুর মতো এমন নিবিড় একাত্মতায় সেই গ্রাম্য সংস্কৃতির জ্ঞান ধারণ করে রেখেছেন আর ক'জন? গাছের নামই দিয়েছেন কত।—বেলতলি খেজুরতলি নারকেলতলি জামতলি বাদামতলি ডুমুরতলি (পৃঃ ৫৩)। আম আছে নানা জাতের—গোপলাধোপা, কালমেঘ, কানাবাঁশী, টুবে, চ্যাটালে, চুষি, কালমেঘা। তেমনি আবার ধানের নাম: "ধানের নামেই তো প্রাণ কেড়ে নেয়।" (পৃঃ ২০৩)—কাজলা, অমৃতশাল, নারকেলফুল, গজমুক্তা, সীতাশাল, গিন্নিপাগলা, শিবজটা, সোনা-খড়কে, সূর্যমণি, পায়রাউড়ি, বাদশাপছন্দ। মনোজ বসুর কাহিনীতে একটি চরিত্র আছে—রমণী দাসী—সে বলে ওক কথা, অর্থাৎ রাজপুত্তুর কোটালপুত্তুর পাতালবাসিনী-রাজকন্যা ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী গোবর-চাপা দেওয়া সাপের-মাথায় মাণিক—এই সব গল্প।

এবং এসব পূর্ণবিস্মৃত অথবা প্রায়-বিস্মৃত গ্রামীণ ধ্যানধারণা রীতিনীতি ও

কাহিনী পাঠকের কাছে তুলে ধরার সময় মনোজ বসু প্রয়োগ করছেন অজস্র শব্দ, যেগুলি আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে মূল্যবান সম্পদ : ব্যাগ্যেতা করছি, লকপকে ডাল, হাতনের বসিয়ে, ছ্যাবড়া-ছেমড়ি, হুতোশ-কাডা, হাতাবিতি, পাইতকে, ধাঁইপাই, তালিতুলি, মুড়োদাঁড়া, আসতিছ কোয়ানতে ? ইত্যাদি।

মনোজ বসুর এই বইয়ের নাম সর্বাঙ্গসার্থক এবং সৃজনীগুণসম্পন্ন. সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ। "তোমরা ছিলে"—এই জীবনকাহিনী কোনো অপ্রাকৃত কাহিনী নয়, কোনান্ ডয়েল-এর "লস্ট্ ওয়ার্ল্ড্" নয় যদিও অন্য অর্থে বাঙালী সংস্কৃতি থেকে এই 'বাঙালা' সংস্কৃতির ধারা আজ প্রায় লোপ পেয়েই গেছে। মনোজ বসুর কাহিনীতে শুধু যে বিস্মৃতপ্রায় সংস্কৃতি বিধৃত হচ্ছে তা-ই নয়, এ-কাহিনীতে একটা মহাকাব্যোচিত, এপিকসঙ্গত বিশালতা, গভীরতা, সূক্ষ্মতা, ব্যাপকতার রূপ ধরা পড়ছে। এ-কাহিনীতে একই কালে সংহত ও উচ্ছলিত, মায়াবী আলোর স্নিগ্ধ রহস্যময় এবং রৌদ্রতপ্ত প্রান্তরের সর্বপ্রকটী প্রকাশ্যতা।

কিন্তু আমার সংবেদনায়, মনোজ বসুর কাহিনী মহাকাব্যোচিত হলেও তাঁর কাহিনীকথনের করণ কৌশল মহাকাব্যপ্রকরণের চেয়ে অনেক বেশি জটিল, বিচিত্র এবং (স্বভাবতই) আধুনিক। এই কাহিনীতে বহু বিচিত্র শিল্পের প্রকরণ আশ্চর্য নম্রতায় সম্মিলিত হয়েছে : কাব্য, গল্পরীতি, নাটক, চিত্রশিল্প, সঙ্গীতশিল্প—সবই যেন মনোজ বসুর সৃজনী কল্পনায় জড়িয়ে গেছে হয়তো তাঁর নিজেরই অজ্ঞাতসারে (কেননা সৃজনী কল্পনা এবং লৌকিক বিচক্ষণতা সমমূল্যের নয়)। মনোজ বসু তাঁর কাহিনীকথন শুরু করেছেন এই ভাবে :—

যবনিকা তুলছি।

এই শতকের প্রথম পাদ। মানুষেরা সেই সময়ের। গ্রামের চেহারা ভিন্ন।

ছোট ছোট চারটি বাক্য, দীর্ঘতম বাক্যটিতে চারটি শব্দ, শেষের তিনটি বাক্যে ক্রিয়াপদ উহ্য। 'যবনিকা তুলছি' অর্থাৎ একটা নাটক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আমাদের (প্রেক্ষাগৃহস্থ দর্শকদের) চোখের সামনে। এই কাহিনীর বিধাতা-স্রষ্টা-কথাকার রঙ্গমঞ্চের এক কোণে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করছেন, 'যবনিকা তুলছি'। এ যেন কবি-নাট্যকার ডিলান্ টমাসের 'আণ্ডার মিল্ক্ উড্' নাটকের শুরুতে একটি কণ্ঠস্বর ঘোষণা করছে, 'To begin at the beginning', আমার কাহিনী শুরু হল।

মনোজ বসুর এই নাটকীয় ঢংয়ের কাহিনীকথন-সূচনা তাঁর সমগ্র করণ-

কৌশলের মহামূল্যবান আঙ্গিক বলে আমার মনে হয়। এই নাটকীয়তার প্রচ্ছদে লেখকের ঐকান্তিক আপন ব্যক্তিত্ব লীন হয়ে গেছে একটি ব্যাপক বহুশক্তিমান ব্যক্তিত্বে, অর্থাৎ ব্যক্তি মনোজ বসু রূপান্তরিত হয়ে গেছেন শিল্প-স্রষ্টা মনোজ বসুতে। এই রূপায়ণের ফলে যে সব মানুষ, যে-জীবন, যে-ধানধারণা তিনি পেশ করেছেন এই গ্রন্থে, সেগুলি একটি বিশেষ মানুষের আত্মকথন থাকছে না- সেগুলির রূপান্তর হয়েছে চিরস্থায়ী সত্যে। সুতরাং সম্পূর্ণ কাহিনীটি উজ্জ্বল হয়েছে পবিত্র প্রতীকের মূর্তিতে।

কিন্তু নাটকীয় সূত্রপাত থেকে আমরা এগিয়ে চলি গল্পকথনের আঙ্গিকে। এবার গল্প বলা শুরু হল ; সোনাখড়ির দেবনাথ ঘোষ আট বেহারার পাল্‌কি চড়ে এসেছেন স্বগ্রামে : এই টুকুন বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের কল্পনা বিশ শতকের চতুর্থ পাদ ছেড়ে ফিরে চলে যায় প্রথম পাদে। বাস্তবে যা সম্ভব নয়, তাই হল, অর্থাৎ সময়ের নদীপ্রবাহ না এগিয়ে গেল পিছিয়ে, (গল্পের আঙ্গিকে এমনটি হয়)। নাট্যধর্ম থেকে আমরা এসেছি গল্পকথনে, আবার কয়েক পৃষ্ঠা পরে (১৩ ১৪ পৃষ্ঠায়) এগিয়ে গেলাম কাব্যে, বর্ণনাধর্মী কাব্যে। এর পরে সঙ্গীতশিল্পে, চিত্রশিল্পে। কত না শিল্পের সমাবেশ ! মনোজ বসুর নাট্যাশ্রিত ব্যক্তিত্বে বহু শিল্প মিশেছে। সেই যে দুশো বছর আগে জার্মান দার্শনিক গট্‌-হোল্‌ড্‌ লেসিং বলেছিলেন যে শিল্পরূপগুলি বিভিন্ন নয়, শিল্পত্বের একান্ত কেন্দ্রীয় স্বধর্মে তারা সবাই সমান, তারা একে অন্যে পরিবর্তিত হতে পারে, সেই বিনিময়-রূপান্তরণ-সমীকরণের কৌশল বিশশতকী শিল্পের উজ্জ্বলতর কীর্তি। এই শতকের কাব্যে উপন্যাসে নাটকে এই রূপান্তরণ সমীকরণ সতত লক্ষ্য করা যায়। কবিতায় নাটকীয়তা চলে আসে, একটা সম্পূর্ণ কবিতার অঙ্গসৌষ্ঠব (যেমন এলিয়টের 'ওয়েইস্‌ট্‌ ল্যাণ্ড' কাব্যে) চতুর ভাবে একটা সিম্ফনির অঙ্গসৌষ্ঠবে মিশে যেতে পারে। এক শিল্পরূপ থেকে অন্য শিল্পরূপে উত্তরণ সব চেয়ে প্রকৃষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে সিনেমা জগতে। সিনেমা নিয়েছে চিত্রশিল্পের ও ধ্বনিশিল্পের ব্যঞ্জনা, কিন্তু নেওয়ার পরে উত্তমর্ণ শিল্পগুলিকে সুদে-আসলে ফিরিয়ে দিয়েছে মহার্ঘতর আঙ্গিক দান করে। সিনেমা-শিল্পের দৃশ্য-প্রতিমা (ভিসুয়াল্‌ ইমেজারি) মনোজ বসুর এই গ্রন্থের সমৃদ্ধতম আঙ্গিক। একের পরে আরেক দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে কল্পনার সামনে এসে দাঁড়ায়, মিলিয়ে যায়, আবার মিলেও যায় পরবর্তী অন্য একটি দৃশ্যের গায়ে। সতত সঞ্চরমাণ দৃশ্যাবলীর পারম্পর্য এমন ভাবে বর্ণিত হয়েছে যেন যে কোন দৃশ্য তার পূর্ববর্তী দৃশ্যের জঠর থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। সিনেমা শিল্পের অধুনা-সুপরিচিত আঙ্গিকগুলি— মনতাজ, কোলাজ, ফেড্‌-আউট, ক্লোজ আপ্‌ প্রভৃতি

আঙ্গিক—মনোজ বসুর এই গ্রন্থে অতীব নিপুণভাবে প্রযুক্ত হয়ে কাহিনী-কথনের ঐশ্বর্য বাড়িয়েছে।

বইখানা পড়তে পড়তে মনে হয়েছে, এই বইখানা লেখকের বিস্তীর্ণ গল্প-জগতের অংশমাত্র। "তোমরা ছিলে।" এই সব নরনারী একদা ছিলেন। কিন্তু তাঁদের জীবনে যে বিচিত্র বহমানতা ছিল সেই প্রবাহ প্রদর্শন করতে হলে, কাহিনীকে এগোতে হবে আরো। এগোতে হবে সেই ধাপে যেখানে "বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল", লেখকের এই বেদনাবিধুর উক্তিটি সার্থক হয়ে যায়, আরো অনেক নরনারীর, অনেক ঘটনার, অনেক আনন্দ বেদনা আশা-নিরাশার আবর্তের মধ্যে দিয়ে চলে, সর্বধ্বংসী নিষ্ঠুর বজ্রপাতের তুল্য দেশবিভাগের ফলে। সেই শেষের দিন সে ভয়ঙ্করের প্রতীক্ষায় বসে থাকবেন রুদ্ধবাক্ পাঠক।

মহাকালের প্রাসাদ-দ্বারে স্তুতিপাঠক ভট্টনায়ক

ডক্টর ভূদেব চৌধুরী

সাহিত্য জীবন-সম্ভব। শুধু তাই নয়, সার্থক সাহিত্য জীবনের চলমান চরিত্রকে অমরতা দান করে। জীবনের আর একটা অংশ ধরা থাকে ইতি-হাসের পাত্রে, বাসিফুলের মালা যদি সে না হয়, তবু স্রোতের সীমানা জোড়া বালুচরের মত পড়ে থাকে, প্রাণের শস্যশ্যামল শোভাটি তার কোথাও গজিয়ে তোলার প্রত্যাশা নেই। কিন্তু যদি পাই পলিমাটির চর।—পদ্মা-মেঘনা-সুরমায় যেমন দেখেছি, গঙ্গা-ভাগীরথীকেও দেখি।—তাহলে জীবনের বহতা স্রোতকে মুঠোর মধ্যে পাই কেবল মূর্তিমান কাঠিন্যের ঘনতায় নয়, প্রাণ-তরঙ্গিত-শ্যামশোভাময় দীপ্তিতে।

তেমনি পাওয়া যেত পূর্ববাংলার ভাটের গানে একদা, সেই স্মৃতি মথিত হয়ে এল আশ্চর্য এক কাহিনী পড়ার অনুভব,—মনোজ বসু লিখেছেন,—'সেই

ভূদেব চৌধুরী, এম. এ., পি-এইচ. ডি.: বিশ্বভারতী (শান্তিনিকেতন) বাংলা-বিভাগের প্রধান, বাংলা-সাহিত্য, বিশেষত বাংলা ছোটগল্প সম্বন্ধে স্মরণীয় গ্রন্থের লেখক।

গ্রাম, সেই সব মানুষ' পড়েছি, আর মনে মনে ভেবেছি,—পূর্ববাংলা ছিল ভূম্যধিকারী ছোটবড় রাজ-রাজড়া জমিদার-জোতদারের বিচরণভূমি। পূজোর সময়ে, এবং পুণ্যাহের মাসগুলিতে ভট্ট ব্রাহ্মণেরা আসতেন, প্রতি গ্রাম-ঘরের সম্পন্ন বংশাবলির ইতি তাঁদের নখদর্পণে। তাই কবিতার মত সাজিয়ে সমবেত দ্রুতকণ্ঠে সুর করে আবৃত্তি করে যেতেন—যেন উচ্চকণ্ঠ বাণীর ঝলমলে সুতোয় অফুরন্ত তথ্যের মালা গাঁথা।

কোন বাদ্যভাণ্ড অথবা তান-লয় সমন্বিত রীতিপদ্ধতির সঙ্গে মিলিত না কখনো—তবু তার সহজ প্রবহমান ঝঙ্কার এক স্বতন্ত্র আবেশ তৈরি করত। রূপকথা-কথকতার পাশে ভাটের গান ছিল আমাদের গ্রামীণ সাহিত্যের আর এক অপরূপ সম্পদ; সরস্বতীর সুরমন্দিরে ভাটেরা ছিলেন ইতিহাসের মালাকার।

'সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ' পড়তে পড়তে শিল্পী মনোজ বসুর ব্যক্তিসত্তার উত্তাপ খুব কাছে থেকে অনুভব করছিলাম। একালের পরিশীলিত বিচার-সচেতন চোখের কাছে সঠিক উপন্যাস তিনি ক'খানা লিখেছেন জানা নেই ;—কতদিন, কতভাবে মনে হয়েছে, 'যশোরের জলজঙ্গলার্দ্র গ্রামীন জীবনের মরমিয়া গাথাশিল্পী' তিনি ; বাদাবন-ধানবনের বাণী যাঁর চেতনার সুরে লেখনীর মুখে গান হয়ে ঝরে। আজ মনে হল, চোখের 'পরে ঘনীভূত হয়ে এল সেই শিল্পিসত্তার পরিণাম-ঘন অক্ষয় মূর্তি :—মহাকালের প্রাসাদ-দ্বারে স্তুতিপাঠক এক ভট্টনায়ক !

মহাসমুদ্রের মতই অতলস্পর্শ, অপারপাথার—এবং চল্লোচ্ছল মহাকালও ; সেই সঙ্গে নৈর্ব্যক্তিক নির্মম আত্মাপহারক। অনাগতের অভিমুখে অন্তহীন যাত্রার বেগে বর্তমান এবং অতীতকে ছুঁড়ে ফেলে যায় বিস্মৃতির অথৈ জলে। মহাকাব্য সেই মহাকালের অবাধ বিচরণভূমি। 'মহাভারত' মহাকাব্য, না মহা-ভারতের অমর ইতিহাস সে নিয়ে তর্ক রয়েইছে, কারণ 'মহাভারত' ঐ দুই-ই। নিরন্তর প্রবহমান নির্মায়িক মহাকালস্রোতের দেশ-কালাতিশায়ী চরিত্র 'মহাভারতে' মুদ্রিত রয়েছে। সে মূর্তি প্রকাণ্ড, প্রচণ্ড, এবং 'ধীরোদাত্তগুণান্বিত' !

কিন্তু ইতিহাসের আরো এক রূপ আছে, দেশকালের বিশেষিত পাত্রে তার প্রতিচ্ছবি মধুময়। প্রতি মুহূর্তে তা চূর্ণিত হচ্ছে মহাসমুদ্রের ঢেউ-এর মত—অন্তহীন মহাস্রোতের পুষ্টিসাধনে পদে পদে তার অন্তিম আত্মবিলয়। ভোরবেলাকার প্রথম রক্তিম আলোর কণিকাটি যে ফেনায়িত ঢেউয়ের মাথায় চিক্‌চিক্ করে—পরমুহূর্তে সে নিজেকে ভেঙেচুরে কুটিকুটি করে ফেলে। মধুবিহ্বল মন মুহূর্তে আক্ষিপ্ত হয়ে উঠে—'হায় কি হারিয়ে গেল !'—ভাটের গানে সেই মায়ামোহ-বিভঙ্গিম মধুরূপটিই আক্ষেপ-আলোড়িত স্মৃতির আভায় ঝক্‌ঝক্ করে ওঠে : বহমান ক্ষণকাল চিরকালীনতার গর্ভে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েও অমরতার দাবি নিয়ে হাত বাড়ায় করুণ-মেদুর সহৃদয়ের আকাশে।

একেই বলি ঐতিহ্য, শ্রদ্ধা এবং মমতার স্রোতে নিষ্ণাত হয়ে পুরাজীবন-কথা যখন পুরোবর্তী জীবন-চেতনার ঘাটে এসে ঢেউ-এর পর ঢেউয়ের হিল্লোল তুলে যায় ! ইতিহাস কেবল নির্জীব প্রত্নতথ্যের পঞ্জী নয়—ঐখানে তার প্রাণময় অক্ষয় অধিষ্ঠান। ইতিহাস আর কাব্যের সঙ্গমতীর্থ ভাটের গান, তথ্য সেখানে স্বপ্ন হয়ে মনকে ভুলিয়ে দিয়ে যায়।

শুধু তাই নয়, ভাটের গানের লয় আর ভঙ্গিমাটুকুও কত নিপাট। উচ্চারণ-

শৈলীতে বুকভরা নিশ্বাসের জোর উর্ধ্বশ্বাস দ্রুততায় ছুটত ; প্রতি দুই চরণে একটি সম্পূর্ণ পদ, পরবর্তী পদের আরম্ভে পূর্ববর্তী পদান্তের শেষ পর্ব পুনরুচ্চারিত হয়ে হয়ে অপরূপ এক আবহের সৃষ্টি করত। ঐটুকুই ছিল যেন ধুয়ো—আলাদা করে কোনো ধ্রুবপদ ছিল না।

হঠাৎ অতদিন পরে স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখি,—সেই বুকভরা আবেগের নিশ্বাস, সেই পুনঃপুনঃ আবর্তিত পুরা-প্রসঙ্গের পুনরুচ্চারণ—সেই উর্ধ্বশ্বাস ত্বরিতগতি, সব কিছু জড়িয়ে চলচ্ছবির মত ধেয়ে চলেছে নিটোল-নিপাট নিবিড় প্রেম ও প্রাণোদ্দীপ্ত একখণ্ড জীবন—ব্যক্তির—সমাজের—দেশকালের ; কালসমুদ্রে যা সগুনিমজ্জিত। তারই নাম 'সেই সব মানুষ'।

সকল সার্থক সৃষ্টিই স্রষ্টার আত্মরচনা। পড়তে পড়তে পদে পদেই মনে হয়—আজীবন স্বপ্নিল ভালোবাসার অঞ্জলিপুটে ধরে হারিয়ে-যাওয়া গ্রামীণ জীবন-মহিমার দেবীতলে শিল্পী মনোজ বসু যেন নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে পারলেন,—মুক্তির নিশ্বাস নিলেন এই মহাগ্রন্থে।

মহাগ্রন্থ বলছি আকার ও প্রকারের কথা ভেবে নয়, নিভৃত অন্তরঙ্গ জীবন-মহিমার স্পর্শে অভিভূত হয়ে থাকতে হয় বইটি পড়ার পর। মনে হয়, পরতে পরতে যেন মনোজ বসুর ব্যক্তিত্ব—তাঁর স্বপ্ন জড়ানো রয়েছে। নিজের জীবনকথা সম্পর্কে শিল্পী স্বল্প ভাষী। তবু অন্যত্র এ-কথা ভাবতে বাধে নি, মনোজ বসুর শিল্পি-প্রতিভা আসলে কৈশোর-স্বপ্নবদ্ধ ; কিশোরের আকাঙ্খার উত্তাপ, স্বপ্নের দীপ্তি, হতাশার কারুণ্য সবটুকু মিলে তাঁর শিল্পি-ব্যক্তিত্ব ; আর তার পুরো গঠন সম্ভাবিত হয়েছিল পল্লীপ্রকৃতির স্নিগ্ধ লালনে। সেখানে ব্যথাও জমে ছিল। পিতার হাত ধরে অতি শৈশবে স্বদেশী সভায় যাবার স্মৃতি আজও তাঁর মনকে বিভোর করে,—পিতার সান্নিধ্যই তাঁকে লেখার স্বপ্নে দীক্ষা দিয়েছিল ; তার পরে অকালে পিতার তিরোধান ঘটল, নানা সূত্রে কৈশোর-স্বপ্ন হয়ে গেল ছিন্নভিন্ন ; এ-সব তথ্য আছে তরুণ লেখক দীপক চন্দ্র'র 'মনোজ বসুর জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে। পরে দেখেছি সেই আক্ষেপ আর আকাঙ্খা ভরেই এগিয়েছিল সাহিত্যের পথে মনোজ বসুর পথ চলা।

সেই জীবন—সেই পথ অমর হয়ে রইল 'সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ'-এর মধ্যে। অনেকটা আক্ষরিক অর্থেই এ-বই শিল্পীর আত্মরচনা। গল্পের শরীরে কমলের সঙ্গে পথ চলতে গিয়ে থেকে থেকেই শিশু মনোজ বসুকে চোখে পড়ে, স্বদেশী সভায় দেবনাথের হাত ধরে চলা কমলের মধ্যে পিতা রামলাল বসুর হাত ধরে চলা চার-পাঁচ বছরের মনোজ বসুকে গোপন রাখা সম্ভব হয়নি—যিনি স্বদেশী সভায় গিয়ে 'বন্দেমাতরম্' গান শুনে এসেছিলেন। তাছাড়া ভর-

নাথ-দেবনাথকে ঘিরে যে পারিবারিক পরিমণ্ডল, তার পেছনে ডোঙাঘাটা গ্রামের (মনোজ বসুর জন্মগ্রাম) বসু পরিবারের স্মৃতিই কেবল উঁকি-ঝুঁকি দেয় নি ; সে সব রচনার লগ্নে বিন্দু বিন্দু স্বপ্ন যেন সুধা হয়ে ঝরেছে শিল্পীর মনের গহন হতে। রবীন্দ্রনাথের কথাই ঠিক, 'ঘটে যা তা সব সত্য নহে।'

যে জীবনের মাটি পায়ের তলা থেকে খসে গিয়েছিল সদ্য উদিত কৈশোর-অনুভবের সীমায়—তার স্মৃতি-পাথেয় নিয়ে সত্তর বছরের দিগন্ত পর্যন্ত পথ চলায় হত আক্ষেপ, যত লুব্ধতা, যত কল্পনা এবং কামনা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে জমা হয়ে চলেছিল চেতনার গভীরে—বাঁধ ভাঙা স্বপ্নস্রোতের মত তাই উদ্বেলিত হয়ে পড়েছে এই গ্রন্থের পাতায় পাতায়। সেই সঙ্গে জমেছে কারুণ্যের অনতিস্ফুট রক্তিমাভা ;—হারিয়ে গিয়েও ফিরে পাবার স্বপ্নে হৃদয়কে যা বিভোর করে রেখেছিল দীর্ঘদিন সেই শেষ আশ্রয়টুকুও হারিয়ে গেল বলে রাজনীতির পাশা খেলায়। একসঙ্গে আজীবন স্বপ্নের বিহ্বলতা এবং স্বপ্নভঙ্গের বেদনাকে একই সুতোয় গেঁথে 'সেই গ্রাম. সেই সব মানুষ' শিল্পীর সর্বাপেক্ষা প্রাণবন্ত পরিপূর্ণ আত্মরচনা।

এই গ্রন্থের মুখ্য আবেদন ঐখানেই। জেনে না জেনে শিল্পীকে, শিল্পীর জীবনস্বপ্নকে—এবং তারই গভীরে হারিয়ে-যাওয়া বাঙালি-জীবনের একটি অধ্যায়কে স্রষ্টার আবক্ষমথিত দীর্ঘশ্বাসের পাত্রে ধরে এক নিশ্বাসে পান করতে পারার অনুভব এবং আত্মমন্থন।

কালের হিসেবটা হয়ত আরো একটু উজিয়ে যাবে ; 'এই শতকের প্রথম প'দ'টুকু কমলের জীবনের নিরিখে উপন্যাসের কালসীমা,—কিংবা আরো স্পষ্টত ১৯০১—১৯১৪ ১৫ মনোজ বসুর প্রত্যক্ষ স্বগ্রাম-বাস অভিজ্ঞতার সীমারেখা। বস্তুত কমলের চিত্ত দর্পণেই তো মনোজ বসুর আত্ম-উৎসার গল্পের ধেয়ে-চলা স্রোতোধারায়। ত' না হলে, দেবন'থের চতুর্থ সন্তান কমল যখন স্বদেশী আন্দোলনের কালে (১৯০৫-১১) সভায় গিয়ে 'বন্দেমাতরম'-এর উচ্ছ্বাস বুক ভরে নিয়ে ফেরে—তখন ভবনাথ-দেবনাথের কালকে নিয়ে উনিশ শতকের উপান্তে পৌঁছে যাওয়া যায় অনায়াসে। কাল নিয়ে এ বিতর্ক আমার শিল্পীর সঙ্গে নয়—সেই পুরা জীবনের ঐতিহ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে জন্মাতে হয়েছে যে ইতিহাস-প্রহত তরুণতম পাঠককে. তার কাছে ইতিহাসে চৌহদ্দিটুকু এ-তে প্রাঞ্জলতর হতে পারে। সন্দেহ নেই. মৃত প্রত্নতথ্যকে প্রাণ দিয়েছে কৈশোর-ব্যথাহত শিল্পীর উচ্ছ্বাসিত কল্পনা ; কিন্তু সে আকাশকুসুম নয়,—উনিশ শতকের বাঙালি জীবনের ঘাটে নোঙর করা আছে সে স্বপ্ন বিকল্পিত কল্পনা।

তরণীর মূল। হারানো ইতিহাস কবির স্বপ্নে গাঁথা হয়ে অমর ভট্ট-সংগীত হয়ে ফুটেছে, এইখানেই এ বই-এর অনন্যতা।

তার আবেদনেও বৈচিত্র্য আছে, গুণ এবং পরিমাণে। অর্থাৎ রচনার আসল ব্যাপ্তা তো কাব্যকলার প্রযুক্তিগত নয়,—জীবনকে আহরণ এবং আত্মস্থ করতে পারার সঙ্গতি ও সার্থকতায়। আজকের বাঙালি পাঠকসমাজে সেই ক্ষমতার স্তরগত তফাত রয়েছে। শিল্পীর আপন কালের পাঠকের অনুভবের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি তিনি নিজে, স্রষ্টাই আপন রচনার প্রথম স্বাদয়িতাও। বর্তমান পাঠক শিল্পীর প্রায় আড়াই দশক পরে পৃথিবীতে এসেছিলেন—'সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ'কে প্রথম বুঝতে শুরু করেছিলেন ত্রিশের দশকের কোন সময় হতে। তবু সমানুভূতির ব্যথালুণ্ঠিত আবেগে ক্ষণে ক্ষণেই বিকম্পিত হতে হয়েছে। তারও পরে—অনেক পরে যাঁরা এসেছেন জীবনের দেহলিতে—'যাঁরা ত্রিভঙ্গ স্বাধীনতার' পরে এই পৃথিবীতে প্রথম চোখ মেলেছেন,— সেই তরুণ এবং সজীবতম পাঠকের চিত্ত পুনঃপুনঃ আক্ষেপের সঙ্গে ভাববে—কি করে, কেন হারিয়ে গেল আজ 'সে স্বপ্নলোকের চাবি।'

কিন্তু হারিয়ে সে যায়ই, মহাকালের ঐটুকু অমোঘ বিধান। রাজনীতির পাশাখেলা এমন মর্মান্তিক না হলেও, তার বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে পড়ত। ভবনাথের অনুভবে তার নিষ্ঠুরতম স্বাক্ষর :—হিরন্ময়ের বিয়ে তাঁর জীবনের মর্মমূলে অগ্নি-আখরে লেখা।—তাছাড়াও কৃষ্ণময় ও অলকাবউ-এর দিন দুপুরে দরজা খিল দেবার খবর বিনো এনে দিয়েছিল তরঙ্গিণীকে, কিংবা ভব-নাথের পোষ্য প্রজার ছেলে কেমন বেয়াড়াপনা করেছিল। এ-জীবন ভাঙছিল —ভাঙতোই। আসলে ভাটের গানের ঐটুকুই চরম আবেদন, মহিমার সঙ্গে বেদনা; গৌরব-বোধের সঙ্গে হারিয়ে ফেলার দীর্ঘশ্বাস এক সুতোয় একত্র গাঁথা।

তবু 'ত্রিভঙ্গ-স্বাধীনতার তাড়নার' বিরুদ্ধে নালিশ কিছু থাকে বৈ কী। আমরা যাঁরা একটু কাছে—লেখার জগৎ আর লেখক দুয়েরই—বিশেষ করে আমাদের। 'সেই গ্রাম, সেইসব মানুষ' নিয়ে গল্প কিছুতেই এগোতে পারল না চার-চ'বছরের সীমানা পেরিয়ে। কমলের বড় হওয়ার—বড় হয়ে ইতি-উতি ভাবনার একটা দুটো সঙ্কেত আছে—কিন্তু কমলের কৈশোর-সীমার বাইরে এই জীবন-অভিজ্ঞতার বলয়রেখা প্রসারিত হতে পারনি। কমল—কিশোর মনোজ বসু—'সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ' হতে আকৈশোর ভাগ্য-নির্বাসিত; স্বপ্ন-সংযোগের সূত্রটুকুও ছিঁড়ে ভিঁড়ে দিলে ঐ 'ত্রিভঙ্গ-তাড়না'। তা না

হলে গল্প কি মহাকাব্যের রাজপথে ধীর মন্থর পদপাতে এগোত?

এটুকু উত্তরহীন জিজ্ঞাসা! তার অভাবে ক্ষতি কিছু হয়নি; ভট্টসংগীতে কারুণ্যের সুরটুকু বাঁধা হয়েছে আরো জমাট করে। 'সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ' অতীতের ঐতিহ্য, স্বপ্ন ও গরিমা-বোধকে হারিয়ে-ফেলার বেদনার সূত্রে গেঁথে মন্থিত আবেগের ধারায় বলয়াবর্তিত করে ফিরেছে। এই স্বপ্ন, এই আক্ষেপ, এই মন্থন এবং আবর্তনাই চিরকালের পাঠকের চেতনায় তার শাশ্বত আবেদন।

আনন্দবাজার পত্রিকা

ওপার বাঙলা, সেকালের সেই পূর্ববাঙলা, অনেকের কাছেই আজ এক স্মৃতির দেশ। মনোজ বসুর নস্ট্যালজিক কল্পনা বার বার সেই স্মৃতিসঞ্জীবিত জগৎটির চার পাশে পরিক্রমা করে, সেই জগৎটিকে নতুন করে গড়ে বার বার ফিরিয়ে দেয় আমাদের কাছে। সেই হারানো দিন, পুরনো দিনের জন্য তাঁর বেদনামিশ্রিত অনুরাগ অ ব তিক্ত ক্ষোভ, কিছুই অগোচর থাকেনি তাঁর এই সাম্প্রতিক উপন্যাসটির মধ্যেও। উৎসর্গপত্রেই তার প্রমাণ দেখি। 'আমার এই দীর্ঘশ্বাসে তোমাদের অন্তিম তর্পণ।' কাদের জন্য তাঁর এই দীর্ঘশ্বসিত স্মৃতিতর্পণ? নিপুণ সূত্রধারের মত বাঙলাদেশের ইতিহাসের একটি পূর্বপট তুলেছেন এই কাহিনীর নেপথ্য বিধাতা: 'যবনিকা তুলছি। এই শতকের প্রথম পাদ। মানুষের সেই সময়ের। গ্রামের চেহারা ভিন্ন!' এমনি করে স্মৃতির উজানে পাঠককে সঙ্গে নিয়ে বাঙলাদেশের যে গ্রামে প্রবেশ করেন লেখক, সেখানে পূর্ববাঙলার সোনাখড়ি গ্রামের জমিদারি সেরেস্তার সদর নায়েব 'ধনীমানী' গৃহস্থ দেবনাথ ঘোষ, তাঁর দাদা ভবনাথ, স্ত্রী তরঙ্গিণী, বৌদি উমাসুন্দরী, দিদি মুক্তকেশী, ছেলে কমল, মেয়ে চঞ্চলা—এদের পাশা-পাশি পরিবারের অন্যান্য মানুষজন, গ্রামের নানা বৃত্তিজীবী মানুষের বিচিত্র মুখের

মেলা, গ্রাম বাঙলার ঋতুচক্রের আবর্তন, গ্রামীণ মানুষের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, প্রথা-প্রকরণ, সংস্কার, বিশ্বাস সব কিছুর মধ্যে দিয়ে তিনি সেই বিগত দিনের একটি বিশ্বাসযোগ্য ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন আমাদের সামনে। কালবৈশাখীর ঝড়ে আম কুড়োনোর ধুম, দুর্গাপূজোর নানা রীতকরণ, গ্রাম্য থিয়েটার, আভিচারিক নানা তুকতাকের চিকিৎসা, আশ্বিনের সংক্রান্তির দিনে ধানকে সাধ খাওয়ানো, 'গারসি'-র নিয়মকানুন, নষ্টচন্দ্রের রাত, কাঁসন্দি তৈরী করা, বড়ি দেওয়া, পিঠে পরবের অনুষ্ঠান. গডমণ্ডলের রথের মেলা, গ্রাম্য পাঠশালা, নানা শ্রেণীর গাছপালা, ধান, আম আর অন্যান্য প্রসঙ্গের বিচিত্র বর্ণনার ভিতর দিয়ে আবহমান বাঙলাদেশ আর বাঙালী সংস্কৃতির একটি চলচ্চিত্র ও স্মৃতিআলেখ্য রচনা করেছেন তিনি এখানে। এখানকার বাঙলা উপন্যাসে এ এক অনাস্বাদিতপূর্ব অভিজ্ঞতা।

আজকের উনিশশো ছিয়াত্তরে দুই প্রজন্মের মানুষের কাছে এই বইয়ের একটি দ্বিমুখী মূল্য রয়েছে। এই শতাব্দীর সমানবয়সী যাঁরা, অথবা একটু আগে পিছে যাদের বয়স, তাঁরা বেশ স্মৃতিভারাতুর হয়ে যাবেন এই বই পড়ে, অতীতের পুনর্নির্মাণ ঘটবে তাঁদের কল্পলোকে, পুরনো সেই দিনগুলো জীবন্ত হয়ে উঠবে তাঁদের বর্তমানে ; আর একালের নব্য মানুষের দল ঈষৎ সংশয়ী বিশ্বাস আর অবিশ্বাস মেশানো চোখে ডুব দেবেন রোমান্সের ঘো... গা অনতি-সুদূর ঐ অতীতের জগতে। এসব কিছুর বাইরে, একালের পাঠকদের চারপাশে একটি চণ্ডীমণ্ডপ গড়ে দিয়েছেন মনোজ বসু, হাতে সেই জাদুদণ্ড, স্মৃতি যার অন্য নাম—সেই জাদুর ছোঁয়ায় এই শতকের গোড়ার দিককার কপোতাক্ষ নদীসন্নিহিত এক সোনাখড়ি গ্রাম, তার মানুষজন, আচার ব্যবহার প্রতিদিনের শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবন সবকিছু ছবির মত একে একে ভেসে যায় আমাদের সামনে দিয়ে।